

ভারতের সাধক

১৩৭০ সালের রবীন্দ্র পুরস্কার জয়ী শ্রেষ্ঠ জীবনীগ্রন্থ



ভারতের সাধক

তৃতীয় খণ্ড

শঙ্করনাথ রায়

পরিবেশনা : হিমাদ্রি সংসদ
১৬, গণেশচন্দ্র এভেন্যু, কলিকাতা-১৩

৪র্থ সংস্করণ
১৯৬৭

প্রকাশনা
বিশ্বরঞ্জন গোস্বামী
সি-৮, এল. আই. জি হাউসিং এষ্টেট
৩৭, বেলগাছিয়া রোড
কলিকাতা-৩৭

পরিবেশনা
হিমাদ্রি সংসদ
১৬, গণেশচন্দ্র এভেন্যু, কলি-১৩

প্রচ্ছদপট
সুপ্রকাশ সেন

মুদ্রণ
রামকৃষ্ণ পাল
শ্রীনারসিংহ প্রেস
৫, বঙ্কিম চাটার্জি ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

বাঁধাই
সেঞ্চুরী বাইণ্ডিং কোং
৪৫, বৈঠকখানা রোড
কলিকাতা-৯

বারো টাকা

প্রকাশকের নিবেদন

তৃতীয় খণ্ড 'ভারতের সাধক'-এর পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হলো।

প্রথম প্রকাশের পর থেকেই বিভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত এই মহান গ্রন্থ দেশের সাহিত্যরসিক ও অধ্যাত্মরস-পিপাসু পাঠকদের বিপুল সমর্থন লাভ ক'রে আসছে। তাছাড়া, বিদগ্ধ সমালোচক ও বিশিষ্ট পত্র-পত্রিকাসমূহ এ যাবৎ যে স্বীকৃতি ও অভিনন্দন একে জানিয়েছেন, বাংলাদেশের খুব কম সাহিত্যকর্মের ভাগ্যেই তা মিলেছে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয়, ১৩৭০ সালে 'ভারতের সাধক' বহুলখ্যাত রবীন্দ্র-পুরস্কার জয়ের সম্মান লাভ ক'রে এবং সমকালীন জীবনী-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থরূপে চিহ্নিত হয়ে ওঠে।

আজকের দিনে ভারতের সাহিত্য, সংস্কৃতি, সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্ব স্তরে দেখা দিয়েছে অবক্ষয়ের সূচনা। এই অবক্ষয় নিবারণ করতে হলে, জাতির ব্যবহারিক ও আত্মিক জীবনের পুনর্গঠন করতে হলে, এই ধরণের কল্যাণবহ গ্রন্থের প্রয়োজন আজ সর্বাধিক। কারণ, এর ভেতর দিয়ে পাই আমরা ভারতীয় সাধকদের আদর্শ, ত্যাগ-তিতিক্ষা, তপস্যা ও সিদ্ধির দিক্‌দর্শন, জান্‌তে পারি আমাদের প্রকৃত আত্মপরিচয়। এজন্যই ভারতের সাধক-এর প্রকাশনার কাজে সানন্দে আমরা এগিয়ে এসেছি। ইতি—

প্রকাশক

পূজ্যপাদ পিতৃদেবের
করকমলে—

—শঙ্করনাথ

পূজ্যপাদ পিতৃদেবের
করকমলে —

— শঙ্করনাথ

ভূমিকা

'ভারতের সাধক' বাংলার রসিক ও গুণগ্রাহী পাঠকবর্গ পরম সমাদরে গ্রহণ করেছেন।

আধুনিক বাংলা-সাহিত্যে ভারতের সাধক চিরস্থায়ী আসন করে নিয়েছে।

বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যানে, লিখনভঙ্গীর অপরূপতায়, ভাবের আন্তরিকতায়, আত্মিক জীবনের গূঢ় রহস্যের উদঘাটনে 'ভারতের সাধক' আপাতত একক ও অনন্যসাধারণ,—পাঠক ও সমালোচক উভয়েই তা একবাক্যে স্বীকার করেছেন।

এ জাতীয় গ্রন্থের প্রকাশে লেখক ধন্য, প্রকাশক কৃতার্থ, পাঠক সুতৃপ্ত এবং সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়।

প্রথম দুখণ্ডে যা অপূর্ণ ছিল, বর্ত্তমান খণ্ডে অর্থাৎ তৃতীয় খণ্ডে তা সম্পূর্ণ হলো। প্রথম দুখণ্ড লেখকের প্রতিভার পরিচয় দিয়েছে, তৃতীয় খণ্ডে সে প্রতিভা প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে।

যে বিরাট ইমারতের সূচনা হয় প্রথম দুখণ্ডে, তৃতীয় খণ্ডে, তা হয়ে উঠেছে বিপুল-আয়তন।

সচরাচর সংস্কৃত নাটকের তৃতীয় অঙ্কে নাট্যকারের প্রতিভার সবিশেষ দ্যুতি জ্বলে ওঠে, 'ভারতের সাধক' তৃতীয় খণ্ডে তেমনি কৃতী লেখকের প্রতিভার পূর্ণ পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হয়েছে।

বিষয়-বস্তুর দিক থেকেও তৃতীয় খণ্ড প্রথম দুখণ্ডকে এগিয়ে দিয়েছে।

ভারতের সুদীর্ঘ সাধনার ইতিহাসে যে সব কালজয়ী মহাপুরুষ নিজেদের সাধনার বৈশিষ্ট্যে মানব-মনের নতুন পথের সন্ধান দিয়ে গিয়েছেন, গ্রন্থকার এই তৃতীয় খণ্ডে সেই নব-পথিকৃৎদের অনেককে একত্রে উপস্থিত করেছেন।

দীর্ঘ পথ, বিচিত্র পথ। সে বিচিত্র দীর্ঘ পথের একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে শঙ্করাচার্য্য, আর এক প্রান্তে শ্রীঅরবিন্দ।

যুগ-প্রবর্ত্তক যে-সব মহাপুরুষ নিজেদের জীবন ও সাধনার বৈশিষ্ট্যে ভারত-মনে অক্ষয় অমৃত স্পর্শ রেখে গিয়েছেন, গ্রন্থকার তাঁদের সকলকে সজীব করে তুলে ধরেছেন। তুলে ধরেছেন তাঁদের প্রত্যেকের সাধনার গূঢ় স্বাতন্ত্র্যকে।

'ভারতের সাধক' মহাপুরুষদের জীবনের কাহিনী শুধু নয়, তাঁদের সাধনার কাহিনীকেও লেখক অপূর্ব্ব বৈজ্ঞানিক নিষ্ঠায় তুলে ধরেছেন। বর্ত্তমান খণ্ড লেখকের সেই অনন্যসাধারণ নিষ্ঠা, অনুশীলন ও রসগ্রাহিতার চরম পরিচয়।

ব্যক্তিগতভাবে এই গ্রন্থ পড়ে যে-আনন্দের স্বাদ আমি পেয়েছি, সেজন্য অন্তর থেকে লেখককে আমার অন্তরের প্রীতি ও নতি জানাচ্ছি।

এই বই পড়া মানে, ভাব-গঙ্গায় অবগাহন স্নান করা।

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

সূচীপত্র

আচার্য্য শঙ্কর	...	১
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য	...	৫৪
কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ	...	১৫৬
ভক্ত তুকারাম	...	১৬৭
গোস্বামী তুলসীদাস	...	১৯০
মাতৃসাধক রামপ্রসাদ	...	২১০
পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ	...	২৩০
শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস	...	২৪৮
প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী	...	৩১০
বিশুদ্ধানন্দ পরমহংস	...	৩৫৯
মহর্ষি রমণ	...	৩৮৭
শ্রীঅরবিন্দ	...	৪৫৮

আচার্য্য শঙ্কর

যতিবেশধারী নম্বুদ্রি বালক একাকী একমনে আগাইয়া চলিয়াছে। মুণ্ডিত মস্তক, নগ্ন পদ। পরিধানে শুধু কৌপীন আর বহির্ব্বাস। হস্তে দণ্ড কমণ্ডলু। পথচারীরা একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকে এই দিব্যকান্তি, সৌম্যদর্শন বালক সন্ন্যাসীর দিকে। সে যেন এক পরম বিস্ময়! বয়স আট বৎসরের বেশী নয়, কিন্তু এই বয়সেই ঘরের মায়া ছাড়িয়া কোন্ অজানার উদ্দেশে সে বাহির হইয়া পড়িয়াছে?

দাক্ষিণাত্যের সুদূর কালাড়ি গ্রাম হইতে শুরু হয় বালকের এই পদযাত্রা। তারপর দীর্ঘ দিন গত হইয়াছে, দীর্ঘ পথ হইয়াছে অতিক্রান্ত। এবার পবিত্র নর্ম্মদার কূলে পেঁ ৗছিয়া তাহার আনন্দের অবধি রহিল না।

স্নান-তর্পণ, পূজা-বন্দনা শেষ হইয়া যায়, তারপর নদীর গতিপথ ধরিয়া আবার চলে পরিব্রাজন। নর্ম্মদার তীরে তীরে কোন্ পরশমণি সে খুঁজিয়া ফিরে, কে জানে!

কবে কোন্ এক শুভ মুহূর্ত্তে মহাযোগী গোবিন্দপাদের নামটি তাহার কানে আসিয়া পশে, হৃদয়ে তখনি গাঁথা হইয়া যায়। তারপর অভ্যাগত সাধুসন্তদের কাছে, চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকদের কাছে এই মহাত্মার কাহিনী সে কম শোনে নাই। অপরিমেয় তত্ত্বজ্ঞান ও যোগবিভূতির অধিকারী এই গোবিন্দপাদ স্বামী। সারা দাক্ষিণাত্যে তাঁহার ঋদ্ধি সিদ্ধির খ্যাতি প্রচারিত। জনশ্রুতি শোনা যায়, ঋষিবর পতঞ্জলি নাকি এই মহাত্মার সিদ্ধদেহ আশ্রয় করিয়া আছেন। নিভৃত গিরিকন্দরে লোকলোচনের অন্তরালে দীর্ঘকাল ইনি রহিয়াছেন সমাধিস্থ।

বালকের হৃদয়ে জাগিয়া উঠিয়াছে দুর্ব্বার আকাঙ্ক্ষা। কোথায় বিরাজ করেন এই বহুজনবাঞ্ছিত মহাযোগী? কোথায় তাঁহার রহস্যঘন সেই

সুগোপন ধ্যানগুহা ! ব্যাকুল হৃদয়ে সন্ধান সে এযাবৎ কম করে নাই। পথে প্রান্তরে অরণ্যে পর্ব্বতে কত ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে, কত মঠ, মন্দির ও সাধকদের দ্বারে ফিরিয়াছে তাহার প্রশ্ন নিয়া।

ভাগ্য সেদিন বড় প্রসন্ন হইয়া উঠিল। নর্ম্মদার তীরে দৈবক্রমে এক অতিবৃদ্ধ সন্ন্যাসীর সঙ্গে বালকের দেখা। কৃপাভরে তিনি কহিলেন, "বৎস, তুমি মহা ভাগ্যবান, তাই এ বয়সেই জেগেছে সত্যকার মুমুক্ষা। কিছুটা দূরেই ওঙ্কারনাথ। সেদিকে তুমি এগিয়ে যাও। আশীর্ব্বাদ জানাই, তোমার প্রার্থিত ধন লাভ হোক্।"

নর্ম্মদার স্রোতধারা খণ্ডিত করিয়া দণ্ডায়মান ওঙ্কারনাথ পাহাড়। পুরাণ সাহিত্যে ইহাকে বলা হইয়াছে বৈদূর্য্যমণি পর্ব্বত। এক সময়ে ভক্তবীর মান্ধাতার রাজধানী ছিল এই স্থানে। ওঙ্কারনাথ, মহাকাল প্রভৃতি জাগ্রত শিবলিঙ্গ এই পবিত্র পাহাড়ের কোলে যুগ যুগ ধরিয়া বিরাজিত। আজও ভারতের দিকদিগন্ত হইতে অগণিত তীর্থযাত্রী এখানে সমবেত হয়, ভক্তিভরে অর্পণ করে শ্রদ্ধাঞ্জলি।

বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর আশ্বাসবাণী কানে গুঞ্জরণ করিয়া ফিরিতেছে। আকুল আগ্রহে বালক তাই তাড়াতাড়ি ওঙ্কারনাথ পর্ব্বতে আরোহণ করিতে থাকে। পাঁতি পাঁতি করিয়া সকল স্থানই খোঁজা হইয়া গেল। কিন্তু কই ? মহাত্মার কোন সন্ধানই তো নাই ! এমন সময় হঠাৎ চোখে পড়িল জঙ্গলাবৃত এক অপ্রশস্ত গুহামুখ।

ভিতরে প্রবেশ করিয়া বালক থমকিয়া দাঁড়ায়। সুড়ঙ্গটি ক্রমে এক প্রশস্ত গিরিকন্দরে আসিয়া মিশিয়াছে। সম্মুখে তাহার দেখা যায় এক বিস্ময়কর দৃশ্য ! জটাজুট সমন্বিত কয়েকজন প্রবীণ যোগী এখানে ধ্যানস্থ রহিয়াছেন, আর স্বল্পালোকিত গুহার অভ্যন্তরে বিরাজ করিতেছে অলৌকিক গাম্ভীর্য্য !

সন্ন্যাসী বালক তাহার হৃদয়াবেগ আর চাপিয়া রাখিতে পারে না। অনতিদূরে নয়ন মুদিয়া বসিয়া আছেন এক প্রাচীন তাপস, সাষ্টাঙ্গ

প্রণাম করিয়া বালক উচ্চকণ্ঠে নিবেদন করে, "প্রভু, আমার ধৃষ্টতা ক্ষমা করুন! মহাযোগী গোবিন্দপাদ স্বামীর করুণাপ্রার্থী আমি। বহুদূর থেকে এই কামনা নিয়েই শুধু এসেছি। তাঁর সন্ধান বলে দিয়ে এ আর্ত্ত বালকের প্রাণ রক্ষা করুন।"

বাহ্য-বিস্মৃত সাধকের কানে এ স্বর সহজে পৌঁছিবার নয়। গুহাগাত্রে বার বার উহা ধ্বনিত হইতে থাকে। খানিক বাদে মৌনী মহাত্মাকে নয়ন উন্মীলন করিতে দেখা যায়।

নতজানু বালক সন্ন্যাসী বার বার আকুতি নিবেদন করিতেছে, গণ্ড বাহিয়া ঝরিতেছে অশ্রুধারা।

তাহার কাতর প্রার্থনা ধ্যানমগ্ন মহাপুরুষকে টলাইয়া দিল। কৃপাভরে হস্ত উত্তোলন করিয়া দিলেন বরাভয়।

ধুনীর আগুন নিভিয়া গিয়াছে—প্রদীপ জ্বালাইবার উপায় নাই। দুই খণ্ড প্রস্তর ঘষিয়া নিয়া বৃদ্ধ তাপস আলোক প্রজ্বলিত করিলেন। তারপর দীপটি হাতে তুলিয়া নিম্নস্বরে কহিলেন, "বৎস, এস, আমার অনুসরণ কর।"

গিরিকক্ষের এক প্রান্তে আসিয়া তাপস থামিয়া গেলেন। অঙ্গুলি সঙ্কেতে দেখাইলেন একটি গর্ভগুহা। একটি নাতিবৃহৎ প্রস্তরখণ্ড উহার প্রবেশপথ রুদ্ধ করিয়া আছে। স্নেহমধুর কণ্ঠে কহিলেন, "বৎস, সামনের গুহার ভেতরেই মহাযোগী গোবিন্দপাদ রয়েছেন সমাধিস্থ। ওঙ্কারনাথ পাহাড় আর নর্ম্মদাতীর উদ্ভাসিত হয়ে রয়েছে এঁর তপঃপ্রভায়। যাঁর সূক্ষ্মদৃষ্টি খুলেছে সে-ই শুধু তা দেখতে পায়। দীর্ঘকাল ধরে এখানে আমরা পড়ে রয়েছি এঁরই কৃপার আশায়। কিন্তু মহাযোগী কবে সমাধি হতে ব্যুত্থিত হবেন, তা কেউ জানে না! তোমার যা কিছু বল্‌বার আছে তা এখানে দাঁড়িয়েই জানাও।"

"কিন্তু প্রভু, আমি যে যোগীরাজকে দর্শন করার কামনা নিয়েই দূর দুর্গম পথ বেয়ে এখানে এসেছি। শুধু তাই নয়, তাঁর আশ্রয় না পাওয়া অবধি যে আমার শান্তি নেই।"

"বৎস, বুঝতে পারছি—তুমি মহা ভাগ্যবান। তাই জন্মান্তরের সাত্ত্বিক সংস্কার এই বয়সেই তোমাতে স্ফুরিত হয়ে উঠেছে। তুমি শক্তিধরও বটে। বেশ তো, এই প্রস্তর-দ্বার উন্মোচন করে মহাযোগীকে তোমার প্রার্থনা জানাও।"

বালক সন্ন্যাসীর অন্তরতলেও পৌঁছিয়াছে মহাত্মা গোবিন্দপাদের কৃপা-ইঙ্গিত। সে বুঝিয়া নিয়াছে—পাষাণ প্রাচীরের আড়ালে অবস্থিত এই মহাপুরুষই তাহার অধ্যাত্ম-জীবনের আলোক-দিশারী, তাহার ইহ-পরকালের পরমাশ্রয়।

অমিততেজা এই বালক। হৃদয়ে তাহার নিরন্তর জ্বলিতেছে বিশ্বাসের দীপশিখা। নির্ভয়ে গুহার দ্বারে সে হস্তার্পণ করিল।

গুহাবাসী অপর সাধকদের ধ্যান ইতিমধ্যে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আগাইয়া আসিয়া বালকের সঙ্গে তাঁহারাও হাত মিলাইলেন। প্রস্তরদ্বার ধীরে ধীরে খুলিয়া গেল।

প্রদীপের আলোকে অমনি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল মহাযোগীর মহিমময় মূর্ত্তি। নয়ন ছুইটি ধ্যান নিমীলিত, তপঃসিদ্ধ দেহে বিস্তারিত অলৌকিক জ্যোতির আভা। সারা দেহে জীবনের কোন লক্ষণ নাই, অথচ অবলীলায় মৃত্যুকে পরাজিত করিয়া সমাসীন রহিয়াছেন আত্ম-জ্ঞানের উত্তুঙ্গ চূড়ায়।

হাতের প্রদীপ ভূতলে নামাইয়া রাখিয়া বালক যুক্তকরে স্তবগাথা গাহিতে শুরু করিয়া দিল। সমবেত সাধকগণ নীরবে, সবিস্ময়ে তাহার কাণ্ড দেখিতেছেন আর ভাবিতেছেন—অদ্ভুতকর্ম্মা এই বালক! নিশ্চয় দৈববলে সে বলীয়ান, নতুবা সমাধিস্থ গোবিন্দপাদের সম্মুখে কে এমন সাহসে দাঁড়াইবে, তাঁহাকে আহ্বান জানাইবে? যোগীগুরু তবে কি নিজেই এই চিহ্নিত সাধককে আজ এমন করিয়া আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছেন?

গোবিন্দপাদ ধীরে ধীরে নয়ন উন্মীলন করিলেন। ঝরিয়া পড়িল

দিব্য কৃপার অমৃতধারা। মুমুক্ষু বালক যোগীবরের আশীর্ব্বাদ ও আশ্রয় লাভে ধন্য হইল।

সেদিনকার এই ভাগ্যবান নম্বুদ্রি ব্রাহ্মণ তনয়ই ভারতের বহুবিশ্রুত মহাপুরুষ—শঙ্করাচার্য্য। 'কৌপীনবন্ত খলু ভাগ্যবন্ত' বলিয়া মহাজ্ঞানী আচার্য্য উত্তরকালে যে শ্লোক রচনা করিয়া যান, কৌপীনধারী অষ্টমবর্ষীয় বালকরূপেই সে সৌভাগ্যকে নিজ জীবনে তিনি আবাহন করিয়া আনেন।

ওঙ্কারনাথের গিরিগুহায় এমনিভাবে সেদিন শঙ্করের অধ্যাত্ম-জীবনের দৃশ্যপটখানি উত্তোলিত হয়। এসময়ে তাঁহার বয়স মাত্র আট বৎসর। চার বৎসরের মধ্যে অসামান্য যোগসিদ্ধি ও শাস্ত্রজ্ঞান হয় তাঁহার করায়ত্ত। তারপর গুরু গোবিন্দপাদের আদেশে হিমালয়ের নিভৃত ধাম বদ্রিকাশ্রমে বেদান্তভাষ্য প্রভৃতি রচনায় রত হন। গুরুর আদিষ্ট এ দায়িত্বপূর্ণ কাজ যেদিন সম্পূর্ণ হয় সেদিন তিনি এক ষোড়শ বর্ষীয় কিশোর মাত্র।

এই নবীন অচার্য্যের চরণে আত্মনিবেদন করিয়া ধন্য হন সমসাময়িক কালের বহু শক্তিধর পণ্ডিত ও সাধক। এই অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিষ্যদল সঙ্গে নিয়াই শঙ্কর ভারত বিজয়ে বাহির হইয়া পড়েন। হিমালয় হইতে কন্যাকুমারী, দ্বারকা হইতে কামাখ্যা—বিস্তীর্ণ অঞ্চল ব্যাপিয়া ঘোষিত হয় এই লোকোত্তর পুরুষ ও যুগাচার্য্যের জয় জয়কার। একটি মানুষের জীবনে মনীষা, কর্ম্মকুশলতা ও অধ্যাত্মশক্তির এমন সমন্বয় বিরল। সারা বিশ্বের ইতিহাসে ইহার তুলনা নাই।

শুধু দিগ্বিজয় করিয়াই শঙ্কর এ সময়ে ক্ষান্ত হন নাই, ভারতের অধ্যাত্মজীবনে এক নূতন স্রোত তিনি সঞ্চারিত করেন, নূতনতর মনন ও ভাষ্যের মধ্য দিয়া করেন অদ্বৈত-বেদান্তের প্রাণ প্রতিষ্ঠা। জ্ঞানগঙ্গার যে প্রবাহকে ভারতভূমিতে তিনি আবাহন করিয়া আনেন, অজস্র ধারায় সমগ্র বিশ্বমানবের জীবনে তাহা বিস্তারিত হয়।

এই বিরাট বিস্ময়কর কাজ আচার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন মাত্র বত্রিশ বৎসরের স্বল্পপরিসর জীবনে। এক অদ্ভুত নাটকীয় দ্রুততার মধ্য দিয়া ঘটিতে দেখা যায় শঙ্কর-জীবনের মহাপ্রকাশ। নাটকীয় ভঙ্গীতেই হয় বিচিত্র পট-পরিবর্ত্তন। আবার তেমনি নাটকীয় চমৎকারিকতার মধ্য দিয়াই নামিয়া আসে লীলাবসানের যবনিকা।

শঙ্কর ছিলেন যুগাচার্য্য—প্রেরিত পুরুষ! তাই দেখি, নবম শতাব্দীর প্রথম পাদে এই বিরাট পুরুষের মহাজীবনই হইয়া উঠে ঐশী লীলার এক অপূর্ব্ব রঙ্গমঞ্চ। এদেশের সন্ন্যাসী ও সাধকদের দৃষ্টি সমক্ষে মহাজ্ঞানী এই আচার্য্য প্রতিভাত হইতে থাকেন দেবাদিদেব শঙ্করের অবতার রূপে।

দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতের কেরল দেশের লাবণ্যশ্রীর তুলনা নাই! ঘন সবুজ তরুলতা আর শ্যামস্নিগ্ধ মৃত্তিকা দেখিয়া মনে হয়, সাগরগর্ভ হইতে সেদিনমাত্র বুঝি ইহা উঠিয়া আসিয়াছে। পুরাণে আছে, জামদগ্ন্য পরশুরাম যোগবলে এক সময়ে এই ভূমিখণ্ডকে সমুদ্রতল হইতে উত্তোলন করিয়া আনেন।

কালাড়ি কেরলের এক ক্ষুদ্র গ্রাম। নিষ্ঠাবান নম্বুদ্রি ব্রাহ্মণ আচার্য্য শিবগুরুর বাস এই গ্রামে। শাস্ত্রচর্চ্চা ও জপধ্যানেই তাঁহার বেশীর ভাগ সময় কাটিয়া যায়। পত্নী বিশিষ্টা দেবীও বড় ধর্ম্ম-পরায়ণা। গ্রামের উপান্তে রহিয়াছে চন্দ্রমৌলীশ্বরের মন্দির, উভয়ে মিলিয়া পরম ভক্তিভরে এই জাগ্রত শিবলিঙ্গের আরাধনা করেন।

আচার্য্য ও তাঁহার পত্নীর অন্তরে দুঃখ—বহুকাল চলিয়া গিয়াছে কিন্তু পুত্রমুখ দেখার ভাগ্য আজো হয় নাই।

শিবগুরু মন্দিরে সেদিন ধ্যানস্থ হইয়া বসিয়া আছেন। সহসা কানে প্রবেশ করিল মহেশ্বরের দৈববাণী—'বৎস, তোমার প্রতি আমি প্রসন্ন হয়েছি। বর দান করছি—শিবকল্প মহাজ্ঞানী এক পুত্র তুমি লাভ করবে, আর দিক্‌বিদিকে ঘোষিত হবে তাঁর জয়বার্ত্তা।'

গৃহে ফিরিয়া আসিয়াই শিবগুরু সোৎসাহে পত্নীকে এই দৈববাণীর কথা কহিলেন। স্বামী-স্ত্রীর সেদিন আনন্দের সীমা রহিল না।

৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দের কথা। বৈশাখী শুক্লা পঞ্চমী তিথির মধ্যাহ্নে শিব-গুরুর গৃহে সেদিন হঠাৎ অনান্দ কলরব পড়িয়া গেল। ভূমিষ্ঠ হইল এক অনিন্দ্যসুন্দর পুত্র। নবজাতকের নাম দেওয়া হইল শঙ্কর।

শৈশব হইতেই বালক বড় তীক্ষ্ণবুদ্ধি, অসামান্য শ্রুতিধর। একবার যাহা কিছু শ্রবণ করে, চিরতরে তাহা স্মৃতিপটে গাঁথা হইয়া যায়। মাত্র তিন বৎসর বয়সে মালায়ালাম সাহিত্যের যে কোন গ্রন্থ সে পাঠ করিতে পারে, পঠিত অজস্র বিষয়বস্তু অনায়াসে আবৃত্তি করিতে কখনো তাহার বাধে না। এই অলৌকিক মেধা ও প্রতিভা দর্শনে গ্রামবাসীদের বিস্ময়ের অন্ত নাই। এই কচি বয়স হইতেই শিবগুরু সোৎসাহে শিশুকে পড়াইতে শুরু করেন। পুত্রকে সর্ব্বশাস্ত্রবিদ্ করিয়া তুলিবেন, ইহাই তাঁহার জীবনের বড় অভিলাষ।

প্রতিভাধর পুত্রের পরিণতি দেখার সৌভাগ্য পিতার আর হয় নাই, অল্পকাল মধ্যেই তিনি মরজগৎ ত্যাগ করিয়া যান। বিশিষ্টা দেবীর মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে। তাই তো! কি করিয়া তিনি সংসার চালাইবেন? বালক শঙ্করের দায়িত্বই বা কিভাবে পালন করিবেন?

অবশেষে নয়নজল মুছিয়া সাহসে বুক বাঁধিতেই হইল। পতির ইচ্ছা ছিল, মেধাবী পুত্রকে শাস্ত্র অধ্যয়নের সমস্ত সুযোগ দিবেন, বংশের মুখ সে উজ্জ্বল করিবে। সে ইচ্ছা তো অপূর্ণ রাখা চলিবে না! শঙ্কর পাঁচ বৎসরে পদার্পণ করা মাত্র বিশিষ্টা দেবী তাহার উপনয়ন দিলেন, অতঃপর শাস্ত্রপাঠের জন্য তাহাকে গুরুগৃহে পাঠানো হইল।

বালক মেধাবী, সৌম্য ও সুদর্শন। অধ্যাপকের স্নেহ লাভ করিতে তাই দেরী হয় নাই। টোলের এক কোণে বসিয়া সে পড়ে, গোড়ার দিকের প্রাথমিক পাঠ আয়ত্ত করিতে থাকে। আর অদূরে বসিয়া গুরু উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদের অধ্যাপনা করেন, শাস্ত্রের নানা দুরূহ তত্ত্বের আলোচনা তাঁহাদের মধ্যে হয়।

পাঁচ বৎসরের বালক হইলে কি হয়, শিক্ষকের অধ্যাপনার সময় শঙ্কর সেদিন হঠাৎ নিজস্ব এক মতামত প্রকাশ করিয়া বসে। একি অদ্ভুত ব্যাপার! শ্রুতিধর বালক এক কোণে বসিয়া কখন যে উচ্চতর শাস্ত্র আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছে, সে খবর কেউ রাখে না। অধ্যাপকের চোখ তখনি খুলিয়া গেল। তিনি বুঝিলেন, ঈশ্বরদত্ত মহাপ্রতিভা নিয়া এ বালক জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এক বিরাট সম্ভাবনার বীজ ইহার মধ্যে রহিয়াছে নিহিত।

এবার হইতে শঙ্করের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল উচ্চতর পাঠক্রম। দুই বৎসর অক্লান্ত অধ্যয়নের ফলে চতুষ্পাঠীর সমস্ত পাঠই তিনি আয়ত্ত করিয়া ফেলিলেন। বেদ বেদান্ত, স্মৃতি পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রে পারঙ্গম হইয়া যখন গৃহে ফিরিলেন তখন তাঁহার বয়স সাত বৎসরের বেশী হইবে না।

কৃতী পুত্র ভক্তিভরে মায়ের চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। বিশিষ্টা দেবীর সেদিন বড় আনন্দ। পুত্র তাঁহার এ বয়সেই সর্ব্বশাস্ত্রবিদ্ হইয়া ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছেন। বিদ্যাবত্তা ও লোকোত্তর প্রতিভার জন্য এই অঞ্চলের সর্ব্বত্র তাঁহার খ্যাতি তখন প্রচারিত।

পুলকাশ্রুতে মায়ের দুই চোখ ছলছল হইয়া উঠে। কহেন, "বাবা, সত্যিই আজ পুত্রগর্ব্বে আমার সারা অন্তর ভরে উঠেছে। তোর পিতার মুখ তুই উজ্জ্বল করেছিস। তাঁর আশা আকাঙ্ক্ষা আজ তোর ভেতর দিয়ে সফল হয়ে উঠেছে।"

শঙ্কর নিবেদন করেন, "মা, আমি ঠিক করেছি, এখন হতে ঘরে বসেই অধ্যাপনা করব, আর করব তোমার চরণ সেবায় দিনাতিপাত। আশীর্ব্বাদ কর, একাজে যেন সফল হই।"

পুত্রকে কোলে নিয়া জননী বার বার আশীষ জানান।

অবিলম্বে শঙ্কর চতুষ্পাঠী খুলিয়া বসিলেন। বালক অধ্যাপকের এ শিক্ষা-কেন্দ্র লোকের কাছে এক পরম বিস্ময়ের বস্তু। এই নূতন কর্ম্মজীবনের পথে বাধাও কম উপস্থিত হইল না। স্থানীয় পণ্ডিতেরা

শঙ্করকে কোন মতেই আমল দিতে চাহেন না। অপরিণতবয়স্ক, অনভিজ্ঞ বালক, সে আবার শাস্ত্রের কি পড়াইবে ?

কিন্তু বালক যে অলৌকিক শক্তিধর, তাহা না মানিয়া উপায় নাই। এই নবীন অধ্যাপকের কাছে বড় বড় শ্রুতি-স্মৃতিবিদ্ পণ্ডিতকে সেদিন মস্তক অবনত করিতে হয়। শাস্ত্রজ্ঞানের এক বিরাট জন্মগত অধিকার নিয়া তাঁহার আবির্ভাব। যেমন অমানুষিক তাঁহার স্মৃতিশক্তি, বুদ্ধিমত্তা ও তর্ক-প্রতিভা, তেমন অলৌকিক শক্তি শাস্ত্রের মর্ম্মোদ্ঘাটনে !

যুগাচার্য্যের ভূমিকা গ্রহণের জন্য শঙ্কর আসিয়াছেন, আর আসিয়াছেন বালক-জীবনের এক বিরাট ব্যতিক্রমরূপে। প্রভাতের বাল-সূর্য্য এ তো নয়, এ যে মধ্যাহ্ন-গগনের খরকরবর্ষী মার্ত্তণ্ড !

বালক শঙ্করের কাছে প্রবীণ পণ্ডিত ও অধ্যাপকগণ অল্পকাল মধ্যে পরাজয় স্বীকার করিলেন। অতঃপর তাঁহার চতুষ্পাঠীতে ছাত্র সমাগম হইতে দেরী হয় নাই।

জননীর প্রতি শঙ্করের শ্রদ্ধার অন্ত নাই। রোজকার পূজা অর্চ্চনা ও অধ্যাপনার পর দীর্ঘ সময় তাঁহার সেবায় অতিবাহিত করেন। বৃদ্ধা মাতাকে কেন্দ্র করিয়াই এ সময়ে তাঁহার সমস্ত জীবনটি যেন আবর্ত্তিত হইতে থাকে। এই মাতৃভক্তির উদ্দীপনায় শঙ্কর সেদিন এক অলৌকিক ঘটনার সৃষ্টি করিয়া বসেন।

বিশিষ্টা দেবী কুলদেবতা শ্রীকেশবের পূজা দিতে বাহির হইয়াছেন ! গ্রাম হইতে কিছুটা দূরেই পবিত্র আলোয়াই নদী, সেখানে স্নান সমাপন করিয়া তবে পূজা মন্দিরে ঢুকিবেন। বার্দ্ধক্যে শরীর আজকাল বড় অপটু হইয়া পড়িয়াছে। তাই পূজা উপচার নিয়া মন্দিরের দিকে আগাইয়া চলিলেন।

বেলা গড়াইয়া গেল। জননী সেই যে ভোরবেলায় কখন বাহির হইয়াছেন, এখনও তো ঘরে ফিরিতেছেন না ! শঙ্কর বড় উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। দ্রুতপদে মন্দিরের দিকে গিয়া দেখিলেন, রাস্তার ধারে

তিনি মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া আছেন, বৃদ্ধ বয়সে এ পথশ্রম সহ্য হয় নাই। চারিদিকে লোকের ভীড় জমিয়া গিয়াছে।

বহুক্ষণ শুশ্রূষার পর জ্ঞান ফিরিয়া আসিল, কোনমতে তিনি চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন।

মাতা ধূলিশয্যায় পড়িয়া আছেন—পথশ্রমে মৃতকল্প। শঙ্কর আর নয়নাশ্রু রোধ করিতে পারিতেছেন না।

শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ মাতৃভক্ত বালকের অন্তর মথিত করিয়া সেদিন প্রার্থনাবাণী উদ্‌গীত হইল, "ভগবান, জননী আমার বৃদ্ধা হয়েছেন—তাঁর এ পথশ্রম, এ দুঃসহ যন্ত্রণা আর যেন আমায় দেখতে না হয়। কৃপা করে তুমি আলোয়াইর স্রোতধারা কিছুটা এগিয়ে দাও। ঐহিক জীবনের কোন প্রার্থনাই আমার নেই প্রভু, শুধু আমার বৃদ্ধা মায়ের স্নানের ঘাটটি আরো একটু কাছে নিয়ে এস।"

সত্যসন্ধ, নিষ্কলুষ ব্রহ্মচারী বালকের সেদিনকার এ প্রার্থনা ভগবান অপূর্ণ রাখেন নাই। অচিরেই তট ভাঙিতে ভাঙিতে আলোয়াই নদী শঙ্করের গৃহের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে জনমানসের সম্মুখে ফুটিয়া উঠে বালক-অধ্যাপকের আর একটি বিশিষ্ট রূপ। অলৌকিক প্রতিভাধর শঙ্কর যে অলৌকিক শক্তিও ধারণ করেন এ সংবাদ সেদিন প্রচারিত হইয়া পড়ে।

শঙ্করের প্রতিভা ও শক্তির নানা কাহিনী ক্রমে কেরলের রাজা চন্দ্রশেখরের কানে যায়। বালকের অমানুষিক বিদ্যাবত্তার কাহিনী, আলোয়াই নদীর গতি পরিবর্ত্তনের কথা দিকে দিকে রটিয়া গিয়াছে। রাজা তাই বড় কৌতূহলী হইয়া উঠিলেন। তাছাড়া, নিজে তিনি বিদ্বান ও বিদ্বোৎসাহী। তাঁহারই রাজ্যে শঙ্করের মত লোকোত্তর প্রতিভার আবির্ভাব ঘটিয়াছে! এ প্রতিভার প্রকৃত মর্য্যাদা না দিলে চলিবে কেন? রাজপ্রাসাদে তাঁহাকে আমন্ত্রণ জানানর জন্য মন্ত্রীকে তিনি প্রেরণ করিলেন।

শঙ্করকে কিন্তু রাজধানীতে নেওয়া গেল না। তেজোদৃপ্ত বালক অধ্যাপক উত্তর দিলেন, "মন্ত্রীবর, আমি ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ, রাজসভার প্রতি কোন আকর্ষণই আমার নেই। তাছাড়া, আমি তো শাস্ত্র ব্যবসায়ী নই, শাস্ত্রজ্ঞান বিতরণ করে যাওয়াই হচ্ছে আমার একমাত্র কাজ। কৃপা করে রাজারাজড়ার সান্নিধ্যে যেতে আমায় প্রলোভিত করবেন না।"

মন্ত্রী হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসেন।

শঙ্করের কথা শুনিয়া কেরলরাজের শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ আরও বাড়িয়া যায়। এই অদ্ভুত বালককে দর্শনের জন্য, তাঁহার সহিত তত্ত্বালোচনার জন্য রাজা নিজেই একদিন কালাড়ি গ্রামে উপস্থিত হন।

সাক্ষাৎ ও আলোচনার পর রাজার বিস্ময় চরমে উঠিল। দেখিলেন, এ বালক সর্ব্বশাস্ত্রে পারঙ্গম, অলৌকিক ঐশী শক্তির অধিকারী না হইলে এ কখনো সম্ভব হয় না। অজস্র সাধুবাদের পর তিনি প্রণাম নিবেদন করিলেন, সম্মুখে রাখিলেন সহস্র স্বর্ণমুদ্রাব উপঢৌকন।

নিরাসক্ত বালক একটি মুদ্রাও স্পর্শ করিলেন না, রাজার অমাত্যদের দ্বারাই এ অর্থ দরিদ্রদের মধ্যে বিলাইয়া দিলেন।

রাজা চন্দ্রশেখর তাঁহার জীবনে কোনদিনই এই অনন্যসাধারণ বালককে বিস্মৃত হইতে পারেন নাই।

সেবার শঙ্করের গৃহে কয়েকটি বিখ্যাত শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত। বালক অধ্যাপকের অলৌকিক প্রতিভা ও জ্ঞানের প্রসিদ্ধি তাঁহারা শুনিয়াছিলেন, এবার তাঁহার সহিত আলাপ আলোচনার ফলে শ্রদ্ধা আরও বাড়িয়া গেল।

কৌতূহলী হইয়া আগন্তুকেরা বিশিষ্টা দেবীকে পুত্রের জন্মকুণ্ডলী আনিতে বলিলেন। জন্মপত্রিকার বিচার করিয়া তাঁহাদের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। এ বালক যে উত্তরকালে যুগাচার্য্যরূপে আত্মপ্রকাশ করিবেন, অধ্যাত্ম-জগতের নেতারূপে থাকিবেন চিরকীর্ত্তিত!

জননী ব্যাকুলভাবে প্রশ্ন করিলেন, "কিন্তু, আমার পুত্রের আয়ু কত

বৎসর, তা আপনারা দেখেছেন কি? সে দীর্ঘায়ু হবে তো? দয়া করে একবারটি আমায় বলুন।”

তাই তো! পণ্ডিতেরা এমন বিমর্ষ হইলেন কেন? ললাট কুঞ্চিত করিয়া বহুক্ষণ তাঁহারা গণনা করিলেন। আবার তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। তারপর সকলে নীরব।

বিশিষ্টা দেবী ছাড়িবার পাত্রী নন, বার বার তিনি মিনতি করিতে লাগিলেন। এড়াইতে না পারিয়া পণ্ডিতেরা বলিতে বাধ্য হইলেন, “মা, কি আর বল্‌ব। তোমার বালক নিতান্ত স্বল্পায়ু। ষোল আর বত্রিশ বৎসরে এর জীবনসংশয় যোগ দেখতে পাচ্ছি।”

বিধবার নয়নের মণি—শঙ্কর। তাহাকে হারাইতে হইবে! গণনার ফল শোনামাত্র জননী কাতর স্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। একমাত্র পুত্র শঙ্কর যে তাঁহার জীবনসর্ব্বস্ব, ‘শিবরাত্তিরের সল্‌তে’—অন্ধকারময় জীবনে এই বালকই যে ক্ষীণ দীপশিখা। বক্ষপুটে অঞ্চলের আড়ালে রাখিয়া এতকাল এ সন্তানকে তিনি আগ্‌লাইয়া চলিয়াছেন।

স্বল্পায়ুর কথা শুনাইয়া দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণের দল চলিয়া গেলেন, কিন্তু বালক শঙ্করের চেতনার মর্ম্মমূলে সেদিন একথা হানিয়া গেল এক প্রচণ্ড আঘাত। ভবিতব্যতার ইঙ্গিত যে ইহাতে রহিয়া গিয়াছে। কান পাতিয়া শঙ্কর শুনিলেন তাঁহার জীব-জীবনের দ্বারে মহাকালের অস্ফুট পদধ্বনি।

জন্মজন্মান্তরের সাত্ত্বিক সংস্কার এবার জাগিয়া উঠিতে চাহিতেছে, মুমুক্ষার আকুতি নাড়া দিতেছে সর্ব্বসত্তায়।

জননীকে শঙ্কর মনের কথা খুলিয়া বলেন,—সন্ন্যাস নিয়া সদ্‌গুরুর সন্ধানে তিনি বাহির হইয়া পড়িতে চান। আত্মজ্ঞান তাঁহাকে অর্জ্জন করিতে হইবে, করিতে হইবে ব্রহ্মলাভ। নহিলে কোথায় এ মানব-জীবনের সার্থকতা? বিধির বিধানে স্বল্পায়ু হইয়া তিনি জন্মিয়াছেন, আর তো তাঁহার সময় নষ্ট করা চলে না!

জননী মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়েন। অসহায় বৈধব্য জীবনের একমাত্র আশা ভরসা এই শঙ্কর। এ বৃদ্ধ বয়সে তাহাকে হারাইয়া কি করিয়া বাঁচিবেন? কিশোর-কমনীয় দেহে কি করিয়াই বা সে সন্ন্যাস-জীবনের কৃচ্ছ্র পালন করিবে? অবুঝ সন্তানের এ কি হৃদয়-বিদারক কথা! জননী হাহাকার করিয়া উঠেন।

সংসার-ত্যাগে শঙ্কর দৃঢ়সঙ্কল্প। কিন্তু জননীর অনুমতি ছাড়া যে গৃহত্যাগ করা চলে না। এবার সেই চেষ্টাতেই তিনি রহিলেন। সেদিনকার এক আকস্মিক বিপদের মধ্য দিয়া জীবন বিধাতা আনিয়া দিলেন তাঁহার পরম সুযোগ।

মায়ের সহিত শঙ্কর সেদিন নদীতে স্নান করিতে নামিয়াছেন। আলোয়াই নদী মোটেই গভীর নয় কিন্তু কোথা হইতে সেদিন সেখানে এক কুমীর আসিয়া উপস্থিত। অতর্কিতে উহা শঙ্করকে আক্রমণ করিয়া বসিল।

আত্মরক্ষার জন্য জলের মধ্যে তিনি ছুটাছুটি করিতেছেন, আর কুমীর করিতেছে পশ্চাদ্‌ধাবন—সে এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য! বিশিষ্টা দেবী ও ঘাটের অন্যান্য নর-নারী সকলে আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিতে লাগিলেন।

শঙ্কর তাড়াতাড়ি এক ক্ষুদ্র চড়ায় উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন, কিন্তু হিংস্র কুমীর কোনমতেই তাঁহাকে ছাড়িবে না, আবার তাড়া করিয়া আসিতেছে। আর নিস্তার নাই, শেষ সময় বুঝি আসন্ন। দূর হইতে জননীকে ডাকিয়া কহিলেন, "মা, আমি মরতে চলেছি। কিন্তু দুঃখ রইল যে, আমার সন্ন্যাস নেওয়া আর হল না, মুক্তিও ঘটল না এ জীবনে। তুমি শিগ্‌গীর অনুমতি দাও, আমি অন্ত্যসন্ন্যাস নিই, ভগবানের নাম নিয়ে মৃত্যুবরণ করি।"

জননী তখন দুই চোখে অন্ধকার দেখিতেছেন। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়া উঠিলেন, "বাবা, তাই হোক্, তাই হোক্। তোকে সন্ন্যাস নিতেই আমি অনুমতি দিচ্ছি।" কথা কয়টি বলার সঙ্গে সঙ্গে নদীতটে লুটাইয়া পড়িল তাঁহার মূর্চ্ছিত দেহ।

নদীর তীরে এতক্ষণ সোরগোল কম হয় নাই। সকলের আর্ত্ত চীৎকার শুনিয়া কয়েকটি জেলে ঘাটের দিকে ছুটিয়া আসে। সাহসে ভর করিয়া, বর্শা নিয়া তাহারা কুমীরটিকে আক্রমণ করে। কুমীর নিহত হয়, আর আহত শঙ্কর দৈব কৃপায় বাঁচিয়া যান।

অন্ত্যসন্ন্যাসের কথাটি কিন্তু সত্যসন্ধ বালকের মনে সেদিন চিরতরে গাঁথা হইয়া যায়। ঈশ্বরদত্ত সুযোগ যেমন আসিয়াছে, তেমনি মিলিয়াছে মায়ের অনুমতি। আনুষ্ঠানিকভাবে না হোক্, এখন তিনি যে মনেপ্রাণে সত্য সত্যই সন্ন্যাসী।

জননীকে সেই দিনই দৃঢ়ভাবে জানাইয়া দিলেন,—সন্ন্যাসীর পক্ষে গৃহবাস নিষিদ্ধ, তিনি গৃহের বাহিরে বৃক্ষমূলেই রাত্রি যাপন করিবেন। তাছাড়া, এই বৃক্ষমূলে থাকাও তাঁহার চলিবে না। কাল প্রত্যূষেই চিরদিনের জন্য সংসার ত্যাগ করিবেন।

শিরে করাঘাত হানিয়া বিশিষ্টা দেবী কাঁদিতে থাকেন—"ওরে সত্যিই কি আমি তোকে সেদিন সন্ন্যাস নিতে বলেছি? সে যে শুধু মুখেরই কথা। অন্তরের কথা তো নয়। কোন মা কি এমন কথা কখনো ছেলেকে বলতে পারে? তাছাড়া, তোর মত শিশু কঠোর সন্ন্যাস-জীবন যাপন কি করে করবে, বল্‌ত?"

শঙ্কর বুঝান—"মা, তুমি জননী হয়ে, সত্যকার মঙ্গলার্থিনী হয়ে কেন আমায় সঙ্কল্পচ্যুত করবে? মিথ্যাচারী করে কেন আমায় নরকের মুখে ঠেলে দেবে? আচ্ছা, কুমীরে আক্রমণ করতে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে আমায় কে বাঁচাল, তা একবার ভেবে দেখ দেখি! ভগবান ছাড়া এমন শক্তিমান, এমন কৃপাময় আর কে আছেন? সেই ভগবানের হাতেই তুমি তোমার পুত্রকে আজ সঁপে দাও, মা।"

একি অদ্ভুত সংসার-বিতৃষ্ণা এই শিশুর? পুত্রের দৃঢ়তা দেখিয়া জননী বুঝিলেন, কোনমতেই আর তাহাকে ধরিয়া রাখা সম্ভব নয়। শঙ্কর তাঁহাকে নানাভাবে প্রবোধ দিলেন, জ্ঞানগর্ভ শাস্ত্রবাক্যও কম

শুনাইলেন না। জননী নীরব হইলেন বটে, কিন্তু মন তাঁহার প্রবোধ মানিল না। অসহায়া বৃদ্ধার বুকের পাঁজর যেন ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। বুকজোড়া ধন শঙ্করকে ছাড়িয়া নিজের অস্তিত্বের কথা যে তিনি ভাবিতেই পারেন না!

সখেদে কহিলেন, "ওরে, তুই চলে গেলে এ বৃদ্ধ বয়সে আমায় হু'মুঠো অন্ন কে দেবে? মুক্তিই বা পাব কি করে?—তা একবার ভেবে দেখ্ দেখি? শেষ নিঃশ্বাস ছাড়বার সময় পুত্রের হাতের মুখাগ্নিটুকুও যে পাব না!"

মাতাকে আশ্বস্ত করিয়া শঙ্কর সর্ব্বাগ্রে পুত্রের প্রাথমিক দায়িত্ব পালনে অগ্রসর হইলেন। জ্ঞাতিদের ডাকিয়া বলিলেন, "আমার যে ক'খণ্ড জমি রয়েছে, তা আমি আপনাদের দান করে যচ্ছি। কিন্তু আপনারা আমায় কথা দিন, এর পরিবর্ত্তে জননীর ভরণ-পোষণের ভার আপনারা গ্রহণ করবেন।" সকলে সোৎসাহে প্রতিশ্রুতি দিলেন—শঙ্করের হৃদয় হইতে এক গুরুভার নামিয়া গেল।

বালকের হৃদয়ে অমিত আশা, চোখে-মুখে আত্মপ্রত্যয়ের আলো। জননীকে প্রবোধ দিয়া কহিলেন, "মাগো, তোমার প্রসাদে সাধনা আমার জয়যুক্ত হবেই। আর তোমায় কথা দিচ্ছি, সন্ন্যাস নিই আর যেখানেই থাকি, তোমার অন্তিমকালে নিশ্চয় আমি তোমার কাছে উপস্থিত হব। ইষ্ট দর্শন করে পরমানন্দে তুমি অমরধামে যেতে পারবে। তোমার পারলৌকিক কাজে কোন রকম বাধার সৃষ্টি হবে না।"

মুমুক্ষু বালক যুক্তকরে স্তবগাথা গাহিতেছেন! আবাহনে তাঁহার উদ্বোধিত হইয়া উঠিল কল্যাণময়ী মাতৃশক্তি। বিশিষ্টা দেবীর মনে পড়িল শঙ্করের জন্মের আগেকার কথা। স্বামী শিবগুরুর প্রাপ্ত দৈবাদেশ ও ভবিষ্যদ্বাণী তিনি আজো বিস্মৃত হন নাই। সাশ্রুনয়নে তাই আশীর্ব্বাণী উচ্চারণ করিলেন।

পুত্রের সন্ন্যাস গ্রহণের সমস্ত কিছু উপচার জননী পরদিন নিজেই

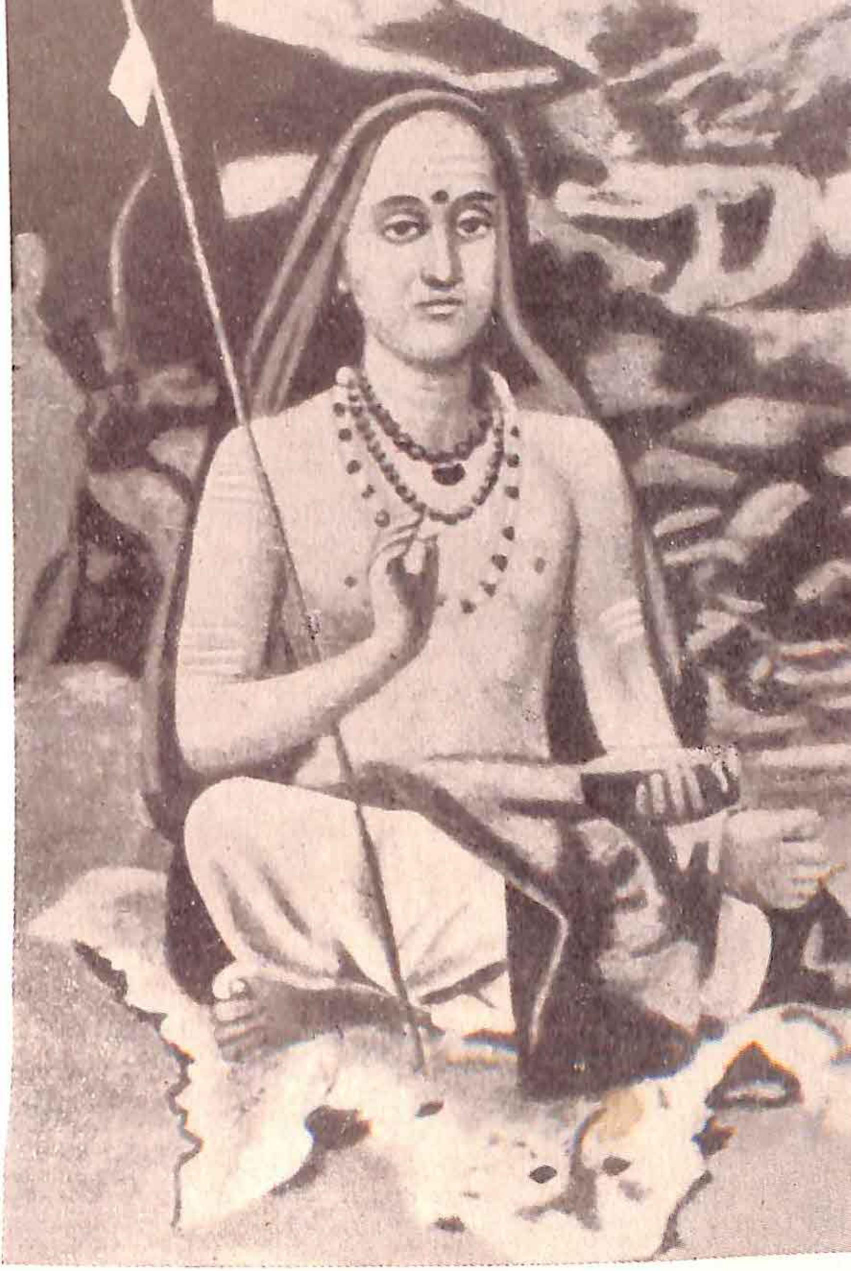
শান্তমনে সংগ্রহ করিয়া দিলেন। এ অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া কালাড়ির নরনারী আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

শঙ্কর সর্ব্বশাস্ত্রে নিপুণ। নৈষ্ঠিকভাবে নিজেই নিজের শ্রাদ্ধ ও বিরজাহোম সম্পন্ন করিলেন। তারপর মুণ্ডিতমস্তক বালক সন্ন্যাসী যাত্রা করিলেন নর্ম্মদার দিকে।

পরিব্রাজনের পথে সেদিন তিনি তুঙ্গভদ্রার তীরে কদম্ববন নামক অরণ্যে পৌঁছিয়াছেন। দীর্ঘপথ অতিক্রম করা হইয়াছে। মধ্যাহ্নের সূর্য্যতাপও হইয়াছে দুঃসহ। শ্রান্ত হইয়া নিকটস্থ বৃক্ষমূলে বসিলেন। এমন সময়ে দেখা গেল এক অদ্ভুত দৃশ্য। একদল ব্যাঙের ছানা নদী জল হইতে লাফাইয়া তীরস্থ একটি প্রস্তরের উপর উঠিয়া বসিল। রৌদ্র বড় অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে, বেশীক্ষণ তিষ্ঠিবার উপায় নাই। আবার তাহারা জলগর্ভে প্রবেশ করিতে যাইবে, এমন সময়ে বিস্ময়কর এক কাণ্ড ঘটিতে দেখা গেল। একটি বৃহদাকার সাপ ফণা বিস্তার করিয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। পরমাত্মীয়ের মত সস্নেহে এই ব্যাঙের ছানাগুলিকে উহা ছায়া দান করিতে লাগিল।

ব্যাঙ দেখিলেই সাপ লুব্ধ হইয়া উঠে, সোৎসাহে উহা ভক্ষণ করে। কিন্তু খাদ্য খাদকের সম্বন্ধের একি অবিশ্বাস্য ব্যতিক্রম! শঙ্করের বুঝিতে দেরী হইল না যে, তপঃপ্রভাব এ স্থানকে পবিত্র করিয়া তুলিয়াছে। এজন্যই হিংস্র সাপের স্বভাবের এই পরিবর্ত্তন, ব্যাঙের প্রতি এই অদ্ভুত বাৎসল্যভাব। তিনি খুঁজিতে বাহির হইলেন, কে সেই মহাতাপস, যাঁহার তপঃশক্তি এমন অলৌকিক কাণ্ড ঘটাইতে সক্ষম?

অদূরে কদম্বগিরি গাত্রে দেখা যাইতেছে এক প্রাচীন সাধকের কুটীর। উহা লক্ষ্য করিয়া ধীরে ধীরে তিনি উপরে উঠিয়া গেলেন। এক বৃদ্ধ তাপস এখানে থাকিয়া সাধন ভজন করেন। শঙ্কর তাহার নিকট শুনিলেন, এই স্থানেই অবস্থিত ছিল প্রাচীনকালের মহামুনি ঋষ্যশৃঙ্গের



আচার্য্য শঙ্কর

আশ্রম। এই অঞ্চলের সর্প কেন তাহার সহজাত খলতা বিসর্জ্জন দিয়াছে এবার তাহা বুঝা গেল।

বহু সাধকের তপস্যাপূত এই বন নিভৃত সাধনার পক্ষে বড় উপযোগী। এখানে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করার ইচ্ছা শঙ্করের মনে উদিত হয়। এই ইচ্ছার বীজই উত্তরকালে আত্মপ্রকাশ করে খ্যাতনামা শৃঙ্গেরী মঠরূপে।

পাহাড় হইতে নামিয়া আবার যাত্রা শুরু হয়।

দুইমাস অবিরাম চলার শেষে শঙ্কর প্রসিদ্ধ মাহিষ্মতী নগর অতিক্রম করেন। তারপর উপনীত হন ওঙ্কারনাথের দ্বীপ-শৈলে। এখানকার পর্ব্বত গুহাতেই ঘটে তাঁহার সৌভাগ্যোদয়, লাভ করেন মহাযোগী গোবিন্দপাদের আশ্রয়। এই অধ্যাত্ম-স্পর্শমণিই কেরলের বালক সন্ন্যাসীকে রূপান্তরিত করে, যুগাচার্য্যের ভূমিকায় তাঁহাকে দাঁড় করাইয়া দেয়।

সমাধিব্যুত্থিত যোগী গোবিন্দপাদ যে কয়টি সাধককে সেদিন আশ্রয় দেন, শঙ্কর তাঁহাদের অগ্রগণ্য। জন্ম-জন্মান্তরের সঞ্চিত অধ্যাত্ম-ঐশ্বর্য্য নিয়া এ বালক আবির্ভূত। বৈরাগ্য, ত্যাগ-তিতিক্ষা ও সাধননিষ্ঠার দিক দিয়াও তাঁহার জুড়ি নাই। মহাব্রহ্মজ্ঞ গুরুর কৃপারাশি ধারণ করার শক্তি নিয়াই সে যে উপস্থিত হইয়াছে।

গুরুর চরণতলে বসিয়া নবীন সাধক একাদিক্রমে তিন বৎসর কঠোর সাধনা করিলেন। এই অল্প সময়ের মধ্যেই অসামান্য যোগসিদ্ধি ও তত্ত্বজ্ঞান আয়ত্ত হইয়া গেল। গুরুর রোপিত সাধনবীজ পুষ্পিত ও ফলিত হইয়া উঠিল অপরূপ মহিমায়। সতীর্থ-সাধকেরা সকলেই বুঝিলেন, শঙ্করের এ অলৌকিক প্রতিভা ও শক্তির পিছনে রহিয়াছে ঐশী লীলানাট্যের এক গূঢ় সূচনা।

গুরু গোবিন্দপাদকে উপলক্ষ করিয়া এসময়ে শঙ্করের যোগবিভূতির এক চমকপ্রদ লীলা প্রকাশিত হইয়া পড়ে।

তখন ঘোর বর্ষাকাল। আকাশ মেঘে মেঘে ছাইয়া গিয়াছে, বর্ষণের বিরাম নাই। নর্ম্মদা ক্রমে স্ফীতকায়া হইয়া উঠে। দুই কূল ভাসাইয়া হঠাৎ ধারণ করে প্রলয়ঙ্করী রূপ। ওঙ্কারনাথ শৈলের গাত্রে বার বার প্রতিহত হইয়া বিপুলজলরাশি ফুলিয়া ফুলিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে।

মহাযোগী গোবিন্দপাদ কয়েকদিন যাবৎ তাঁহার নিজস্ব গুহায় সমাধিমগ্ন রহিয়াছেন। শিষ্যেরা শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন, বন্যার বেগ বাড়িতেছে, গুরুদেবের জীবন বিপন্ন না হয়। প্লাবনের জল গুহাদ্বারেই সেদিন আসিয়া পড়িয়াছে। সকলেরই মুখ শুকাইয়া গেল। যত বড় বিপদই হোক না কেন, যোগীরাজের সমাধি ভঙ্গ করা যাইবে না। অথচ এ জলস্রোতই বা কে রোধ করিবে ?

শক্তিধর শঙ্কর দৃঢ়পদে আগাইয়া আসিলেন। কহিলেন, "আপনারা কেন শুধু শুধু উদ্বিগ্ন হচ্ছেন ? আমাদের গুরু মহারাজ মহাব্রহ্মজ্ঞ। প্রাকৃতিক বিপর্যায় তাঁর অনিষ্ট করতে পারে না। আর সমাধিমগ্ন অবস্থায় তো অনিষ্টের প্রশ্নই উঠে না। আপনভোলা মহাযোগীর সাথে সহযোগিতা না করে প্রকৃতির যে কোন উপায় নেই। তাছাড়া, তাঁর আশীর্ব্বাদে এ বন্যার গতিরোধ আমিই করতে সক্ষম।"

একটি মাটির ঘড়া আনিয়া শঙ্কর তাহা কাৎ করিয়া রাখিয়া দিলেন। এদিকে জলোচ্ছ্বাস কেবলই বাড়িয়া চলিয়াছে। কিন্তু একি বিস্ময়কর কাণ্ড! জলরাশি স্ফীত হইয়া গুহার দ্বারে আসামাত্র ঐ মৃৎকুম্ভের ভিতরে ঢুকিতেছে আর নিমেষে হইতেছে অদৃশ্য। এ অলৌকিক দৃশ্য দেখিয়া সকলে শঙ্করের সাধুবাদ করিতে লাগিলেন।

সমাধিভঙ্গের পর যোগীবর সেদিনকার ঘটনা সব শুনিলেন। প্রসন্নকণ্ঠে শঙ্করকে বলিলেন, "বৎস, আমার আশীর্ব্বাদে তুমি হয়েছ পূর্ণকাম, ব্রহ্মবিদ্যা তুমি লাভ করেছ। সর্ব্বশাস্ত্রের তত্ত্ব তোমার ভেতর যেমন স্ফুরিত হয়েছে, তেমনি সর্ব্বজ্ঞান ও যোগবিভূতিও হয়েছে করতলগত। তোমার আর কিছু প্রার্থনা থাকে তো বল।"

সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া শঙ্কর যুক্তকরে কহিলেন, "প্রভু, আপনার কৃপায় আমার সকল অভাবই তো দূর হয়েছে। আর কিছুই আমার প্রার্থনীয় নেই। আপনি কৃপা করে অনুমতি দিলে এবার সমাধিস্থ হয়ে এ দেহ বর্জ্জন করতে চাই, ব্রহ্মসাগরে বিলীন হতে চাই।"

গোবিন্দপাদ গম্ভীর হইয়া উঠিলেন। উত্তর দিলেন, "বৎস, দেহ বিসর্জ্জনের সময় এখনো আসেনি। ঐশী নির্দ্দেশে, যুগ-প্রয়োজন সাধনের জন্য তুমি এসেছো, সে কাজ তো তোমার এখনো শেষ হয়নি! অদ্বৈত ব্রহ্মাত্মজ্ঞান নতুন করে তোমায় প্রচার করতে হবে। নিতে হবে লুপ্ত তীর্থগুলো উদ্ধারের ভার। সন্ন্যাসীদের মধ্যে নানা পাপ ও অনাচার ঢুকেছে। এর সংস্কার সাধন করতে হবে, পুনর্গঠন করতে হবে এদেশের অধ্যাত্মজীবনকে। সারা জনসমাজ আজ হয়ে পড়ছে ঈশ্বরবিমুখ। তাকে টেনে আনতে হবে পরম কল্যাণের দিকে।"

"আদেশ করুন, কি আমায় এবার করতে হবে।"

"তোমার আধারে অদ্বৈতজ্ঞানের আলো জ্বলে উঠবে, তা ছড়িয়ে পড়বে দিকে দিকে, এই প্রতীক্ষাই আমি করছিলাম। আমার কাজ আজ শেষ হয়েছে। তাই এ দেহের প্রয়োজনও ফুরিয়েছে। এবার তুমি কাশীর দিকে এগিয়ে যাও, বিশ্বেশ্বরের আদেশ নিয়ে নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মব্রত উদ্‌যাপন কর।"

শিষ্যদের কাছে বিদায় নিয়া গোবিন্দপাদ নিমজ্জিত হন সমাধি সাগরে। এই সমাধি হইতে আর তিনি উত্থিত হন নাই।

মহাযোগীর প্রাণবায়ু উৎক্রমণ করে ব্রহ্মরন্ধ্র পথে। ভারতের অধ্যাত্ম-গগনের এক অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক অন্তর্হিত হয়।

গুরুদেবের আদেশ মত শঙ্কর কাশীতে পৌঁছিলেন। সারা ভারতের ধর্ম্মজীবনের মধ্যমণি এই মহাতীর্থ। দণ্ডী সন্ন্যাসী, শাস্ত্রবিদ্ ও পরিব্রাজকদের এখানে নিরন্তর আনাগোনা। শাস্ত্রালাপ, মন্ত্রোচ্চারণ ও স্তবগুঞ্জনে এ নগরীর পথ ঘাট সদাই থাকে মুখরিত। যত কিছু

নূতন ধর্ম্মমত প্রচারিত হয়, যত কিছু নূতন শাস্ত্রব্যাখ্যা রচিত হয় তাহার উৎস এই বারাণসী !

শঙ্কর এখানে কিছুদিনের জন্য অবস্থান করেন।

মণিকর্ণিকা ঘাটের নিকটে পরিকরবৃন্দসহ তিনি আসন পাতিয়া বসিলেন। তেজঃপুঞ্জকলেবর কে এই বালক সন্ন্যাসী ? লোকের যেন কৌতূহলের আর অন্ত নাই। তাঁহার প্রচারিত অদ্বৈতবাদ কাশীর জনজীবনে প্রচণ্ড আলোড়ন তুলিয়া দিল।

সেদিন আচার্য্যকে ঘিরিয়া প্রবীণ দণ্ডী সন্ন্যাসী ও শাস্ত্রবিদেরা বসিয়া আছেন, আর অতুল বিক্রমে তিনি প্রতিপক্ষের মত খণ্ডন করিয়া অদ্বৈতসিদ্ধান্ত স্থাপন করিতেছেন। শাস্ত্রবিচারের রণভূমিতে তিনি এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী যোদ্ধা। আবার মুমুক্ষ সাধনার্থী নর-নারীর সম্মুখে তিনি আত্মপ্রকাশ করেন পরিত্রাতারূপে—শুধু দর্শনে ও উপদেশেই লোকের সংসার বন্ধন চিরতরে শিথিল হইয়া যায়।

অদ্ভুত এ বালক আচার্য্য! লোকোত্তর জ্ঞান ও যোগবিভূতির ঐশ্বর্য্যে সারা বারাণসীকে তিনি বিস্ময়ে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছেন।

এ সময়ে চোলদেশীয় এক ব্রাহ্মণ যুবক তাহাকে দর্শন করিতে আসেন, দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে করেন আত্মসমর্পণ। শাস্ত্রবিদ্যায় এ চোল ব্রাহ্মণের ছিল অসাধারণ পারদর্শিতা। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীরূপে প্রথম জীবনে জ্ঞান সাধনায় তিনি ব্রতী হন, তারপর বৈরাগ্যের হাতছানি একদিনে তাঁহাকে ঘরের বাহির করিয়া আনে। এতদিন পরে মহাসাধক শঙ্করের মধ্যে তিনি খুঁজিয়া পাইলেন তাঁহার পরম আশ্রয়। এই নবাগত যুবকই আচার্য্যের সর্ব্বপ্রথম দীক্ষিত শিষ্য, সনন্দন। ইনিই অসামান্য যোগবিভূতি-খ্যাত পদ্মপাদ।

নির্ব্বিশেষ পরব্রহ্মতত্ত্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উদ্‌গাতা ছিলেন স্বামী গোবিন্দপাদ। শঙ্কর তাঁহারই মানসপুত্র। গুরুর মহাবাণী প্রচার করিবেন, মানব জাতির সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত করিবেন আত্মজ্ঞানের পরম তত্ত্ব—এই ইচ্ছাই শঙ্করের মনে এতদিন বাসা বাঁধিয়াছিল। এবার

আদেশ মিলিয়াছে, যোগীগুরু তাঁহার ভিতরে শক্তি সঞ্চারও করিয়াছেন। কিন্তু কোন্ পথে তাঁহার এ কাজ শুরু করিবেন? পরমগুরু, আচার্য্য গৌড়পাদ অদ্বৈতবাদের এক উৎসস্বরূপ। তাঁহার রচনার ব্যাখ্যা দিয়াই কাজ শুরু করা মন্দ কি? শঙ্কর তাই মাণ্ডূক্যকারিকা প্রথমে রচনা করিলেন। কর্ম্মব্রত শুরু করিলেন গুরুর গুরুকে মর্য্যাদা দিয়া।

একদল গবেষকের ধারণা—আচার্য্য গৌড়পাদ ছিলেন গৌড়দেশীয় ব্রাহ্মণ। শঙ্করের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিষ্য আচার্য্য সুরেশ্বরও (মণ্ডন মিশ্র) এই মত সমর্থন করিয়া গিয়াছেন।

অদ্বৈতবাদের ধারা ভারতবর্ষে সেদিন বড় ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে। এ ধারাকে উজ্জীবিত করিয়া তোলার জন্য শঙ্কর ব্রতী হইলেন। উৎসাহ উদ্দীপনার ভিতর দিয়া শুরু হইল তাঁহার নবতর সিদ্ধান্ত স্থাপন ও তত্ত্বের ব্যাখ্যান।

উদাত্ত কণ্ঠে তিনি ঘোষণা করিলেন, ব্রহ্মই একমাত্র সত্য বস্তু, এই জগৎ একেবারে মিথ্যা, স্বপ্নের মতই অলীক। জীব প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্ম ছাড়া অন্য কিছু নয়।

অদ্বৈতবাদের এই ব্যাখ্যাকে চরম পর্য্যায়ে টানিয়া নিয়া আরো কহিলেন,—নির্গুণ নির্বিবশেষ এই ব্রহ্মে শক্তিরও স্থান নাই, আর এই নির্বিবশেষ ব্রহ্মই হইতেছে একমাত্র পরমার্থতত্ত্ব। মুমুক্ষু মানুষকে এই তত্ত্বই জানিতে হইবে, নিজ জীবনে উপলব্ধি করিতে হইবে।

তরুণ আচার্য্যের অতিমানুষিক জ্ঞান ও যোগবিভূতির কথা শুনিয়া দলে দলে লোক তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিতে আসে। পণ্ডিত ও মূর্খ, সাধু ও বিষয়ী সবাই উপস্থিত হয় তাঁহার ধর্ম্মসভায়। কিন্তু তাঁহার অদ্বৈতবাদের এই চরম ব্যাখ্যা বুঝিবার মত প্রস্তুতি কয়জনের? কে ইহার প্রকৃত অধিকারী, কাহার মধ্যে এ তত্ত্বের স্ফুরণ হইবে, একথা শঙ্কর উদ্দীপনার তোড়ে বিস্মৃত হইয়াছেন। কাশীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী অন্নপূর্ণা সেদিন তাই তাঁহাকে সতর্ক করিতে আসেন।

মণিকর্ণিকার ঘাটে শঙ্কর স্নান করিতে যাইতেছেন। খানিকটা আগাইয়া যাইতেই দেখিলেন, এক সদ্যবিধবা তরুণী তাহার মৃত পতির শব কোলে করিয়া কাঁদিতেছে। রাস্তাটি বড় অপরিসর, ইহার মুখ অবরোধ করিয়া সে বসিয়া আছে। শব সৎকারের জন্য যে টাকাকড়ির দরকার, তাহার জোগাড় নাই। তাই মাঝে মাঝে পথচারীদের কাছে ভিক্ষা চাহিতেছে।

পথ বন্ধ, আগাইবার উপায় কই? শঙ্কর কোমল কণ্ঠে কহিলেন, "মাগো, শবটিকে এমন আড়াআড়ি রেখ না, সোজা করে রাখ। তা হলে আমরা পথ চলতে পারি।"

কিন্তু কে কাহার কথা শুনে? শোকাকুলা নারী কাঁদিয়াই চলিয়াছে, নড়িবার নামটি নাই। শিষ্য পরিবৃত শঙ্কর বড় বিপদে পড়িয়াছেন। কি করিয়া গঙ্গায় যাইবেন? বার বার তাই মিনতি জানান।

নারী হঠাৎ তীক্ষ্ণস্বরে বলিয়া উঠিল, "সন্ন্যাসী, সরে যাবার অনুরোধ যা কিছু করতে হয় তা বরং এই শবের কাছেই কর। অভিরুচি হলে হয়ত সে এক পাশে সরে যেতে পারে।"

একি অদ্ভুত কথা! তবে কি পতিশোকে এ নারীর মাথা খারাপ হইয়াছে?

করুণায় বিগলিত শঙ্কর বলিলেন, "মা, তাও কি কখনো হয়? শব কি করে স্থান পরিবর্ত্তন করবে?"

বিধবা এবার দৃঢ়ভাবে বলিয়া উঠিল, "আচার্য্য, শক্তিশূন্য ব্রহ্ম হচ্ছেন জগৎ-কর্ত্তা—এ সিদ্ধান্ত আপনি সর্ব্বত্র স্থাপন করে চলেছেন। আচ্ছা, তাই যদি সত্য হয়, তবে এই নিষ্প্রাণ শক্তিহীন শব কেন নিজেকে সরিয়ে নিতে পারবে না?"

কথা কয়টি বলার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল শবসহ রমণী মুহূর্ত্তমধ্যে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। একি অলৌকিক কাণ্ড! কোন্ নিগূঢ় তত্ত্বকে শঙ্করের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত করিতে চাহিতেছে?

ধ্যানস্থ হইয়া আচার্য্য বুঝিতে পারিলেন, এ লীলার নায়িকা স্বয়ং

অন্নপূর্ণা। তিনি বুঝাইয়া দিয়া গেলেন, সাধারণ অধিকারীর পক্ষে সগুণ ব্রহ্মতত্ত্বের উপদেশই উপযোগী। শক্তিযুক্ত ব্রহ্মের কল্পনাই সহজে সে করিতে পারে। আর নির্ব্বিশেষ পরব্রহ্মতত্ত্ব শুধু সেই মুষ্টিমেয় সাধকদেরই জন্য, যাঁহাদের আছে উচ্চতর জ্ঞানসাধনা।

আর একদিনের কথা। শঙ্কর গঙ্গার ঘাটে চলিয়াছেন, পিছনে ভক্ত ও শিষ্যের দল। তাকাইয়া দেখেন, সম্মুখে দাঁড়ান এক ভীমকায় চণ্ডাল, সঙ্গে কয়েকটা বিকটদর্শন কুকুর।

একে অন্ত্যজ চণ্ডাল, তাহাতে আবার পূতিগন্ধময় শ্মশানের নোংরা ঘাঁটিয়া বেড়ায়। সন্তর্পণে লোকটির স্পর্শ এড়াইয়া শঙ্কর কিছুটা দূরে দাঁড়াইলেন। কহিলেন, "ওরে, ওধারে একটু সরে দাঁড়া, বাবা।"

চণ্ডাল অট্টহাস্যে ফাটিয়া পড়িল। তারপর অনর্গল ধারায় তাহার কণ্ঠ হইতে নির্গত হইতে লাগিল জ্ঞানগর্ভ, চমকপ্রদ শ্লোকরাজি।

শঙ্কর বিস্ময়ে হতবাক হইয়া গিয়াছেন।

যে শ্লোক তিনি শুনিলেন, তাহার মর্ম্ম এই—"আচার্য্য, আপনি কা'কে সরে যেতে বলেছেন? আমার আত্মাকে না দেহকে? আত্মা সর্ব্বব্যাপী, নিষ্ক্রিয়, নিষ্কল—সে সরে যাবে কোথায়? আর, কেনই বা যাবে? তার পক্ষে পবিত্রতা কি, আর অপবিত্রতাই বা কি? গঙ্গাবক্ষে চন্দ্র হয় প্রতিফলিত, সুরাপাত্রেও দেখা যায় তারই প্রতিবিম্ব। কিন্তু এ দু'য়ের পার্থক্য কোথায়, তা আমায় বলতে পারেন? আর আপনি যদি আত্মাকে সরে যেতে না বলে এ দেহকেই অনুরোধ করে থাকেন, সে কি করে তা পালন করবে? সে তো জড়। সন্ন্যাসী, আচার্য্যরূপে, আত্মজ্ঞানের খ্যাতনামা উপদেষ্টারূপে আপনি দেখ্‌ছি লোককে কেবলই করছেন প্রবঞ্চনা!"

একি অদ্ভুত ব্যাপার? কে এই ছদ্মবেশী চণ্ডাল? মুহূর্ত্তমধ্যে আচার্য্য শঙ্করের নয়ন সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে দেবাদিদেব মহেশ্বরের চিন্ময় মূর্ত্তি। নিজেও নিজেকে করেন উপলব্ধি। সত্যই তো,

গুরুর আদেশে যুগাচার্য্যের মহান্ ভূমিকায় তিনি আজ অবতীর্ণ। মহাজ্ঞানী গুরুর তিনি মানসপুত্র। সংস্কারের কিছুমাত্র আবিলতা তাঁহার রাখিলে চলিবে কেন? চণ্ডালের ছদ্মবেশে তাই তো বিশ্বেশ্বর স্বয়ং এখানে নামিয়া আসিয়াছেন, জ্ঞানাঞ্জন শলাকাদ্বারা করিয়াছেন তাঁহার চক্ষু উন্মীলন।

রজতগিরিসন্নিভ, প্রজ্ঞানঘন মূর্ত্তি তাঁহার সম্মুখে। বড় অপরূপ, বড় মহিমময় দেবাদিদেবের এই আবির্ভাব! শঙ্কর নির্নিমেষে সেদিকে তাকাইয়া রহিলেন।

প্রসন্নমধুর কণ্ঠে বিশ্বেশ্বর কহিলেন, "বৎস, সর্ব্ব সংস্কারের উর্দ্ধে উঠে, এবার হতে তুমি প্রকৃত অদ্বৈততত্ত্বের ধারক ও বাহক হও। তোমার কাজে আমি প্রসন্ন হয়েছি। এবার জগৎ কল্যাণের জন্য তুমি এই অদ্বৈতজ্ঞানের প্রচারে অগ্রসর হও। তার আগে উপনিষদ্ ও ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা কর, বৈদিক জ্ঞানের অবরুদ্ধ ধারাকে দিগ্বিদিকে ছড়িয়ে দাও। জ্ঞানসাধনায় নতুন করে সঞ্চারিত কর প্রাণশক্তি।"

বিশ্বেশ্বরের আদেশ মিলিয়াছে, তাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে আর দেরী হইল না। শঙ্কর স্থির করিলেন, হিমাচলের কোলে, ব্যাসদেবের তপস্যাপূত ভূমিতে আসন পাতিয়া বসিবেন, আদিষ্ট গ্রন্থরচনা সেখানে সমাপ্ত হইবে। সঙ্গে চলিল সনন্দন এবং আরও কয়েকজন ঘনিষ্ঠ শিষ্য। কিছুদিনের মধ্যে সকলে হৃষিকেশে পৌঁছিলেন।

পৌরাণিক কালের পবিত্র যজ্ঞভূমি এই হৃষিকেশ। যজ্ঞেশ্বর শ্রীবিষ্ণুর বিগ্রহ চিরকাল এখানে পূজা পাইয়া আসিতেছে। বহুপূর্ব্বে একবার চীনা দস্যুরা এস্থান আক্রমণ করে, পাণ্ডারা ভীত হইয়া বিগ্রহটি তাড়াতাড়ি গঙ্গাগর্ভে লুকাইয়া রাখে। দীর্ঘদিন ইহার আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। এবার সেই হারান পবিত্র বিগ্রহের সন্ধান শঙ্কর শুরু করিলেন।

এই দেবমূর্ত্তি যেখানে আছে সেখানকার চিত্র একদিন ধ্যানাবিষ্ট

অবস্থায় তাঁহার মানসপটে ভাসিয়া উঠে। সবাইকে ডাকিয়া তখনি জলগর্ভ হইতে এটিকে উদ্ধার করা হয়।

বদ্রিধামের অবস্থাও ছিল অনুরূপ। সীমান্ত হইতে দস্যুরা মাঝে মাঝে আক্রমণ চালাইত, লুঠপাট করিয়া অদৃশ্য হইত। বিগ্রহের পবিত্রতা ও নিরাপত্তা রক্ষা করা তাই কঠিন হইয়া উঠে। অবশেষে উহা নিকটস্থ এক জলকুণ্ডে ডুবাইয়া রাখা হয়। শঙ্কর দেখিয়া ক্ষুব্ধ হইলেন। পূর্ব্বের সে বহুখ্যাত নয়নাভিরাম মূর্ত্তি আর নাই, সেস্থলে এক শালগ্রাম শিলার অর্চ্চনা চলিতেছে।

সবাইকে ডাকিয়া তিনি কহিলেন, "নারায়ণের সেই প্রাচীন মূর্ত্তিটি আমি উদ্ধার করব বলে সঙ্কল্প করেছি। আপনারা তাড়াতাড়ি বিগ্রহের অভিষেক ও প্রতিষ্ঠার আয়োজন করুন।"

পাণ্ডা ও স্থানীয় লোকেরা ভীত হইয়া বলাবলি করিতে থাকে ঃ এই কুণ্ডের তলদেশে যে দুরন্ত পার্ব্বত্য নদী অলকানন্দার যোগ রহিয়াছে। এখানে ডুব দিতে গিয়ে অনেকে প্রাণ হারায়। তরুণ আচার্য্য কেন বৃথা এই বিপদের মুখে পা বাড়াইতে চান? কিন্তু কিছুতেই শঙ্করকে নিরস্ত করা গেল না।

ভাবাবিষ্ট হইয়া ধীর পদে কুণ্ডের মধ্যে তিনি প্রবেশ করিলেন। পদ্মাসনে উপবিষ্ট চতুর্ভুজ মূর্ত্তিটি নিয়া যখন উপরে উঠিয়া আসিলেন, লোকের আনন্দের সীমা রহিল না। চারিদিক কম্পিত করিয়া জয়ধ্বনি উত্থিত হইল—বদরী বিশাল লালা কী জয়!

ইহার পর আচার্য্য সদলবলে আসিয়া উপস্থিত হন ব্যাস তীর্থে। অলকানন্দা ও কেশবগঙ্গার সঙ্গমস্থানের ঊর্ধ্বে, হিমবন্তের কোলে ব্যাসদেবের প্রাচীন আশ্রমগুহা। দিব্য ভাবের স্পন্দনে এখানকার আকাশ-বাতাস পূর্ণ, চারিদিকে অপূর্ব্ব ধ্যানগম্ভীর পরিবেশ। এই নিভৃত গিরিগুহাটি আচার্য্যের বড় পছন্দ হইল।

চার বৎসর কঠোর পরিশ্রমের ফলে এই গিরিকন্দরে রচিত হইল

ষোলখানি শাস্ত্রগ্রন্থের মহাভাষ্য। অলৌকিক প্রতিভার দীপ্তিতে নিগূঢ় তত্ত্ব নির্ণয়ে আজিও এগুলি বিশ্বমানবের জ্ঞানভাণ্ডারে অক্ষয় সম্পদ হইয়া রহিয়াছে।

শঙ্করের রচিত ব্রহ্মসূত্র, দ্বাদশ উপনিষদ্, ভগবদ্গীতা প্রভৃতির ভাষ্য, বিষ্ণুর সহস্র নাম ও সনৎসুজাতীয় গ্রন্থগুলির ব্যাখ্যা সর্ব্বত্র বিস্ময়ের চমক লাগাইয়া দেয়। অদ্বৈতবাদের নবতর উদ্ভাসে ভারতের সাধক ও পণ্ডিতসমাজ আলোড়িত হইয়া উঠে।

আরব্ধ কর্ম্মকে সফল করিয়া তোলার সুযোগও সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়া যায়। আচার্য্যের অলৌকিক শক্তি ও প্রতিভা দেখিয়া জ্যোতির্ধামের রাজা মুগ্ধ হন, তাঁহার চরণাশ্রয় গ্রহণ করেন। এই রাজশিষ্যের সহায়তায় নব রচিত গ্রন্থগুলির অনুলিপি সর্ব্বত্র প্রচারিত হইতে থাকে। শুধু তাহাই নয়, লুপ্ত তীর্থের উদ্ধার ও অদ্বৈতবাদের প্রচারেরর মধ্য দিয়া উত্তরাপথের বৌদ্ধ ও তান্ত্রিকপ্রধান অঞ্চলগুলিতে বেদাচার আবার ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হয়। জিজ্ঞাসু সাধক, সন্ন্যাসী ও শাস্ত্রবিদের দল ব্যাসগুহার আশ্রমে ভীড় জমান।

আচার্য্য জানেন, তিনি স্বল্পায়ু হইয়া জন্মিয়াছেন এবং এই অল্পপরিসর জীবনে তাঁহাকে এক বিরাট ব্রত উদ্যাপন করিতে হইবে। একলা একাজ করা সম্ভব নয়। এজন্য সর্ব্বাগ্রে চাই একদল শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্তাত্মা সন্ন্যাসী শিষ্য। তাই শিষ্যদের মধ্যে জ্ঞান ও শক্তিসঞ্চারের কার্য্যে তিনি ব্রতী হইলেন। কয়েকজনকে অচিরে যোগসিদ্ধি ও শাস্ত্রজ্ঞান আয়ত্ত করিতে দেখা গেল।

শিষ্যদের মধ্যে সনন্দন শঙ্করের বড় প্রিয়, যোগসামর্থ্য ও শাস্ত্রজ্ঞানের অনেক কিছু সযত্নে তাঁহাকে তিনি দান করিয়াছেন। এই গুরুকৃপার জন্য কেহ কেহ সনন্দনকে বেশ একটু ঈর্ষাও করেন।

এই প্রিয় শিষ্যের গুরুভক্তির প্রকৃত স্বরূপ শঙ্কর একদিন সকলের সামনে তুলিয়া ধরিলেন।

অলকানন্দার তীরে আচার্য্য শিষ্যদল পরিবৃত হইয়া বসিয়া আছেন। সকলেই উপস্থিত, সনন্দন শুধু সেখানে নাই। কি একটা ঔষধি সংগ্রহের জন্য ওপারে গিয়াছেন।

পার্ব্বত্য নদীটি অপরিসর, কিন্তু বড় খরস্রোতা, ফেনিল আবর্ত্ত তুলিয়া তীব্রবেগে সোঁ সোঁ শব্দে কোথায় ছুটিয়া চলিয়াছে। কাহারো পক্ষে সাঁতরাইয়া এ নদী পার হওয়া সম্ভব নয়। কয়েক মাইল দূরে গাছের গুঁড়ি ও লতাগুল্ম দিয়া একটি সেতু বাঁধা হইয়াছে—গঙ্গার ধারা সেখানে খুব সঙ্কীর্ণ। এই সেতুর উপর দিয়া সনন্দন কিছুক্ষণ আগে অপর তীরে পৌঁছিয়াছেন।

শিষ্যদের কাছে শঙ্কর এ সময়ে একটি নিগূঢ় দার্শনিক তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। হঠাৎ একটি কূটতর্কের মীমাংসার জন্য সকলকে তিনি আহ্বান জানাইলেন। বড় জটিল প্রশ্ন—কাহারো মুখে কথা সরিতেছে না।

আচার্য্যের চোখে মুখে স্মিত হাসির ঝলক। কহিলেন, "দেখ্‌ছি, তোমরা কেউ এর মীমাংসা করতে পারলে না? এ বড় পরিতাপের কথা। কিন্তু সনন্দনকে যে দেখছিনে? সে কোথায়? তাকে একবার ডাক, দেখি সে এর উত্তর দিতে পারে কি না?"

জনৈক শিষ্য জানাইলেন, "গুরুদেব, সনন্দন ওপারের অরণ্য অঞ্চলে কি এক কাজে গিয়াছেন।...ঐ দেখুন, তিনি কাজ শেষ করে নদীতীরের দিকেই আসছেন। আপনি নিজে তাঁকে তাড়াতাড়ি আমাদের সভায় আসতে বলুন।"

নদীর অপর তীরে শঙ্কর নয়ন ফিরাইলেন। ঐ তো, সনন্দন ওপারে পাকদণ্ডির বনপথে আগাইয়া আসিতেছেন।

আচার্য্য ব্যগ্রস্বরে কহিয়া উঠিলেন, "সনন্দন, তোমার জন্য সবাই আমরা প্রতীক্ষা করছি। এখনি চলে এস, একটুও বিলম্ব করো না।"

একথা কানে পৌঁছামাত্র সনন্দন চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। প্রাণপ্রিয় আচার্য্যের আহ্বান! এক মুহূর্ত্তও যে দেরী করা চলে না। যে সেতুর

উপর দিয়া নদী পার হইয়াছেন, তাহা খুব কাছে নয়। সে পথে ফিরিতে হলে সময় লাগিবে। তাই গুরুদেবের পাদপদ্ম স্মরণ করিয়া তখনি সরাসরি নদীতে নামিয়া পড়িলেন সনন্দন।

উন্মত্তের মত অলকানন্দা ছুটিয়া চলিয়াছে। এ স্রোতে যে কোন মানুষই তৃণের মত ভাসিয়া যাইবে। কিন্তু এসব কোন বিপদের কথাই সনন্দনের মনে স্থান পাইল না।

এপারে সকলে রুদ্ধশ্বাসে দাঁড়াইয়া আছেন। তুহিনশীতল, পার্ব্বত্য নদীর খরস্রোতে আজ কোন্ মর্ম্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে কে জানে!

অচিরে দেখা গেল এক অদ্ভুত দৃশ্য! শিষ্যের দল বিস্ময়ে আনন্দে অভিভূত হইয়া গেলেন। গুরুগতপ্রাণ সনন্দন পরমানন্দে আগাইয়া চলিয়াছেন—অলকানন্দার জলে এক একবার পা রাখিতেছেন, আর পায়ের তলায় ফুটিয়া উঠিতেছে এক একটি করিয়া জলপদ্ম। দেহভার রক্ষার এ কি অপূর্ব্ব অলৌকিক ব্যবস্থা! শক্তিধর শিষ্য অবলীলায় এপারে আসিয়া পৌঁছিলেন, গুরুর চরণে করিলেন সাষ্টাঙ্গ প্রণাম।

শঙ্করের নয়নে এবার ফুটিয়া উঠিয়াছে শিষ্যগৌরবের অপূর্ব্ব দীপ্তি। আননে প্রসন্নমধুর হাসির আভা। দাক্ষিণ্যভরা হাতটি তুলিয়া সনন্দকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। সস্নেহে কহিলেন, "বৎস সনন্দন, তোমার গুরুভক্তি, যোগৈশ্বর্য্য আর জ্ঞান সকলের শিক্ষণীয় হোক্। পদ্মের উপর পদ স্থাপন করে তুমি অলকানন্দা অতিক্রম করেছ, তাই আজ থেকে তুমি আখ্যাত হবে পদ্মপাদ নামে।"

অতঃপর সনন্দনের মুখে আচার্য্যের তাত্ত্বিক প্রশ্নের মীমংসা শুনিয়া সকলে আরো খুশী হইয়া উঠেন।

ভাষ্যাদি রচনার মধ্য দিয়া অদ্বৈতজ্ঞানের জোর প্রচার চলিতেছে, রচিত হইয়াছে জ্ঞান সাধনার নূতনতর ভিত্তি। শিষ্যেরা অনেকেই হইয়াছেন সিদ্ধ, সর্ব্ব-শাস্ত্র পারঙ্গম। শঙ্কর এবার ধীরে ধীরে ব্যাস-গুহার নিভৃতি হইতে বাহির হইয়া পড়েন।

উত্তরাখণ্ডের দূর দুর্গম তীর্থগুলি দর্শনের পর সদলবলে তিনি উত্তরকাশীতে উপনীত হন। এখানে পৌঁছিবার পর হইতেই তাঁহার মধ্যে দেখা যায় এক অপূর্ব্ব ভাবান্তর। অধ্যাপনা ও তত্ত্বোপদেশ দানে আর পূর্ব্বের সে উৎসাহ উদ্দীপনা নাই। এখন সদাই থাকেন অন্তর্ম্মুখীন, আত্মসমাহিত।

জীবনের পাতা উল্টান আচার্য্য। অন্তরে চিন্তা খেলিয়া যায়—গুরু গোবিন্দপাদের ইচ্ছানুসারী কাজ তিনি সম্পন্ন করিয়াছেন। পালন করিয়াছেন প্রভু বিশ্বেশ্বরের আদেশ। ভারতের অধ্যাত্মক্ষেত্রে বেদান্ত-বাদের জ্ঞানগঙ্গা আজ ছড়াইয়া পড়িয়াছে। অভীষ্ট তাঁহার পূর্ণ হইয়াছে। এবার সমাধিযোগে উত্তরকাশীর পুণ্যভূমিতে এই দেহের খোলস ভাঙ্গিয়া ফেলিলে ক্ষতি কি?

পদ্মপাদ প্রভৃতি অন্তরঙ্গ শিষ্যেরা বড় দুশ্চিন্তায় পড়িলেন। তাইত। আচার্য্যের বয়স এবার ষোল বৎসর পূর্ণ হইতে চলিয়াছে। তাঁহারা শুনিয়াছেন, ইহার বেশী আয়ু তাঁহার নাই। তবে কি সত্য সত্যই তিনি দেহরক্ষা করিতে চাহিতেছেন? আসন্ন বিপদের কথা ভাবিয়া সকলে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলেন।

কথিত আছে, এ সময়ে উত্তরকাশীতে শঙ্কর একদিন অলৌকিকভাবে ব্যাসদেবর সাক্ষাৎ লাভ করেন। পুরাণের বর্ণিত রূপ ধারণ করিয়া, কৃষ্ণবর্ণ বিশালবপু মহামুনি জটাজুট-সমন্বিত হইয়া আবির্ভূত হন। স্তবে তুষ্ট হইয়া শঙ্করকে বরদান করেন, "বৎস, ঈশ্বর-আদিষ্ট-কর্ম্ম তুমি সম্পন্ন করেছ। আমি আশীর্ব্বাদ করছি, তোমার রচিত অদ্বৈতবাদের ভাষ্যসমূহ জগতে চির-অক্ষয় থাকবে।"

শঙ্কর করজোড়ে নিবেদন করিলেন, "প্রভু, কৃপা করে তাহলে আমায় অনুমতি দিন, এবার আমি স্ব-স্বরূপে অবস্থিত হই—এ দেহের বন্ধন চিরতরে ত্যাগ করি।"

"না বৎস, ঐশী বিধান যে অন্যরূপ। তোমায় আরও কিছুকাল বেঁচে থাকতে হবে, বিশেষ কর্ত্তব্যকর্ম্ম রয়েছে। এ কথাটা জানাবার

জন্যেই আমি নিজে এখানে এসেছি। অদ্বৈতবাদের ব্যাখ্যার ভেতর দিয়ে তুমি শাস্ত্রীয় ভিত্তি রচনা করেছ সত্যি, কিন্তু এখনো তা সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতদের তোমার স্বমেত আনতে হবে। এ কঠিন কাজটা যে এখনো বাকী। তোমার সিদ্ধান্ত এই মহারথীরা গ্রহণ না করলে দেশের সাধারণ লোক তা মানতে চাইবে কেন? ঈশ্বর প্রেরিত পুরুষরূপে তুমি আবির্ভূত হয়েছ, এবার নির্দ্দিষ্ট কাজকে সম্পূর্ণ করে তোল। আরো ষোল বৎসর তুমি এ কাজের জন্যে বেঁচে থাকবে।"

যুগাচার্য্যের জীবন-নাট্যে এমনি করিয়া আবার এক নূতনতর অঙ্ক সংযোজিত হইল।

এবার দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতদের বিজয়ে শঙ্কর বাহির হইয়া পড়েন। উত্তরাখণ্ড হইতে রামেশ্বর, দ্বারকা হইতে পরশুরাম ক্ষেত্র, সর্ব্বত্র উড্ডীন করেন অদ্বৈতবাদের বিজয়পতাকা। সারা ভারত এই শক্তিধর মহাপুরুষের প্রভায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠে।

আচার্য্য শঙ্কর কিন্তু অদ্বৈতবাদের প্রবর্ত্তক নন—এ তত্ত্ব, এ আদর্শ পূর্ব্ব হইতেই এ দেশে ছিল। তিনি করিয়াছেন ইহার পুনরুজ্জীবন। তাঁহার শাস্ত্র-ব্যাখ্যা ও প্রচার, তাঁহার ব্যক্তিত্ব, সংগঠন প্রতিভা ও অলৌকিক শক্তি ভারতের মানসলোকে আনিয়া দেয় এক সুদূরপ্রসারী পরিবর্ত্তন। যোগবিভূতির সহিত মনীষা ও কর্ম্মকুশলতার বিস্ময়কর সম্মিলন দেখা যায় আচার্য্যের জীবনে! শুধু এ দেশের নয়, সমগ্র বিশ্বের ইতিহাসে ইহার তুলনা খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

শঙ্কর কহিয়াছেন—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। নির্গুণ নিরুপাধিক ও জ্ঞানস্বরূপ পরব্রহ্মই একমাত্র নিত্য বস্তু ও পরমতত্ত্ব, আর এই বিশ্ব-প্রপঞ্চের সমস্ত কিছু হইতেছে মায়ার লীলাবৈচিত্র্য,—অনিত্য। এ সত্য পূর্ব্ববর্ত্তী অদ্বৈতবাদী আচার্য্যেরাও ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু শঙ্কর ইহাতে আনিয়া দিলেন নূতন প্রাণস্পন্দন। নূতন তরঙ্গের

বেগ ইহাতে তিনি সঞ্চারিত করিয়া তুলিলেন। শত শত বৎসরের পর আজিও তাহার প্রভাব অব্যাহত রহিয়াছে।

ভারতের অধ্যাত্মজীবনে বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের তখন বড় প্রাধান্য। যাগযজ্ঞ ও বহিরঙ্গ অনুষ্ঠান নিয়াই সেদিনকার মানুষ মত্ত হইয়া পড়িয়াছে। শঙ্করের অদ্বৈততত্ত্ব ও মায়াবাদ এ মানসিকতার উপর এক প্রচণ্ড আঘাত হানিয়া বসিল। বেদের জ্ঞানকাণ্ডের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়া নিজ মতবাদকে তিনি টানিয়া নিলেন চূড়ান্ত স্তরে।

সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্ব দুই-ই বেদে রহিয়াছে। কিন্তু শঙ্কর জোর দিয়া কহিলেন, জীবের পরম মুক্তি সাধিত হইবে—যতক্ষণে সে নির্গুণ নির্বিবশেষ ব্রহ্মকে, মায়িক জগতের সহিত সম্বন্ধহীন পরমাত্মাকে উপলব্ধি না করিবে। আরো ঘোষণা করিলেন, ব্রহ্ম ও জীব অভিন্ন—শুধু মায়ার আবরণ দ্বারাই এ দু'য়ের পার্থক্য সূচিত হয়। জ্ঞানের আলোক-সম্পাতে এই মায়ার অন্ধকার দূরে যায়, জীব ও ব্রহ্মের অভেদ-তত্ত্ব স্ফুরিত হয়,—উদিত হয় 'তত্ত্বমসি' এই মহাজ্ঞান।

শ্রুতির সগুণ ব্রহ্ম শঙ্কর স্বীকার করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার মায়াবাদ এ সগুণ ব্রহ্মকেও বলিয়াছে মিথ্যা ও অনিত্য। শক্তি ও গুণাদির অস্তিত্ব তিনি স্বীকার করিয়াছেন সগুণ ব্রহ্মে। তাঁহার সিদ্ধান্ত অনুসারে এই সগুণ ব্রহ্ম মায়িক, অনিত্য। যুক্তিনিষ্ঠার দিক দিয়া শঙ্কর শুধু তাই মানিয়াছেন নির্বিবশেষ ব্রহ্মতত্ত্ব। আর এ পরমতত্ত্বই তিনি সারা বিশ্বের সম্মুখে স্থাপন করিয়া গিবাছেন।

আচার্য্যের অদ্বৈতবাদ তখনকার দিনে শুধু দার্শনিক বিতণ্ডাতেই পরিণত হয় নাই, তাঁহার প্রদর্শিত বেদান্ত-বিচার ও সাধন-পদ্ধতির মধ্য দিয়া বহু শিষ্য আত্মজ্ঞানলাভে সমর্থ হন। ইঁহাদের প্রভাবে ভারতে দিকে দিকে জ্ঞানপন্থী সিদ্ধ সাধকের প্রকাশ ঘটিতে থাকে। শুধু অসামান্য শাস্ত্রবিদরূপেই নয়, এক মহাশক্তিধর আত্মজ্ঞানী মহাপুরুষরূপে শঙ্কর কীর্ত্তিত হন। নিখিল ভারতের অধ্যাত্মনেতার আসন তিনি

অধিকার করেন। মুমুক্ষু সন্ন্যাসী ও প্রাচীন শাস্ত্রবিদ সকলেই এই তরুণ আচার্য্যের কাছে ভীড় জমাইতে থাকে।

নূতন সাধক ও সাধারণ মানুষের বেলায় কিন্তু আচার্য্য ব্রহ্ম-আরাধনার নানা পথ ও পদ্ধতি দেখাইয়া গিয়াছেন,—মায়া বলিয়া এসব উড়াইয়া দেন নাই। তাইত এই মায়াবাদী, অদ্বৈত-বিজ্ঞানীর ভক্তি-আপ্লুত কণ্ঠে উচ্চারিত হইতে শুনি অন্নপূর্ণা প্রশস্তি, শিবাষ্টক ও গঙ্গা-যমুনা স্তুতির শ্লোকরাশি। সন্ন্যাসীর জন্য তিনি রাখিয়াছেন জ্ঞানোপাসনা আর সাধারণ ভক্তের জন্য ব্যবস্থা দিয়াছেন পূজা-অর্চ্চনা ও ভজনের। নিষ্কল, নিরুপাধিক ব্রহ্মবাদের শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতার লেখনীতে ছন্দিত হইয়া উঠিয়াছে—ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে। এ এক পরম বিস্ময়।

সারা ভারতে স্থাপন করিতে হইবে বেদান্তের ধর্ম্ম, উড্ডীন করিতে হইবে অদ্বৈতবাদের পতাকা। আর দেরী করা চলে না। শঙ্কর তাই তাড়াতাড়ি উত্তরাখণ্ড হইতে নামিয়া আসিলেন।

চারিদিকে তখন কুমারিল ভট্টের জয়-জয়কার। মীমাংসাদর্শনের শ্রেষ্ঠ আচার্য্য এই চোলদেশীয় পণ্ডিত। যাগযজ্ঞসমন্বিত বৈদিক কর্ম্ম-কাণ্ডের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করাই তাঁহার জীবনের প্রধান ব্রত। বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্মের বিখ্যাত নেতাগণ তাঁহার বিরাট প্রতিভার সম্মুখে একের পর এক মস্তক অবনত করিতেছেন।

প্রয়াগধামে গিয়া শঙ্কর কুমারিলের সম্মুখীন হইলেন। সম্ভাষণের পর কহিলেন, "মহাত্মন্, আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করব বলেই এখানে আমি এসেছি। বেদান্তের অদ্বৈতসিদ্ধান্ত প্রচারের জন্য আমি সারা ভারত ভ্রমণ করে বেড়াচ্ছি। কিন্তু আপনার মত দিগ্বিজয়ী শাস্ত্রবিদের স্বীকৃতি না পেলে তো আমার কাজ অগ্রসর হবে না। আমি জানি, আপনি বেদের কর্ম্মকাণ্ডের শ্রেষ্ঠ সমর্থক। কিন্তু আজ আমি আপনাকে আমার মতবাদই গ্রহণ করাতে চাই। পরাস্ত হবার পর আপনি আমার ভাষ্যের একটি বার্ত্তিক রচনা করে দিন। আপনার

মত মহাপণ্ডিতকে দিয়ে এটা করাতে পারলে তবেই অদ্বৈতবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারবে।”

রোষে কুমারিল ভট্টের নয়ন দুইটি ধ্বক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। শঙ্করের আপাদমস্তক নির্নিমেষে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কে এই ষোড়শ বর্ষীয় কিশোর সন্ন্যাসী? কোথায় পাইল সে এমন দুঃসাহস। একি তাঁহার ঔদ্ধত্য, না দৈবী প্রতিভার শক্তি?

ভট্টপাদের শিষ্যেরা মহা উত্তেজিত হইয়াছেন, শঙ্কর ও তাঁহার অনুগামীদের সকলে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন।

শঙ্করের পরিচয় অচিরে সেখানে প্রকাশ হইয়া পড়িল। কুমারিল কহিলেন, “আচার্য্য, আমি জানি, আপনি গোবিন্দপাদ স্বামীর শিষ্য, আপনার অলৌকিক প্রতিভা ও শক্তির কথাও আমি শুনেছি। উত্তরাখণ্ড থেকে যে ভাষ্যাদি আপনি রচনা করেছেন, তার খ্যাতি দেশের সর্ব্বত্র প্রচারিত হয়েছে।”

নিজের রচিত প্রধান ভাষ্য কয়টি আগাইয়া দিয়া শঙ্কর কহিলেন—“ভট্টপাদ! আমার এ গ্রন্থগুলো পড়ে আপনাকে আজ আমার সিদ্ধান্ত মেনে নিতে হবে। তা নইলে তো চলবে না।”

“কিন্তু আচার্য্য, আপনি বড় অসময়ে এসে পড়েছেন। আমি যে সঙ্কল্প করেছি, তুষানলে এ দেহ এবার ত্যাগ করবো।”

“সে কি কথা? আপনার মত মহাপণ্ডিত কেন আত্মহত্যা করতে যাবেন?”

“তবে সংক্ষেপে শুনুন। বৌদ্ধ ন্যায়শাস্ত্র আয়ত্ত করবার জন্য এক সময়ে আমি নালন্দা বিহারে যাই। সেখানে আচার্য্য ধর্ম্মকীর্ত্তির কাছে কয়েক বৎসর অধ্যয়ন করি। আমার এই বৌদ্ধ আচার্য্য অবশেষে একদিন আমার কাছেই বিচারে পরাভূত হন। ক্ষোভে দুঃখে তুষানলে তিনি প্রাণত্যাগ করেন। আজ আমার জীবন সায়াহ্নে সেই গুরুবধের প্রায়শ্চিত্ত করবো বলে স্থির করেছি। সামনে ঐ তুষের ঢিবি দেখতে পাচ্ছেন, এখনি আমি তাতে আরোহণ করবো, আগুন জ্বেলে দেবো আত্মাহুতি।”

"কিন্তু মহাত্মন্, আমার প্রার্থিত বিচার এড়িয়ে গেলে যে আপনার অপযশ ঘোষিত হবে।"

"না আচার্য্য, সেজন্য চিন্তা নেই—বিচারের ব্যবস্থা আমি করেই যাচ্ছি। বেদের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য আমি আজীবন চেষ্টা করে এসেছি। কিন্তু বৌদ্ধ জৈন প্রভৃতি অবৈদিকদের উচ্ছেদ করতেই আমার বেশীর ভাগ সময় ব্যয়িত হয়েছে, অবসর আমি মোটেই পাইনি। আসলে পূর্ণাঙ্গ বেদের প্রতিষ্ঠাই হচ্ছে আমার কাম্য। এদিক দিয়ে আপনার ও আমার মতবাদ ধীরে ধীরে পরস্পরের কাছে এগিয়ে আসবে, এই আশাই আমি করি। আপনি এবার আমার শিষ্য মণ্ডন মিশ্রের কাছে যান। শিষ্য হলেও সে আমার শ্রদ্ধার পাত্র। প্রতিভা ও বিচারনৈপুণ্য তার অতুলনীয়। মণ্ডন আপনার কাছে পরাস্ত হলে, ধরে নেবেন—আমারই পরাজয় ঘটেছে।"

বৈদিক জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত কুমারিল অতঃপর ধীরপদে অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন।

দক্ষিণে মাহিষ্মতী নগরে পণ্ডিত মণ্ডন মিশ্রের বাস। নর্ম্মদা ও মাহিষ্মতী নদীর সঙ্গমের কাছে তাঁহার প্রাসাদোপম ভবন বিরাজিত। বেদবিদ্যায় মণ্ডন অপ্রতিদ্বন্দ্বী, প্রসিদ্ধ যাজ্ঞিক ও ধর্ম্মগুরুরূপে তাঁহার প্রতিপত্তি ও ঐশ্বর্য্যের সীমা নাই।

শঙ্কর সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখেন, প্রাচীরঘেরা বৃহৎ যজ্ঞস্থলটি ধূমে সমাচ্ছন্ন। বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ ও শিষ্যদের দ্বারা পরিবৃত হইয়া মণ্ডন নিবিষ্ট মনে হোম করিতেছেন। দ্বারপালেরা কিছুতেই শঙ্করকে ঢুকিতে দিবে না, বারবার অনুনয় বিনয় করিয়াও কোন ফল হইল না। তিনি মহা ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। কথিত আছে, শঙ্কর এ সময়ে তাঁহার বিভূতি প্রকাশ করিতে বাধ্য হন—যোগবলে শূন্যপথে উঠিয়া অবলীলায় তিনি প্রাচীর অতিক্রম করেন।

মণ্ডন মিশ্র প্রতাপশালী যাজ্ঞিক। বহুধনীব্যক্তি ও রাজরাজড়া তাঁহার শিষ্য—ইঁহারাও কেহ কখনো তাঁহার অনুমতি ছাড়া যজ্ঞক্ষেত্রে

প্রবেশ করেন না। কিন্তু কে এই দুর্ব্বিনীত তরুণ সন্ন্যাসী? এত সাহস তাঁহার কি করিয়া হয়? মণ্ডন মিশ্র সরোষে তাঁহার দিকে আগাইয়া আসিলেন।

শঙ্কর প্রশান্ত কণ্ঠে কহিলেন, "আচার্য্যবর, আমার সঙ্গে আপনার পরিচয় নেই। আমি মহাযোগী গোবিন্দপাদ স্বামীর শিষ্য—শঙ্করাচার্য্য। আপনাকে বিচারদ্বন্দ্বে আহ্বান করতেই আমি আজ এখানে এসেছি। সেদিন আপনার গুরু ভট্টপাদ কুমারিলকে পরাস্ত করতে গিয়েছিলাম, কিন্তু তার সুযোগ পাইনি। মরদেহ ত্যাগ করার আগে তিনি বলে গিয়েছেন—আপনার পরাজয় নাকি তাঁরই পরাজয় বলে গণ্য হবে। আমি চাই, বেদের কর্ম্মকাণ্ড ছেড়ে আপনি আমার প্রচারিত জ্ঞান-সাধনা ও অদ্বৈতবেদান্ত মত গ্রহণ করুন।

বিস্মিত ক্রুদ্ধ মণ্ডন একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন আর ভাবিতেছেন, অর্ব্বাচীন সন্ন্যাসী জানেনা কাহার সহিত সে কথা বলিতেছে।

কিন্তু মণ্ডন মিশ্রের ভুল ভাঙ্গিতে বেশী দেরী হয় নাই। কিছুটা আলাপ করিয়াই বুঝিলেন, এই তরুণ সামান্য ব্যক্তি নয়, অলৌকিক শক্তিতে সে শক্তিমান। তাছাড়া, ঐ আহ্বান শোনার পর তর্কযুদ্ধে না নামিয়াও উপায় নাই।

মণ্ডন কহিলেন, "যতিবর, আপনার বিচার-দ্বন্দ্বের এ আহ্বান আমি গ্রহণ করলাম। কিন্তু আগে থাকতে ঠিক করা হোক্, যিনি পরাস্ত হবেন তাঁকে কি দণ্ড নিতে হবে।"

দৃপ্ত ভঙ্গীতে শঙ্কর উত্তর দিলেন—"আচার্য্য, সর্ত্ত রইলো—তাঁকে গ্রহণ করতে হবে বিজয়ী প্রতিদ্বন্দ্বীর শিষ্যত্ব। আপনি যদি হেরে যান আমাকে গুরুত্বে বরণ করবেন, গার্হস্থ্য ছেড়ে নেবেন সন্ন্যাস। আর আমি পরাভূত হলে নেবো আপনার শিষ্যত্ব, এই দণ্ডকমণ্ডলু চিরতরে ত্যাগ করবো।"

"উত্তম কথা। কিন্তু এ বিচারসভায় মধ্যস্থ কে হবেন?"

"আচার্য্য, বহুস্থানে আপনার সহধর্ম্মিণী উভয়ভারতী দেবীর খ্যাতির কথা আমি শুনে এসেছি। এ বিচারসভার নেত্রী হয়ে তিনিই করুন জয়-পরাজয় নির্দ্ধারণ।"

"এ প্রস্তাব আবার ভেবে দেখুন। উভয়ভারতী একে নারী, তার ওপর আমারই গৃহিণী। তাঁর কাছে সুবিচার পাবেন বলে কি আপনার বিশ্বাস আছে?"

"হ্যাঁ। আমি জেনেছি, আপনার স্ত্রী শুধু অসামান্য মনীষা ও শাস্ত্রজ্ঞানেরই অধিকারিণী নন, সত্যনিষ্ঠার দিক দিয়েও তাঁর তুলনা বিরল। আমার ইচ্ছে, তিনিই আমাদের মধ্যস্থা হোন।"

মণ্ডন এ প্রস্তাব মানিয়া নেন। তারপর মাহিষ্মতী নগরের পণ্ডিত সমাজের সম্মুখে উভয়ের এই বিচার বিতর্ক চলে প্রায় আঠার দিন ব্যাপিয়া। বিচারের শেষে উভয়ভারতী আচার্য্য শঙ্করেরই জয় ঘোষণা করেন। পরাক্রান্ত বেদবিদ্, মণ্ডন মিশ্রের এ পরাজয়ে চারিদিকে আলোড়ন পড়িয়া যায়।

শঙ্করের আননে ফুটিয়া উঠিয়াছে জয়গৌরবের আনন্দ। বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের শ্রেষ্ঠ আচার্য্য আজ তাঁহার কাছে পরাস্ত। ইহার ফলে অদ্বৈতবাদ প্রচারের প্রধান বাধাটি অপসারিত হইয়া গেল। মণ্ডনকে এবার নিতে হইবে তাঁহার শিষ্যত্ব। সন্ন্যাসদীক্ষা দিবার জন্য শঙ্কর তাড়াতাড়ি আগাইয়া আসিলেন।

বাধা দিয়া উভয়ভারতী কহিলেন, "যতিবর, একটু থামুন। এখনি কিন্তু আমার স্বামীকে আপনি সন্ন্যাস গ্রহণ করাতে পারেন না। স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গিনী আমি। কই, আমাকে তো এখন অবধি আপনি তর্কযুদ্ধে হারাতে পারেন নি! ভেবে দেখতে গেলে, প্রকৃতপক্ষে আপনার জয় হয়ে আছে অর্দ্ধসমাপ্ত! তবে আসুন, এবার আমি আপনাকে আহ্বান করছি শাস্ত্র-বিচারে।"

বড় অদ্ভুত এই দ্বন্দ্ব-আহ্বান। যৌক্তিকতা ইহার কিছু থাক্ বা না

থাক্, শঙ্কর এ দ্বন্দ্ব এড়াইয়া যাইতে রাজী নন। উভয়ভারতীকে পরাস্ত করিয়া শুধু মণ্ডন-গৃহেই নয়, সারা দক্ষিণদেশে যে তাঁহাকে বেদান্তের জয়পতাকা উড়াইতে হইবে।"

সহাস্যে শঙ্কর কহিলেন—"আচার্য্যপত্নী, এ আহ্বান গ্রহণ করলাম আমি। কিন্তু কোন শাস্ত্র নিয়ে বিচার হবে, আপনিই তা ঠিক করুন।"

"যতিবর, আমাদের এ তর্কযুদ্ধ হবে কামশাস্ত্র নিয়ে।"

শঙ্কর চমকিয়া উঠিলেন। এ আবার কি কথা? বিশাল শাস্ত্রবারিধির তুলনায় এ যে কূপোদক! তাছাড়া আজীবন তিনি ব্রহ্মচর্য্য ও সন্ন্যাসব্রত নিয়া আছেন, শেষটায় কি কামশাস্ত্রের বিচারে তাঁহাকে অবতীর্ণ হইতে হইবে? তাঁহার পক্ষে এ যে বড় কঠিন ব্যাপার। প্রমাদ গণিলেন তিনি।

সানুনয়ে কহিলেন, "দেবী, আমার একান্ত অনুরোধ, দয়া করে এ বিষয়বস্তু ছেড়ে অন্য কিছু নিয়ে আপনি তর্ক করুন।"

"আচার্য্য, সর্ব্বশাস্ত্রবিদ্ ও মহাজ্ঞানী বলে আপনার খ্যাতি রটেছে। তবে আমার উত্থাপিত কামশাস্ত্রের প্রশ্ন আমার জ্ঞানের বাইরে থাকবে কেন? তাছাড়া, আপনি ব্রহ্মবিদ্। বলুন তো, এ আলোচনা করতে আপনার মনে শঙ্কাই বা উঠে কেন? আরও একটা কথা। আমার স্বামী তাঁর সর্ত্ত অনুযায়ী আপনার কাছে সন্ন্যাস নিতে যাচ্ছেন, তার আগে আমি পরীক্ষা করতে চাই আপনার জ্ঞানের পরিধি কতটা, আর আপনার যোগ-সামর্থ্যই বা কতটুক।"

শঙ্করকে এ নারী-প্রতিদ্বন্দ্বীর আহ্বান গ্রহণ করিতেই হইল। কিন্তু প্রস্তুতির জন্য তিনি একমাসের সময় নিলেন।

মাহিষ্মতী নগরের উপকণ্ঠে, এক অরণ্যে আচার্য্য শঙ্কর সেদিন শিষ্যগণসহ বসিয়া আছেন। আসন্ন বিচারের কথা ভাবিয়া তিনি বড় চিন্তাকুল। কামশাস্ত্রের শুধু তাত্ত্বিক দিক জানিলেই তো জয়ী হইতে পারিবেন না—এ শাস্ত্রের ব্যবহারিক দিকটি সম্বন্ধে যে তিনি অজ্ঞ। প্রত্যক্ষ অনুভূতি ও জ্ঞান ছাড়া এ প্রতিভাশালিনী নারীর সম্মুখে

কতক্ষণ আর টিকিতে পারিবেন ? নিজে তিনি আজন্ম ব্রহ্মচারী। কাজেই তাঁহার পক্ষে প্রস্তুত হওয়ার একমাত্র পথ পরকায়ায় প্রবেশ। অপর কাহারো দেহের মাধ্যমে এ তত্ত্বের ব্যবহারিক দিকটি আয়ত্ত করিতে হইবে। কিন্তু সে সুযোগই বা কোথায় ?

ভাগ্যক্রমে অচিরে এক যোগাযোগ দেখা গেল। সংবাদ মিলিল, অদূরে বনের ভিতর এক শব সংকারের আয়োজন চলিতেছে। মৃতদেহটি অমরুক নামক এক তরুণ রাজার।

আচার্য্য অমনি স্থির করিলেন, এ সুযোগ ছাড়া হইবে না। গহন বনের মধ্য দিয়া চলিয়াছে দীর্ঘ পাহাড়ের শ্রেণী। উহার এক দুর্গম গুহায় উপনীত হইয়া শিষ্যদের কহিলেন, "ছাখো, মণ্ডনপত্নীর বিদ্যাদর্প আমায় চূর্ণ করতেই হবে। নইলে বেদান্ত প্রচারের ব্রত আমাদের থেকে যাবে অসমাপ্ত। এখনি যোগবলে আমি ঐ মৃত রাজার দেহে প্রবেশ করছি। একমাস শেষ হবার আগেই আমার নিজ দেহে ফিরে আসবো। তোমরা এ ক'দিন আমার পরিত্যক্ত দেহকে সতর্কভাবে পাহারা দেবে। সাবধান ! এ গুপ্ত স্থানের সন্ধান কেউ যেন না পায়, কেউ যেন এ দেহ স্পর্শ না করে।"

এদিকে রাজদেহের সংকারের আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ। ভারে ভারে চন্দন কাষ্ঠ ও ঘৃত আনিয়া জড়ো করা হইয়াছে। অমাত্য ও পুরোহিতেরা আনুষ্ঠানিক কর্ম্মে ব্যস্ত। হঠাৎ শবাধারটি নড়িয়া উঠিল। তারপর দেখা গেল, মৃত রাজা ধীরে ধীরে নয়ন উন্মীলন করিতেছেন। এ দৃশ্য দেখিয়া সকলের বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

অমরুকের দেহে প্রাণ সঞ্চারিত হইল, বস্ত্রাভরণ ও পুষ্পমাল্যের বোঝা ঠেলিয়া তিনি উঠিয়া বসিলেন।

দৈব কৃপায় রাজা বাঁচিয়া উঠিয়াছেন, আত্মীয় স্বজন ও অনুচরদের তাই আনন্দের সীমা নাই। বাদ্যভাণ্ডসহ সাড়ম্বরে তাঁহাকে প্রাসাদে ফিরাইয়া নেওয়া হইল।

শুধু বাঁচিয়া উঠাই নয়, রাজা যেন এক নূতন মানুষরূপে ফিরিয়া আসিয়াছেন। আগেকার সেই রাজসিক মনোবৃত্তি আর নাই। ভোগ-সুখ আর বিলাস-ব্যসনের সম্মুখে কেন যেন আজকাল বড় সঙ্কুচিত হইয়া পড়েন। রাজকার্য্যে বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞানের প্রকাশ দেখা যায়, কিন্তু সে কূটকৌশলী রাজাকে তো আর পাওয়া যাইতেছে না।

রাজমহিষীর সন্দেহ জাগিল, রাজার মৃতদেহে যোগবিভূতিসম্পন্ন কোন মহাপুরুষ প্রবেশ করেন নাই তো? মন্ত্রীর মনেও অনুরূপ চিন্তা জাগিয়া উঠিয়াছে।

রাণী ও মন্ত্রী উভয়ে মিলিয়া পরামর্শ করিলেন। সূক্ষ্ম লোকচারী যোগী বা সন্ন্যাসী যিনিই এ দেহে বিহার করুন না কেন, আর তাঁহাকে ফিরিয়া যাইতে দেওয়া হইবে না। যে কোন উপায়ে রাজাকে জীবিত রাখিতেই হইবে।

মন্ত্রীবর প্রবীণ, কূটবুদ্ধি। তাঁহার বিশ্বাস, পরকায়ায় প্রবেশে সমর্থ যোগীর নিজস্ব দেহ নিশ্চয়ই নিকটস্থ কোন নিভৃত অঞ্চলে সংরক্ষিত আছে। খুঁজিয়া বাহির করিয়া সর্ব্বাগ্রে সেটি বিনষ্ট করা প্রয়োজন। তবেই রাজদেহবাসী সূক্ষ্মদেহী সাধক আর তাঁহার এই বর্ত্তমান আধার ছাড়িয়া যাইতে পারিবেন না।

কঠোর আদেশ প্রচার করা হইল, কোন যোগী বা সন্ন্যাসীর শব দেখিলে তখনি তাহা পুড়াইয়া ফেলিতে হইবে।

রাজানুচরেরা সকল স্থান পাঁতি পাঁতি করিয়া খুঁজিতেছে। শঙ্করের শিষ্যেরা বড় ভীত হইলেন। কোনমতে একবার যদি তাহারা গুরুদেবের দেহের সন্ধান পায়, তবে আর রক্ষা নাই।

প্রধান শিষ্য পদ্মপাদ ঠিক করিলেন, আর বিলম্ব করা উচিত নয়, সময় থাকিতে আচার্য্যকে সতর্ক করা দরকার। ভিক্ষার্থীরূপে কয়েকজন গুরুভ্রাতাসহ রাজা অমরুকের কাছে উপস্থিত হইলেন।

রাজদেহচারী শঙ্করকে নিবেদন করা হইল, "প্রভু, রাজার লোকেরা সর্ব্বত্র ঘোরাঘুরি করছে। আপনার পরিত্যক্ত দেহ একবার দেখতে পেলে ছাড়বে না, জোর করে দাহ করে ফেলবে। আর দেরী না করে আপনি স্ব-দেহে ফিরে আসুন।

মৃত ভোগীর দেহে বাসের প্রয়োজন শঙ্করের ফুরাইয়াছে। ইহারই মধ্যে কামশাস্ত্রের সকল তত্ত্ব ও তথ্য তিনি আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছেন। চুপি চুপি শিষ্যদের আশ্বাস দিয়া কহিলেন, "ভয় নেই। তোমরা তাড়াতাড়ি গিরিগুহায় ফিরে গিয়ে অপেক্ষা কর। আজই এ দেহ আমি ছেড়ে দিয়ে যাচ্ছি।"

এদিকে কিন্তু যে বিপদের আশঙ্কা করা গিয়াছিল তাহাই ঘটিল। একদল রাজসৈন্য বনের মধ্যে সন্ন্যাসীদের আড্ডা দেখিয়া সন্দিহান হয়, তল্লাসী চালানোর জন্য আগাইয়া যায়।

খুঁজিতে খুঁজিতে সৈন্যেরা সেই গুহায় আসিয়া পৌঁছে। আচার্য্যের শিষ্যেরা সবাই প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত আছেন, কোনমতেই গুরুর দেহ তাঁহারা স্পর্শ করিতে দিবেন না।

ঘোর বিতর্ক ও দ্বন্দ্ব চলিতেছে, এমন সময় হঠাৎ অচেতন দেহটি নড়িয়া চড়িয়া উঠিল।

নিদ্রোত্থিত মানুষের মত শঙ্কর ধীরে ধীরে শয্যার উপর উঠিয়া বসিলেন। এ অলৌকিক দৃশ্য দেখিয়া রাজসৈন্যরা তো হতবাক। কালবিলম্ব না করিয়া তাহারা রাজধানীতে ফিরিয়া গেল।

শঙ্করের নিজদেহে ফিরিয়া আসার সঙ্গে সঙ্গে, সেদিন ঠিক সেই সময়ে রাজা অমরুকেরও ঘটে প্রাণবিয়োগ।

শঙ্করের এ অত্যাশ্চর্য্য যোগবিভূতির কথা দাবানলের মত চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। মাহিষ্মতী নগর ও তৎসন্নিহিত অঞ্চল আচার্য্যের কথা নিয়া মুখর হইয়া উঠে।

দৃপ্ত ভঙ্গীতে শঙ্কর এবার মণ্ডন মিশ্রের গৃহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত

উভয়ভারতীর সহিত তর্কযুদ্ধের জন্য তিনি সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছেন।

মণ্ডন-পত্নী বড় ভয় পাইয়া গেলেন। আচার্য্য কামশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন, এবার আর তাঁহাকে পরাস্ত করা সম্ভব নয়। তাছাড়া অলৌকিক শক্তিধর এই তরুণ সন্ন্যাসীর স্বরূপও তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন। ঈশ্বরপ্রেরিত আচার্য্য ও যুগমানবরূপে তাঁহার আবির্ভাব ! তাই সর্ব্বত্র হইয়াছেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। উভয়ভারতী যুক্তকরে পরাজয় স্বীকার করিলেন। কথিত আছে, ইহার অল্পকাল পরেই এই মহিয়সী মহিলা যোগবলে মরদেহ ত্যাগ করেন।

শঙ্করকে গুরুরূপে বরণ করিয়া মণ্ডন তাঁহার নিকট সন্ন্যাস দীক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁহার নাম হয় সুরেশ্বরাচার্য্য। ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈদান্তিকরূপে উত্তরকালে তিনি পরিচিত হন।

মণ্ডন মিশ্রের এ পরাজয়ের ফল সুদূরপ্রসারী হইয়া উঠে। সারা দাক্ষিণাত্যের পণ্ডিত সমাজে শঙ্করের অদ্বৈত বেদান্তের প্রভাব অচিরে বিস্তারিত হয়। বেদের কর্ম্মকাণ্ডের পরিবর্ত্তে জ্ঞানমার্গীয় শাস্ত্র ও সাধনার ধারা নূতন করিয়া উৎসারিত হয়।

নিজের মতবাদ প্রচারের জন্য শঙ্কর এ সময়ে নাসিক ও পন্ঢারপুর অঞ্চল পরিভ্রমণ করিতে থাকেন। তারপর দিগ্বিজয়ী আচার্য্যরূপে উপনীত হন শ্রীশৈলে। পুণ্যতোয়া কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রার সঙ্গমস্থলে, এখানকার শৈল চূড়ায় এক জাগ্রত শিবলিঙ্গ বিরাজিত। মল্লিকার্জ্জুন নামে পৌরাণিক কাল হইতে রহিয়াছে ইহার প্রসিদ্ধি। এই শিব-লিঙ্গকে কেন্দ্র করিয়া বহু শাক্ত, শৈব ও কাপালিক সাধক এখানে তপস্যারত রহিয়াছেন। শক্তিধর আচার্য্য শঙ্করের সম্মুখে ইঁহাদের অনেকেই সেদিন মস্তক অবনত করিলেন।

উগ্রভৈরব নামে এক প্রবীণ কাপালিক এখানে সাধনা করেন। এ অঞ্চলে শিষ্য ও অনুচরের সংখ্যা তাঁহার কম নয়। শঙ্করের বেদান্তবাদের

তিনি ঘোর বিরোধী, তাছাড়া এ দ্বিগ্বিজয়ী তরুণ আচার্য্যের প্রভাব তাঁহার কাছে অসহ্য হইয়া পড়িয়াছে। ক্রকচ নামক উগ্রভৈরবের অনুরাগী এক রাজা নিকটেই অবস্থান করেন। উভয়ে মিলিয়া চক্রান্ত করিলেন, শঙ্করকে হত্যা করিয়া মনের জ্বালা মিটাইবেন, এই সঙ্গে অদ্বৈতবাদেরও হইবে মূলোৎপাটন।

নিভৃত শৈলশিখরে বসিয়া শঙ্কর সেদিন সবেমাত্র তাঁহার সায়ং-কৃত্যাদি শেষ করিয়াছেন। এমন সময়ে ক্রকচের প্রেরিত একদল আততায়ী হঠাৎ তাঁহাকে আক্রমণ করে, বন্দী করিয়া দূরস্থিত এক পর্ব্বত গুহায় তাঁহাকে টানিয়া নেয়।

অমাবস্যার দুর্ভেদ্য অন্ধকার। কাপালিকের অনুচরদের হাতে জ্বলন্ত মশাল। ঝক্ ঝক্ করিতেছে বর্শার ফলক। একদল প্রেতের মত আচার্য্যকে তাহারা ঘিরিয়া আছে। নিকটেই গুহার ভিতরে বিরাজিত রহিয়াছেন মহাভৈরব বিগ্রহ। এই পীঠস্থানে আচার্য্যকে বলি দিয়া আজ সকলে প্রতিহিংসার বাসনা পুরাইবে।

ধ্যানস্তিমিত নেত্রে, নিস্পন্দভাবে শঙ্কর বসিয়া আছেন। বীতরাগ-ভয়ক্রোধ মহাপুরুষের কোন কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নাই।

এদিকে শঙ্করের শিষ্যেরা সবাই বড় চিন্তাকুল হইয়া পড়িয়াছেন। রাত্রি গভীর হইয়া আসিল কিন্তু আচার্য্যের দেখা নাই কেন? নিভৃতে কোথাও কি ধ্যানমগ্ন হইয়া রহিলেন? এই নূতন জায়গায় কোন বিপদে পড়িয়াছেন কি না, তাহাই বা কে বলিবে?

কুটিরের এক প্রান্তে শিষ্য পদ্মপাদ বহুক্ষণ যাবৎ ধ্যানস্থ ছিলেন। হঠাৎ তাঁহার ধ্যান ভাঙ্গিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিল এক বিস্ময়কর দিব্য আবেশ। তেজোদৃপ্ত কণ্ঠে প্রচণ্ড হুঙ্কার দিয়া তিনি ছুটিয়া বাহির হইলেন। আচার্য্যের শিষ্য ও অনুগামীরা ব্যগ্রভাবে তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া চলিল।

দুর্গম পার্ব্বত্য অঞ্চলের অনেকটা পথ চলিয়া আসার পর সকলে

উপনীত হইলেন ভৈরবগুহায়। ইতিমধ্যে আচার্য্যকে হত্যা করার সমস্ত আয়োজন আততায়ীরা করিয়া ফেলিয়াছে। ক্রুদ্ধ শিষ্যেরা প্রচণ্ড বিক্রমে তাহাদের আক্রমণ করিল।

হঠাৎ দশদিক সচকিত করিয়া ধ্বনিত হইল ভাবাবিষ্ট পদ্মপাদের হুঙ্কার! প্রচণ্ড বিক্রমে নিমেষ মধ্যে কাপালিকদের উপর তিনি ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। শঙ্করকে বধ করার জন্য রাখা হইয়াছে সিন্দুরচর্চ্চিত এক বৃহৎ খড়্গ। বিদ্যুৎবেগে এই খড়্গ নিয়া পদ্মপাদ কাপালিক-গুরুর গলায় বসাইয়া দিলেন। উগ্রভৈরব ছিন্নমুণ্ড হইয়া ভূতলে পড়িলেন, অনুচরগণ ঊর্দ্ধশ্বাসে সেখান হইতে পলায়ন করিল।

পদ্মপাদের সেদিনকার এ ভাবোন্মত্ততা বড় বিস্ময়কর। ইহার কারণ নির্ণয়ের জন্য সকলে কৌতূহলী হইয়া উঠিলেন। শোনা গেল, সাধন-জীবনের গোড়ার দিকে একবার তিনি নৃসিংহদেবের আরাধনায় রত হন। অচিরে সিদ্ধিলাভও ঘটে। এ সময়ে তিনি বরলাভ করেন—যে কোন সত্যকার সঙ্কটে নৃসিংহদেব তাঁহার পরিত্রাতারূপে আবির্ভূত হইবেন। গুরুদেবের বিপদের দিনে আজ তাই তাঁহার মধ্যে ঘটিয়াছে নৃসিংহদেবের সেই আবেশ!

শিষ্য ও পার্ষদগণসহ শঙ্কর এবার গোকর্ণে আসিলেন। বিখ্যাত শৈব পণ্ডিত নীলকণ্ঠের বাস এই স্থানে। পণ্ডিতকে বেদান্তমতে আনার পর মৌনাম্বিকা নামক শক্তিপীঠে আচার্য্য উপনীত হন।

এ সময়ে যে কোন অঞ্চলে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই তাঁহার খ্যাতি আগে আগে গিয়া উপস্থিত হইত। এখানেও তাহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই।

দেবী দর্শন শেষ করার পর শঙ্কর মন্দির ত্যাগ করিতেছেন। হঠাৎ দেখিলেন, অদূরে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ ও তাঁহার স্ত্রী আকুল হইয়া কাঁদিতেছেন। সম্মুখে শায়িত রহিয়াছে সদ্যমৃত এক বালক। এটি তাঁহাদের একমাত্র পুত্র—সর্ব্বস্বধন। শোকে দুঃখে স্বামী-স্ত্রী একেবারে পাগলের মত হইয়াছেন।

শঙ্করের অলৌকিক শক্তির কাহিনী ইহাদেরও কানে পৌঁছিয়াছে। তিনি আজ মন্দির দর্শনে আসিবেন উভয়ে তাই মৃত পুত্রটি কোলে নিয়া এখানে আসিয়াছেন। আচার্য্যের চরণে লুটাইয়া ব্রাহ্মণ ও তাঁহার পত্নী মর্ম্মভেদী কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়িলেন।

মহাপুরুষের হৃদয় বিগলিত হইল, ফুটিয়া উঠিল করুণাঘন রূপ। দেবীর নির্ম্মাল্যটি তখনো তাঁহার হাতে ছিল, মৃত বালকের শিরে সস্নেহে উহা তিনি স্থাপন করিলেন।

মুহূর্ত্তমধ্যে দেখা গেল এক অলৌকিক দৃশ্য। বালকের নয়ন ও ওষ্ঠাধর কাঁপিতেছে, দেহ ধীরে ধীরে নড়িয়া উঠিতেছে। মৃতের মধ্যে প্রাণ সঞ্চারিত হইতে দেখিয়া ধ্বনিত হইতে লাগিল আচার্য্যের জয়গান। শিষ্যগণসহ শঙ্কর দ্রুতপদে তখনি পীঠস্থান ত্যাগ করিলেন।

বিরাট ঐশী কর্ম্মের গুরুভার রহিয়াছে আচার্য্যের শিরে। সম্মুখে দীর্ঘায়ত বন্ধুর পথ। কিন্তু স্বল্পায়ু তিনি—হাতে সময় নিতান্ত কম। তাই এ সময়ে প্রায়ই কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহাকে মনীষা ও বিদ্যাবত্তার সহিত প্রকটিত করিতে হইয়াছে যোগবিভূতির ঐশ্বর্য্য। যখন যেখানে তিনি গিয়াছেন, সেখানেই স্বল্পকাল মধ্যে বিশিষ্ট সাধক ও আচার্য্যদের আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছেন—লৌকিক ও অলৌকিক উভয় শক্তিবলে করিয়াছেন তাঁহাদের আত্মসাৎ।

আচার্য্যের বেদান্তমতের বিরাট প্রতিষ্ঠা সেদিন কিন্তু শুধু বিজয়ীর রথচক্রের পেষণেই গড়িয়া উঠে নাই। পরিক্রমার পথে পথে নব নব প্রতিভার আবিষ্কার তিনি করিয়াছেন, অলৌকিক শক্তিবলে তাঁহাদের টানিয়া আনিয়াছেন নিজের ছত্রছায়ায়। এই শিষ্যদের মধ্য হইতে সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন বেদান্তবাদের এক একটি দিকপাল। সৃজনী-প্রতিভা ও সংগঠনের অপরূপ সমন্বয় তাঁহার সমগ্র অধ্যাত্মকর্ম্মে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

শ্রীবলীর জনসাধারণের মধ্যে সেদিন আলোড়ন পড়িয়া গিয়াছে।

আচার্য্য শঙ্কর তাঁহার দিগ্বিজয়ী বাহিনী নিয়া সেখানে উপস্থিত। স্থানীয় প্রাচীন সাধক ও শাস্ত্রজ্ঞেরা চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন।

পণ্ডিত প্রভাকর এ অঞ্চলের এক প্রতাপান্বিত আচার্য্য। খ্যাতি, সমৃদ্ধি উভয়ই তাঁহার যথেষ্ট, কিন্তু মনে বিন্দুমাত্র সুখ নাই। একমাত্র পুত্রটি জড়ভাবাপন্ন। বুদ্ধি ও মননশীলতার চিহ্ন তো নাই-ই, কোন সময়ে তাহার বাক্‌স্ফূর্ত্তি হইতেও শোনা যায় না। এ যেন মানুষ নয়—মাংসপিণ্ড বিশেষ। এ ছেলের দুঃখে পণ্ডিত ও তাঁহার স্ত্রীর জীবন হইতে হাসি ও আনন্দ চিরতরে মুছিয়া গিয়াছে।

শঙ্করের মহিমা ও যোগৈশ্বর্য্যের কথা প্রভাকর শুনিয়াছেন। ভাবিলেন, পুত্রের নিরাময়ের জন্য এই মহাপুরুষের কাছেই একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখা যাক্ না। ছেলেকে আচার্য্যের পদতলে রাখিয়া সাশ্রু-নয়নে নিবেদন করিলেন—"প্রভু, একবার চেয়ে দেখুন, এ দুর্ভাগার কি অবর্ণনীয় দুর্দ্দশা। একে নিয়ে আমরা জীবন্মৃত হয়ে কাল কাটাচ্ছি। আপনি একবার কৃপা করুন। শুনেছি, আপনার চরণাশ্রয় পেয়ে মৃত প্রাণ ফিরে পেয়েছে, তবে আমার ছেলের কি বাক্‌স্ফূর্ত্তিটুকুও হবে না ?"

বালক একেবারে জড়পিণ্ডের মত—নির্ব্বাক, অচঞ্চল। শঙ্করের চরণতলে বসিয়া উদাস নয়নে সে তাকাইয়া আছে, আর পণ্ডিত প্রভাকর কাতরস্বরে বারবার মিনতি জানাইতেছেন।

বৃদ্ধের আকুতি আচার্য্যের অন্তর স্পর্শ করিল। করুণামাখা কণ্ঠে বালককে প্রশ্ন করিলেন, "বৎস, আমায় বল দেখি—তুমি কে ? কোথা থেকে এসেছো ? আবার কোথায়ই বা চলে যাবে ? এ জগতে তোমার আকাঙ্ক্ষার বস্তুই বা কি আছে ?"

জড়পিণ্ডের আজ একি অলৌকিক পরিবর্ত্তন ! চকিতে তাহার মধ্যে দেখা দিল চৈতন্যের বিদ্যুৎ ঝলক। নয়ন দুইটি ঝক্‌মক্ করিয়া উঠিল ; বাক্‌হীন মুহূর্ত্তমধ্যে হইয়া উঠিল বাঙ্‌ময়। অপূর্ব্ব দৈব শক্তিতে সে আজ উদ্দীপিত। কণ্ঠ হইতে অনর্গল ধারায় নির্গত হইতেছে সংস্কৃত

শ্লোকরাজি—যেমন তাহার উচ্চারণভঙ্গী, তেমনই ভাবের গভীরতা ও ভাষার ব্যঞ্জনা।

বালকের পিতা প্রভাকর ও উপস্থিত দর্শনার্থীরা এ দৃশ্য দেখিয়া একেবারে অবাক হইয়া গিয়াছেন। শুধু তাহাই নয়, পদ্মপাদ, সুরেশ্বরাচার্য্য প্রভৃতি শঙ্করের দিক্‌পাল শিষ্যদের বিস্ময়ও এদিন চরমে উঠিল। এ স্তোত্ররাশি যে অপরূপ, অনুপম! আত্মস্বরূপ-বোধের এমন বর্ণনা পূর্ব্বে তাঁহারা আর শোনেন নাই।

ভাবগম্ভীর কণ্ঠে শঙ্কর শিষ্যদের কহিলেন, "তোমরা সবাই শুনে রাখো, এ হচ্ছে 'হস্তামলক স্তোত্র'। এর নিহিতার্থ উপলব্ধি করতে পারলে সাধকের কাছে আত্মজ্ঞান হয়ে উঠে সহজসাধ্য—করধৃত আমলকী ফলের মত তা আয়ত্তে এসে পড়ে। তোমরা সবাই এ চৈতন্যময় স্তোত্র রোজ অভ্যাস করবে।"

অকর্ম্মণ্য, জড়ভরত পুত্রের এ কি অপ্রত্যাশিত রূপান্তর! পণ্ডিত প্রভাকর ভাবাবেগে আত্মহারা হইয়া গিয়াছেন, দুই চোখ দিয়া অবিরাম ঝরিতেছে পুলকাশ্রু।

স্নিগ্ধমধুর কণ্ঠে শঙ্কর কহিলেন, "পণ্ডিত, আপনার এ পুত্র সামান্য নয়—অসামান্য। জড়পিণ্ড মোটেই নয়—চৈতন্যের পুঞ্জ। এঁর ভেতরকার আত্মজ্ঞানের আলোক আজ হঠাৎ স্ফুরিত হয়ে উঠেছে। প্রকৃতপক্ষে ইনি হচ্ছেন এক অনন্যসাধারণ মহাপুরুষ। আরো শুনুন, সংসারে আবদ্ধ থাকবার মানুষও ইনি নন। আপনার কোন প্রয়োজনেও কখনো আসবেন না। এঁকে আমার হাতেই সঁপে দিতে হবে। আজ থেকে আমিই এঁর ভার গ্রহণ করলাম।"

পণ্ডিত প্রভাকরের নয়নে আবার দেখা দিল অশ্রুধারা। এবার পুলকের অশ্রু নয়—দুঃখের। পুত্রকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া পাইয়া আবার তাহাকে হারাইলেন, তাই এ ক্রন্দন।

শঙ্করের আবিষ্কৃত এই পরম জ্ঞানী, বালক-শিষ্য এখন হইতে তাঁহার

নিকটেই রহিয়া গেলেন। সন্ন্যাসদীক্ষা গ্রহণের পর ইহার নূতন নামকরণ হয়, হস্তামলকাচার্য্য। পদ্মপাদ ও সুরেশ্বরাচার্য্যের মতই শঙ্করমণ্ডলীতে ইহার মর্য্যাদা ছিল অসমান্য।

ঘুরিতে ঘুরিতে আচার্য্য সে-বার শৃঙ্গেরীতে আসিয়াছেন। এ অঞ্চলটি পৌরাণিক ঋষি বিভাণ্ডক ও ঋষ্যশৃঙ্গের তপস্যায় পবিত্র। এক সময়ে শঙ্করের ইচ্ছা ছিল, এখানে একটি আশ্রম গড়িয়া তুলিবেন। এখানকার মনোরম পরিবেশ দেখিয়া অন্তরঙ্গ শিষ্যেরা এবার তাই উৎসাহী হইয়া উঠিলেন। কর্ণাটের রাজা সুধন্বা ইতিমধ্যে আচার্য্যের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। এই রাজা ও তাঁহার শিষ্যদের উৎসাহে প্রতিষ্ঠিত হইল সুপ্রসিদ্ধ শৃঙ্গেরী মঠ। আচার্য্য এখানে মহাসমারোহে সারদাদেবীর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিলেন।

এই মঠে শঙ্কর বেশ কিছুকাল অবস্থান করেন এবং তাঁহার বহু গ্রন্থ এখানে রচিত হয়। শাস্ত্রালোচনায় ও সাধ্য-সাধন নির্ণয়ে আচার্য্য এক একদিন উদ্দীপিত হইয়া উঠিতেন, অমূল্য তত্ত্বরাজি তাঁহার শ্রীমুখ হইতে নির্গত হইতে থাকিত। সুপণ্ডিত শিষ্যেরা তখনই সেগুলি সযত্নে লিখিয়া রাখিতেন।

শৃঙ্গেরীতে থাকা কালে শিষ্যদের কাছে উপস্থিত হয় গুরুসান্নিধ্যের সুবর্ণ সুযোগ। আচার্য্যের অন্তরঙ্গতা ও ব্যক্তিত্বের স্পর্শে সকলেই এ সময়ে প্রভাবিত হইতে থাকেন। গুরুকৃপার অমৃতসিঞ্চন সাধক শিষ্যদের মধ্যে আনিয়া দেয় অপূর্ব্ব রূপান্তর।

পর্য্যটন, তর্কযুদ্ধ ও সংগঠন কর্ম্মের নানা ভীড়ের মধ্যে শঙ্করের জীবনে বিশ্রামের অবকাশ কমই মিলিয়াছে। কিন্তু এত কিছু ব্যস্ততার মধ্যেও ঘনিষ্ঠ শিষ্যদের অন্তর্লোকের কোন খুঁটিনাটি সংবাদই তাঁহার কাছে কখনো অজানা থাকে নাই। সতর্ক, অতন্দ্র দৃষ্টি নিয়া আশ্রিতদের সাধনা ও সিদ্ধির ধারাকে সদাই তিনি নিয়ন্ত্রিত করিতেন। তাহাদের

অহংবোধের সূক্ষ্মতম তরঙ্গটিও সর্ববজ্ঞ আচার্য্যের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াইতে পারিত না।

উচ্চকোটি শিষ্যদের শিক্ষার জন্য, তাঁহাদের প্রচ্ছন্ন আত্মাভিমান দূর করার জন্য আচার্য্য শৃঙ্গেরীতে বসিয়া সেদিন এক অলৌকিক যোগবিভূতি প্রদর্শন করিলেন।

গিরি নামক এক নিরক্ষর শিষ্যকে তিনি বড় ভালবাসেন। সেবা, ভক্তি ও সাধননিষ্ঠার দিক দিয়া গিরির তুলনা সত্যই বিরল। কিন্তু শাস্ত্রজ্ঞান তাহার কিছুই নাই, আর এ দৈন্য ও ত্রুটি নিয়া কখনো মাথা ঘামাইতেও তাহাকে দেখা যায় না।

শিষ্য ও ভক্তদের নিকট শঙ্কর অনেক সময় উৎসাহভরে নানা দুরূহ তত্ত্বের ব্যাখ্যা করেন, সকলে মনপ্রাণ দিয়া তাঁহার ভাষণ শুনিতে থাকে। কিন্তু গিরি এসব বিষয়ে একেবারে নিস্পৃহ। কোন ঔৎসুক্য, কোন প্রশ্নই তাহার নাই। বিচার-বিতর্কের অরণ্যে প্রবেশ না করিয়া গুরুসেবা ও গুরুকৃপার উপরই সে নির্ভর করিয়া বসিয়া আছে। সে উপলব্ধি করিয়াছে যে, গুরুসেবাই সকল বিদ্যা ও সকল সিদ্ধির মূলে।

আচার্য্যের শাস্ত্রব্যাখ্যার কালে নিরক্ষর গিরির প্রতিদিনকার কাজ —এককোণে করজোড়ে দাঁড়াইয়া থাকা। শাস্ত্রের একবর্ণ সে বোঝে না, বুঝিতেও চাহে না। কিন্তু গুরুর অমৃত ভাষণ রোজ কাণে না শুনিলে তাহার দিন চলে না।

সেদিন এক গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব ব্যাখ্যা করা হইবে। শিষ্যগণ উৎকণ্ঠিত হইয়া নীরবে বসিয়া আছেন। কিন্তু কই, গুরুদেব তো গ্রন্থের ডোর উন্মোচন করিতেছেন না। কাহার জন্য তিনি অপেক্ষমান? সকলে মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতেছেন, নানা কথা ভাবিতেছেন।

কিছুক্ষণ পরে পদ্মপাদ সাহস সঞ্চয় করিয়া কহিলেন, "প্রভু আমরা সবাই উপস্থিত। কৃপা করে এবার তবে ব্যাখ্যা শুরু করুন।"

শঙ্কর প্রশান্ত কণ্ঠে কহিলেন, "দেখছি তোমরা সবাই রয়েছো, কিন্তু গিরি কই, বলতো? তাকে তো দেখছিনে?"

সেবকশিষ্য গিরির খোঁজে কয়েকজন বাহির হইলেন। শোনা গেল, নিকটেই নদীস্রোতে সে গুরুদেবের বহির্ব্বাস ও কমণ্ডলু প্রক্ষালন করিতে গিয়াছে। আসিতে একটু দেরী হইবে।

আচার্য্য কিন্তু নিশ্চলভাবেই বসিয়া আছেন, পুঁথি খুলিবার কোন লক্ষণই নাই।

পদ্মপাদ আর কৌতূহল চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না। প্রশ্ন করিয়া বসিলেন, "প্রভু, গিরি তো একেবারে নিরক্ষর, আজকের এই দুরূহ শাস্ত্র ব্যাখ্যার মর্ম্ম কি সে বুঝতে পারবে।"

প্রকৃত উত্তরটি আচার্য্য এড়াইয়া গেলেন। মৃদুকণ্ঠে শুধু কহিলেন, "তার জন্য আমাদের অপেক্ষা করাই তো উচিত। সে যে পরম শ্রদ্ধা-ভরে প্রতিদিন আমাদের আলোচনা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শোনে।"

নির্দ্দিষ্ট কাজকর্ম্ম সমাপনের পর গিরি গুরুদেবের সম্মুখে আসিয়া হাতজোড় করিয়া দাঁড়াইল।

শঙ্কর স্মিতহাস্যে কহিলেন, "গিরি রোজই তো শাস্ত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা তুমি শুনে যাচ্ছো। আজ তুমিই বরং আমাদের কিছু শ্লোক শুনিয়ে দাও। আমার তো মনে হয় তুমি নিজেই বেশ রচনা করতে পারবে।"

একি অবিশ্বাস্য কথা! অক্ষর পরিচয়টুকুও যাহার নাই, সংস্কৃত শ্লোক সে কি করিয়া রচনা করিবে? গুরুদেব একি কহিতেছেন?

মুহূর্ত্তমধ্যে গিরির নয়ন দুইটি ভাবাবেশে নিমীলিত হইয়া গেল। আচার্য্যের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ভক্তিভরে সে আবৃত্তি করিতে লাগিল অপূর্ব্ব শ্লোকরাশি। অনর্গলধারায় বহিয়া চলিল তোটকছন্দে গাঁথা সদ্যরচিত গুরুমাহাত্ম্যের বর্ণনা। ভক্তপ্রাণের আকুতি হইয়া উঠিল প্রাণবন্ত, বাক্‌বিভূতির ঐশ্বর্য্যে অনুপম!

এ শ্লোক শুনিয়া সমবেত শিষ্যদের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তাঁহারা বুঝিলেন, সর্ব্বশক্তিমান গুরুর কৃপায় গিরি লাভ করিয়াছে সর্ব্ব বিদ্যা, সফল হইয়াছে তাহার সর্ব্ব অভীষ্ট। নবস্ফুরিত বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধির প্রভায় মূর্খের মনোলোক আজ উদ্ভাসিত।

এই অলৌকিক লীলার মাধ্যমে আচার্য্য সেদিন তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে গুরুভক্তির মাহাত্ম্য প্রকটিত করিলেন। প্রথিতযশা শিষ্যদের সূক্ষ্ম বিদ্যাভিমানের মূলে পড়িল এক প্রচণ্ড আঘাত।

সন্ন্যাসদীক্ষা গ্রহণের পর শঙ্করের এই সেবক-শিষ্য, গিরির নাম হয় তোটকাচার্য্য। অল্পকাল মধ্যে এক মহাজ্ঞানী সাধকরূপে সমগ্র ভারতের বৈদান্তিক সমাজে তিনি কীর্ত্তিত হইয়া উঠেন।

শৃঙ্গেরীতে বসিয়া শঙ্কর সেদিন অধ্যাপনায় রত হইয়াছেন। হঠাৎ চমকিয়া উঠিলেন। একি বিচিত্র অনুভূতি? জিহ্বায় তাঁহার বারবার মাতৃস্তন্যের স্বাদ লাগিতেছে কেন?

ধ্যানস্থ হইয়া জানিলেন, এ তাঁহার জননীরই আহ্বানের ফল। অন্তিম শয্যায় তিনি শায়িতা। সন্ন্যাসী পুত্রকে আর একবার না দেখিয়া শান্তিতে মরিতে পারিতেছেন না।

মনে পড়িয়া গেল পুরাতন কথা। গৃহত্যাগের সময় প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন—শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার আগে জননীর চরণতলে গিয়া উপবেশন করিবেন। যেখানেই থাকুন না কেন, সময়মত কালাড়ির কুটির প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইতে তাঁহার ভুল হইবে না।

কিন্তু সময় যে আর মোটেই নাই। অবিলম্বে না পৌঁছিতে পারিলে জননীর সহিত শেষ বারের মত দেখা হয়তো আর হইবে না। কথিত আছে, যোগবলে এই সময়ে তিনি দীর্ঘপথ অতিক্রম করেন, অগৌণে উপস্থিত হন মাতার সন্নিধানে।

দীর্ঘ চব্বিশ বৎসর পর মাতা পুত্রের এ মিলন। আনন্দে আত্মহারা জননীর গণ্ড বাহিয়া পুলকাশ্রু ঝরিতে থাকে। শেষ বিদায়ের পালা তাঁহার আসিয়া গিয়াছে। তবুও ভাল, পুত্রের চাঁদমুখ শেষবারের মত দেখিয়া নিলেন।

অন্তিম সময়ে, মাতার শিয়রে বসিয়া পুত্র, ভগবৎ-মহিমা গাহিতে লাগিলেন। অদ্বৈতব্রহ্মাত্মবাদী আচার্য্যের কণ্ঠে শোনা গেল সগুণ

ব্রহ্মের অপরূপ স্তুতিগান। জননীও ভাবগম্ভীর সুরে সুর মিলাইয়া ক্ষীণস্বরে নিবেদন করিলেন তাঁহার শেষ প্রার্থনা। তারপর চিরতরে তাঁহার নয়ন দুইটি মুদিয়া আসিল।

জ্ঞাতিরা ছিলেন শঙ্করের জ্ঞানমার্গীয় সাধনার বিরোধী। ইতি পূর্ব্বেই আচার্য্যকে তাহারা সমাজচ্যুত করিয়াছে। একদল কুচক্রী এবার সুযোগ বুঝিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে সকলকে উত্তেজিত করিয়া তুলিল। শুরু হইল নির্য্যাতন ও লাঞ্ছনা। মৃত জননীর ঔর্দ্ধদৈহিক কাজে একটি লোকেরও সাহায্য পাওয়া গেল না।

সর্ব্বসংস্কারমুক্ত সন্ন্যাসীর জীবনে সেদিন রূপায়িত হইয়া উঠে মাতৃ-ভক্তির পরাকাষ্ঠা। মাতার দেহের সংকার শঙ্কর একাকী স্বহস্তে সমাপ্ত করেন, পারলৌকিক সব কিছু কাজই অনুষ্ঠিত হয়। কালাড়িতে থাকিতে জননীকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়া আসিয়াছিলেন সেদিন তাহা এমনি করিয়া পালন করিয়া যান।

এবার শেষবারের মত শঙ্কর তাঁহার বেদান্তধর্ম্মের প্রচার-পরিক্রমায় বাহির হন—অলৌকিক প্রতিভা ও যোগসিদ্ধির মূর্ত্ত বিগ্রহ এই তরুণ আচার্য্য। অনুগামী শিষ্যদেরও ত্যাগ, বৈরাগ্য ও জ্ঞানৈশ্বর্য্যের সীমা নাই। মনীষা, ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্বের শক্তিতে তাঁহারা এক একটি দিক্‌পাল। এই সুসংগঠিত মণ্ডলী নিয়া আচার্য্য যখনি যেখানে উপস্থিত হন, উচ্চকোটি সাধক ও পণ্ডিতের দল তাঁহার মতবাদ মানিয়া নেন, মন্ত্রমুগ্ধের মত শির নত করে।

বৌদ্ধবাদের ধারা ভারতভূমিতে এসময়ে ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। শঙ্করের অদ্বৈত-বেদান্তবাদ ইহার উপর এক চরম আঘাত হানিয়া বসিল। বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড প্রচারের রন্ধ্রপথে সমাজে এ সময়ে ঢুকিয়া পড়িয়াছে নানা বাহ্যানুষ্ঠান ও অনাচার। চারিদিকে কুসংস্কার পুঞ্জীভূত। অধ্যাত্মজীবনের আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া মানুষ দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছে। শঙ্করের শুদ্ধাদ্বৈত-জ্ঞানের স্নিগ্ধ নির্ম্মল ধারা

এসময়ে সমাজের অনেক কিছু ক্লেদ, পঙ্কিলতা ধুইয়া মুছিয়া দিল।

জ্ঞানসাধনার বাণীর মধ্য দিয়া আচার্য্য একদিকে স্থাপন করিলেন আত্মতত্ত্বের বিচার, অপরদিকে জনজীবনের সম্মুখে তুলিয়া ধরিলেন ত্যাগ বৈরাগ্য ও শুচিতার নূতনতর আদর্শ। এদেশের ধর্ম্ম ও সমাজে দেখা দিল পুনরুজ্জীবন। তীর্থাঞ্চলে, নগরে ও পল্লীতে নূতন প্রাণ-স্পন্দন জাগিয়া উঠিল। সার্ব্বভৌম ধর্ম্মনায়করূপে, যুগাচার্য্যরূপে এই তরুণ বৈদান্তিক সারা ভারতের বরেণ্য হইয়া উঠিলেন।

বদরিধাম হইতে রামেশ্বর, দ্বারকা হইতে কামাখ্যা—অধ্যাত্মসাধনার সকল কেন্দ্রই শঙ্করকে সেদিন প্রেরিত-পুরুষরূপে মানিয়া নিয়াছে, তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও আদর্শ দ্বারা হইয়াছে প্রভাবিত।

লোকোত্তর মনীষা ও যোগশক্তির সহিত শঙ্করের মহাজীবনে মিলিত হয় অসাধারণ সংগঠন-প্রতিভা ও কর্ম্মকুশলতা। ফলে তাঁহার প্রভাব শুধু একদল সার্থকনামা বৈদান্তিক সন্ন্যাসীই তৈরী করে নাই—সুসম্বদ্ধ মণ্ডলী গঠন, মঠ স্থাপন ও সন্ন্যাসীদের পুনর্গঠনের মধ্য দিয়া অধ্যাত্ম-ভারতকে উন্নততর করিয়া তোলে।

ভারতের চার প্রান্তে, চারিটি বিশিষ্ট ধামে আচার্য্য তাঁহার কর্ম্মকেন্দ্র স্থাপন করেন। একের পর এক প্রতিষ্ঠিত হয়—দ্বারকার সারদামঠ, পুরীর গোবর্দ্ধন মঠ, জ্যোতির্ধামের যোশীমঠ এবং রামেশ্বরের শৃঙ্গেরী মঠ। স্বনামধন্য শিষ্যগণ—সুরেশ্বর, পদ্মপাদ, তোটকাচার্য্য ও হস্তামলক যথাক্রমে এগুলির দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন।

দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায় গঠন করিয়া শঙ্কর অপরূপ সংগঠন প্রতিভার পরিচয় দেন। গিরিপুরী ভারতী প্রভৃতি সন্ন্যাসীদের এই সব মঠের অধীনে রাখিয়া আচার্য্য তাঁহাদিগকে সংহত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করেন। এ তাঁহার এক বড় কীর্ত্তি। তাঁহার এ সংস্কার-ব্যবস্থা একদিকে যেমন সন্ন্যাস-আশ্রমের শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছে, তেমনি ভারতের পুরাতন সমাজজীবনের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছে পরম কল্যাণময় আদর্শ।

কয়েক বৎসরের পরিক্রমা ও অনলস কর্ম্মসাধনার পর আচার্য্য

সেবার উত্তরাখণ্ডে ফিরিয়া আসিলেন। গুরুদেবের আদিষ্ট কর্ম্ম তিনি সমাপ্ত করিয়াছেন। ঐশীকর্ম্মের ব্রতও প্রায় উদ্‌যাপিত। বেদান্তের ত্যাগবৈরাগ্যময় ভাবধারা দিকে দিকে বহিয়া চলিয়াছে। সর্ব্বত্র সগৌরবে উড়িতেছে অদ্বৈত ব্রহ্মাত্মজ্ঞানের পতাকা।

ধ্যানগম্ভীর হিমাদ্রির কোলে এবার তাঁহার চির বিশ্রামের পালা। প্রতীক্ষিত মহালগ্নটি অতঃপর একদিন আসিয়া পড়ে। দেবাদিদেব মহেশ্বরের উদ্দেশে সুললিত এক স্তবগাথা তিনি রচনা করেন। শেষ আরাধনা ও অর্ঘ্য নিবেদনের পর মগ্ন হন মহাসমাধিতে।

সম্মুখে আকাশের সীমাহীন বিস্তার। রজতশুভ্র হিমগিরির চূড়ায় চূড়ায় তরঙ্গিয়া উঠিয়াছে অরূপের দিব্য রূপ, মহামৌনের অপরূপ মহিমায় আকাশ বাতাস মন্থর। অন্তরঙ্গ শিষ্যগণ নীরবে আচার্য্যকে ঘিরিয়া বসিয়া আছেন। শঙ্কায় অন্তর কাঁপিতেছে, কাহারও আজ বুঝিতে বাকী নাই—আচার্য্যের এ সমাধি আর ভাঙ্গবার নয়! আসন্ন চিরবিদায়ের কথাটি যে আভাষে ইঙ্গিতে কিছু দিন আগে হইতেই তিনি জানাইয়া আসিতেছেন।

আত্মজ্ঞানী মহাসাধক সমাধির মধ্য দিয়া আত্মপূজার শেষ আরতিটুকু সাঙ্গ করিলেন, তারপর ঘটিল মরলীলার চির-অবসান।

ভক্ত শিষ্যদের স্মৃতিতে বারবার এ সময়ে জাগিয়া উঠিতেছিল আচার্য্যের রচিত আত্মদর্শনের মহাবাণী—

কিং করোমি ক্কঃ গচ্ছামি
কিং গৃহ্ণামি ত্যজামি কিম্।
আত্মনা পূরিতং সর্বং
মহাকল্পাম্বুনা যথা॥

—মহাপ্রলয়ে জলোচ্ছ্বাস যেমন সারা নিখিল বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হয়, তেমনি ভাবেই তো আত্মা দিয়ে সবকিছু রয়েছে আবরিত, আত্মাতেই রয়েছে নিমজ্জিত। তাহ'লে কি আর আমার আছে করবার? কোথায় আমি যাবো? কোন্ বস্তু করবো গ্রহণ? কি-ই বা ক'রবো আজ বর্জ্জন?

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য

নিমাই পণ্ডিত গয়া হইতে নবদ্বীপে ফিরিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু এ যেন একেবারে নূতন মানুষ! বিদ্যার সে অভিমান, কূটতর্কের সে বিলাস আজ আর নাই। কৃষ্ণ বিরহে সদাই থাকেন মুহ্যমান। আর্ত্তি আর দৈন্য দেখিয়া অশ্রু সম্বরণ করা যায় না। উদ্ধত, বিদ্যাদর্পী পণ্ডিতের একি অদ্ভুত রূপান্তর! নদীয়ার যে কেউ এ পরমভাগবত রূপ একবার দর্শন করে, বিস্মিত হইয়া যায়।

এ রূপান্তরের কাহিনী বড় বিচিত্র, বড় অলৌকিক। গয়ায় গিয়া প্রথমেই পণ্ডিত ভক্তিভরে তাঁহার পিতৃকার্য্য সমাপন করেন। কাছেই ভারতবিশ্রুত বিষ্ণুপাদপদ্ম-মন্দির। পুণ্যার্থীর সবাই এ পবিত্র স্থান দর্শন করিতে আসে। নিমাইও আসিলেন। কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করিয়াই কি জানি কেন, অপূর্ব্ব এক ভাবাবেশে তিনি অধীর হইয়া উঠিলেন।

পুষ্পদল, ধূপ-ধূনা ও অগুরু চন্দনের গন্ধে মন্দিরগর্ভ আমোদিত। ভক্ত ও দর্শনার্থীরা দলে দলে আসিয়া শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করিতেছে। তরুণ নিমাই এক দিব্য ভাবতরঙ্গে উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছেন। সারা দেহ তাঁহার থরথর করিয়া কাঁপিতেছে—ভক্তিরসের আবেশে হইয়াছেন আত্মহারা। আয়ত নয়ন দুইটি ছাপাইয়া অবিরল ধারে অশ্রু ঝরিতেছে। কাণে পশিতেছে ব্রাহ্মণদের স্তবগান—'এই সেই পরম প্রভুর চরণ, মহালক্ষ্মী যাহার করেন সেবা, দেবাদিদেব শঙ্কর যাহা হৃদয়ে রাখিয়া হন ধন্য। যোগীজনের চিরবাঞ্ছিত পরম ধন, এই চরণকমল হইতেই সদা নিঃসৃত মুক্তিদায়িনী গঙ্গা।'

ভক্তির আবেশে উদ্বেল, ক্রন্দনরত নিমাইর দিকে সকলের দৃষ্টি পড়িল। দীর্ঘায়ত সুন্দর সুঠাম তনু কে এই তরুণ? দুই চোখ ছাপাইয়া কেনই বা তাঁহার এ হৃদয়বিদারী কান্না? এ ভুবনমোহন রূপ একবার

দেখিলে নয়ন ফিরাইবার উপায় নাই। এমন মানুষকে কাঁদিতে দেখিলে না কাঁদিয়া কে থাকিতে পারে? সর্ব্বচিত্তহারী কে এই করুণ-সুন্দর পুরুষ?

মন্দির কক্ষের কোণে পরমভাগবত ঈশ্বরপুরী করজোরে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া আছেন। সমকালীন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবসাধক এই সন্ন্যাসী। প্রেমভক্তিধর্ম্মের উৎস, মহাত্মা মাধবেন্দ্র পুরীর ইনি অন্তরঙ্গ শিষ্য। তীর্থ পরিক্রমায় বাহির হইয়া ইনিও এ সময়ে হঠাৎ গয়াধামে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন।

ধ্যানস্তিমিত নেত্রে ঈশ্বরপুরী এতক্ষণ পাদপদ্ম-বেদীর দিকে চাহিয়াছিলেন। এবার নিমাইর দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। প্রেমভক্তি-রসের এ কি অপূর্ব্ব বিহ্বলতা? এ দৃশ্য দেখা মাত্রই তিনি চমকিয়া উঠিলেন। সঙ্গে সঙ্গে অন্তরে খেলিয়া গেল আনন্দের তরঙ্গ। এ তরুণ যে তাঁহার অতি পরিচিত!

নবদ্বীপে ঈশ্বরপুরীর বেশ যাতায়াত আছে। তরুণ অধ্যাপক নিমাই পণ্ডিতের সঙ্গে সেখানেই তাঁহার আলাপ। শুধু অসাধারণ তীক্ষ্ণধীই নয়, অমানুষী প্রতিভারও সে অধিকারী। এই অল্প বয়সেই নবদ্বীপের পণ্ডিতসমাজে নিমাই এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে। তাঁহার সে বিদ্যা ও প্রতিভা ছাপাইয়া আজ কোন্ অলৌকিক ভক্তিরস উৎসারিত হইতে চাহিতেছে! ভীড় ঠেলিয়া ঈশ্বরপুরী নিমাইর দিকে আগাইয়া আসিলেন।

বড় অপ্রত্যাশিত এ সময়ে এ বৈষ্ণব মহাপুরুষের দর্শন। নিমাই আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। দৈন্যভরে প্রণাম করিয়া কহিলেন, "প্রভু, আজ যে আমার মহাভাগ্য। গয়ায় এসে বিষ্ণু পাদপদ্ম দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে মিলে গেল শ্রেষ্ঠ বিষ্ণুভক্তেরও দর্শন। ঈশ্বর কৃপায় এমন যোগাযোগ যখন ঘটেছে, আর আপনাকে ছাড়ছিনে, কৃপা করে আমায় মন্ত্র প্রদান করুন, চরণে আশ্রয় দিন। আপনার কাছে আমি

আত্মসমর্পণ করলাম। এবার সংসারসাগর থেকে আমায় উদ্ধার করুন, কৃতার্থ করুন বিষ্ণু-পাদপদ্মের মধু পান করিয়ে।”

ঈশ্বরপুরী কহিলেন, “নিমাই, নবদ্বীপে থাকতে তোমার অদ্ভুত প্রতিভা ও পাণ্ডিত্য আমি দেখেছি। এবার দেখ্‌ছি, অমানুষী ভক্তি-রস উদ্‌গত হচ্ছে তোমার ভেতর থেকে। কৃপাময় কৃষ্ণ নিশ্চয় তোমার অভীষ্ট পূরণ করবেন।”

কয়েকদিনের মধ্যেই নামমন্ত্রে শক্তিসঞ্চার করিয়া ঈশ্বরপুরী নিমাইকে দীক্ষা দিলেন। শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীর ভক্তিবীজ সেদিন রোপিত হইল সর্ব্বোত্তম আধারে। এ বীজের পুষ্পিত ও ফলিত রূপ—প্রেম-ভক্তিধর্ম্মের প্রবর্ত্তক, শ্রীচৈতন্য।

১৪০৭ শকাব্দের সন্ধ্যা। ফাল্গুনী পূর্ণিমার পুণ্য তিথি। নবদ্বীপের আকাশে আর সুরধুনীর বুকে জোছ্‌নার জোয়ার উথলিয়া উঠিয়াছে। নদীতীর বড় নয়নাভিরাম। ঘাটে ঘাটে অগণিত মানুষের আনাগোনা। চাঁদিনী রাতে নগরের পণ্ডিত ও পড়ুয়ারা দলে দলে এখানে আসিয়া জোটে। তর্ক-বিতর্কে, হাসি-হুল্লোড়ে আকাশ বাতাস সরগরম করিয়া তোলে। আজ আবার রহিয়াছে চন্দ্রগ্রহণের যোগ, ভীড়ের তাই অন্ত নাই। কোলাহল আর হরিধ্বনিতে আকাশ বাতাস ভরপুর।

এমনি সময়ে মায়াপুর পল্লীতে শ্রীহট্টীয়া পাড়ায় শোনা গেল নারী-কণ্ঠের ঘন ঘন হুলুধ্বনি আর শঙ্খরব।

পণ্ডিত জগন্নাথ মিশ্রের গৃহে এইমাত্র একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

মিশ্রপত্নী শচীদেবীর আর প্রতিবেশিনীদের আনন্দের অবধি নাই! নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী শচীদেবীর পিতা। নবদ্বীপের পণ্ডিতসমাজে তাঁহার যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা, জ্যোতির্বিদ্যায়ও তাঁহার খ্যাতি কম নয়। দৌহিত্রের জন্ম-সংবাদ পাইয়াই তিনি পাঁজিপুঁথি নিয়া আসিয়া উপস্থিত। গণনা করিয়া কহিলেন, “এ জাতকের কোষ্ঠী যে দেখছি অপূর্ব্ব! শুধু অসামান্য

মনীষা ও বিদ্যার অধিকারী হবে না—ধর্ম্মজগতের এক মস্ত নেতা সে হবে। বহুলোক তাকে পূজো করবে দেবতা জ্ঞানে।"

অনিন্দ্যসুন্দর মিশ্রগৃহের এই শিশু। আজিকার পূর্ণিমার চাঁদের তরণী বাহিয়া সে আবির্ভূত, এই পূর্ণিমারই স্বর্ণকান্তি যেন তাহার সারা অঙ্গে উপচিয়া পড়িতেছে।

উত্তরকালে এই শিশুরই অভ্যুদয় ঘটে নদীয়ার গৌরাঙ্গ-চাঁদ রূপে। সুরধুনীর দুই তীর প্রেমভক্তির সুধাস্নিগ্ধ কিরণে তিনি প্লাবিত করিয়া দেন। আবার নীলাচলের সাগরতীরে দেখি, আর এক অনির্ব্বচনীয় রূপ। সেখানে তিনি চৈতন্য-চন্দ্র—প্রেমভক্তির পূর্ণ প্রকাশ তাঁহার মধ্যে। বিশ্বভক্তজনের হৃদয়সাগর উদ্বেলিত করিয়া পূর্ণচন্দ্রেরই মত সেখানে তিনি বিরাজমান।

মধুর রূপ, মধুর প্রেম আর মধুর করুণার এ এক আনন্দঘন মহা-প্রকাশ। ঐশী কৃপা আর যুগ যুগ সঞ্চিত মানব-তপস্যার ফল সেদিন এই প্রকাশের মধ্য দিয়া রূপায়িত হইয়া উঠে। মানবেতিহাসে ইহার তুলনা আজিও মিলে নাই।

জগন্নাথ মিশ্রের পৈত্রিক নিবাস ছিল শ্রীহট্টের ঢাকাদক্ষিণ গ্রামে। বিদ্যাচর্চ্চার জন্য নবদ্বীপে আসিয়া আর তিনি দেশে ফিরেন নাই। স্বীয় অধ্যাপক নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর কন্যাকে বিবাহ করিয়া এখানেই তিনি রহিয়া গিয়াছেন। সংসারে তেমন প্রাচুর্য্য না থাকিলেও অস্বচ্ছলতা কিছু নাই। মোটামুটিভাবে দিন বেশ চলিয়া যায়।

মিশ্রের প্রথম পুত্রের নাম বিশ্বরূপ। পর পর কয়েকটি পুত্রকন্যার মৃত্যুর পর এবার এই পুত্রের জন্ম। জননী তাই এ শিশুর নাম রাখিলেন নিমাই। কোষ্ঠির নাম বিশ্বম্ভর।

নিমাই শুধু নিজ গৃহেরই আনন্দধন নয়, পাড়া-পড়শীদেরও সে নয়নমণি। ভুবনভোলানো তাহার দিব্য রূপের ছটা। একবার দেখিলে দুই চোখ ফিরাইয়া নেওয়া কঠিন। আনন্দ-চঞ্চল এ শিশুর হাসিতে

গৃহ-অঙ্গন মুখর হইয়া উঠে, আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই মনপ্রাণ নিমাই কাড়িয়া নেয়।

হাতে-খড়ির পর দেখা গেল, বালকের মেধা ও প্রতিভা দুই-ই বড় বিস্ময়কর। বিদ্যালয়ের পাঠ একের পর এক অবলীলায় সে আয়ত্ত করে। পুত্রগৌরবে জনক জননীর মন খুসীতে ভরিয়া ওঠে।

নিমাইর বয়স তখন প্রায় সাত বৎসর। মিশ্রের গৃহে এই সময়ে হঠাৎ এক মহাবিপদ ঘটিয়া যায়। প্রথম পুত্র বিশ্বরূপের বয়স ষোল বৎসরের বেশী হইবে না। কিন্তু এই বয়সেই দেখা দেয় তাঁহার বিষয়-বিরক্তি। অবশেষে একদিন গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। মিশ্রদম্পতি শোকে দুঃখে মুহ্যমান হইয়া পড়ে।

সন্ন্যাস নিবার পর বিশ্বরূপের নাম হয় শঙ্করারণ্য পুরী। এ জীবনে আর তিনি কখনো ঘরে ফিরিয়া আসেন নাই, বহু অনুসন্ধানেও তাঁহাকে আর পাওয়া যায় নাই।

মিশ্র পরিবারের উপর দুঃখ দুর্দ্দৈবের আঘাত এখানেই থামে নাই। নিমাইর বয়স তখন দশ এগারো বৎসরের বেশী নয়, এসময়ে সামান্য কয়েক দিন রোগে ভুগিয়া বৃদ্ধ পণ্ডিত জগন্নাথ মিশ্র শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। বালক পুত্রটিকে নিয়া জননী শচীদেবীর বিপদের অন্ত রহিল না।

মায়ের একমাত্র আশা ভরসাস্থল, এই নিমাই। গঙ্গাদাস পণ্ডিতের চতুষ্পাঠীতে সে পড়িতেছে। অতুলনীয় তাহার মেধা ও বুদ্ধিবৃত্তি কিন্তু তাহাকে নিয়া ঝঞ্চাটেরও অন্ত নাই। কি পাঠশালায়, কি পথে ঘাটে বা গঙ্গার ঘাটে নিমাইর দৌরাত্ম্যে সকলে অস্থির। দুষ্টামি করিয়া কাহারো পূজার ফুল সে কাড়িয়া নেয়, কাহারো গায়ে হঠাৎ জল ছিটাইয়া দিয়া কোথায় লুকাইয়া পড়ে। চঞ্চল বালকের বিরুদ্ধে প্রায়ই থাকে নানা অভিযোগ, এসব শুনিতে শুনিতে জননীর কান ঝালা-পালা হয়। প্রতিবেশীদের কোনমতে বুঝাইয়া তিনি শান্ত রাখেন।

চতুষ্পাঠির পড়া শেষ হইয়া আসিয়াছে। নিমাইর বয়স এখন মাত্র আঠার বৎসর। কিন্তু এই বয়সেই তাঁহার প্রতিভার অপূর্ব্ব দীপ্তি দেখিয়া সকলে চমকিয়া উঠে। বাল-চঞ্চলতা আর নাই। এখন তিনি হইয়া উঠিয়াছেন কূট-তার্কিক, বিদ্যাদর্পী,—অসাধারণ তাঁহার প্রতিভা ও বিদ্যাবত্তা। নানা দুরূহ তত্ত্ব যেমন অবলীলায় আয়ত্ত করেন, উহা নিয়া সঙ্গী পড়ুয়াদের সাথে তর্কজালের বিস্তারও কম করেন না।

নিমাইর সব চাইতে বড় বিলাস—ফাঁকির নানা কূট প্রশ্ন তুলিয়া লোককে বিব্রত করা, তাহাদের অপদস্থ করিয়া রঙ্গ দেখা। নবদ্বীপের নবীন প্রবীণ সকল পড়ুয়াই তাঁহার ভয়ে ভীত, তাঁহাকে এড়াইয়া চলিতে পারিলেই যেন বাঁচে।

নিমাইর টোলের পড়াশুনা সমাপ্ত হইয়া গেল। এবার নিজেই সোৎসাহে অধ্যাপনা শুরু করিলেন। মুকুন্দসঞ্জয় নবদ্বীপ শহরের একজন বর্দ্ধিষ্ণু লোক। তাঁহার বৃহৎ চণ্ডীমণ্ডপটিতে নবীন শিক্ষক নিজস্ব টোল খুলিয়া বসিলেন। নিমাই পণ্ডিতের প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের খ্যাতি তাড়াতাড়ি চারিদিকে প্রচারিত হইতে থাকে। টোল জমিয়া উঠিতে তাই বেশী দেরী হইল না।

পুত্র এবার অধ্যাপক। সংসারে আর্থিক স্বাচ্ছল্যও বেশ কিছুটা হইয়াছে। তাহার জন্য একটি মনোনীত পাত্রী খুঁজিতে শচীদেবী ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। অবশেষে বল্লভ আচার্য্যের সুলক্ষণা কন্যা লক্ষ্মীদেবীকে তাঁহার মনে ধরিল। বধূরূপে তাহাকেই ঘরে তুলিলেন।

নবীন অধ্যাপক হইলে কি হয়, ব্যক্তিত্ব ও বিদ্যাবত্তা নিমাইর অসাধারণ। তাছাড়া অলৌকিক প্রতিভার প্রকাশও তাঁহার মধ্যে মাঝে মাঝে দেখা যায়। বিশিষ্ট অধ্যাপক ও পণ্ডিতরা এজন্য তাঁহাকে বড় একটা ঘাঁটাইতে চাহেন না। বরং কিছুটা এড়াইয়াই চলেন। এ সময়কার একটি ঘটনায় তাঁহার লোকোত্তর স্বরূপটি নবদ্বীপের লোকের কাছে হঠাৎ একদিন প্রকাশিত হইয়া পড়ে।

আচার্য্য কেশব কাশ্মীরের এক প্রথিতযশা পণ্ডিত। ভারতের প্রসিদ্ধ বিদ্যাকেন্দ্রগুলিতে সাড়ম্বরে তিনি ঘুরিয়া বেড়ান, আর তর্কযুদ্ধে সকলকে পরাস্ত করেন। নবদ্বীপে আসিয়াই পণ্ডিত হাঁকডাক শুরু করিয়া দিলেন। তাঁহার কাব্যপ্রতিভা ও বিচারশক্তির খ্যাতি শুনিয়া পণ্ডিত সমাজে বেশ কিছুটা ভীতির সঞ্চার হইল। সহসা কেহ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইতেছেন না।

নিমাই সেদিন গঙ্গাতীরে বসিয়া আলাপ আলোচনা করিতেছেন। চারিদিকে তাঁহার ছাত্রের দল উপবিষ্ট। দিগ্বিজয়ী কাশ্মীরী পণ্ডিত পাল্‌কীতে চড়িয়া নিকটেই কোথায় যাইতেছেন। প্রতিভাদীপ্ত এই নবীন অধ্যাপকের দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। ঘাটে আসিয়া নিজ হইতেই আলাপ-পরিচয় শুরু করিলেন।

ভারতখ্যাত, মহারথী পণ্ডিত তাঁহার সম্মুখে। উপযুক্ত সম্মান দেখাইয়া নিমাই নম্রনতি জানাইলেন।

নানা কথাবার্ত্তা চলিতেছে। হঠাৎ নিমাই তাঁহাকে কহিলেন, "পণ্ডিতবর, আমাদের সামনেই প্রবাহিতা রয়েছেন মুক্তিদায়িনী ভাগীরথী। শুনেছি আপনার কবিত্বশক্তি অতুলনীয়। কৃপা করে একটি নূতন গঙ্গা-স্তব রচনা করে আমাদের শুনিয়ে দিন। পাপ মোচন হোক্।"

নিমাইর মুখের কথা না ফুরাইতেই পণ্ডিত কেশব অবলীলায় ঝড়ের বেগে এক সদ্যরচিত স্তব আবৃত্তি করিয়া চলিলেন। রচনাটি সুদীর্ঘ এবং রসমধুর। অপূর্ব্ব প্রতিভার ছাপ তাহার ছত্রে ছত্রে। চারিদিকে শ্রোতাগণ বিস্ময়বিমূঢ় হইয়া আছে। স্তবপাঠ শেষ হইয়া গেলে কেশব তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া নবীন অধ্যাপকের দিকে চাহিলেন।

এবার নিমাই সবিনয়ে শুরু করিলেন শ্লোকের সমালোচনা। শব্দ ও ভাবের অশুদ্ধি, অলঙ্কারের অপপ্রয়োগ একটির পর একটি অসাধারণ প্রতিভা ও চাতুর্য্যবলে তিনি বর্ণনা করিতে লাগিলেন।

দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করিলে কি হয়, নিমাই মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহাকে কোণঠাসা করিয়া ফেলেন। একি অদ্ভুত অলৌকিক

শক্তি এই তরুণ অধ্যাপকের! কাহার সাধ্য ইঁহার সহিত আঁটিয়া উঠে? মহাপণ্ডিত কেশবের ভারতজয়ী প্রতিভা কোথায় আজ লুকাইয়া গিয়াছে, তিনি বড় মুষড়িয়া পড়িলেন।

পণ্ডিতের দুরবস্থা বুঝিয়া নিতে নিমাইর দেরী হইল না। আশ্বাস দিয়া কহিলেন—"পণ্ডিতবর, আজ আর বিতর্কে কাজ নেই। অনেক হয়েছে, আপনিও শ্রান্ত হয়েছেন। বরং আগামী কাল আমরা আবার মিলিত হবো।"

পরের দিন ভোর না হইতেই দিগ্বিজয়ী একাকী নিমাইর কাছে আসিয়া উপস্থিত! নিতান্ত দীনভাব। সে রণং-দেহি, উদ্ধত মূর্ত্তি আর নাই। কহিলেন, পূর্ব্ব রাত্রে স্বপ্নযোগে নিমাইর অলৌকিক স্বরূপ নাকি তিনি জ্ঞাত হইয়াছেন, আর তাঁহার সহিত বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইতে, তাঁহার কাছে পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিতে ইচ্ছা নাই। পরদিনই তিনি নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া গেলেন।

দিগ্বিজয়ীর এই রহস্যময় অন্তর্দ্ধানের ফলে নিমাই পণ্ডিতের খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। নবদ্বীপের পণ্ডিতসমাজে তাঁহার প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়িয়া যায়।

কিছুদিন পরে নিমাই একবার পূর্ব্ববঙ্গ ভ্রমণে যান। সুপণ্ডিত ও প্রতিভাবান পণ্ডিত বলিয়া সে অঞ্চলে তিনি যথেষ্ট মর্য্যাদা পান, প্রচুর অর্থও উপার্জ্জন করিয়া আনেন।

ফিরিয়া আসিয়া দেখেন, ইতিমধ্যে গৃহে এক শোকাবহ দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। নব পরিণীতা স্ত্রী লক্ষ্মীদেবী সর্পদংশনের ফলে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন।

এখন হইতে অধ্যাপনার উপর নিমাই জোর দেন। প্রতিষ্ঠা দিন দিন বাড়িতে থাকে। দূরদূরান্ত হইতে তাঁহার টোলে ছাত্রগণ আসিয়া জড় হয়। ধনী ও প্রতিপত্তিশালী নাগরিকদের পৃষ্ঠপোষকতায় অচিরে তিনি বেশ গণ্যমান্য হইয়া পড়েন।

শচীদেবীর অন্তরে কিন্তু সুখ নাই। এমন প্রাচুর্য্যভরা ঘর-সংসার, কিন্তু একটি গৃহিণী সেখানে না থাকিলে চলিবে কেন? নিমাইর আবার বিবাহ না দিলে তিনি শান্তি পাইতেছেন না।

সুপাত্রী শীঘ্রই জুটিল। নবদ্বীপে সনাতন পণ্ডিতের বেশ সুনাম রহিয়াছে, মান সম্মান ও বিষয় সম্পত্তিও তাঁহার কম নয়। রাজপণ্ডিত নামেই এ অঞ্চলে তিনি পরিচিত। তাঁহার কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়াকে শচীর বড় পছন্দ হইল। ভাবিয়া খুসী হইলেন, পরম রূপলাবণ্যবতী এই কিশোরীকে নিমাইর পাশে চমৎকার মানাইবে।

মহা আড়ম্বরের সহিত বিবাহ হইয়া গেল। জননী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন।

মিশ্রপণ্ডিতের ঘর-সংসার এবার বড় মধুময়, বড় মনোহর। নানা দুঃখ-দুর্দ্দৈবের পরে সুখনীড়টি সদাই আনন্দের হিল্লোলে দুলিতেছে। বৃদ্ধা জননী গৃহদেবতা রঘুনাথ-বিগ্রহের সাম্‌নে বসিয়া শান্ত মনে মালা জপেন, গঙ্গাস্নান করিয়া তুলসীতলায় রোজ পুত্রের কল্যাণে প্রণাম নিবেদন করেন, আর পুরাণপুত্তলি নিমাইর সংসারের দিকে চাহিয়া মাঝে মাঝে তৃপ্তির হাসি হাসেন।

আর কিশোরী বিষ্ণুপ্রিয়া? তাঁহার জীবনে আজ উথলিয়া উঠিয়াছে স্বর্গের অমৃত ধারা। এমন স্বামী-সৌভাগ্য এই নবদ্বীপে আর কাহার আছে? পরম রমণীয় রূপ নিমাইর, অসামান্য তাঁহার প্রতিভা ও পাণ্ডিত্য। এমন স্বামীর সোহাগিনী তিনি।

যুবক নিমাইর জীবনেও আসিয়াছে প্রতিষ্ঠা আর সুখৈশ্বর্য্যের জোয়ার। অনন্যসাধারণ বিদ্যা ও প্রতিভার তিনি অধিকারী। মহানন্দে পাণ্ডিত্যের দর্প ও বিলাস নিয়াই অধ্যাপক ও পড়ুয়া সমাজে তাঁহার দিন কাটে। কেহ তাহাকে বলে—উদ্ধত। কেহ বলে,—লোকোত্তর শক্তির অধিকারী মহাভাগ্যবান পুরুষ।

গৃহজীবনেই বা নিমাই পণ্ডিতের মত ভাগ্যবান কয়জন? এমন কল্যাণময়ী জননীর স্নেহচ্ছায়া কে কোথায় পায়? আর পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়া?

দেহে তাঁহার অনুপম রূপলাবণ্যের ঐশ্বর্য্য, অন্তরে সদা টলমল করিতেছে স্বামীপ্রেমের মধুর রস।

অধ্যাপক জীবনের সাফল্য, আর গৃহী জীবনের মাধুর্য্যে নিমাইর মত আর কাহার জীবন এমন ভরপুর ?

আনন্দ-মদির এই জীবন কিন্তু কয়েক বৎসর পরে হঠাৎ একদিন বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়। আর এ বিপর্য্যয় আসে নিমাইর অলৌকিক ভাবমত্ততার মধ্য দিয়া—দমকা হাওয়ার মত।

গয়াধামে পৌঁছিবার পরই জীবনের পুরাতন নির্ম্মোক কখন যেন কি করিয়া খসিয়া পড়িল। বাহির হইয়া আসিল নূতন রূপে, নূতন ভাবময়তার মধ্য দিয়া এক নূতন মানুষ। কৃষ্ণ-অনুরাগের অঞ্জন কে যেন তাঁহার দুই চোখে পরাইয়া দিয়াছে। সংসারের সমস্ত কিছু রঙ রসও আজ তাই বদলাইয়া গিয়াছে।

মিশ্রগৃহের সুখনীড়ে পূর্ব্বের সে নিমাই আর ফিরিয়া আসে নাই। সে তেজোদৃপ্ত অধ্যাপক আজ কোথায় যেন হারাইয়া গিয়াছে। সেই মাতৃভক্ত পুত্র—প্রেমগদগদ সে স্বামী আর নাই। নিমাই ফিরিয়াছেন কৃষ্ণবিরহবিধুর, মহাপ্রেমিক এক সাধকরূপে।

ভক্তি-প্রেমের এ সাধনা সেদিন তাঁহাকে ভক্ত মানবের হৃদয়েশ্বর করিয়া তুলে। অধ্যাপক বৃত্তি ও বিদ্যাবৈভব ত্যাগ করিয়া তিনি হন প্রেমের কাঙাল। সর্ব্বজীবের বিরহবেদনা, দৈন্য ও আর্ত্তি তরঙ্গিত হইয়া উঠে তাঁহার বুকে। শচীমায়ের দুলাল রূপান্তরিত হন অগণিত মানব হৃদয়ের আনন্দঘন রূপে। বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণকান্ত হইয়া উঠেন লক্ষ জীবের প্রাণেশ্বর—প্রেমের ঠাকুর।

গয়াধামে নিমাইর সম্মুখে শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী সেদিন নিতান্ত আকস্মিকভাবেই আবির্ভূত হন। ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম সমাপ্ত করিয়া আবার তেমনি আকস্মিক ভাবে এই পরমভাগবত সন্ন্যাসী অদৃশ্য হইয়া যান। আর তাঁহার সন্ধান মিলে নাই।

যে নাম-মন্ত্রটি সেদিন এই ভক্তিসিদ্ধ মহাবৈষ্ণব নিমাইর কাণে ঢালিয়া দেন, তাহার প্রতিক্রিয়া হয় সুদূরপ্রসারী। বিদ্যা অভিমানের কঠিন আবরণটি মুহূর্ত্তে টুটিয়া যায়। কৃষ্ণ মিলনের পিয়াসে, বিরহের দুঃসহ দহনজ্বালায় তিনি হন অধীর উদ্বেল। কাঁদিয়া কাঁদিয়া বিহ্বল হন, আর নয়নের জলে বয়ান ভিজিয়া যায়। সর্ব্ব অঙ্গে ফুটিয়া উঠে অশ্রুকম্প-পুলক চিহ্নিত সাত্ত্বিক প্রেমবিকার।

শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর সেদিনকার আশীর্ব্বাদ ছিল অমোঘ! ইহার ফল ফলিতে দেরী হয় নাই। যুগযুগান্তের ধ্যানের বিগ্রহ, প্রাণের ইষ্টকে নিমাই তাঁহার কৃপায় দর্শন করেন। 'নব কিশোর নটবর, মুরলীধর মনোহর' রূপে প্রাণপ্রভু কৃষ্ণ হন তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত! এ ভুবনভোলানো রূপ, এ রূপের অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য তরঙ্গায়িত হয় তাঁহার সর্ব্বসত্তায়। এ তরঙ্গে কোথায় তিনি ভাসিয়া চলেন?

এ রূপ, এ মাধুর্য্য তাঁহাকে পাগল করিয়া দেয়, আবার হঠাৎ আত্মগোপন করে? কোথায়, কি করিয়া প্রেমময়ের দর্শন মিলিবে? বিরহে নিমাই উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠেন। অধীর হইয়া বিলাপ করিতে থাকেন, 'কৃষ্ণরে, বাপরে! আমার প্রাণমন চুরি করে নিয়ে কোথায় তুমি লুকিয়ে রইলে! প্রাণের ঈশ্বর! এসো, এসো কৃপা করে তেমনিভাবে আবার আমায় দেখা দাও।'

সঙ্গীরা সকলে মিলিয়া বারবার প্রবোধ দিতে থাকেন। কিন্তু কে তাহাতে কাণ দেয়? কৃষ্ণবিরহের আগুন দাউ দাউ করিয়া সর্ব্বসত্তায় জ্বলিয়া উঠিয়াছে। কে তাহা নিভাইবে?

কাঁদিয়া কাঁদিয়া নিমাই বলেন, "ভাইরে, তোমরা সবাই ফিরে চলে যাও। আমি আর নবদ্বীপে যাবো না। প্রাণ-সর্ব্বস্ব কৃষ্ণকে কোথায় পাবো, তাই বলে দাও। আমার হৃদয়-বৃন্দাবন ছেড়ে তিনি কি মথুরায় গিয়েছেন? তাহলে, আজ মথুরার পথেই আমি পা বাড়াবো। তোমরা আমায় ছেড়ে দাও, এ দুঃসহ জ্বালা কেউ বুঝবে না।"

বহু সান্ত্বনা, বহু অনুনয়-বিনয়ের পর কোনমতে তাঁহাকে নবদ্বীপে ফিরাইয়া আনা হইল।

সর্ব্বত্র রটিয়া গেল, পাণ্ডিত্যগৌরবে উদ্ধত সে নিমাই পণ্ডিত আর নাই। গয়াধামে গিয়া তাঁহার এক অপূর্ব্ব রূপান্তর ঘটিয়া গিয়াছে। নিমাই আজ বৈষ্ণবীয় দৈন্যের মূর্ত্ত বিগ্রহ—এক পরম ভাগবত। প্রাণ-প্রভু কৃষ্ণের বিরহে সদাই তিনি থাকেন মুহ্যমান। আর্ত্তি দেখিয়া নয়নজল রোধ করা যায় না।

নবদ্বীপের বৈষ্ণবদের মধ্যে মহা উৎসাহের সঞ্চার হইল। অনন্য-সাধারণ প্রতিভা ও বিদ্যাবত্তার অধিকারী এই নিমাই পণ্ডিত। এবার ভক্তি-ধর্ম্মে তাঁহার মতি হইয়াছে। শুধু তাহাই নয়, অসামান্য ভক্তি ও প্রেমাবেশ দেখা যাইতেছে তাঁহার মধ্যে। ভক্তসমাজের কাছে এ বড় আনন্দের কথা, বড় আশার কথা।

ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা তাঁহার গয়াধামের অলৌকিক অভিজ্ঞতার কথা শুনিতে উৎসুক হইয়াছেন। নিজের মনের দুঃখ বর্ণনার জন্য, প্রাণ ভরিয়া কাঁদিবার জন্য নিমাইও কম ব্যস্ত নন। শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর গৃহে সকলে একদিন তাই মিলিত হইলেন।

কিন্তু কথা বলিবার মত মনের অবস্থা নিমাইর কই? তাছাড়া, পরিচিত ভক্তিমান বন্ধুদের দর্শনমাত্রেই তিনি উদ্দীপিত হইয়া উঠিলেন, কৃষ্ণবিরহের শোক উথলিয়া উঠিল।

ভাগবত হইতে শ্লোকরাশি উচ্চারণ করিয়া অধীরভাবে কেবলই তিনি কাঁদিতে থাকেন। ক্রমে তীব্র প্রেমাবেশে উন্মত্ত হইয়া উঠেন। কনককান্তি দেহটি কখনো ধূলায় আছ্ড়িয়া পড়িতেছে—কখনো বা কাঁদিয়া কাঁদিয়া তিনি হইতেছেন মূর্চ্ছিত।

"আমার কৃষ্ণ কই, কৃষ্ণ কই?" বলিয়া নিমাই হঠাৎ একবার প্রচণ্ড বেগে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। গৃহের স্তম্ভটিকে সজোরে জড়াইয়া ধরিলেন, মড়্ মড়্ শব্দে উহা ভাঙ্গিয়া পড়িল। তারপর শুরু হইল, 'হা কৃষ্ণ—হা

কৃষ্ণ' বলিয়া তাঁহার মর্ম্মভেদী বিলাপ। এ বিলাপ ও প্রেমবিকারের চিহ্নসমূহ দেখিয়া বন্ধুরা তো হতবাক্।

সকলে ভাবিতেছেন, এ যে সাত্ত্বিক প্রেমবিকার। বৈষ্ণব সাধকদের কাছে এ যে পরম আকাঙ্ক্ষার বস্তু! উচ্চকোটি সাধক ছাড়া এ প্রেম লাভের সৌভাগ্য তো কাহারো হয় না! ভাগবতে যে সব অবস্থার বর্ণনা রহিয়াছে, সুদীর্ঘ সাধনার পর সিদ্ধ ভক্তদেহে যাহা প্রকটিত হয়, নিমাই পণ্ডিতের দেহে হঠাৎ সেসব লক্ষণ কি করিয়া দেখা দিল? এ যে সত্যই এক অভাবনীয় কাণ্ড!

মুরারি, সদাশিব, দামোদর প্রভৃতি ভক্ত সাধকগণ নিমাইর মুখে তাঁহার পরিবর্ত্তনের কথা, অধ্যাত্ম-অভিজ্ঞতার কথা শুনিতে আসিয়াছেন। সকল কথা শুনিয়া ও এই অদ্ভুত প্রেমবিকার দেখিয়া তাঁহারা বুঝিলেন, গয়াধামে নিমাইর ইষ্ট দর্শন হইয়াছে। পূর্ব্ব জীবনের সঞ্চিত পুণ্যপ্রবাহ ঐশী নির্দ্দেশে হঠাৎ সেদিন তাঁহার জীবনে নামিয়া আসিয়াছে—আর তাহা নামিয়াছে বন্যার বেগে। এ বেগ দুর্দ্দমনীয়, অফুরন্ত!

বিস্ময়ে ও আনন্দে সকলে ভাবিতে লাগিলেন, ভগবানের কোন্ নিগূঢ় ইঙ্গিত ইহাতে রহিয়াছে কে জানে? শক্তিধর নিমাই কি তবে ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষ? ভারতে ভক্তিধর্ম্ম আজ স্তিমিতপ্রায়। উহারই পুনরুজ্জীবনের বার্ত্তা নিয়া কি আজ সে আবির্ভূত?

নিমাই কাঁদিয়া কহিতে লাগিলেন, "ভাই গদাধর, তোমরা ধন্য, আগে থেকে কৃষ্ণভজন করে আস্‌ছো। আমার এ জীবন কেটে গেল বৃথা কাজে। যদিই বা ভাগ্যবলে গয়ায় গিয়ে কৃষ্ণের দেখা পেলাম, তাও আবার ফেল্‌লাম হারিয়ে। তোমরা আমায় বলে দাও, কোথায় গেলে আমার প্রাণপ্রভুকে পাবো।"

কৃষ্ণবিরহবিধুর নিমাই বাণবিদ্ধ পাখীর মত ছট্‌ফট্ করিতেছেন। সঙ্গীরা সবাই তাঁহার চারিদিকে দণ্ডায়মান। এ অ-মানুষী ভক্তির উচ্ছ্বাস দেখিয়া সকলে স্তম্ভিত।

নানাভাবে প্রবোধ দিবার পর নিমাই কিছুটা শান্ত হইলেন, তাঁহাকে গৃহে পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

টোলের অধ্যাপনা দুই তিন মাস যাবৎ বন্ধ রহিয়াছে। নিমাই এবার তাই ছাত্রদের পড়াতে বসিলেন। কিন্তু আগের সে উৎসাহ উদ্দীপনা কোথায়? তেজোদৃপ্ত অধ্যাপক আজ হইয়াছেন এক দীনাতিদীন ভক্ত কৃষ্ণদর্শনের ব্যাকুলতায় তিনি অধীর।

পাঠ গ্রহণের জন্য ছাত্রের দল সাগ্রহে তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়াছে। কিন্তু পড়াইবে কে? ব্যাকরণগ্রন্থ খোলা অবস্থাই একপাশে পড়িয়া থাকে। নিমাই ভাবাবেশে মুহ্যমান হন। অর্দ্ধবাহ্য অবস্থায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া যায়। মুখে কেবলই উচ্চারণ করিতে থাকেন ভাগবতের শ্লোক আর কৃষ্ণকথা। আয়ত নয়ন দুইটি বহিয়া দরদরধারে কৃষ্ণ-বিরহের অশ্রুধারা ঝরিতে থাকে।

বহুক্ষণ পর আবার তাঁহার স্বাভাবিক জ্ঞান ফিরিয়া আসে। শিষ্যদের বলিতে থাকেন, "ভাইসব, পড়ানোর কাজ এখন থেকে আর আমাকে দিয়ে হবে না। গ্রন্থ খুলে বসলে পাঠ বা ব্যাখ্যার দিকে মন যায় না। যাবেই বা কি করে? নয়ন মেলতে না মেলতেই দেখি কৃষ্ণবর্ণ এক শিশু, হাতে তাঁর মোহন বাঁশী, মাথায় শিখিপুচ্ছ-চূড়া, গলায় বনমালা। মধুর হাসিতে তাঁর চারদিক ঝলমল করে ওঠে। সুস্মিত হাসি হেসে সে মুরলী বাজায়, আর আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকে। আমাতে আর আমি থাকিনে! তোমরা এবার আমায় বিদায় দাও। প্রাণভরে আমি আশীর্ব্বাদ করছি, তোমাদের সবার কৃষ্ণভক্তি হোক্।"

অতঃপর প্রিয় ছাত্রদের নিয়া নিমাই পরম আনন্দে নামকীর্ত্তন সুরু করিয়া দেন। করতালি দিয়া সকলকে গাওয়ান—

হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন ॥

সারা অন্তর ভাবাবেশে উদ্বেল। সুগৌর সুঠাম দেহটি ভূতলে পড়িয়া লুটাইতে থাকে। নয়নের নীরে বসন তিতিয়া যায়। বাহ্যজ্ঞান মাঝে

বৎসরের পর বৎসর, দিনের পর দিন আচার্য্য ভগবৎ-চরণে আকুল প্রার্থনা জানাইয়াছেন, তুলসীচন্দন নিবেদন করিয়া কাঁদিয়াছেন, "প্রভু তোমার স্বষ্ট পৃথিবীতে আজ ভক্তি নেই, প্রেম নেই। জীবনের স্তরে স্তরে জমে উঠেছে কলুষ আর ক্লেদ। তুমি এসো, তোমার কৃপার ধারায় সব শুচি-স্নিগ্ধ করে তোল। জীবের উদ্ধার সাধন কর।" আজ কি তাঁহার সেই প্রার্থনারই উত্তর আসিয়া গিয়াছে?

এ কোন্ ভাগবতী-তনু তাঁহার নয়ন সমক্ষে আবির্ভূত? অমরার লাবণ্য ছানিয়া রচিত ইঁহার দেহ, আয়ত নয়নযুগলে অবিরাম বহিতেছে প্রেম-যমুনার ধারা। আর্ত্তি ও ক্রন্দনে কঠিন পাষাণও বিগলিত হয়—পাষাণ-হৃদয় তো কোন্ ছার!

অদ্বৈত আচার্য্যের অন্তরের অন্তস্তল হইতে কে যেন আজ বারবার ডাকিয়া কহিতেছে, "ওরে, এই যে তোর বহুপ্রার্থিত প্রেমঘন বিগ্রহ। নিখিল মানবের আর্ত্তি বুকে নিয়া, কৃষ্ণবিরহের কান্না দুই চোখে পুরিয়া আজ ইঁহার আবির্ভাব!"

বৃদ্ধ আচার্য্য আনন্দাবেশে অধীর হইয়া উঠিয়াছেন। নিমাইর মধ্যে কোন্ অলৌকিক বস্তু তিনি দেখিলেন তাহা তিনিই জানেন। তাঁহার সম্বিৎহীন দেহের সম্মুখে বসিয়া, পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া তিনি পূজা করিলেন।

শ্রীঅদ্বৈতের সেদিনকার এই স্বীকৃতি নবদ্বীপের বৈষ্ণব সমাজে নিমাইর এক অপূর্ব্ব মর্য্যাদা আনিয়া দিল। প্রেম-ভক্তিধর্ম্মের নেতারূপে তিনি চিহ্নিত হইয়া উঠিলেন।

এবার তিনি হইলেন ভক্তজনের হৃদয়প্রভু—শ্রীগৌরাঙ্গ, আর প্রেমিক সাধকের—গৌরসুন্দর!

শ্রীবাসঅঙ্গনে প্রভুর অপূর্ব্ব অন্তরঙ্গ প্রেমলীলা, আর কীর্ত্তনবিলাস এবার হইতে শুরু হইল।

কখনো দেখা যায় তাঁহাকে এক মহাভক্তরূপে। অন্তরঙ্গ সঙ্গীদের কাছে হৃদয় উঘারিয়া তিনি মনোবেদনা জানাইতেছেন—বুকফাটা

আর্ত্তনাদ শুনিয়া সকলে কাঁদিতে শুরু করিয়াছে আবার কখনো বা অপরূপ দিব্য চেতনায় তিনি উদ্বুদ্ধ—অলৌকিক ভাবৈশ্বর্য্য ও ভগবত্তার প্রকাশ তাঁহার মধ্যে। চুম্বক যেমন লৌহকণাসমূহ অবলীলায় আকর্ষণ করে, তেমনি শ্রীগৌরাঙ্গ একের পর এক তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্ষদদের কাছে টানিয়া আনিতেছেন। এখন তিনি আর শুধু প্রেমভক্তিরসে উচ্ছল সাধকমাত্র নহেন—এখন তিনি শত শত ভক্ত হৃদয়ের অধীশ্বর, নূতন বৈষ্ণবগোষ্ঠীর নিয়ামক। এখন তিনি 'প্রভু'।

নবদ্বীপের এই প্রেমলীলা ও কীর্ত্তন বিলাসে কিন্তু এক বৎসরের বেশী সময় অতিবাহিত হয় নাই। কিন্তু এ অত্যল্প সময়ের মধ্যে প্রেমধর্ম্মের বিরাট এক সংগঠন তিনি নিপুণভাবে গড়িয়া তুলিলেন। আর আনিলেন মধুর ভজন, রাগানুগা সাধন আর নামকীর্ত্তনের অপূর্ব্ব তরঙ্গোচ্ছ্বাস!

চিহ্নিত ভক্তদল একে একে নিমাইর চরণতলে উপস্থিত হইতেছেন। কেউ কেউ পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার সহিত সহজ সখ্য ও প্রীতির সম্পর্কে আবদ্ধ। আবার নূতনও অনেকে আসিয়া জুটিতেছেন। সকলে মিলিয়া ইহারা নিমাইকে প্রভু বলিয়া ডাকিলেন, আকুল আগ্রহে তাঁহার ভক্তিগঙ্গার প্রবাহে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন।

গৌরাঙ্গের ভুবনমোহন মূর্ত্তি, আর ভুবনমঙ্গল নাম-কীর্ত্তনের আকর্ষণ বড় প্রবল, বড় অমোঘ। সবার অলক্ষ্যে অন্তরঙ্গ ভক্তদল শ্রীবাস-অঙ্গনে আসিয়া জুটিতেছেন। মহাপ্রেমিক, মহাশক্তিধর প্রভুকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিতেছে এক বিরাট ভাগবতগোষ্ঠী—সূচনা করিতেছে এক নবযুগের অভ্যুদয়।

কোথায় গৌরাঙ্গের এ বিস্ময়কর শক্তির উৎস? যোগৈশ্বর্য্য তিনি প্রকটিত করেন না। শাস্ত্ররচনা ও শাস্ত্রব্যাখ্যানও তাঁহাকে করিতে দেখা যায় না। তবে মানুষ কোন্ আকর্ষণে দলে দলে ছুটিয়া আসে? এ শক্তি রহিয়াছে তাঁহার সর্ব্বহৃদয় আকর্ষণকারী, সর্ব্বহৃদয় দ্রবকারী প্রেমের মধ্যে। রূপের মাধুর্য্য আর প্রেমের মহাভাব নিমাইর মধ্যে অলৌকিক-ভাবে আজ মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে।

দেবদুর্লভ তাঁহার অঙ্গের লাবণি, ভুবনভোলানো, হৃদয়গলানো তাঁহার রূপ। এ রূপ দেখাইয়া মানুষকে তিনি আকর্ষণ করেন। দলে দলে তাহারা ছুটিয়া আসে। ছুটিয়া আসিয়া গৌরসুন্দরের রূপের ফাঁদে পড়ে। তাঁহার কৃষ্ণবিরহের কথা শুনিয়া, হৃদয়-নিঙড়ানো কাঁদন শুনিয়া তাহারা কাঁদে। তারপর চিরতরে তাঁহার চরণতলে দেহমনপ্রাণ বিকাইয়া দেয়! 'প্রভু' হইয়া উঠেন তাঁহাদের ধ্যানের বস্তু, তাঁহাদের প্রেমের পুত্তলি, তাঁহাদের জীবনসর্ব্বস্ব!

কৃষ্ণপ্রেমরসে শ্রীগৌরাঙ্গ থাকেন সদা ভাসমান। আর্ত্তি, ক্রন্দন ও আনন্দোচ্ছ্বাসের মধ্য দিয়া দিবারাত্রি তাঁহার কোথা দিয়া যেন কাটিয়া যায়। কখনো থাকেন মূর্চ্ছিত, কখনো বা অর্দ্ধ-বাহ্যাবস্থায়। কিন্তু বড় আশ্চর্য্যের বিষয়, এ ভাবোন্মত্ততার ভিতর একদিনের তরেও আপন লীলাসঙ্গী নির্ব্বাচনের বেলায় একটুও তাঁহার ভুল হয় নাই। এ কাজে সর্ব্বদা দেখা গিয়াছে তাঁহার বিস্ময়কর দক্ষতা, আর প্রয়োজন মত সর্ব্বত্র স্ফুরিত হইয়াছে তাঁহার অলৌকিক শক্তি।

অন্তরঙ্গ পার্ষদদের মধ্যে শ্রীবাস, মুরারি, গদাধর, নরহরি, পুরুষোত্তম সঞ্জয় প্রভৃতি একে একে পূর্ব্বেই আসিয়া গিয়াছেন। অদ্বৈত আচার্য্য, হরিদাস প্রভৃতিকে আত্মসাৎ করিয়া নিতেও প্রভুর দেরী হয় নাই। এবার তিনি প্রতীক্ষমান রহিয়াছেন তাঁহার প্রধানতম পার্ষদ ও প্রতিনিধি নিত্যানন্দের জন্য।

শ্রীবাস অঙ্গনে কীর্ত্তন সমাপন করিয়া প্রভু সেদিন ভক্তসঙ্গে ইষ্টগোষ্ঠী করিতেছেন। হঠাৎ এক সময়ে সকলকে ডাকিয়া কহিলেন, "তোমরা সবাই শোন। এক উচ্চকোটি মহাপুরুষ কয়েকদিন হয় পদার্পণ করেছেন নবদ্বীপে। নিজ ইচ্ছায় তিনি আত্মগোপন করে আছেন। তোমরা ভাল করে তাঁর সন্ধান কর। তাঁর সঙ্গে মিলিত হবার জন্য আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।"

ভক্তগণ মহাবিপদে পড়িলেন। নবাগত মহাপুরুষটি এত লোকের

ভিতর কোথায় আপনাকে লুকাইয়া রাখিয়াছেন কে জানে? জনবহুল নবদ্বীপে তাঁহার সন্ধান পাওয়া সহজ কথা নয়। অনেক খোঁজাখুঁজি করিয়াও তাঁহাকে পাওয়া গেল না।

প্রভু এবার নিজেই পার্ষদদের নিয়া শহরের পথে বাহির হইলেন। ভাবাবিষ্ট অবস্থায় সোজা নন্দন আচার্য্যের গৃহে গিয়া তিনি উপস্থিত। সবাই সবিস্ময়ে দেখিলেন, শুভ্রকান্তি অনিন্দ্যসুন্দর এক অবধূত সেখানে উপবিষ্ট। প্রভু ভক্তগণসহ ভক্তিভরে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া করজোড়ে সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

উভয়ে উভয়ের দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া আছেন। কাহারো মুখে একটিও কথা নাই। গৌরাঙ্গ মনে মনে ঠিক করিলেন, অবধূতের হৃদয়ের অর্গলটি কৌশলে তিনি খুলিয়া দিবেন, আর সবাইকে দেখাইবেন এক অপূর্ব্ব রঙ্গ। তাই শ্রীবাসকে তিনি ভাগবত হইতে একটি ভক্তি-রসাত্মক শ্লোক পড়িতে কহিলেন।

শ্লোকটি পড়া হইবামাত্র দেখা গেল এক চমকপ্রদ দৃশ্য! দুর্ব্বার প্রেমতরঙ্গে অবধূত কোথায় যেন ভাসিয়া চলিয়াছেন। দুই নয়নে অবিরল ঝরিতেছে পুলকাশ্রু ধারা। সর্ব্বদেহে সাত্বিক বিকারের অপূর্ব্ব চিহ্ন। তারপর গৌরসুন্দর তাঁহার দেহে হস্তটি স্পর্শ করামাত্র তিনি হৃতচেতন হইয়া ভূতলে পড়িলেন।

অতঃপর ভক্তদের কাছে এ মহাপ্রেমিক সন্ন্যাসীর পরিচয় আর গোপন রহে নাই। তাঁহারা জানিয়াছেন, ইনিই প্রভুর বহুপ্রতীক্ষিত মহাপুরুষ—শ্রীনিত্যানন্দ।

সকলে অবাক বিস্ময়ে চাহিয়া আছেন, আর ভাবিতেছেন, প্রভুর দর্শন স্পর্শনের মধ্যে এ কি দিব্য শক্তির ইন্দ্রজাল?

সন্ন্যাসী নিত্যানন্দ গৌরসুন্দরের প্রেমবন্ধনে চিরতরে বাঁধা পড়িয়া গেলেন। সর্ব্বত্যাগী নিরাসক্ত অবধূত সেদিন হইতে হইলেন প্রভুর প্রেমভক্তি-ধনের ভাণ্ডারী। নূতনতর কর্ম্মযজ্ঞে তাঁহাকে নামিতে হইল। এখন হইতে তিনি হইলেন গৌরাঙ্গের প্রধান পার্ষদ।

দূর দূরান্ত হইতে একের পর এক ভক্তগণ আসিয়া উপস্থিত হন। ভক্তিধর্মের জগতে ইঁহারা যেন এক একটি দিক্‌পাল। কিন্তু কোন্ সূত্রে কোন্ অজ্ঞাত আকর্ষণে ইঁহারা আসেন তাহা কে বলিবে? তাছাড়া এই ভক্তদের চিনিবার সামর্থ্যই বা রাখে কয়জন?

প্রভুর কাছে কিন্তু তাঁহার এই চিহ্নিত পার্ষদদের আগমন রহস্য মোটেই অজানা নয়। ইঁহাদের আগমনের জন্যই যে তিনি হৃদয়ভরা উৎকণ্ঠা নিয়া প্রতীক্ষমান রহিয়াছেন। নির্দিষ্ট লগ্নটি উপস্থিত হইলেই আর তিনি আত্মসম্বরণ করিতে পারেন না!

'পুণ্ডরীক, পুণ্ডরীক' বলিয়া গৌরসুন্দর সেদিন কাঁদিয়া আকুল! বারবার বিনাইয়া বিনাইয়া কহিতেছেন, "বাপ্ পুণ্ডরীক, তোমার বিহনে বুক যে আমার ফেটে যাচ্ছে, তবুও তোমার দেখা নাই! কি নিষ্ঠুর তুমি! এসো বাপ, শিগ্গীর এসে আমার হৃদয়ের জ্বালা জুড়াও।"

ভক্তদের কেহই এ রহস্য ভেদ করিতে পারিতেছেন না। কে এই পুণ্ডরীক? এ কোন মহাভাগ্যবান ভক্ত যাঁহার বিরহে প্রভু এমন করিয়া কাঁদিতেছেন? নামটি কেহ শুনিয়াছেন বলিয়া তো মনে হয় না!

গৌরাঙ্গকে নানাভাবে প্রশ্ন করিয়া জানা গেল—পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি চট্টগ্রাম অঞ্চলের এক মহাভক্ত। ধনী ও প্রতিপত্তিশালী লোক। চাল-চলনেও বেশ রাজসিকতা রহিয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি বিষয়বিরক্ত এক মহাবৈষ্ণব! অনেকেই সহসা এ প্রচ্ছন্ন মহাপুরুষের প্রকৃত তত্ত্ব নিরূপণ করিতে সক্ষম নন।

প্রভু কিন্তু অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে কেবলই বলিয়া চলিয়াছেন, "ওগো, তোমরা সবাই বাপ্ পুণ্ডরীককে এখনি আমার কাছে এনে দাও, আমার তাপিত প্রাণ শীতল কর।"

শ্রীবাস প্রভৃতি ভক্তগণ ভীত হইয়া কেবলি একে অন্যের মুখের দিকে চাহিতেছেন। পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি নবদ্বীপে কবে আসিয়াছেন, কোথায় আছেন কেহ জানেন না। সকলে ভাবিয়া পাইতেছেন না, কি করিয়া প্রভুকে শান্ত করা যাইবে।

যোগাযোগ অচিরেই ঘটিয়া গেল। ভক্ত মুকুন্দ সেদিন প্রভুর সভায় আসেন নাই। তিনি চাটগাঁয়ের লোক, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে। হঠাৎ শুনিলেন, বিদ্যানিধি নবদ্বীপে আসিয়াছেন। মুকুন্দ ভাবিলেন, এ অতি উত্তম সুযোগ, এ মহাবৈষ্ণবকে তিনি প্রভুর কাছে আনিয়া উপস্থিত করিবেন।

মুকুন্দের সহিত গদাধরের চিরদিনই অন্তরঙ্গতা। সেদিন পথিমধ্যে তিনিও সঙ্গ নিলেন। কথা প্রসঙ্গে এ মহাপুরুষের নানা মাহাত্ম্য শুনিয়া তাঁহার বিস্ময়ের অবধি রহিল না।—ভক্তি-সাধনার ইনি মূর্ত্ত বিগ্রহ, গঙ্গায় পাদস্পর্শ ঘটিবার ভয়ে গঙ্গাস্নানও নাকি কখনো করেন না। এই মহাপুরুষটিকে দেখিতে গদাধর বড় উৎকণ্ঠিত হইলেন।

বিদ্যানিধির সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কিন্তু বড় হতাশ হইতে হয়। যে বেশে, যে ভঙ্গীতে তিনি বসিয়া আছেন, তাহাতে প্রকৃত ভক্ত বা বৈরাগ্যবান সাধক বলিয়া চিনিবার উপায় নাই।

তাঁহার চেহারাটি দেখিতে রাজপুত্রের মত। সুদৃশ্য পালঙ্কের উপর দুগ্ধফেননিভ শয্যায় তাকিয়া হেলান দিয়া বসিয়া আছেন। মাথার উপর কারুকার্য্যময় চন্দ্রাতপ। পরিধানে মূল্যবান পরিচ্ছদ। সুগন্ধি দ্রব্যের সুবাসে ঘরটি ভরপুর। রূপার পানের বাটা হইতে মাঝে মাঝে দুই এক খিলি পান মুখে পুরিতেছেন আর গল্প করিতেছেন। কয়েকটি ভৃত্য ময়ূরপুচ্ছের পাখা নিয়া তাঁহাকে হাওয়া করিতে ব্যস্ত।

গদাধর চিরদিনই বড় বিষয়বিমুখ ও বৈরাগ্যনিষ্ঠ। ভাবিতেছেন, এ আবার কাহাকে তিনি দেখিতে আসিলেন? এ যে এক মহাবিলাসী ব্যক্তি। বৈষ্ণব মহাপুরুষ দেখিতে আসিয়া তাঁহার খুব শিক্ষা হইয়াছে, এবার তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরিতে পারিলেই বাঁচা যায়।

মুকুন্দ কিন্তু এতক্ষণ বন্ধুবর গদাধরের ভাবভঙ্গী দেখিয়া মনে মনে হাসিতেছিলেন। ভাবিলেন, আর নয়, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির প্রকৃত স্বরূপটি ভক্তপ্রবর গদাধরকে এবার দেখাইতে হইবে। কথা প্রসঙ্গে

ভাগবত হইতে তিনি কৃষ্ণের মহিমাব্যঞ্জক একটি মধুর শ্লোক পড়িতে লাগিলেন।

মুহূর্ত্তমধ্যে গৃহমধ্যে যেন এক মহাবিপ্লব ঘটিয়া গেল। পুণ্ডরীকের দেহে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল অপূর্ব্ব সাত্ত্বিক প্রেমবিকার। পালঙ্ক হইতে ভূতলে আছড়াইয়া পড়িয়া তিনি মূর্চ্ছিত হইলেন। পদাঘাতে মূল্যবান তৈজসপত্র, তম্বুলাধার প্রভৃতি চারিদিকে ছিটকাইয়া পড়িয়াছে। পরিধানে জামা-কাপড় ছিন্নভিন্ন, কেশপাশ আলুথালু! সে বিলাসী মানুষটিকে আর চিনিবার উপায় নাই।

বাহ্যজ্ঞান লাভের পর পুণ্ডরীক করুণ কণ্ঠে কাঁদিতে লাগিলেন, "পরাণ প্রভু আমার, কবে আমায় উদ্ধার করবে? আমার প্রাণ যে কাষ্ঠের মত কঠিন, ভক্তির লেশমাত্র নেই তাতে। তোমার কৃপা আমি কবে পাবো, তাই আমায় বলে দাও।"

প্রেমোন্মাদের এ করুণ দৃশ্য দেখিয়া গদাধর অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না। মনে বড় অনুশোচনা হইল, এই আত্মগোপনকারী মহাপুরুষকে এতক্ষণ অবজ্ঞা করিয়া তিনি মোটেই ভাল করেন নাই। বৈষ্ণবাপরাধের কথা ভাবিয়া বেশ কিছুটা ভয়ও পাইলেন। ঠিক করিলেন, ইহার নিকট হইতেই তিনি মন্ত্র গ্রহণ করিবেন, তাহাতে যদিবা অপরাধের কিছুটা খণ্ডন হয়।

সেই রাত্রিতেই শ্রীবাস-অঙ্গনে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি গৌরসুন্দরকে দর্শন করিতে আসিলেন। প্রভুর সকাশে সাশ্রুনয়নে গলবস্ত্র হইয়া তিনি আসিয়াছেন। পরিধানে এবার তাঁহার দীনহীনের মলিন বেশ। চরণতলে পড়িয়া আর্ত্তনাদ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তারপর কহিলেন, "প্রভু, সবাইকে যেমন উদ্ধার ক'রছো তেমনি আমাকেও ক'র উদ্ধার। আর আমায় তুমি দূরে সরিয়ে রেখোনা, বঞ্চনা ক'রোনা।

প্রেমাপ্লুত প্রভুও অঝোর ধারে কাঁদিতেছেন, আর বারবার কহিতেছেন, "পুণ্ডরীক বাপ আমার! এবার তোমায় পেয়ে হৃদয় আমার শান্ত হল, আমি পুনর্জ্জীবন পেলাম।"

এ প্রেমলীলা দেখিয়া ভক্তদের আনন্দের অবধি রহিল না।

প্রকৃতিস্থ হইয়া প্রভু কহিলেন, "কৃষ্ণের আজ আমার ওপর বড় কৃপা। পুণ্ডরীক বাপকে আমার কাছে এনে দিয়ে আমার তাপিত হৃদয় শীতল করলেন। তোমরা সবাই কিন্তু জেনে রেখো, আজ হতে এঁর পদবী বিদ্যানিধি নয়—প্রেমনিধি। প্রেমভক্তির নিগূঢ় সাধন বিলাবার জন্যই কৃষ্ণ এঁকে গড়েছেন।"

প্রভুর প্রিয় পার্ষদ গদাধর কয়েকদিনের মধ্যেই পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির কাছে মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এদিকে শ্রীবাসঅঙ্গনে রোজই চলিতেছে প্রেমনাট্যের নব নব দৃশ্যের উদ্‌ঘাটন। দিনের পর দিন অন্তরঙ্গ সাধনের সঙ্গে সঙ্গে প্রভুর নানা লীলাবৈচিত্র্যও ফুটিয়া উঠিতেছে। সর্ব্ব ভাবের ভাবুক তিনি, সর্ব্ব রসে তিনি রসময়। ভক্তকবি বৃন্দাবনদাস তাঁহার এসময়কার অবস্থাটির বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন—

> দাস্যভাবে প্রভু যবে করেন ক্রন্দন॥
> হইল প্রহর দুই গঙ্গা আগমন।
> যবে হাসে তবে প্রভু প্রহরেক হাসে॥
> মূর্চ্ছিত হইলে প্রহরেক নাহি শ্বাসে।
> ক্ষণে হয় সানুভাব দম্ভ করি বৈসে॥
> মুঁই সেই মুঁই সেই ইহা বলি হাসে॥

প্রায়ই তিনি থাকেন ভক্তি আর প্রেমের রসে বিভোর। ভক্তের দৈন্য ও আর্ত্তির যেন তিনি মূর্ত্ত বিগ্রহ। আবার এক এক দিন তাঁহার মধ্যে দেখা যায় বিস্ময়কর ঈশ্বরীয় আবেশ। দৃপ্ত তেজে, প্রমত্ত ভঙ্গীতে শ্রীবাসগৃহের বিষ্ণুখট্টায় অবলীলায় বসিয়া পড়েন। ভগবত্তার ভাবটি এ সময়ে প্রকট হইয়া উঠে, বিশিষ্ট ভক্তেরা প্রভুর অলৌকিক ও ঐশ্বর্য্যময় রূপ দর্শন করিয়া ধন্য হন। এই ভাগ্যবানদের মধ্যে রহিয়াছেন অদ্বৈতাচার্য্য নিত্যানন্দ, শ্রীবাস, মুরারি, মুকুন্দ, হরিদাস ইত্যাদি।

প্রভু প্রায়ই আবেশগ্রস্ত হন, ভগবত্তা-ভাবে উদ্দীপিত হইয়া উঠেন, আবার বাহ্যজ্ঞান পাইলেই শুরু হয় তাঁহার দাস্যভাব ও ক্রন্দন।

একদিন কিন্তু ইহার ব্যতিক্রম দেখা গেল। সেদিন আর শুধু আবেশে নয়, সজ্ঞানে স্বচ্ছন্দে শ্রীবাসপণ্ডিতের পূজিত বিষ্ণুবিগ্রহের খট্টায় তিনি বসিয়া পড়িলেন। সম্মুখে ভক্তদের কীর্ত্তন ও নর্ত্তন চলিতেছে, আর তিনি মহিমোজ্জ্বল মূর্ত্তিতে উপবিষ্ট হইয়া প্রসন্ন মধুর হাসি হাসিতেছেন! ভগবান জ্ঞানে ভক্তগণ সেদিন তাঁহার অভিষেক স্নান সম্পন্ন করাইলেন, পূজা করিয়া ধন্য হইলেন।

দিব্য ঐশ্বর্য্যের প্রকাশ সেদিন গৌরসুন্দরের মধ্যে ঘটিয়াছে, তিনি একেবারে কল্পতরু হইয়া বসিয়াছেন। স্বেচ্ছামত নানা করুণা, নানা বিভূতি অন্তরঙ্গ ভক্তদের প্রদর্শন করিতেছেন। শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে সেদিন স্বর্গীয় আনন্দের বন্যা উৎসারিত। বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন প্রভুর এ অলৌকিক ভাবটি সাত প্রহর ব্যাপিয়া বর্ত্তমান ছিল।

এই ঐশ্বরীয় আবেশের মধ্যে গৌরাঙ্গ সাড়ম্বরে সভা জমাইয়া বসিয়া আছেন। চারিদিক কৃতবিদ্য ও সার্থকনামা ভক্তগণ করজোড়ে দণ্ডায়মান। হঠাৎ তিনি 'শ্রীধর শ্রীধর' বলিয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিতে লাগিলেন। নবদ্বীপের এক অতি দরিদ্র অধিবাসী, খোলাবেচা এই শ্রীধর! সে নাকি প্রভুর পূর্ব্বেকার পরিচিত। কিন্তু তাঁহাকে এমন করিয়া আজ এত ডাকাডাকি কেন?

করুণাভরে প্রভু কহিতে লাগিলেন, 'শিগ্ গীর আমার পরমভক্ত শ্রীধরকে তোমরা খুঁজে বার কর, এখানে ডেকে আনো। বড় দরিদ্র সে! কলার খোলা বেচে কোন রকমে জীবন ধারণ করে—আর সদাই করে জীবনপ্রভুর স্মরণ-মনন। বাজারের এক নগণ্য খোলা বিক্রয়কারী বলে লোকে তাকে তুচ্ছজ্ঞান করে, কিন্তু সে যে ভক্ত শিরোমণি তা কেউ জানে না। যাও, আমার শ্রীধরকে এখনি তোমরা নিয়ে এসো।"

ভক্তগোষ্ঠীতে সোরগোল পড়িয়া গেল। মহাভাগ্যবান এই শ্রীধর!

কিন্তু জনাকীর্ণ নবদ্বীপের কোথায় সে বাস করে তা কে জানে? বহু খোঁজাখুঁজির পর তাঁহাকে আবিষ্কার করা গেল! ভক্তগণ তাহাকে ধরিয়া আনিয়া প্রভুর সম্মুখে হাজির করিলেন।

শ্রীধর তো বিস্ময়ে হতবাক। সম্মুখে তাঁহার বৈষ্ণবগোষ্ঠীর অধীশ্বর শ্রীগৌরাঙ্গ—আগেকার দিনে যাঁহাকে তিনি জানিতেন নিমাই পণ্ডিত রূপে। আজ সর্ব্ব দেহে তাঁহার দিব্য লাবণ্যের ছটা, নয়নে স্বর্গের জ্যোতি বিচ্ছুরিত—শত শত পুতচরিত বৈষ্ণবের তিনি সর্ব্বস্বধন, পরম প্রভু। সেদিনকার অধ্যাপক নিমাই আজ শুধু মহাসাধকই হন নাই, ভগবানরূপে এত লোকে আজ তাঁহাকে পুজা করিতেছে।

ভক্তগণ কহিতেছেন, "শ্রীধর, প্রভুর তুমি এমন প্রিয়, এমন মহা-অধিকারী পুরুষ তুমি, তা কে জানতো। এসো, এসো, তোমার স্পর্শ লাভে আমাদের কিছুটা পুণ্য সঞ্চয় করিতে দাও।"

কনকদণ্ড সম বাহু দুইটি প্রসারিয়া প্রভু সোৎসাহে আগাইয়া আসিলেন। প্রগাঢ় স্নেহে আলিঙ্গন দান করিয়া কহিলেন, "শ্রীধর তুমি কি আমাকে ভুলে গিয়েছ? তোমার কাছ থেকে কত বস্তু কেড়ে নিয়ে এসেছি। কত প্রণয়-কলহ তোমার সঙ্গে করেছি! আজকের এ আনন্দের হাটে, তুমিও এসে যোগ দাও।"

ভক্ত শ্রীধরের মনে কত কথার স্মৃতি ভীড় করিয়া আসে। নবীন অধ্যাপক নিমাই বাজারে আসিয়াই তাহার উপর চড়াও হইতেন! কত কোন্দল, কত রঙ্গই না তাহাদের চলিত। নিমাই তাঁহার নিকট হইতে কিনিতেন দু'চারপয়সার থোড়, কলা, খোলা। কিন্তু ইহা নিয়া ঝগড়া আর বাগ্‌বিতণ্ডার যেন অন্ত নাই। শ্রীধর বড় দরিদ্র, কোনমতে কায়ক্লেশে তাহার দিনাতিপাতচলে। কিন্তু তরুণ পণ্ডিত তাহাকে সহজে ছাড়িবেন না। বিক্রয়ের জিনিষপত্র নিয়া তিনি হুড়াহুড়ি করেন, চড়া দর হাঁকিতেছে বলিয়া তাহাকে গালাগালি দেন। শ্রীধর চরম অনটনের মধ্যে বাস করে বটে, কিন্তু সত্যে চিরদিনই তাহার বড় আঁট। যে দ্রব্যের যা উচিত

মূল্য তাহাই সে চায় ! কিন্তু তাহা শুনে কে ? নিমাই পণ্ডিত মিছামিছি কেবলই ঝগড়া বাধাইয়া বলিতে থাকেন, "তুমি অল্পদামের জিনিষের জন্য বেশী দাম চাচ্ছো, মিথ্যা ভাষণে তোমার জুড়ি নবদ্বীপে আর নেই !"

নিমাই বাজারে আসিলেই এমনি রোজ শ্রীধরকে উত্যক্ত করেন। তাহার জিনিষপত্র কাড়িয়া নিয়া অর্দ্ধেক মূল্য ছুঁড়িয়া দেন। কিন্তু কি অলৌকিক আকর্ষণ এই নবীন অধ্যাপকের। এ দুরন্তপনা, এ অত্যাচার সত্ত্বেও তাঁহাকে একটা কটু কথা বলা চলে না ! দৈনন্দিন কলহের শেষে শ্রীধর এই চঞ্চল স্বভাব পণ্ডিতের কথাই আবার ভাবিতে বসে। হাস্যোজ্জ্বল অনিন্দ্যসুন্দর সেই মুখখানি শ্রীধরের স্মৃতিপটে বারবার উঁকি মারিয়া যায়।

সেই নিমাইর মধ্যে শ্রীধর আজ দেখিতেছেন এক অদ্ভুত রূপান্তর ! দিব্য ঐশ্বর্যের এ কি অপরূপ প্রকাশ তাঁহার মধ্যে ! সর্ব্বাপেক্ষা বড় কথা, সর্ব্বজনের জীবনপ্রভু হইয়া, এত বড় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া কৃপাময় প্রভু তাহাকে একটুও বিস্মৃত হন নাই ! আপনি যাচিয়া তাহাকে প্রেম দিতেছেন।

ভাববিমুগ্ধ শ্রীধর জোড়হস্তে গৌরসুন্দরের দিকে তাকাইয়া আছে। আনন্দাশ্রু ধারায় তাহার দুই গণ্ড প্লাবিত হইতেছে।

ভগবত্তা ভাবে প্রভু আজ উদ্দীপিত। এই মহা ভক্তকে তাঁহার যেন অদেয় কিছুই নাই। প্রসন্নোজ্জ্বল দৃষ্টিখানি শ্রীধরের সর্ব্বদেহে বুলাইয়া নিয়া কহিলেন, শ্রীধর তুমি আমার পরমভক্ত, পরম প্রিয়। আজ তোমাকে আমি বর দেবো। কি তোমার অভিলাষ, খুলে বল। রাজ্য চাও ? রাজ্য পাবে। অষ্টসিদ্ধি চাও ? আমি বল্‌ছি, তাও অচিরে হবে তোমার করতলগত !"

ভক্তিগদ্‌গদ্ কণ্ঠে শ্রীধর কহিল, "প্রভু এবার কিন্তু তুমি আর আমায় ভাঁড়াতে পারছো না। তুমি যে পরমবস্তু তা আজ আমার জানতে বাকী নেই। ঋষি সিদ্ধির কথা তুলে আজ আমায় বিভ্রান্ত করো না।"

কিন্তু প্রভু কিছুতেই তাহাকে ছাড়িবেন না। বারবারই অনুরোধ করিতেছেন, "শ্রীধর, একটা কিছু বর আজ আমার কাছে তোমায় মেগে নিতেই হবে।"

সহজ প্রেমের সহজ সরণী বাহিয়া ভক্ত শ্রীধর তাহার পরম প্রভুর চরণতলে আজ আসিয়া পৌঁছিয়াছে। বিধি দয়া করিয়া মিলাইয়া দিয়াছেন তাহার বাঞ্ছানিধি। আর কোন্ বস্তু তাহার চাহিবার আছে? কিন্তু প্রভু আর তাঁহার পার্ষদদের পীড়াপীড়ি কোনমতেই করিতেছে না, অগত্যা শ্রীধরকে বর মাগিতেই হইল।

আঁখি দুইটি তাহার অশ্রু ছলছল। যুক্তকরে গৌরাঙ্গের ভগভাবে বিভাবিত, জ্যোতির্ম্মণ্ডিত আননের দিকে চাহিয়া শুধু সে নিবেদন করিল—

যে ব্রাহ্মণ কাড়িলেক মোর খোলা পাত।
সে ব্রাহ্মণ হউ মোর জন্মে জন্মে নাথ॥
যে ব্রাহ্মণ মোর সঙ্গে করিল কোন্দল।
মোর প্রভু হউ তান চরণ যুগল॥

সিদ্ধি নয়, ঐশ্বর্য্য নয়—শুদ্ধাভক্তি, প্রভুর চরণে রতি, ইহাই দীনভক্ত শ্রীধরের একমাত্র কাম্য। প্রভুর ঐশ্বর্য্যময় রূপ দর্শনের অভিলাষীও সে নয়। যে লীলাচপল রূপটি নিয়া তিনি দীন শ্রীধরকে বারবার দেখা দিয়াছেন, কোন্দল ও হাস্য পরিহাসের মধ্য দিয়া তাহার মন কাড়িয়া নিয়াছেন আজ সেই সহজ সুন্দর রূপটির স্মৃতিই ভক্ত শ্রীধর চিরতরে তাহার বুকে আঁকিয়া রাখিতে চায়।

ভক্তজনদের মধ্যে খোলাবেচা শ্রীধরের উদ্দেশে 'ধন্য ধন্য' রব পড়িয়া গেল।

গৌরাঙ্গ স্থির করিলেন, তাঁহার প্রেমভক্তির ধর্ম্মকে এবার তিনি জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইতে দিবেন। অন্তরঙ্গ ভক্তদের মধ্যে এ পরম বস্তুকে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখার প্রয়োজন ফুরাইয়াছে। এখন হইতে সর্ব্ব মানবের কল্যাণে ইহা বিস্তারিত হইবে।

এ প্রচার কার্য্যে নিজে না নামিয়া প্রভু ভার দিলেন তাঁহার দুই শ্রেষ্ঠ পার্ষদ নিত্যানন্দ ও হরিদাসের উপর। ইঁহাদের চেয়ে যোগ্যতর প্রতিনিধি আর কে হইবে? উভয়েই গৌরগতপ্রাণ, উভয়েই সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী। তাছাড়া—একজন হিন্দু, অপর জন মুসলমান।

নিত্যানন্দ ও হরিদাসকে ডাকিয়া প্রভু আজ্ঞা দিলেন, "আজ থেকে নবদ্বীপের সর্ব্বত্র তোমরা কৃষ্ণনাম প্রচার কর। লোকের দোরে দোরে গিয়ে, তাদের পায়ে ধরে, কৃষ্ণনাম ভিক্ষা চাও। রোজ ফিরে এসে আমায় জানাবে তোমাদের কাজের ফলাফল।"

নিত্যানন্দ ও হরিদাস পরমানন্দে নগরের পথে পথে নাম কীর্ত্তন করিয়া ফিরেন। সাধিয়া, কাঁদিয়া, সর্ব্বলোকের পায়ে পড়িয়া তাঁহারা কৃষ্ণনাম গ্রহণ করান।

এ কাজ বড় সহজ নয়। কেহ শ্লেষ ও ব্যঙ্গোক্তি করে, কেহ বা কটুকথা বলিয়া বিদায় দেয়। আবার একদল জানায় আন্তরিক অভ্যর্থনা। ভক্তি ও প্রেমের এ সহজ পথ, এ রসের পথতো কেহ কখনো দেখাইতে আসে নাই! অধ্যাত্মপথের এমন মাধুর্য্য, এমন আনন্দের কথা তো জানা ছিল না! কৃষ্ণকথা, গৌরাঙ্গকথা শুনিয়া তাহারা মুগ্ধ হইয়া যায়। হরিনামের ভিখারী, দৈন্য ও আর্ত্তির বিগ্রহ, নিত্যানন্দ ও হরিদাসকে দেখিয়া, কি জানি কেন, নয়নে তাহাদের অশ্রু ঝরিতে থাকে।

প্রভুর পার্ষদদ্বয় একদিন বড় সঙ্কটে পড়িলেন। দুইজনে সোল্লাসে নামগান করিতে করিতে চলিয়াছেন। হঠাৎ দেখিলেন, অদূরে যমদূতের মত দুই ব্যক্তি দাঁড়াইয়া আছে। শুনিলেন, ইঁহারা দুইটি সহোদর ভাই —জগন্নাথ ও মাধব। জাতিতে ব্রাহ্মণ হইলে কি হয়, পাপানুষ্ঠানের দিক দিয়া ইহাদের জুড়ি নবদ্বীপে নাই। লুণ্ঠন ও নরহত্যায় দু'জনে সিদ্ধহস্ত। হরিনাম কৃষ্ণনাম শুনিলেই ছুটিয়া মারিতে আসে। মদের নেশায় চুর হইয়া দুই ভাই সেদিন পথের মোড়ে দাঁড়াইয়া আছে।

নিতাই মনে মনে ঠিক করিয়াছেন, এ দুই পাষণ্ড-প্রধানকে হরিনাম

নেওয়াইতে হইবে। এবার সম্মুখে গিয়া উচ্চস্বরে কৃষ্ণনাম গাহিবামাত্র ইহারা মারমুখী হইয়া ছুটিয়া আসিল।

নিত্যানন্দ যেমন কৌতুকী, তেমনি লীলা-চঞ্চল। একটা কিছু ঝঞ্চাট বাধাইতে পারিলেই তাঁহার পরম আনন্দ। মনে মনে ভাবিলেন, এবার পালা জমাইতে হইবে। হরিদাসকে সঙ্গে নিয়া প্রাণপণে তিনি ছুটিতে লাগিলেন। তারপর উভয়ে হাঁফাইতে হাঁফাইতে একেবারে গৌরসুন্দরের নিকট গিয়া উপস্থিত।

নিতাই সরোষে কহিতে লাগিলেন, "প্রভু, তোমার যত সব উল্টো ব্যাপার। ভক্ত ও সাধুদের কৃষ্ণনাম নেওয়াও, এতে আর তোমার কি এমন কৃতিত্ব ? তারা তো নাম নেবার জন্যে প্রস্তুত হয়েই আছে। হ্যাঁ, জগাই মাধাইয়ের মত দুর্বৃত্তদের নাম নেওয়াতে পারো—তবে বুঝি তোমার বাহাদুরী ! এবার তাই কর, প্রভু !"

গৌরাঙ্গ মুচকি হাসিয়া কহিলেন, "শ্রীপাদ, এ পাষণ্ডদের উপর তোমার যখন করুণা হয়েছে, কৃষ্ণ এদের নিশ্চয় উদ্ধার করবেন।"

কয়েকদিন পরের কথা। নামকীর্ত্তনরত নিতাই ও হরিদাস রাত্রি-কালে একদিন জগাই মাধাইর সম্মুখে গিয়া পড়িলেন। মদ্যপ দুই ভ্রাতা আরক্তিম নয়নে তখন রাস্তায় ঘোরাফেরা করিতেছে। কৃষ্ণনাম কাণে যাওয়ামাত্র উত্তেজিত হইয়া ধাইয়া আসিল। হুঙ্কার দিয়া উঠিল, "ওরে, কার এমন মরবার ইচ্ছে জেগেছে যে, ঘটা করে নামকীর্ত্তন আমাদের শোনাতে আসে ? তোরা কে ?"

নিত্যানন্দ আজ একটা গুরুতর কাণ্ড ঘটাইতেই চাহেন। তাড়া-তাড়ি পাষণ্ডদের কাছে আগাইয়া আসিয়া কহিলেন, "ভাই, আমি কৃষ্ণনাম তোমাদের শোনাতে এসেছি, আমি এক অবধূত।"

আর যায় কোথায়। পাপিষ্ঠ মাধাইর মাথায় যেন খুন চাপিয়া গিয়াছে। রাস্তার একপাশ হইতে একটি ভাঙ্গা কলসী তুলিয়া নিয়া সবেগে সে উহা নিতাইর মাথায় ছুঁড়িয়া মারিল।

এ এক মহা চাঞ্চল্যকর দৃশ্য। নিতাইর আহত মস্তক হইতে দরদর ধারে রক্ত ঝরিয়া পড়িতেছে। সেদিকে কিন্তু তাঁহার ভ্রুক্ষেপও নাই। রক্তাক্ত স্থানটি হাত দিয়া চাপিয়া ধরিয়া কেবলই তিনি সুস্মিত হাসি হাসিতেছেন। পাষণ্ডী উদ্ধারের জন্য গৌরাঙ্গের কৃপার ধারা আজ তিনি অবতরণ করাইতে চান, তাই তো একটা সঙ্কট পাকাইয়া তুলিতে তাঁহার এত আগ্রহ।

চারিদিকে কৌতুহলী জনতার ভীড়। গৌরাঙ্গের কাছেও ইতিমধ্যে সংবাদ গিয়াছে—দুর্ব্বৃত্তেরা নিত্যানন্দকে নির্ম্মমভাবে প্রহার করিতেছে তাঁহার মস্তক হইতে ঝরিতেছে রক্তধারা।

মাধাইর ক্রোধ কিন্তু এখনো প্রশমিত হয় নাই। রোষকষায়িত নেত্রে সে লক্ষ্য করিতেছিল, নিতাই এখনো তাহার নিক্ষিপ্ত কলসী-কানার আঘাত খাইয়া দাঁড়াইয়া আছে। উত্তেজিত অবস্থায় আবার সে তাঁহাকে মারিতে উদ্যত হইল।

এতটা বাড়াবাড়ি জগাইর কিন্তু পছন্দ নয়। নিরস্ত্র ও শান্তস্বভাব নিতাইকে মারিয়া এমন কি গৌরব তাহাদের বাড়িল। মাধাইকে বাধা দিয়া সে কহিল, "ওরে, কেন বৃথা এ বিদেশী সন্ন্যাসীকে এমন করে মারছিস্। এতে সত্যকার কি লাভ হবে বল্‌তো!"

দুই ভ্রাতায় একথা লইয়া বচসা চলিতেছে, এমন সময় গৌরাঙ্গ সেখানে আসিয়া উপস্থিত।

নিত্যানন্দের আহত শির হইতে তখনও রক্ত ঝরিতেছে। এ দুঃসহ দৃশ্য দেখিয়াই ক্রোধে তিনি ফাটিয়া পড়িলেন। হুঙ্কার দিয়া কহিলেন, নিত্যানন্দের শোণিতপাত যাহারা করিয়াছে, সে পাষণ্ডীদের শাস্তি না দিয়া তিনি আজ ছাড়িবেন না।

নিত্যানন্দ ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। প্রভুর করুণা-লীলা সর্ব্বসমক্ষে তিনি প্রকটিত করিতে চান, তাহা বুঝি বানচাল হইয়া যায়। পাতকী উদ্ধারের মহিমময় দৃশ্যটিকে উদ্‌ঘাটিত করার জন্যই যে এত কাণ্ড তিনি ঘটাইয়া তুলিয়াছেন।

তাড়াতাড়ি আগাইয়া আসিয়া কহিলেন, "প্রভু, তুমি শান্ত হও। এরা যে মহাপাপী। তোমার কৃপা-প্রসাদ যে সবার আগে এদেরই প্রয়োজন! তাছাড়া, তুমি তো জান না, ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায় মাধাই আমাকে হয়তো একেবারেই মেরে ফেলতো, কিন্তু জগাই তাকে বাধা দিয়েছে। তাইতো আমার প্রাণ রক্ষা হ'লো। আমার সব কষ্ট দূর হবে যদি এ দুজনকে তুমি আজ আমায় ভিক্ষা দাও।"

গৌরসুন্দর ততক্ষণে করুণার্দ্র হইয়া উঠিয়াছেন। তাই তো! জগাই তাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় নিত্যানন্দের প্রাণ বাঁচাইয়াছে। তবে তো সে তাঁহার পরম বান্ধব, পরম আপনার জন। সাশ্রুনয়নে কহিলেন, "ভাই জগাই, নিত্যানন্দকে রক্ষা ক'রে তুমি আজ আমায় কিনে নিয়েছ। আশীর্ব্বাদ ক'রছি, পরমকরুণ কৃষ্ণ তোমায় কৃপা করুন। আজ থেকে তোমার প্রেম-ভক্তি লাভ হোক।"

প্রভু প্রেমভরে তাহাকে আলিঙ্গন দিলেন।

কি অলৌকিক শক্তি সঞ্চারিত হয় প্রভুর দর্শনে ও স্পর্শনে, তাহা কে বলিবে? জগাই প্রেমাবেশে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িল।

পাষণ্ড জগাইর এ সৌভাগ্যোদয় দেখিয়া ভক্তদের আনন্দের সীমা রহিল না নামকীর্ত্তনে ও গৌরাঙ্গের জয়ধ্বনিতে তাঁহারা সমগ্র অঞ্চলটি কাঁপাইয়া তুলিলেন।

মাধাইর নিষ্করুণ প্রাণও এবার চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। একি অদ্ভুত পুরুষ এই নিমাই পণ্ডিত! এ যুগে এ বস্তু যে বড় দুর্ল'ভ! নয়নে তাঁহার স্বর্গের মোহময় অঞ্জন। বদনে মধুস্রাবী কৃষ্ণনাম! আর বুক ভরিয়া পাতা রহিয়াছে ভালবাসার ইন্দ্রজাল! কি বিস্ময়কর তাঁহার স্পর্শের প্রভাব! এ স্পর্শে জগাইর মত এমন দুর্দ্দান্ত, এমন পাপাত্মাও প্রেমে বিবশ হইয়া এলাইয়া পড়ে, চৈতন্য হারায়। আরও বিস্ময়কর নিমাইর কর্ম্মসঙ্গী এই মহাপ্রেমিক অবধূত! এমন প্রাণঘাতী প্রহারের পরেও অপার করুণা নিয়া দাঁড়াইয়া আছে। এরা মানুষ না দেবতা?

অনুতাপদগ্ধ মাধাইর হৃদয় এবার গলিতে শুরু করিয়াছে। অশ্রুর বন্যায় তাহার বক্ষস্থল প্লাবিত। কাতর কণ্ঠে বারবার মিনতি জানাইয়া প্রভুর পায়ে সে আত্মসমর্পণ করিল। সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া তিনিও তাহাকে তখনি কোল দিলেন।

এবার জগাই মাধাই দুই ভাইকে আশ্বাস দিয়া গৌরাঙ্গ কহিলেন, "ভাই, আজ থেকে তোমাদের সব পাপের বোঝা আমার ওপর দাও, আনন্দে কৃষ্ণনাম কর। সর্ব্ব অভীষ্ট তোমাদের লাভ হোক।"

প্রভুর কৃপাপ্রসাদ পাইবার পর দুই দুর্ব্বৃত্ত, জগাই ও মাধাই হইয়া উঠেন পরমভাগবত। সমস্ত বিত্তবিষয় ত্যাগ করিয়া এবার তাঁহারা কাস্থাকরঙ্গধারী কাঙাল বৈষ্ণব। নিরন্তর জপ-ধ্যান আর বৈষ্ণবসেবায় তাঁহাদের দিন কাটিতে থাকে। নবদ্বীপের অধিবাসীরা এ রূপান্তর দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হয়।

এখন হইতে প্রতিদিন গঙ্গার ঘাটে দেখা যায় এক প্রাণস্পর্শী দৃশ্য। জগাই মাধাই দুই ভ্রাতা দীনহীনভাবে প্রতি স্নানার্থীর চরণে প্রণিপাত করেন। করজোড়ে অশ্রু-সজল চক্ষে মিনতি জানান, "জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে কোন অপরাধ যদি আপনার কাছে হয়ে থাকে, কৃপা করে আমাদের মার্জ্জনা করুন।"

গঙ্গাস্নানে আগত নরনারীর সেবার জন্য ভক্তপ্রবর মাধাই কোদাল দ্বারা স্বহস্তে একটি ঘাট নির্ম্মাণ করিয়া দেন, এই ঘাট আজিও মাধাইর ঘাট নামে পরিচিত হইয়া আছে!

জগাই মাধাইর এ পরিবর্ত্তনের ফল সেদিনকার নবদ্বীপে সুদূর-প্রসারী হয়। গৌরাঙ্গের নবপ্রবর্ত্তিত প্রেমভক্তির ধর্ম্ম এবার ধীরে ধীরে আরও শক্তিশালী হইয়া উঠিতে থাকে।

ভক্ত-সাধকদের সংখ্যা এখন হইতে ক্রমে আরও বাড়িয়া চলে। চারিদিকে কেবলই শোনা যায় হরিনামের জয়ধ্বনি। সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে খোল-করতালসহ নাম-কীর্ত্তনের অনুষ্ঠান।

কাজী বার্-বাহ্‌ক্ তখন নবদ্বীপের শাসক। তেমনি হিন্দুবিদ্বেষী তিনি নন বটে, কিন্তু নূতন বৈষ্ণবগোষ্ঠীর এতটা মাতামাতি, হৈ-হুল্লোড় তিনি বেশী সুচক্ষে দেখিতেছেন না। সঙ্ঘবদ্ধ কীর্ত্তন সম্বন্ধে কিছুটা ভয়ও হয়তো পাইয়া থাকিবেন। একদিন এই কাজীর অনুচরগণ একদল ভক্তের খোল-করতাল ভাঙ্গিয়া ফেলিল। সঙ্গে সঙ্গে সরকারী আদেশ জারী হইল, এখন হইতে নবদ্বীপে সমবেতভাবে ও উচ্চস্বরে কীর্ত্তন করা চলিবে না।

ভক্তদের মধ্যে অনেকেই বড় ভীত হইয়া পড়িলেন। শেষকালে কি কাজীর অত্যাচারে ধর্ম্ম ও ধন-প্রাণ-মান সবই যাইবে? সকলে আসিয়া গৌরাঙ্গকে কহিলেন, "প্রভু, কাজীর লোকেরা সহরে টহল দিয়া ফিরিতেছে আর কীর্ত্তন ভাঙ্গিয়া দিতেছে। আমরা কি করবো তা বলুন। তবে কি নবদ্বীপ ছেড়ে আর কোথাও চলে যাবো?"

প্রভু ক্রোধে রুদ্রমূর্ত্তি হইলেন। নিত্যানন্দকে ডাকিয়া কহিলেন, "শ্রীপাদ, তুমি সর্ব্বত্র প্রচার করে দাও, নবদ্বীপের পথে আজ সন্ধ্যায় নগর কীর্ত্তন হবে। হরিনামে কে বাধা দেয়, তা আমি দেখবো।"

ভক্তদের উৎসাহ আনন্দ আর ধরে না। প্রভুর আদেশ যখন মিলিয়াছে, তখন শাসনকর্ত্তা কাজীকে আর কে ডরায়?

সহস্র সহস্র মানুষের হৃদয় এবার উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে। হরি-নামের মর্য্যাদা রক্ষায় আজ সকলে বদ্ধপরিকর। প্রভুর অনুপ্রেরণার ইন্দ্রজাল, আর নিত্যানন্দের সংগঠন-প্রতিভার স্পর্শে অবিলম্বে গড়িয়া উঠিল এক বিরাট ভক্তবাহিনী।

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই কীর্ত্তনকারীরা প্রস্তুত। দেখা গেল, শুধু গৌরাঙ্গের অনুগামীরাই নয়, সারা নবদ্বীপের আবালবৃদ্ধবনিতাই এই বিরাট আন্দোলনে মাতিয়া উঠিয়াছে। এ যেন দৈবীশক্তি চালিত এক বিরাট তরঙ্গোচ্ছ্বাসের সূচনা। ইহাকে রোধ করিবে কে?

খোল করতাল, ঝাঁঝ কাঁসর আর নিশান নিয়া দলে দলে লোক শ্রীবাস অঙ্গনের চারিদিকে জুটিতেছে। প্রত্যেকের হাতে এক একটি

জ্বলন্ত প্রদীপ বা মশাল। পরিধানে মনোরম পরিচ্ছদ। চন্দন আর ফুলের মালায় সকলেরই অঙ্গ সুশোভিত।

পুরনারীদের হৃদয়েও সেদিন এ তরঙ্গের দোলা না লাগিয়া পারে নাই। ঘরে ঘরে তাই দেখা যাইতেছে কদলীবৃক্ষ, মঙ্গল কলস আর দীপমালা।

শাসনকর্ত্তার নির্দ্দেশ অমান্য হইতেছে, কিন্তু আইনভঙ্গকারীদের মনে নাই কোন উষ্মা, হাতে নাই কোন অস্ত্র। আজিকার এ উৎসাহ-উদ্দীপনার, এ সর্ব্ববিপ্লবী শক্তির উৎস রহিয়াছে নামপ্রেমে আর প্রভুর মাধুর্য্য-মূর্ত্তির অমোঘ আকর্ষণে।

গৌরাঙ্গ তাঁহার বিদ্রোহের ধ্বজাটি তুলিলেন বড় অভিনবরূপে। এ তো সংঘাত বা সংঘর্ষ নয়—এ যে তাঁহার অতিমানবীয় প্রেম-নাট্যের এক দৃশ্যোদ্‌ঘাটন। এমনিতেই রূপ তাঁহার নয়নাভিরাম—ভুবনমোহন। তদুপরি আজ সাজিলেন নাটুয়ার ভঙ্গীতে, রঙ্গীয়ার বেশে। ভক্ত কবি বৃন্দাবন দাসের অনুপম তুলিকায় প্রভুর সেদিনকার সর্ব্বজনমোহন রূপের আলেখ্যটি ফুটিয়া উঠিয়াছে—

জ্যোতির্ম্ময় কনক-বিগ্রহ বেদসার।
চন্দনে ভূষিত যেন চন্দ্রের আকার॥
চাঁচর চিকুরে শোভে মালতীর মালা।
মধুর মধুর হাসে জিনি সর্ব্বকলা॥
ললাটে চন্দন শোভে ফাগবিন্দু সনে।
বাহু তুলি 'হরি হরি' বোলে শ্রীবদনে॥
আজানুলম্বিত মালা সর্ব্ব-অঙ্গে দোলে।
সর্ব্ব অঙ্গ তিতি পদ্মনয়নের জলে॥
দুই মহা-ভুজ যেন কনকের স্তম্ভ।
পুলকের শোভা যেন কনক কদম্ব॥
সুরঙ্গ অধর অতি সুন্দর দশন!
শ্রুতিমূলে শোভা করে ভ্রুভঙ্গে পতন॥

গজেন্দ্র জিনিয়া স্কন্ধ, হৃদয় সুপীন।
তঁহি শোভে শুক্ল-যজ্ঞসূত্র অতি ক্ষীণ॥

কে বলিবে গৌরাঙ্গ সেদিন এক বৃহৎ সংঘর্ষে অবতীর্ণ হইয়াছেন, বাদশাহের প্রতিনিধি কাজীকে তিনি দমন করিতে যাইতেছেন? এ যেন তাঁহার এক পরম রমণীয় প্রেমাভিসার!

প্রভুর অহিংস অভিযান শুরু হইল। ভক্তদের সঙ্গে তিনি অগ্রসর হইলেন। অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, শ্রীবাস প্রভৃতি এক একটি কীর্ত্তনমণ্ডলীতে নৃত্য গীত করিতে করিতে চলিয়াছেন। আর প্রভু চলিয়াছেন সকলের মধ্যস্থলে। এক দিব্য ভাবাবেশে তিনি প্রমত্ত।

কীর্ত্তনকারী এই বিপুল জনতা কাজীর গৃহের সম্মুখে আসিয়া থামিল। একি বিস্ময়কর জন সংঘট্ট! শুধু নবদ্বীপের ইতিহাসে কেন, সমগ্র ভারতের ইতিহাসে এরূপ রাজবিরোধী অহিংস অভিযানের কথা সেদিন শোনা যায় নাই। এমন জনসমুদ্র অভাবনীয়। কাজী তাই ভয় পাইয়া কোথায় আত্মগোপন করিয়া আছেন।

আশ্বাস দিয়া তাঁহাকে ডাকাইয়া আনা হইল। প্রভুর দেবদুর্লভ কান্তি, মোহন নাগর বেশ আর ভাবাবেশে ঢুলু-ঢুলু নয়ন দুইটি দেখিয়া কাজী অভিভূত। ভয়ে, বিস্ময়ে এবং অজানা আকর্ষণে তাঁহার বুক তোলপাড় করিতেছে। ভাবিতেছেন, একি মর্ত্তের জীব না স্বর্গের দূত? এ কাহার সঙ্গে তিনি বিরোধ করিতে গিয়াছেন!

শান্ত কণ্ঠে, অনুযোগের সুরে গৌরাঙ্গ কহিলেন, "আচ্ছা, আমি তোমার বাড়িতে ছুটে এলাম, আর তুমি রইলে দূরে লুকিয়ে, এ কেমন কথা? এ তো শিষ্টাচারসম্মত নয়।"

প্রভুর কথা কয়টিতে যেন অমৃতঢালা, কি যাদু যেন ইহাতে জড়ানো রহিয়াছে। কাজী একবারে গলিয়া গেলেন।

উত্তরে কহিলেন, "তুমি ক্রুদ্ধ হয়েছো, সঙ্গে নিয়ে এসেছো বিরাট এক জনতা। তাই তো ভয়ে লুকিয়ে ছিলাম। এবার শান্ত হয়েছো, তাই এসে পড়লাম। তাছাড়া, তুমি তো জান না, তুমি আমার আপন

জন। তোমার দাদামশায় নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী গ্রাম সুবাদে আমার কাকা, তুমি যে তাই আমার ভাগ্‌নে হও। ভাগ্‌নে হিসেবে তোমার ক্রোধ ও আব্‌দার আমার কিছুটা সইতেই হবে। যাক্ যা হবার হয়ে গেছে—এবার তুমি বল, কি চাও।"

অপূর্ব্ব অলৌকিক শক্তি এই মহাভাবময় প্রেমিক পুরুষের। সামান্য দুই চারিটি শান্ত মধুর কথা—কিন্তু ইহা দিয়াই কাজীকে তিনি চিরতরে প্রেমের বন্ধনে বাঁধিয়া ফেলিলেন।

এবার গৌরসুন্দর চাহিলেন তাঁহার ভিক্ষা। বলিলেন, "আমায় একটি দান তুমি কৃপা করে দাও। আদেশ প্রচার কর, নবদ্বীপে কেউ যেন কখনো কীর্ত্তন বন্ধ না করে।"

কাজী মন্ত্রমুগ্ধবৎ কহিলেন, "আমি শপথ করে বলছি, আমার বংশের কেউ তোমার প্রবর্ত্তিত কীর্ত্তন বন্ধ করবে না।"

চারদিকে জয়জয়কার পড়িয়া গেল। প্রেমের বলে কাজীকে বশীভূত করিয়া সানন্দে প্রভু স্বগণসহ ঘরে ফিরিলেন।

হিন্দুর অবাধ ধর্ম্মাচরণের অধিকার গৌরাঙ্গ মুসলমান শাসনকর্ত্তাকে দিয়া স্বীকার করাইলেন। আর এ কাজ তিনি করাইলেন আপন অলৌকিক ব্যক্তিত্ব ও আত্মপ্রত্যয়ের প্রভাবে। তাই সেদিন শুধু নবদ্বীপেই নয়, সারা গৌড়দেশে তাঁহার অসামান্য প্রতিষ্ঠা দেখা দিল, তিনি পরিচিত হইয়া উঠিলেন জীব-উদ্ধারকারী মহামানবরূপে।

প্রেমের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমভক্তির এ লীলা বড় অভিনব, বড় জীবন্ত। তাঁহার দৃষ্টিতে ঝরিতেছে স্বর্গের সুধাস্নিগ্ধ আলো—স্পর্শে ছড়াইয়া পড়ে দিব্য রূপান্তরের ইন্দ্রজাল। একবার যে সান্নিধ্যে আসে, সেই আত্মসমর্পণ করে, একেবারে নূতন মানুষ হইয়া যায়।

সমকালীন পদকর্ত্তা বাসুদেব ঘোষ তাই প্রভুর এ সময়কার অলৌকিক লীলা প্রত্যক্ষ করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন—

আমার পরশমণির কি দিব তুলনা।

পরশমণির গুণে, জগতের জীবগণে
নাচিয়া গাইয়া হৈল সোণা ॥

প্রতিদিনকার মত সেদিনও শ্রীবাস অঙ্গনে নাম-কীর্ত্তন হইতেছে। সাঙ্গোপাঙ্গসহ প্রভু ভাবাবিষ্ট। পরমানন্দে নৃত্য করিয়া চলিয়াছেন। শ্রীবাসের একটি শিশুপুত্র কিছুদিন যাবৎ বড় অসুস্থ। হঠাৎ অন্তঃপুরে ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া শ্রীবাস দ্রুতপদে ভিতরে চলিয়া গেলেন। দেখিলেন, শিশুটি এইমাত্র দেহত্যাগ করিয়াছে। বিস্ময়ের বিষয়, পুত্রশোকে এ মহাবৈষ্ণবকে অধীর হইতে দেখা গেল না। তিনি বরং ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন প্রভুর জন্য—তাঁহার কোন অসুবিধা না হয়।

বাড়ীর মেয়েদের কাঁদিতে নিষেধ করিয়া দৃঢ়কণ্ঠে তিনি কহিলেন, "ত্যাখো, প্রভুর কণ্ঠের নাম গান শুনতে শুনতে পুত্র দেহত্যাগ করেছে, এ তার মহাভাগ্য, সে উর্দ্ধলোকে গিয়েছে। কিন্তু তোমরা যদি এখন কাঁদাকাটি করো, প্রভুর কীর্ত্তন-আনন্দ ভঙ্গ করো, তবে কিন্তু আমি গঙ্গায় ডুবে আত্মহত্যা করবো। সবাই এখন একেবারে চুপচাপ থাকো। কাঁদতে হয়, পরে কাঁদবে।"

কীর্ত্তন-অঙ্গনের অনেকেই কিছু জানিল না। শ্রীবাস আবার আসিয়া সেখানে যোগ দিলেন। অল্পকাল মধ্যেই কিন্তু প্রভুর প্রেমাবেশ টুটিয়া গেল। ভক্তদের দিকে চাহিয়া কহিতে লাগিলেন, "আজ আমার মন হঠাৎ এমন উচাটন হয়েছে কেন? কীর্ত্তনের আনন্দে মন বসতে চাইছে না। এমন রসভঙ্গের কারণ কি? নিশ্চয় শ্রীবাসের ঘরে কোন অমঙ্গল ঘটেছে। তোমরা সব খুলে বলো।"

এবার আর প্রভুকে এড়ানো গেল না। তাঁহাকে বলা হইল, "পণ্ডিতের গৃহে পুত্রশোকে সকলে বিহ্বল। শুধু প্রভুর কীর্ত্তনানন্দ ভঙ্গ হবে ব'লে এ দুঃসংবাদ শ্রীবাস তাঁকে জানাতে দেন নি।"

প্রভুর নয়নপদ্ম দুইটি ততক্ষণে সজল হইয়া উঠিয়াছে। কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, "কৃষ্ণ আমার পরম কৃপালু। তাই শ্রীবাসের মত

দুর্লভ আত্মজন আমায় জুটিয়ে দিয়েছেন ! আমার জন্য এরা সব করতে পারে ! ভাবছি, এদের ছেড়ে আমি কি করে থাকবো ?”

অতঃপর ব্যস্তসমস্ত হইয়া প্রভু মৃত শিশুর শয্যার নিকট আসিলেন। শ্রীবাসের স্ত্রী মালিনী দেবী ও বাড়ীর অন্যান্য সকলে শোকার্ত্ত হইয়া কাঁদিতেছেন। কৃপাময় প্রভুর অন্তর গলিয়া গেল। পুরনারীদের সান্ত্বনা দিবার জন্য এক অদ্ভূত অলৌকিক লীলা সর্ব্বসমক্ষে সেদিন তিনি প্রকটিত করিয়া বসিলেন।

মৃতদেহটিকে লক্ষ্য করিয়া প্রভু কহিতে লাগিলেন, “তোমার পিতা মাতা ও আত্মীয় স্বজনেরা শোকার্ত্ত। একবার তাঁদের বলে যাও, তুমি কেন তাঁদের ছেড়ে যাচ্ছো, কোথায়ই বা যাচ্ছো ?”

উপস্থিত সকলে সবিস্ময়ে দেখলেন, মৃত শিশুটির দেহে ধীরে ধীরে প্রাণ ফিরিয়া আসিতেছে। চোখ মেলিয়া চাহিয়া সে উত্তর দিল, “প্রভু যতদিন নির্ব্বন্ধ ছিল এদেহে বিরাজ করেছি, শ্রীবাস পণ্ডিতের পুত্ররূপে অনেক কিছু ভোগ করেছি, এবার প্রাক্তন শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে নতুন জায়গায় আমি চললাম। কারুর সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নেই। তোমার আর তোমার পার্ষদদের চরণে রইলো আমার প্রণাম। আমি এবার তাহলে বিদায় নিচ্ছি।” শিশু আবার নিঃসাড় দেহে শয্যায় পড়িয়া রহিল, প্রাণের কোন চিহ্ন আর দেখা গেল না।

জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে যে কোন পার্থক্যই নাই, এ তত্ত্বটি বুঝাইতে গিয়া প্রভুকে এই অলৌকিক লীলাটি প্রকটিত করিতে হইল। বলা বাহুল্য, ইহার ফলে শ্রীবাস-গৃহের নরনারীর শোকোচ্ছাস সেদিন অনেকটা প্রশমিত হয়।

পণ্ডিত ও তাঁহার পত্নী মালিনী দেবীকে প্রভু সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন, “ঈশ্বরের বিধানে এক পুত্র তোমাদের চলে গেলো। কিন্তু আজ থেকে আমি আর নিত্যানন্দ এ দু'জন তোমাদের পুত্র হ'লাম, তোমরা শোক-তাপ ভুলে যেতে চেষ্টা ক'র।”

ভক্তগণসহ প্রভু নিজে মৃত শিশুর সৎকার করিলেন।

গয়াধাম হইতে ফিরিয়া আসিবার পর এক বৎসরেরও বেশী সময় অতিবাহিত হয় নাই। ইহারই মধ্যে গৌরাঙ্গ এক বিরাট বৈষ্ণবগোষ্ঠী গড়িয়া তুলিয়াছেন। প্রভাব প্রতিপত্তি এখন ইঁহাদের যথেষ্ট। নবদ্বীপের ঘরে ঘরে আজ শোনা যায় কীর্ত্তনের আনন্দধ্বনি। গৌরসুন্দর হইয়া উঠিয়াছেন ভক্তদের সর্ব্বস্বধন, তাঁহাদের জীবন-মরণের প্রভু।

নবদ্বীপের এই প্রেমলীলায়, এই কীর্ত্তন-বিলাসে গৌরাঙ্গের কিন্তু আর তেমন মন বসিতেছে না। প্রেমধর্ম্মের যে প্রবাহ তিনি অর্গলমুক্ত করিয়াছেন, দিকে দিকে আজ তাহা প্রবাহিত হইতে চায়—সর্ব্ব মানবের অন্তর-সত্তার সহিত তাহা একাকার হইতে চায়। তাই শুধু শ্রীবাস-অঙ্গনের অন্তরঙ্গ লীলায় মাতিয়া থাকিলে চলিবে কেন? নবদ্বীপের সীমিত ক্ষেত্রটিতে তাঁহার এ দুর্লভ প্রেমধন বিলাইয়াই বা প্রভুর তৃপ্তি হইবে কেন?

অন্তরাত্মায় এবার আহ্বান আসিয়া গিয়াছে। বিশ্ব মানবের কল্যাণ তাঁহাকে এ প্রেমভক্তির প্রবাহকে সঞ্চালিত করিতে হইবে। সকল মানুষের দুঃখ, বিরহ ও আর্ত্তি তিনি বুক পাতিয়া নিবেন, সারা বিশ্বকে তিনি আহ্বান জানাইবেন। কিন্তু গৃহ না ছাড়িলে, নবদ্বীপ না ছাড়িলে তাঁহার এ বৃহত্তর কর্ম্মক্ষেত্রে কি করিয়া ঝাঁপ দিবেন?

আরও একটা বড় কথা আছে। গৌরাঙ্গ নিজে সংসারী। মাতার স্নেহ, কিশোরী ভার্য্যার প্রেম, আর ভক্ত শিষ্যদের শরণাগতির বন্ধন তাঁহার চারিদিকে। এ বন্ধন টুটিয়া না বাহির হইলে লোকে তাঁহার কথা শুনিতে চাহিবে কেন? সংসার ত্যাগ না করিলে সংসারের জীব যে তাঁহাকে তাহাদেরই মত এক মায়াবদ্ধ জীব বলিয়া ধরিয়া নিবে। তাই প্রভু স্থির করিলেন, অবিলম্বে সন্ন্যাস নিবেন। কাটোয়ার সন্ন্যাসী কেশব ভারতীকে বরণ করিবেন তাহার দীক্ষাগুরুরূপে।

নিজের সঙ্কল্পের কথাটি নিত্যানন্দ ও অপর কয়েকটি অন্তরঙ্গ ভক্তকে

তিনি জানাইলেন। আর জানাইলেন শচীদেবীকে। এ নিদারুণ সংবাদে সকলের মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল।

মিনতি, ক্রন্দন ও অশ্রুজল—কোন কিছুই সেদিন গৌরাঙ্গকে তাঁহার সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত করিতে পারে নাই। কুসুমের মত কোমল, আবার বজ্রের মত কঠোর তাঁহার প্রাণ। প্রয়োজন বুঝিয়া এবার বজ্রের কঠোরতাই তিনি গ্রহণ করিলেন।

মাঘ মাসের শুক্লপক্ষ। গভীর নিশীথে গৌরসুন্দর একদিন চিরতরে গৃহত্যাগ করিলেন। পশ্চাতে পড়িয়া রহিল বৃদ্ধা জননীর করুণ বিলাপ তরুণী পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়ার হৃদয়ভেদী দীর্ঘশ্বাস, আর ভক্তবৃন্দের আকুতি ও ক্রন্দন। কাটোয়ার পথ লক্ষ্য করিয়া প্রভু ছুটিয়া চলিলেন।

কেশব ভারতীর কুটীরে পেঁাছিবার পর একে একে নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ প্রভৃতি পার্ষদদের জড়ো হইতে দেখা গেল।

মস্তক মুণ্ডনের পর কেশব ভারতী তাঁহাকে দীক্ষা দান করিলেন। নবীন সন্ন্যাসীর নব নামকরণ হইল—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

প্রভুর বয়স তখন চব্বিশ বৎসর।

সন্ন্যাসের পর প্রভু দ্রুতপদে কাটোয়া ত্যাগ করিলেন। নবদ্বীপে আর ফিরিবেন না। এবার তঁাহার লক্ষ্য নীলাচলের দিকে। নীলমাধবের বাঁশরী-সংকেত তাঁহার অন্তরের অন্তঃপুরে পশিয়াছে। বিরহিনী রাধার মত পাগলপারা হইয়া তাই তিনি বাহির হইয়া পড়িয়াছেন।

নবদ্বীপের শ্রীবাস-অঙ্গন আর নয়—এবার তঁাহার লীলা-রঙ্গমঞ্চ দারুব্রহ্ম শ্রীজগন্নাথের মহাধাম! আত্মপ্রকাশের পরম লগ্নটি আসিয়া গিয়াছে, আর তো তাঁহার দেরী করিবার যো নাই!

পথমধ্যে দশদিনের জন্য প্রভু শান্তিপুরে অদ্বৈতের গৃহে অবস্থান করেন। সংবাদ পাইবামাত্র জননী ও ভক্তগণ আসিয়া উপস্থিত হন। নৃত্য কীর্ত্তন ও মহোৎসবের পর্ব্ব সমাপ্ত হইলে শেষবারের মত প্রভু সকলের কাছে বিদায় গ্রহণ করেন। দ্রুত চলিতে থাকেন উড়িষ্যার পথে।

ভাববিহ্বল অবস্থায় তিনি ছুটিয়া চলিয়াছেন। সঙ্গে নিত্যানন্দ প্রভৃতি চারিজন ভক্ত। কতক্ষণে তাঁহার নয়নমণি নীলমাধবকে দর্শন করিবেন, এই চিন্তায়ই তিনি বিভোর।

দীর্ঘ বন্ধুর পথ অতিক্রম করিয়া প্রভু পুরীধামের উপকণ্ঠে পৌঁছিয়াছেন। দূর হইতে শ্রীমন্দিরের উচ্চ চূড়াটি দেখা গেল, আর অমনি প্রেমোন্মত্ত অবস্থায় তিনি সেদিকে ধাবিত হইলেন। তাঁহার গতির সহিত তাল রাখিবে কে? সঙ্গীরা তখন অনেকটা পিছনে পড়িয়া আছেন।

শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিয়াই প্রভু মহাভাবে প্রমত্ত হইয়া পড়িলেন! সম্মুখে তাঁহার বহুঈপ্সিত ধ্যানের ধন বিরাজিত। তিনি দেখিতেছেন,—এতো দারুময় প্রতীক-মূর্ত্তি নয়, এ যে গোলকপতি মদনমোহনের চিন্ময়, পরম রসোজ্জ্বল রূপ! নিখিলের সকল মাধুর্য্য, সকল সৌন্দর্য্য ছানিয়া যে এ বিগ্রহ গড়া হইয়াছে!

অরূপ এখানে রূপায়িত, সচ্চিদানন্দ এখানে বিগ্রহীভূত! পরম প্রভুর এখানে চিরপ্রকাশ—চিরবিহার! এ দুর্লভ, দিব্যদর্শনের পর কে স্থির থাকিতে পারে?

প্রেমোন্মত্ত প্রভু ঘন ঘন হুঙ্কারে মন্দির কাঁপাইয়া তুলিতেছেন। অল্পকাল পরেই আর বাহ্যজ্ঞান রহিল না। হঠাৎ দুই বাহু প্রসারিয়া জগন্নাথ বিগ্রহকে তিনি বুকে জড়াইয়া ধরিতে গেলেন।

পাণ্ডা ও পরিহারীদের মধ্যে সোরগোল পড়িয়া গেল। একি দুঃসাহস এই তরুণ সন্ন্যাসীর—মহাবিগ্রহকে সে স্পর্শ করিতে আসে! সকলে আসিয়া একযোগে তাঁহাকে বাধা দিল। প্রভু একেবারে সম্বিৎহারা হইয়া ভূতলে পড়িলেন। তাঁহাকে ঘিরিয়া মন্দিরের সেবকদের উত্তেজনা ও কলরব সেদিন যেন আর থামিতে চায় না।

রাজ-পণ্ডিত বাসুদেব সার্ব্বভৌম এসময়ে শ্রীজগন্নাথকে প্রণাম করিতে আসিয়াছেন। তরুণ সন্ন্যাসীর এ কাণ্ড ও পরিহারীদের দৌড়ঝাঁপ তিনি এতক্ষণ যাবৎ লক্ষ্য করিতেছিলেন। তাড়াতাড়ি এবার ভীড়ের দিকে আগাইয়া আসিলেন।

পুরীতে তখন সার্ব্বভৌমের প্রবল প্রতাপ। উৎকল-রাজ প্রতাপ-রুদ্র সযত্নে তাঁহাকে নবদ্বীপ হইতে আনিয়া পুরীতে স্থাপন করিয়াছেন। গুরুর মত তাঁহাকে তিনি মান্য করেন। সমগ্র ভারতের নৈয়ায়িক এবং বৈদান্তিক সমাজে সার্ব্বভৌমের তখন অসাধারণ মর্য্যাদা। দিক-দিগন্ত হইতে ছাত্র, আচার্য্য ও দণ্ডী সন্ন্যাসীরা দলে দলে তাঁহার টোলে শাস্ত্র পাঠ করিতে আসে। উড়িষ্যার ধর্ম্মসংক্রান্ত যে কোন বিতর্কের মীমাংসায় তাঁহার সিদ্ধান্তই প্রামাণ্য বলিয়া গণ্য হয়। রাজা ও জনসাধারণ সকলেরই কাছে তাঁহার বিরাট প্রতিষ্ঠা।

বাসুদেব সার্ব্বভৌমকে সম্মুখে আসিতে দেখিয়া সকলে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। ভীড় সরাইয়া দিয়া পণ্ডিত তরুণ সন্ন্যাসীর দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। থম্‌কিয়া গেলেন। এমন নয়নাভিরাম মূর্ত্তি সহসা তো চোখে পড়ে না। তাছাড়া, একি অদ্ভুত প্রেম-বিহ্বলতা।

পণ্ডিতের মন গলিয়া গেল। তৎক্ষণাৎ কয়েকটি বাহকের সাহায্যে সন্ন্যাসীকে নিজ গৃহে নিয়া আসিলেন।

কিছুকাল পরেই শ্রীচৈতন্যের ভক্ত সঙ্গীরা তাঁহাদের পিছে পিছে সেখানে আসিয়া উপস্থিত। পণ্ডিতবর শুনিয়া খুসী হইলেন, সন্ন্যাসী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তাঁহার নবদ্বীপের লোক। প্রেমভক্তির আবেশে সদাই তিনি থাকেন বিহ্বল। বাসুদেব সার্ব্বভৌম আরও লক্ষ্য করিলেন, সঙ্গীয় ভক্তেরা ইঁহাকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করেন দেবতা জ্ঞানে।

তরুণ সন্ন্যাসীর প্রতিভাদীপ্ত আনন, অপূর্ব্ব প্রেমাবেশ এসব দেখিয়া তাঁহার প্রতি সার্ব্বভৌম বড় আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি কিছুটা সুস্থ হইলে কহিতে লাগিলেন, "ছাখো, বহু দণ্ডী সন্ন্যাসী আমার কাছে অদ্বৈত-বেদান্ত পড়তে আসে। প্রকৃত সন্ন্যাসীর কাজই হচ্ছে বেদান্ততত্ত্ব আয়ত্ত করা—এটা যেন কখনো ভুলে যেয়ো না। এখন থেকে তুমি রোজ আমার কাছে বসে বেদবেদান্তের ব্যাখ্যা শুনবে। কেমন? দেখবে, তাতে তোমার উপকারই হবে।"

শ্রীচৈতন্য সবিনয়ে কহিলেন, "আচার্য্যবর, আপনি পণ্ডিত শিরোমণি,

মহাজ্ঞানী। আমি আপনার কাছে বালকমাত্র। যাতে আমার কল্যাণ হয় তাই করুন। আপনার হাতেই নিজেকে সঁপে দিলাম।”

বেদান্ত পাঠ শুরু হইয়া গেল। বাসুদেব সার্ব্বভৌম রোজ নানা দূরূহ তত্ত্বের ব্যাখ্যা করেন, আর নিকটে বসিয়া প্রভু নিবিষ্ট মনে শুনিতে থাকেন। প্রায় সাত দিন অতিবাহিত হইয়া গেল, কিন্তু একবারও তিনি মুখ খুলিতেছেন না। একটি প্রশ্নও আজ অবধি জিজ্ঞাসা করেন নাই, একমনে শুধু শুনিয়াই যাইতেছেন। বাসুদেব পণ্ডিতের মনে সন্দেহ জাগিল, তবে কি এ তরুণ সন্ন্যাসী তাঁহার ব্যাখ্যার অর্থ কিছু ধরিতে পারিতেছেন না?

পণ্ডিত কহিলেন, “প্রতিদিন আমি এতকিছু জটিল শাস্ত্রতত্ত্ব ব্যাখ্যা করছি, কিন্তু কই, তোমার দিক থেকে তো কোন সাড়া শব্দ শুন্‌ছিনে। আমার ব্যাখ্যা প্রাঞ্জল হচ্ছে তো? সব বুঝতে পারছো কিনা তা আমার জানা দরকার।”

প্রভু সবিনয়ে নিবেদন করিলেন, “আচার্য্যবর, আপনি বলে দিয়েছেন, অদ্বৈততত্ত্ব শ্রবণ করা সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য। আপনার কথা শিরোধার্য্য করে তাই এ সব শুনে যাচ্ছি। কিন্তু আপনার প্রকৃত বক্তব্য আমি কিছুই বুঝতে পারছিনে।”

সার্ব্বভৌম রুষ্ট হইয়া উঠিলেন। গম্ভীর স্বরে কহিলেন, “সে কি কথা! যদি না বুঝতে পেরে থাকো, তবে আমায় প্রশ্ন করে সঠিক অর্থ জেনে নাওনি কেন? এরূপ চুপচাপ থাকার মানে আমি ভেবে পাচ্ছিনে, এ তোমার অন্যায় হয়েছে।”

প্রশান্ত কণ্ঠে, চৈতন্য অবলীলায় বলিয়া বসিলেন, “আচার্য্য, সত্যি কথা বলতে কি, শাস্ত্রের সূত্রের অর্থ বেশ সহজ! অতি স্বাভাবিকভাবে তা আমার উপলব্ধিতে এসে যায়। কিন্তু মায়াবাদী, আচার্য্য শঙ্করের অনুসরণে আপনি যে ভাষ্য করেছেন তাতে ফুটে উঠ্‌ছে বিপরীত অর্থ। মনে হয়, মুখ্য অর্থ ছেড়ে দিয়ে আপনি কাল্পনিক ব্যাখ্যা করে

যাচ্ছেন। ভগবান্ ব্যাসের সূত্র স্বপ্রকাশ। কিন্তু সে সূত্রকে আচ্ছাদন করে আপনি করেছেন আপনার নিজস্ব ভাষ্য।"

ক্রোধে অভিমানে পণ্ডিত ফাটিয়া পড়িবার মত হইলেন। প্রচণ্ড দুঃসাহস এ যুবক সন্ন্যাসীর! কে না জানে—বাসুদেব সার্ব্বভৌম ভারতবরণ্যে মহাপাণ্ডিত। আর তাঁহারই ব্যাখ্যায় এ অর্ব্বাচীন ভুল ধরিতে আসে! শুধু তাহাই নয়, শাঙ্কর-ভাষ্য ও তাঁহার নিজস্ব ব্যাখ্যাকে কাল্পনিক বলিয়া সে উড়াইয়া দিতে চায়!

উষ্মা ও উত্তেজনা চাপিয়া পণ্ডিত কহিলেন, "বেশ, তা'হলে সূত্রের প্রকৃত অর্থ এবার তোমার মুখেই শুনি।"

প্রভু শুরু করিলেন তাঁহার ভাষণ। মুহূর্ত্তে কোথা হইতে দিব্য শক্তি তাঁহার মধ্যে জাগ্রত হইয়া উঠিল। অপরূপ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মধ্য দিয়া প্রেমধর্ম্মের প্রাধান্য তিনি স্থাপন করিলেন। তত্ত্ব নিরূপণ করিলেন—শ্রীভগবান হইতেছেন সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, আর তাঁহার প্রতি প্রেমই জীবের পরম পুরুষার্থ।

অলৌকিক প্রতিভায় মুখমণ্ডল তাঁহার প্রদীপ্ত। মুখনিসৃত প্রতিটি শব্দ চৈতন্যময়। ব্যক্তিত্বে, ভাবের গাঢ়তায় ও বাচনভঙ্গীতে এ কি অদ্ভুত ইন্দ্রজাল! দৈবী শক্তিতে শক্তিমান এমন প্রতিপক্ষের সম্মুখীন সার্বভৌম কখনো হন নাই! ভক্তি, শক্তি ও জ্ঞানের একি বিস্ময়কর মিলন চব্বিশ বৎসর বয়স্ক এ সন্ন্যাসীর মধ্যে! কোন সিদ্ধান্তই যে তাঁহার খণ্ডন করা যাইতেছে না।

মহাপণ্ডিত বাসুদেব বড় দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন। আত্মরক্ষার কোন উপায়ই আর ভাবিয়া পাইতেছেন না। ন্যায় ও বেদান্তের যুগ্মরশ্মি তিনি ধারণ করেন, এ দেশের পণ্ডিত-সমাজের পুরোভাগে তিনি অধিষ্ঠিত। তাঁহার মত শক্তিধর পুরুষকে এই তরুণ আজ তৃণখণ্ডের মত কোথায় ভাসাইয়া নিতেছে?

ভয়ে, বিস্ময়ে ও শ্রদ্ধায় সার্ব্বভৌম চৈতন্যের দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া আছেন, আর ভাবিতেছেন—একি মানুষ, না নরদেহে আবির্ভূত কোন

দেবতা? পণ্ডিতের সকল অহঙ্কার, সকল আত্মপ্রত্যয় যেন এই মহাবলী প্রেমিক সন্ন্যাসী আজ নিঃশেষে শুষিয়া নিয়েছেন। বেদশাস্ত্রে যিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী, বেদ-বেদান্তে অনভিজ্ঞ এই যুবকের কাছে তিনি হইয়া গিয়াছেন ক্ষুদ্র শিশুটির মত অসহায়। নূতন ভাষ্য, নূতন মূল্যমান আজ ইহারই কাছে তাঁহাকে শুনিতে হইতেছে।

সূত্রসমূহের প্রেমভক্তিমূলক ব্যাখ্যা শেষ হইয়াছে। প্রভু এবার ভাব-গদগদ কণ্ঠে কহিলেন, আচার্য্যবর, ভগবদ্-ভক্তিই মানুষের পরম সাধন, তাই আত্মজ্ঞানী মহামুক্ত মুনিরাও এর জন্য থাকেন লালায়িত। শ্রীমদ্ভাগবত এই মহাসত্যই ঘোষণা করে বলেছেন—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কূর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভুতগুণো হরিঃ॥"

পণ্ডিত সবিনয়ে কহিলেন "যতিবর, বড় অপরূপ এই শ্লোক! এর নিহিতার্থ আজ আপনার মুখ থেকে শুনতে বড় ইচ্ছে হয়েছে। দয়া করে আমায় বলুন।"

সার্ব্বভৌমের পাণ্ডিত্যাভিমান নির্জ্জিত হইয়াছে বটে, কিন্তু একেবারে তাহা যায় নাই। প্রভুও তাঁহাকে সহজে ছাড়িবেন না। তাই চাতুরী করিয়া কহিলেন, "উত্তম কথা। কিন্তু আপনি বয়সে প্রবীণ, জ্ঞানবৃদ্ধ, আপনিই আগে এর ব্যাখ্যা করুন। পরে আমি করবো।"

পণ্ডিতের প্রাণে এতক্ষণে কিছুটা বল আসিল। ভাবিলেন, পাণ্ডিত্যবলে এই শ্লোকের বহুতর নূতন ব্যাখ্যা তিনি শুনাইয়া দিবেন। যদিবা এভাবে কিছুটা মান রক্ষা করা যায়। ভাষা, ভাব ও তত্ত্বের খুঁটিনাটি ধরিয়া নয়টি বিভিন্ন ব্যাখ্যা তিনি বর্ণনা করিলেন। ভাবিলেন, এ শ্লোকের আর নূতন কোন ব্যাখ্যা সম্ভব নয়।

কিন্তু একি বিপদ! চৈতন্য তাঁহার এ আশায়ও বাজ হানিলেন। স্মিত হাস্যে কহিলেন, "আচার্য্যবর, আরও কয়েকটি অর্থ এ শ্লোকের করা যায়। তা হ'লে কৃপা করে শুনুন।

প্রভু ব্যাখ্যা শুরু করিলেন। পণ্ডিত উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেছেন আর হতবাক্ হইয়া ভাবিতেছেন—অতিমানুষিক প্রতিভা ছাড়া একাজ কেহ করিতে পারে না। এ যে অভাবনীয় !

অবলীলায় প্রভু আঠারো রকমের নূতন ব্যাখ্যা শুনাইয়া দিলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের বিদ্যার দর্প যেন জ্বলন্ত অগ্নিশিখা! এতক্ষণ যাবৎ প্রভু পণ্ডিতের দীপাধার হইতে একটু একটু করিয়া তেল শোষণ করিতেছিলেন। উগ্র শিখা ক্রমে স্তিমিত হইয়া আসিতেছিল। এবার শেষ ফুৎকারটি দিয়া প্রভু তাহা নিভাইয়া দিলেন।

আত্মাভিমানের আগুন নিভিয়া গিয়াছে। এবার মহাপণ্ডিত সার্ব্বভৌমের নয়নে উদ্‌গত হইল ভক্তি-প্রেমের অশ্রুধারা। হৃদয়ের স্বচ্ছ দর্পণে নবীন সন্ন্যাসীর দিব্যরূপটি ফুটিয়া উঠিল। দেখিলেন, ঐশ্বরীয় ভক্তি, ঐশ্বরীয় জ্ঞান, আর ঐশ্বরীয় শক্তি তাঁহাতে রূপায়িত !

মুহূর্ত্তমধ্যে কোথা দিয়া কি ঘটিয়া গেল, বাসুদেব সার্ব্বভৌম প্রভুর চরণতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। অতঃপর চিরতরে তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিতে হইল। চৈতন্যকে স্বীকার করিয়া নিলেন জীবন মরণের প্রভুরূপে।

এভাবে সেদিন বাসুদেব সার্ব্বভৌমকে প্রভু আত্মসাৎ করিয়া নেন। এ আত্মসাৎ শুধু প্রভু আর ভক্তের ব্যাপারই নয়, করুণালীলার আলোকসম্পাত মাত্র নয়,—ইহার তাৎপর্য্য আরও অনেক বেশী। শক্তিধর সার্ব্বভৌমের এ আত্মসমর্পণ হইয়া উঠে প্রভুর নীলাচল-লীলার এক বিশিষ্ট অধ্যায়। শুধু উৎকলের রাজশক্তি ও বিদ্যজ্জন সমাজই নয়, সারা ভারতের বৈদান্তিকদের মধ্যেও সার্ব্বভৌমের এ পরাজয় আনিয়া দেয় প্রকাণ্ড আলোড়ন। চৈতন্যের নাম অচিরে দেশের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। সমাজে তিনি কীর্ত্তিত হইয়া উঠেন প্রেমভক্তি-ধারার নব ভগীরথরূপে।

নীলাচলে প্রায় মাস দুই অতিবাহিত হইয়া গেল। প্রভু এবার

স্থির করিলেন, কিছু দিনের জন্য তিনি দক্ষিণের তীর্থস্থানগুলি দর্শন করিতে বাহির হইবেন।

সার্ব্বভৌম কহিলেন, "প্রভু, দক্ষিণদেশে তুমি ভ্রমণে যাচ্ছো—খুব ভালো কথা। সেখানে রামানন্দ রায়ের সঙ্গে অবশ্য একবার দেখা ক'রো, বিদ্যানগরে উৎকলরাজের প্রতিনিধিরূপে তিনি দেশ শাসন করছেন। শূদ্র, বিষয়ী ভেবে তাঁকে যেন উপেক্ষা ক'রো না। প্রেমভক্তি সাধনার মহা অধিকারী পুরুষ এই রামানন্দ। পৃথিবীতে এমন রসজ্ঞ ভক্ত আর দু'টি নেই। বৈষ্ণব ব'লে একসময়ে আমি তাঁকে কত উপহাস করেছি, আজ তোমার প্রসাদে বুঝেছি তাঁর মর্ম্ম।"

প্রভু সাগ্রহে সম্মত হইলেন। তারপর শুরু হইল পরিব্রাজন।

কৃষ্ণ নামরসে মগ্ন হইয়া তিনি পথ চলিতেছেন—ভক্তি, প্রেম ও শরণাগতির ভাবে সদা বিভোর। কণ্ঠে চলিতেছে কীর্ত্তন—

রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাম্।
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহি মাম্॥

নামগান, প্রেমাবেশ ও নৃত্য কীর্ত্তনে নবীন সন্ন্যাসী পথে পথে সবাইকে মাতাইয়া চলিয়াছেন। কেহ তাঁহার দিব্যরূপ দেখিয়া, কেহ কীর্ত্তন শুনিয়া, কেহ বা স্পর্শ পাইয়া প্রেমাবেগে অধীর হইতেছে। প্রতি গ্রামে, নগরে তিনি এরূপে শক্তিসঞ্চার করিয়া চলিয়াছেন।

সময় অল্প—কিন্তু পরিক্রমার পথটি দীর্ঘ। ইহারই মধ্যে দূর দূরান্তে নামের বীজ প্রভুকে রোপণ করিয়া যাইতে হইবে, প্রেমধর্ম্মের রসস্রোত প্রবাহিত করিতে হইবে। দ্রুতবেগে তাই তিনি ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট এ ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া চলিয়াছেন।

দক্ষিণাপথে দিনের পর দিন চলিতে থাকে চৈতন্যের অবিরাম পরিক্রমা, আর চারিদিকে বিস্তারিত হয় তাঁহার প্রেমের অদ্ভুত ইন্দ্রজাল। এ ইন্দ্রজালের প্রভাব এড়ানো সেদিন অনেকেরই পক্ষে সম্ভব হয় নাই। তার্কিক, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ও বিষয়াসক্ত ধনীরা যেমন আকর্ষিত হয়, তেমনি পাষণ্ড, দস্যু ও পতিতা নারীরাও আসিয়া করে আত্মসমর্পণ।

যে একবার প্রভুর দর্শন পায়, ভক্তিরস তাহার মধ্যে সঞ্চারিত হয়, ধীরে ধীরে সে রূপান্তরিত হইয়া উঠে। শৈব, শাক্ত, বৌদ্ধ ও মায়াবাদী সাধকেরা দলে দলে এই প্রেমোন্মাদ, মহাশক্তিধর সন্ন্যাসীর চরণে আশ্রয় নিতে থাকে।

গোদাবরীতীরে, বিদ্যানগরের এক প্রান্তে চৈতন্য সেদিন বিশ্রাম করিতেছেন। এমন সময় রামানন্দ রায় দোলায় চড়িয়া নদীতে স্নান করিতে আসিলেন। সঙ্গে বহু অনুচর ও দাসদাসী।

স্নান তর্পণের শেষে অদূরস্থিত বৃক্ষতলে রামানন্দের দৃষ্টি পড়িল। দেখিলেন, এক দিব্যকান্তি তরুণ সন্ন্যাসী নিশ্চল হইয়া বসিয়া আছেন। একবার তাঁহার দিকে চোখ পড়িলে আর সরানো যায় না। নিকটে গিয়া ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন।

লোকলস্কর ও আড়ম্বর দেখিয়া তাঁহাকে চিনিয়া নিতে প্রভুর দেরী হয় নাই। মৃদু মধুর স্বরে প্রশ্ন করিলেন, আপনিই কি উৎকল-রাজের প্রতিনিধি রামানন্দ রায় ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, আমিই সেই অধম শূদ্র।"

"বাসুদেব সার্ব্বভৌম আমায় বারবার বলে দিয়েছেন, আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে। সেই জন্যেই আমার এখানে আসা। আপনি পরমভাগবত তাতে সন্দেহ নেই—আপনার দর্শনমাত্রই যে আমি কৃষ্ণ-প্রেমরসে ভাস্‌ছি।"

প্রভু উঠিয়া দাঁড়াইয়া রামানন্দকে আলিঙ্গন করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে রামানন্দের দেহে ফুটিয়া উঠিল অশ্রু-কম্প-পুলক প্রভৃতি প্রেমবিকার। এ রাজ্যের তিনি শাসনকর্ত্তা, ধীর স্থির ও দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ বলিয়াই লোকে তাঁহাকে জানে। কিন্তু প্রভুর স্পর্শ পাইবামাত্র কি এক স্বর্গীয় প্রেমাবেশে তিনি মত্ত হইয়া পড়িলেন। এ অলৌকিক দৃশ্য দেখিয়া সকলের বিস্ময়ের অবধি রহিল না।

প্রকৃতিস্থ হইবার পর রামানন্দ বারবার চৈতন্যের কৃপা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। কাতর কণ্ঠে নিবেদন করিলেন, "প্রভু, অধমকে শুদ্ধ

করার জন্যই যখন এসেছো, কিছুদিন এখানে অপেক্ষা করে যাও। আমায় তোমার কৃপা ও আশ্রয় দাও।”

প্রভু সর্ব্বজ্ঞ। তাঁহার জানিতে বাকী নাই—রায় রমানন্দ নিগূঢ় ব্রজরসের ভাণ্ডারী, আর অচিরে তিনি আত্মপ্রকাশ করিবেন তাঁহারই এক শ্রেষ্ঠ লীলাপরিকররূপে। তাছাড়া তিনি বুঝিয়া নিয়াছেন, আচার-আচরণে রামানন্দ রাজসিক ভাবাপন্ন, বৃত্তি তাঁহার রাজকার্য্য ও কূটনীতি, কিন্তু এই বিষয়ী আবরণের নীচে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে এক মহাবৈষ্ণব—প্রেমভক্তি-পথের এক অসামান্য সাধক!

প্রভু স্থির করিলেন, কয়েকটা দিন নিভৃতে এই পরম ভাগবতের সহিত কাটাইবেন, কৃষ্ণরস উপভোগ করিবেন। তাই রায়ের অনুরোধ শুনিয়াই বিদ্যানগরে থাকিতে তিনি রাজী হইয়া গেলেন। এক ভক্ত ব্রাহ্মণের গৃহে তাঁহার বাসের ব্যবস্থা হইল।

দশদিন তিনি এখানে যাপন করেন। প্রতিদিন রাত্রে রামানন্দ রায় তাঁহার কাছে উপস্থিত হন। দুইজনের একান্ত আলাপনে প্রেমানন্দ উদ্বেলিত হইয়া উঠে। উৎসারিত হয় বৈষ্ণবীয় ভজন ও সাধ্য-সাধনের নিগূঢ় তত্ত্ব।

রাত্রি সেদিন গভীর হইয়া উঠিয়াছে। কৃষ্ণকথায় উভয়ে মাতোয়ারা। প্রভু রামানন্দকে দিয়া মধুর ভজনের রসতত্ত্বটি উদ্‌ঘাটন করিতে চান, জীবের কল্যাণে উহা বিস্তারিত করিতে চান। তাই সেদিন একটির পর একটি প্রশ্ন করিয়া রামানন্দকে তিনি উদ্দীপিত করিতেছেন, আর উভয়ের সংলাপের মধ্য দিয়া চলিতেছে সাধ্যসাধন তত্ত্বের অপরূপ মন্থন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের যে অমৃত সেদিন এখানে উদ্‌গত হয়, প্রেমভক্তি-সাধনার জগতে তাহা চির অক্ষয় হইয়া রহিয়াছে।

প্রভু কহিলেন, “রামরায়, যে সাধন-ভজনের মাধ্যমে জীবের পরম প্রাপ্তি ঘটবে, তা আমার কাছে আজ খুলে বলো।”

কৃষ্ণপ্রেমের মরমী রসবেত্তা এই রামানন্দ রায়। প্রভু তাঁহাকে দিয়া

নিজের প্রচারিত তত্ত্বকে পরিস্ফুট করিয়া তুলিতে চান। তাই রাম রায়ের বিনয়, দৈন্য, ওজর-আপত্তি কোন কিছুই তিনি মানিলেন না। রায়কে অবশেষে মুখ খুলিতে হইল। স্বধর্ম্মাচরণ কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ জ্ঞানমিশ্রাভক্তি অনেক কিছুরই উল্লেখ রামানন্দ করিতেছেন, কিন্তু কোন কিছুই আজ প্রভুর মনঃপূত হইতেছে না। প্রেমাবেশে কেবলই বলিতেছেন, "রায়, এসব কথা তো বাহ্য। নিগূঢ় তত্ত্বের কথা আমায় তুমি শোনাও।"

একান্ত ভক্তি, দাস্য-সখ্য-বাৎসল্যময় ভক্তি প্রভৃতি নানা সাধনের কথাই রাম রায় কহিলেন। কিন্তু প্রভুর তাহাতে মন ভরিয়া উঠে কই? ভাবাবিষ্ট হইয়া কেবলই বলিতেছেন, "রাম রায়, এখানেই থেমে যেয়ো না, আরো এগিয়ে যাও, আরো—আরো গভীরের কথা বলো।"

উত্তর হইল, "প্রভু, এর পর বাকী থাকে কান্তা প্রেম, আর তাই হচ্ছে বৈষ্ণবের সর্ব্ব সাধ্যসার।" ভাগবতে বর্ণিত প্রেম-ভক্তি সাধনার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত রামানন্দ রায় এতক্ষণ পর্য্যন্ত ঢুঁড়িয়া আসিয়াছেন। ভাবিলেন, এবার তিনি রেহাই পাইলেন, প্রভুর জিজ্ঞাসার পালাও সাঙ্গ হইল।

কিন্তু তাহা হইবার যো কই? তিনি বলিয়া উঠিলেন, "রায়, সাধনার সীমারেখা টানতে হয় এখানেই, সে ঠিক কথা। কিন্তু এতে তো আমার সত্যকার তৃপ্তি হচ্ছে না। এর পরেও যদি আরো কিছু থাকে, তা উদ্‌ঘাটন কর!"

রামানন্দ চমকিয়া উঠিলেন। ইহা অপেক্ষা নিগূঢ়তর প্রেম-সাধনার কথা তো কেহ জানিতে চাহে না! বুঝিলেন, প্রভু তাঁহাকে দিয়া আজ চরম সাধ্যসাধন-তত্ত্বের নির্ণয় না করিয়া ছাড়িবেন না।

উত্তরে কহিলেন, "প্রভু এর পরে রয়েছে শুধু রাধা-প্রেম। আর এ হচ্ছে প্রেমের পরম সার—সাধ্য শিরোমণি। ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণের স্বরূপ হ'ল সৎ-চিৎ-আনন্দময়, আর তাঁরই আনন্দাংশে—হ্লাদিনী শক্তিরূপে বিরাজিতা রয়েছেন শ্রীরাধা। এই রাধাপ্রেমই মহাভাব হয়ে টেনে নিয়েছে প্রেমসাধনাকে চূড়ান্ত স্তরে।"

কৃষ্ণরসের রসিক, মহাসাধক রাম রায়ের সম্মুখে বসিয়া প্রভুর প্রেমরস পানের তৃষ্ণা আজ কেবল বাড়িয়াই চলিয়াছে। রস-ভুঞ্জনের এ আকাঙ্ক্ষার যেন অবধি নাই। লুব্ধনেত্রে কহিলেন, "রামরায়, তারপর আরো কিছু থাকে তো বল—আমার প্রাণের তৃষ্ণা মেটাও।"

সব শেষের পরেও আবার কি শুরু করিবেন? রামানন্দ রায় আর পারিয়া উঠিতেছেন না। এবার তাই ব্যক্ত করিলেন তাঁহার শেষ কথা। স্বরচিত একটি সঙ্গীতের মাধ্যমে রাধাকৃষ্ণ-প্রেমের চরম ও একীভূত রসটি তিনি উদ্ঘাটিত করিলেন।—স্বরূপ আর শক্তি, দুইটি পৃথক তত্ত্ব আর সেখানে থাকে না, রাধা আর কৃষ্ণের যুগলসত্তা সেখানে এক হইয়া যায়। রাম রায়ের সে সঙ্গীতের মূল সুর—'ন সো রমণ, ন হাম রমণী'। 'রসরাজ মহাভাব দুই এক রূপ'-এ সেখানে সব কিছু একাকার!

এ অবস্থায় লীলা আর থাকে না। বিষয় আর আশ্রয়—গোলকপতি কৃষ্ণ আর রাধা সেখানে যে একীভূত। তবে দ্বৈত রসসত্তার বিলাসই বা থাকে কই? ব্যগ্রভাবে প্রভু তাঁহার চম্পকবর্ণ করতল দিয়া তখনি রায়ের মুখ চাপিয়া ধরিলেন। অর্থাৎ—'এ বড় নিগূঢ় কথা, সব একাকার করার কথা। রায়, এ কথা আর নয়।'

কৃষ্ণরসের বন্যাধারা হইয়াছে অর্গলমুক্ত। মহাভাবরসে দুইজনে একেবারে প্রমত্ত হইয়া উঠিয়াছেন।

বিদ্যানগরে চৈতন্য সানন্দে দিন দশেক কাটাইলেন। রামানন্দের জীবন ইতিমধ্যেই হইয়া উঠিয়াছে প্রভুময়। এখানকার রাজকার্য্যে আর তাঁহার মন টিকিতেছে না। সমস্ত কর্ম্মভার ত্যাগ করিয়া প্রভুর নিরন্তর সঙ্গ লাভের জন্য তিনি উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছেন।

প্রভু তাঁহাকে বুঝাইয়া কহিলেন, "রাম রায়, তুমি উতলা হ'য়োনা। আমার পরিক্রমার শেষে, নীলাচলে অবশ্যই আবার আমরা মিলিত হ'বো। উভয়ে মিলে অন্তরঙ্গ লীলারস আস্বাদন করবো!"

প্রভু অতঃপর আরো দক্ষিণের দিকে চলিয়া গেলেন।

চৈতন্যের এ পরিক্রমা শুধু তীর্থদর্শনের জন্য নয়, এ যেন কৃপা বিতরণেরই এক লীলা। দেহ-বিগ্রহ দর্শনের নাম করিয়া নিজেই পুণ্য স্থানগুলিতে দর্শন দিয়া বেড়াইতেছেন। যেখানে ভক্ত সেখানেই তাঁহার ঘটিতেছে আবির্ভাব। আর যেখানে তিনি আবির্ভূত হন, সেখানেই উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠে ভক্তিরসের অমৃতস্রোত!

ঘুরিতে ঘুরিতে প্রভু সেদিন শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে আসিয়াছেন। পুণ্যতোয়া কাবেরীতে স্নানতর্পণ শেষ করিয়া তিনি রঙ্গনাথজীকে দর্শন করিলেন। নৃত্য কীর্ত্তন ও প্রেমাবেশে স্বর্গীয় আনন্দ উথলিয়া উঠিল।

মন্দিরের এক কোণে সৌম্যদর্শন এক প্রবীণ ব্রাহ্মণ ভগবদ্‌গীতা পাঠ করিতেছেন। নাম তাঁহার যুধিষ্ঠির। বিশিষ্ট ভক্ত বলিয়া এ অঞ্চলের সর্ব্বত্র তিনি পরিচিত।

ব্রাহ্মণ প্রতিদিনই একমনে ভক্তিভরে গীতার অষ্টাদশ অধ্যায় পাঠ সমাপ্ত করেন। আর এ সময়ে তাহার দুই নয়ন হইতে অবিরাম ধারায় অশ্রু ঝরিতে থাকে। সকলেই জানে, সংস্কৃত ভাষা তিনি জানেন না। তাই গীতার শ্লোকার্থ হৃদয়ঙ্গম করাও তাঁহার পক্ষে সম্ভব নয়। তবুও কেন যে আদ্যোপান্ত এ গ্রন্থটি রোজ তাহার পড়া চাই, অনেকে ভাবিয়া পায় না। তাছাড়া, পড়িতে গিয়া এত ক্রন্দন আর অশ্রুবর্ষণই বা কেন? পাঠের এমন প্রচেষ্টা দেখিয়া অনেকে উপহাসও করে।

রঙ্গনাথজীকে প্রণামের পর চৈতন্য বাহিরে আসিতেছেন, হঠাৎ তাহার দৃষ্টি পড়িল যুধিষ্ঠিরের উপর। গীতা পাঠ তাহার সবেমাত্র শেষ হইয়াছে। নয়নজলে দুই গণ্ড প্লাবিত। প্রেমাবেশে বিহ্বল ব্রাহ্মণ ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতেছেন। নিকটে গিয়া প্রভু সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিপ্রবর, গীতা পাঠ করে এমন প্রেমোদ্বেল হতে কাউকে আমি দেখিনি। আচ্ছা, কোন্ শ্লোকটি পড়ে আপনি এ অপার্থিব আনন্দে অধীর হয়ে ওঠেন, তা কি দয়া করে আমায় বলবেন?"

ব্রাহ্মণ উত্তর দিলেন, "প্রভু, কোন শ্লোকেরই শব্দার্থ আমি জানিনে,

আমি যে একেবারে মূর্খ। শুদ্ধ হোক, অশুদ্ধ হোক রোজই উচ্চকণ্ঠে সমস্ত অধ্যায়গুলো পাঠ করে যাই। গুরু আজ্ঞা দিয়েছেন, তাই একাজ করি। শ্লোকের অর্থ ভেদ করতে পারিনে, তার কোন প্রয়োজন আছে বলেও মনে হয় না। কারণ, যখনি এ মহাগ্রন্থের পাতা আমি খুলে বসি, তখনই গুরুকৃপায় দেখতে পাই—আমার শ্যামসুন্দর রথাগ্রে বসে অর্জ্জুনকে পরম তত্ত্বের উপদেশ দিচ্ছেন। সে দিব্যোজ্জ্বল মূর্ত্তিটি দেখতে দেখতে আমি প্রেমাবিষ্ট হয়ে পড়ি। ভেতর থেকে যে কান্না উথ্‌লে ওঠে, তা ঠেকানো যায় না। যতক্ষণ এই গীতা পাঠ করি ততক্ষণই পরম প্রভুর দিব্য রূপ দর্শন করি। তাই আর কোন দিকে হুঁস থাকে না।"

বাহু প্রসারিয়া, প্রেমভরে প্রভু এই মহাভক্ত ব্রাহ্মণকে আলিঙ্গন দিলেন। প্রেমাশ্রুপূরিত নয়নে কহিলেন, "ভাই, তোমায় মূর্খ কে বল্‌বে? অন্তর যে তোমার জ্যোতির্ম্ময় হয়ে উঠেছে। গীতার অর্থ তুমিই বুঝতে পেরেছো, তোমার পাঠই তো সার্থক। যে পাঠ পরম প্রভুর দর্শন ঘটিয়ে দেয়, তাই তো সত্যকার পাঠ!"

শ্রীরঙ্গক্ষেত্রের পরে প্রভু রামেশ্বর, ত্রিবাঙ্কুর, পন্‌ঢরপুর প্রভৃতি দক্ষিণাপথের বহুতর অঞ্চল পর্য্যটন করিতে থাকেন। দুই বৎসর পর নীলাচলে তিনি ফিরিয়া আসিলেন। আবার তাঁহাকে ফিরিয়া পাইয়া ভক্তসমাজে আনন্দের অবধি রহিলনা।

গৌড় হইতে প্রভুর প্রধান পার্ষদগণ দলে দলে নীলাচলে আসিয়া উপনীত হন। রথযাত্রার উৎসব সময়ে বৈষ্ণবদের নৃত্য কীর্ত্তনে পুরীধাম মুখরিত হইয়া উঠে। রথাগ্রে প্রভুর উদ্দণ্ড কীর্ত্তন ও প্রেমাবেশ লক্ষলক্ষ ভক্ত ও দর্শণার্থীর হৃদয়ে দিব্য আনন্দের তরঙ্গ তুলিয়া দেয়।

উৎকলরাজ প্রতাপরুদ্র এই সময়ে চৈতন্যের চরণে আত্মসমর্পণ করেন—প্রভুর প্রেমভক্তি-ধর্ম্মের অন্যতম ধারক ও বাহকরূপে অচিরে তিনি চিহ্নিত হইয়া উঠেন।

সে-বার প্রভুর সহিত আনন্দরঙ্গে গৌড়ীয়া ভক্তদের দিন কাটিতেছে।

দেশ হইতে অনেক দিন হয় তাঁহারা আসিয়াছেন। কিন্তু ফিরিবার কথা উঠিলেই সকলের মুখ শুকাইয়া যায়। প্রভুর সান্নিধ্যের এ স্বর্গসুখ ছাড়িয়া যাইতে কাহারো মন সরে না।

এ সময়ে প্রভু একদিন শ্রীপাদ নিত্যানন্দকে নিকটে ডাকাইলেন। নিভৃতে বসিয়া তাঁহাকে কহিলেন, "শ্রীপাদ, আমি তো চিরজীবনের মত ঘর-সংসার ছেড়ে এলাম। তুমিও যদি অবধূতবৃত্তি নিয়ে এমন যত্রতত্র বিচরণ করতে থাকো, তবে সংসারী জীবের উদ্ধার কি করে হবে? আমার অনুরোধ শোন। তুমি গৌড়ে ফিরে যাও এবং সেখানেই থাকো। প্রতিবৎসর সবাইকে নিয়ে নীলাচলে আস্‌বে, তখন আমার সঙ্গে দেখা হ'বে। আরো একটা কথা। আমার ইচ্ছে, তুমি বিয়ে করে সংসার জীবনে প্রবিষ্ট হও। অগণিত গৃহীভক্ত তোমার আশ্রয় পেয়ে বাঁচুক, তোমার আদর্শে তারা প্রকৃত বৈষ্ণব হয়ে উঠুক। ঘরে ঘরে আদর্শ গৃহী-বৈষ্ণবের সৃষ্টি হোক্। আমার প্রতিনিধি হয়ে, গৌড়দেশের সমাজ-জীবনের স্তরে স্তরে তুমি নাম-প্রেমরস বিলিয়ে বেড়াও!"

নিত্যানন্দের মাথায় এ যেন বিনা মেঘে বজ্রাঘাত! আজীবন ব্রহ্মচারী ও অবধূত থাকিয়া তাঁহাকে আবার এ বয়সে গৃহী হইতে হইবে? সংসারের বন্ধন গলায় পরিতে হইবে? প্রভু একি বলিতেছেন?

কাতর কণ্ঠে কহিলেন, "প্রভু, আমার প্রতি এমন নির্দ্দয় হ'লে কেন, এমন কঠোর দণ্ডই বা দিতে যাচ্ছো কেন, তা খুলে বলো?"

"শ্রীপাদ, সবাই জানে, তুমি আর আমি অভিন্নাত্মা। তুমি গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম গ্রহণ না করলে সমাজের সঙ্গে, জীবের সঙ্গে আমার যোগ থাকবে কি করে? প্রেমধর্ম্মের প্রচারই বা কিরূপে হবে? তোমার পক্ষে গৃহী-জীবনে ফিরে যাওয়া কঠিন—এ এক মস্ত বড় ত্যাগ তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু জীবের কল্যাণের জন্য সেই ত্যাগই তোমায় বরণ করতে হবে। তুমি কৃপা না করলে, লোকে কি করে পরমবস্তু পাবে?"

নিত্যানন্দ জানেন—এ প্রভুর অনুরোধ নয়, আদেশ। বাধ্য হইয়া তাই তাঁহাকে দেশে ফিরিতে হইল। প্রভুর নির্দ্দেশ মত গার্হস্থ্যধর্ম্মও

গ্রহণ করিলেন। তারপর সমগ্র গৌড়দেশ তাঁহার হুঙ্কারে, উদ্দণ্ড নৃত্যে আর নাম-প্রচারে মাতিয়া উঠিল। তিনি চিহ্নিত হইলেন প্রেমদাতা 'দয়াল নিতাই'-রূপে।

বহুদিন হয় প্রভুর বৃন্দাবন ও মথুরায় যাওয়ার ইচ্ছা। তিন তিনবার চেষ্টা করিয়াও নানা বাধা-বিঘ্নের জন্য ইহা ঘটিয়া উঠে নাই। এবার একটিমাত্র সেবক সঙ্গে নিয়া তিনি তাঁহার ইপ্সিত পর্য্যটনে বাহির হইয়া পড়িলেন।

বৃন্দাবনে পৌঁছিয়াই শুরু হইল তাঁহার নৃত্যকীর্ত্তন আর প্রেমাবেশ। এক একটি পুণ্যস্থান দর্শন করেন আর আনন্দে আত্মবিস্মৃত হইয়া যান। কখনো গাভীর হাম্বারব শুনিয়া, কখনো বা ময়ূর-ময়ূরীর নৃত্য দেখিয়া কৃষ্ণলীলার উদ্দীপনা জাগিয়া উঠে, প্রভু বাহ্যজ্ঞান হারান।

এই সময়ে দিব্য ভাবাবেশে আবিষ্ট হইয়া তিনি ব্রজমণ্ডলের বহু প্রাচীন লুপ্ত তীর্থের পুনরুদ্ধার করেন। উত্তরভারতে প্রেমভক্তিধর্ম্মের উজ্জীবনে তাঁহার এ অবদানের মূল্য অপরিসীম।

ব্রজমণ্ডলে ঘুরিতে ঘুরিতে প্রভু একদিন ব্যাকুলভাবে সবাইকে প্রশ্ন করিতে থাকেন—রাধাকুণ্ড কোথায়? দীর্ঘদিন যাবৎ এ পবিত্র স্থানটির কথা লোকে বিস্মৃত হইয়াছে, কোন সন্ধান পাইবার আর উপায় নাই। অবশেষে একদিন দিব্য ভাবাবেশে আবিষ্ট হইয়া নিজের রাধারাণীর স্মৃতিপূত এই কুণ্ড আবিষ্কারে বাহির হইলেন। সঙ্গে চলিল কৌতূহলী জনতা ও ভক্ত বৈষ্ণবের দল।

পথ চলিতে চলিতে একটি নির্দিষ্ট স্থানে গিয়া প্রভু হঠাৎ থামিয়া পড়িলেন। চারিদিকে ধানের ক্ষেত—মধ্যস্থলে একটি ক্ষুদ্র ডোবা। আবেশগ্রস্ত অবস্থায় সর্ব্বসমক্ষে ঘোষণা করিলেন, "এই হচ্ছে রাধারাণীর স্মৃতিবিজড়িত সেই প্রাচীন রাধাকুণ্ড।"

সঙ্গে সঙ্গে তিনি উহার মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন, আর ভক্ত বৈষ্ণবগণ এই কুণ্ড ঘিরিয়া নৃত্য ও কীর্ত্তন শুরু করিয়া দিল।

প্রভুর আবিষ্কৃত এই রাধাকুণ্ডকে দেশের সাধকসমাজ অচিরে সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে স্বীকৃতি দান করে।

মথুরা ও বৃন্দাবনের অবস্থা তখন শোচনীয়। মানুষের বসতি বড় কম, চারিদিকে নিবিড় অরণ্য। মুসলমান আক্রমণকারীদের উপর্য্যুপরি লুণ্ঠনে এ অঞ্চলের জনপদগুলি আর গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। শান্তি, সমৃদ্ধি বহুদিন যাবৎ বিলুপ্ত হইয়াছে।

এবার এই বনাকীর্ণ পবিত্র অঞ্চলকে চৈতন্য সারা ভারতের জনমানসের সম্মুখে তুলিয়া ধরেন। লুপ্ত তীর্থগুলির উদ্ধার, বিস্মৃতপ্রায় পুণ্যস্থানগুলির মাহাত্ম্য প্রচার ভক্তসমাজে আলোড়ন তুলিয়া দেয়। প্রভু ও তাঁহার প্রেরিত শক্তিমান গোস্বামীদের চেষ্টায় বৃন্দাবন আবার জাগ্রত হয়, আর বৃন্দাবনের শ্রীরাধাকৃষ্ণ নূতন করিয়া সংস্থাপিত হন দেশবাসীর হৃদয়-মঞ্চে।

বৃন্দাবন ত্যাগের পর প্রভু প্রয়াগের পথে চলিয়াছেন। সঙ্গে সেবক বলদেব ভট্টাচার্য্য আর একটি নবাগত ভক্ত, নাম কৃষ্ণদাস, জাতিতে রাজপুত। একযোগে অনেকটা পথ চলা গিয়াছে। তাই বিশ্রামের জন্য সকলে একটি বৃক্ষতলে বসিলেন!

নিকটেই একদল গাভী চরিয়া বেড়াইতেছে। হঠাৎ এই সময়ে এক রাখাল বংশীধ্বনি করিয়া উঠিল। আর যায় কোথায়? আগে হইতেই প্রভু বৃন্দাবনের স্মৃতিতে ভরপুর আছেন, এবার এই গোচরণের দৃশ্য ও বাঁশীর রব তাঁহাকে কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত করিয়া তুলিল। মহাভাবের উদ্দীপনায় তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। নিঃশ্বাস রুদ্ধ, মুখ দিয়া ফেনা নির্গত হইতেছে, দেহে প্রাণের চিহ্নমাত্র নাই।

বাদশাহের এক অশ্বারোহী পাঠান ফৌজ ঠিক এ সময়ে এখান দিয়া যাইতেছিল। সন্ন্যাসীর এই অবস্থা দেখিয়া তাহারা সন্দিহান হইয়া উঠিল। তবে কি সঙ্গী দুইটি তাঁহাকে কোন ছলে বিষ খাওয়াইয়াছে? হয়তো তাঁহার টাকাকড়ি নিয়া ইহারা এবার পলায়ন করিবে। ঘোড়া থামাইয়া তখনি প্রভুর সঙ্গী দুইটিকে তাহারা বাঁধিয়া ফেলিল।

কৃষ্ণদাস ব্যাকুলভাবে বুঝাইতে থাকেন, "আমরা এ সন্ন্যাসীরই ভক্ত ও সেবক। ভাবাবেশে ইনি মূর্চ্ছিত হয়েছেন। এমনধারা প্রায়ই ঘটে থাকে। আমরা দু'জনে এতক্ষণ পরিচর্য্যা করছিলাম।"

কিন্তু পাঠানেরা কোন কথাই কানে তুলিতে চাহে না, তাহারা এ দু'জনকে এখনি বধ করিবে।

অনুনয়-বিনয় এবং তর্ক-বিতর্ক চলিতেছে, এমন সময় চৈতন্য সম্বিৎ ফিরিয়া পাইলেন। চোখ মেলিয়া চাহিতেই পাঠানেরা তাঁহাকে কহিল, "সাধু, তোমার ভাগ্য ভালো, বেঁচে উঠ্‌লে। এ দুর্ব্বৃত্তেরা তোমায় বিষ খাইয়ে মেরে, টাকাকড়ি লুঠ করতে চেয়েছিল।"

প্রভু ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "না-না ভাই, তোমরা ভুল বুঝছো। ওরা আমার একান্ত আপন জন। আমার এক এক সময় মূর্চ্ছা হয়, তখন ওরাই তো সেবাযত্ন করে আমার প্রাণ বাঁচায়।"

সাধুর কথায় বিশ্বাস করা ছাড়া আর উপায় কি? সৈন্যেরা অগত্যা বলদেব ও কৃষ্ণদাসের হাতপায়ের বাঁধন কাটিয়া দিল।

পাঠানদের সেনাপতি বেশ পণ্ডিত লোক। হিন্দুশাস্ত্র তাঁহার কিছুটা জানা আছে। তাছাড়া, চৈতন্যের এমন দিব্যকান্তি ও অদ্ভুত প্রেমাবেশ দেখিয়া তিনি বড় আকৃষ্ট হইয়াছেন। আগাইয়া আসিয়া প্রভুর সঙ্গে তাই অধ্যাত্ম-আলোচনা শুরু করিয়া দিলেন।

প্রভুর অমৃতময় কথা যত শুনিতেছেন, ততই তিনি বিকল হইয়া পড়িতেছেন। কি অপূর্ব্ব সম্মোহন এই প্রেমিক সন্ন্যাসীর চাহনিতে, কণ্ঠস্বরে ও তাঁহার ব্যক্তিত্বে! পাঠানের সমগ্র সত্তায় প্রচণ্ড নাড়া পড়িয়া গেল। মুমুক্ষু হইয়া চৈতন্যের চরণে তিনি আত্মসমর্পণ করিলেন। আশ্রয় দিয়া প্রভু তাঁহার নামকরণ করিলেন—রামদাস।

এই পাঠান বাহিনীর মধ্যে একটি ধর্ম্মপ্রাণ তরুণ ছিলেন, তাঁহার নাম বিজ্‌লি খান। ইনি এক বিশিষ্ট মুসলমান ওমরাহের পুত্র। এই বিজ্‌লি খানও প্রভুর নিকট হইতে প্রেমভক্তি-ধর্ম্মের উপদেশ গ্রহণ করেন, তাঁহার কৃপা লাভে ধন্য হন।

ইহার পর প্রভু প্রয়াগে আসিয়া পৌঁছেছেন। তাঁহার চারিদিকে জমিয়া উঠে দর্শনার্থীর ভীড়। এ সময়েই তাঁহার সমীপে উপনীত হন শ্রীরূপ। গৌড়ের বাদশাহ হুসেন শাহের প্রাক্তন সচিব ইনি, উপাধি 'সাকর মল্লিক'। রূপের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম সনাতন, বাদশাহের প্রধান সচিব বা দবীর খাস-রূপে তিনি সুবিখ্যাত।

রূপের কবিত্ব শক্তি ও সনাতনের পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ, আবার তেমনি ছিল উভয়ের বিষয়-বিরক্তি। সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া প্রভুর নিকট আত্মসমর্পণের জন্য দুই ভ্রাতা তখন বড় ব্যাকুল। পত্রযোগে বারবার এ সঙ্কল্পের কথা তাঁহাকে নিবেদনও করিয়াছেন।

অবশেষে রূপ আর ধৈর্য্য ধরিতে পারেন নাই। রাজ অমাত্যের মর্য্যাদা, ধনৈশ্বর্য্য, সব কিছু ঠেলিয়া ফেলিয়া চৈতন্যের চরণতলে আসিয়া এবার মাথা ঠেকাইলেন।

এই চিহ্নিত পার্ষদের আগমনে প্রভুর আনন্দ আর ধরে না। বারবার কহিতে লাগিলেন, "ভাল হলো, রূপ, এতদিন পরে এবার প্রভু তোমায় কৃপা করলেন, বিষয়-কর্দ্দম থেকে টেনে তুললেন।"

কয়েকদিন আপন সান্নিধ্যে রাখিয়া প্রভু তাঁহাকে ব্রজরসতত্ত্বের নানা উপদেশ দান করেন। তারপর শক্তি সঞ্চারিত করিয়া তাঁহাকে পাঠাইয়া দেন বৃন্দাবনে। এই সঙ্গে নির্দ্দেশ থাকে, রূপ যেন পরে নীলাচলে গিয়া তাঁহার সঙ্গে মিলিত হন।

ইহার পর উপনীত হন প্রভুর অপর অন্তরঙ্গ পার্ষদ, তাঁহার মণ্ডলীর অন্যতম স্তম্ভ—সনাতন।

সনাতন ও রূপ উভয়েই বাদশাহ হুসেন শাহের বিশ্বস্ত ও কর্ম্মদক্ষ সচিব। রূপ তাঁহার কর্ম্মভার ত্যাগ করায় বাদশাহ খুব ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। এবার সনাতন চলিয়া গেলে আরো বিপদের কথা। তাই বাদশাহ ঠিক করলেন, কোনমতেই তাঁহাকে গৌড় ছাড়িতে দিবেন না। সংসার বিরক্ত সচিবকে কড়া পাহাড়ায় বন্দী রাখা হইল।

সনাতন রূপের সাথে পত্রে যোগাযোগ রাখিতেছেন। ভ্রাতা প্রভুর

চরণাশ্রয় পাইয়াছে ইহা তাঁহার অজানা নাই। প্রাণ তাঁহার এবার আরও ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। যে কোন উপায়ে তাঁহাকে মুক্ত হইতেই হইবে, নতুবা প্রভুর সহিত মিলিত হইবার তো কোন আশা নাই। অবশেষে একদিন রক্ষীদের প্রচুর অর্থ উৎকোচ দিয়া তিনি কারা-প্রাচীরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

পরিধানে দীন ফকিরের বেশ। রৌদ্র, ঝড়জল কোন কিছুর দিকে ভ্রুক্ষেপ নাই, মুমুক্ষু সনাতন দ্রুতবেগে ছুটিয়া চলিয়াছেন। প্রভু এখন বারাণসীতে, তাঁহার সহিত মিলনের জন্য তিনি মহা উৎকণ্ঠিত।

সনাতন জানেন, বাদশাহের সৈন্যেরা তাঁহার পিছু না নিয়া সহজে ছাড়িবে না, যে কোন প্রকারে তাঁহাকে গৌড়ে ফিরাইয়া নিতে চাহিবে। তাই দুর্গম অরণ্যপথ দিয়া তিনি রওনা হইলেন। পদদ্বয় ক্ষতবিক্ষত, অর্দ্ধাশনে ও পথশ্রমে দেহ বিশীর্ণ। কেবলি ছুটিয়া চলিয়াছেন।

বারাণসীতে আসিয়াই চৈতন্যের চরণে তিনি লুটাইয়া পড়িলেন। সাক্ষাৎমাত্র অপূর্ব্ব প্রেমতরঙ্গ উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, উভয়েরই নয়ন ছাপাইয়া বহিতে লাগিল পুলকাশ্রু। প্রভু ও ভক্তের এ মিলন বড় মর্ম্মস্পর্শী।

প্রভু ভক্তদের কহিতে লাগিলেন, "আজ আমার পরম সৌভাগ্য, মহাবৈরাগ্যবান সাধককে কৃষ্ণ আমার কাছে এনে দিলেন। তোমরা সনাতনের মস্তক মুণ্ডন করাও। গঙ্গাস্নান করিয়ে তাকে কৌপীন বহির্বাস প'রতে দাও।"

সনাতনের যেমন মুমুক্ষা, তেমনি তীব্র বৈরাগ্য! বহু অনুরোধ সত্ত্বেও নূতন বস্ত্রের কৌপীন ও বহির্বাস তিনি নিবেন না। পুরাতন একখণ্ড বস্ত্র চিরিয়া নিয়া দুই খণ্ড করিলেন। বেশ পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন এভাবে মিটিয়া গেল।

আহারের ব্যাপারেও তাঁহার কৃচ্ছ্রসাধন কম নয়। কোন দিন প্রভুর কিঞ্চিৎমাত্র প্রসাদ, কোন দিন বা মাধুকরী করিয়া উদর-পূর্ত্তি চলে।

সকলের মুখে প্রিয় ভক্ত সনাতনের বৈরাগ্যের কথা শুনিয়া চৈতন্যের আনন্দ আর ধরে না।

কিন্তু মুখে যাহাই বলুন না কেন, প্রভুর মনে কি যেন একটা প্রশ্ন উঁকিঝুঁকি মারিতেছে। বারবার কেন সনাতনের স্কন্ধস্থিত ভোট কম্বলটির দিকে তিনি চাহিতেছেন?

আসল কথাটি সনাতন তখনি বুঝিতে পারিলেন। পথে বাদশাহের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী, তাঁহার এক আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা। এ কম্বল জোর করিয়া তিনি তাঁহার কাঁধে চাপাইয়া দিয়াছেন। এই বস্তুটির উপরই প্রভুর দৃষ্টি পড়িয়াছে। সনাতন ভাবিলেন, সত্যই তো, সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া আসিয়া এ বোঝা আর বওয়া কেন? কাঙাল বৈষ্ণবের কাঁধে দামী ভোট কম্বলই বা থাকিবে কেন? থাকিবে জীর্ণ কন্থা। প্রভুর সদা সতর্ক দৃষ্টি কল্যাণের পথটিই তাঁহাকে আজ দেখাইয়া দিয়া গেল।

অমনি দ্রুতপদে গঙ্গার ঘাটে তিনি ছুটিয়া গেলেন। এদিক ওদিক ঘুরিয়া দেখিলেন, এক দরিদ্র ভিখারী তাহার জীর্ণ কাঁথাটি রৌদ্রে শুকাইয়া নিতেছে। মিনতি করিয়া কহিলেন, "ভাই, আমায় একটু দয়া করবে? এই নূতন ভোট কম্বলটি রেখে দিয়ে তার বদলে তোমার ঐ পুরাতন কাঁথাটি আমায় দিতে পারো?"

কাঁথার মালিক কিছুতেই এ প্রস্তাবের অর্থ বুঝিতে পারিতেছে না। ভাবিতেছে, লোকটা কি পাগল, না আর কিছু? সনাতনও হটিবার পাত্র নন। এ কাঁথা হস্তগত না করিয়া তিনি ছাড়িবেন না। বহু অনুনয়ের পর লোকটিকে রাজী করাইয়া তখনি প্রভুর নিকট ফিরিয়া আসিলেন।

এবার তিনি সত্যই ভারমুক্ত হইয়াছেন। কাঁধে ভোট কম্বলের স্থলে ছিন্ন কন্থা।

চৈতন্যের আননে ফুটিয়া উঠিল প্রসন্ন-মধুর হাসি। ব্রজমণ্ডলের ভাবী কর্ত্তা, গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজের ভাবী শিক্ষাগুরু তাঁহার সনাতন!

এই চিহ্নিত পুরুষের বিচারবুদ্ধির ত্রুটি থাকিবে কেন? ত্যাগ-বৈরাগ্য ও আচার-আচরণেই বা কেন থাকিবে ফাঁক? সনাতনকে ত্রুটি সংশোধন করিতে দেখিয়া প্রভু বড় খুসী হইলেন।

দুই মাস চৈতন্য বারাণসীতে অবস্থান করেন। এই অবসরে সনাতনকে তাঁহার নবপ্রবর্ত্তিত ব্রজরস সাধনায় ব্রতী করিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের ভাবী শাস্ত্রকারের প্রস্তুতি শুরু হইল।

সাধক সনাতন দৈন্য ও বৈরাগ্যের মূর্ত্ত বিগ্রহ। গৌড়ের বাদশাহের প্রধান সচিব আজ কান্থা-করঙ্গধারী, রাজৈশ্বর্য্য ছাড়িয়া এক মুষ্টি অন্নের জন্য নগরের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। যে এ দৃশ্য দেখে, বিস্মিত হইয়া যায়।

চৈতন্যের প্রেমভক্তির প্রচার কাশীতে এবার কিছুটা শুরু হয়। প্রথমটায় বৈদান্তিক সন্ন্যাসী ও পণ্ডিতেরা তাঁহাকে ধরিয়া নেন এক ভাবুক সাধকরূপে। তাঁহার ভাবাদর্শ ও সাধনপদ্ধতিকেও ইঁহারা তেমন সুচক্ষে দেখেন নাই। পরে প্রভুকে ঘনিষ্ঠভাবে দেখিয়া, ভক্তদের ভক্তি ও বৈরাগ্য দেখিয়া সকলে সশ্রদ্ধ হইয়া উঠিলেন।

কাশীতে অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী প্রবোধানন্দের তখন বড় প্রতাপ। বহু গণ্যমান্য লোক তাঁহার শিষ্য। আশ্রমে সর্ব্বদা বেদবেদান্তের শিক্ষার্থীর ভীড়। চৈতন্যের কথা প্রবোধানন্দ শুনিয়াছেন, কিন্তু গুরুত্ব তেমন কিছু দেন নাই। বরং নিজের সভায় একদিন তাঁহার সম্বন্ধে নানা ঠাট্টা-বিদ্রূপই তিনি করিলেন।

সেদিন বিন্দুমাধব দর্শন করিয়া প্রভু এক মহারাষ্ট্রীয় ভক্তের গৃহে ভিক্ষা গ্রহণে আসিয়াছেন। শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিয়া তিনি মহা পুলকিত। সঙ্গীগণসহ উৎসাহে ও আনন্দে নামকীর্ত্তনে মত্ত হইলেন, প্রেমভক্তির রসতরঙ্গ উথলিয়া উঠিল। জনসমাগমও কম হইল না। প্রবোধানন্দ কয়েকটি শিষ্যসহ এদিক দিয়া যাইতেছিলেন, কীর্ত্তনের মধুর স্বর তাঁহাকে টানিয়া আনিল।

নৃত্য ও কীর্ত্তন করিতে করিতে চৈতন্য প্রেমাবিষ্ট হইয়া ভূমিতলে পড়িয়া গেলেন। অশ্রুকম্পপুলকাদি সাত্ত্বিক বিকারের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল সারা দেহে। তারপর ধীরে ধীরে একেবারে সম্বিৎহারা হইয়া পড়িলেন। জীবনের কোন লক্ষণই নাই। প্রবোধানন্দ তো এ দৃশ্য দেখিয়া স্তম্ভিত!

বিচার-নিপুণ, মায়াবাদী আচার্য্য প্রবোধানন্দ। কিন্তু একি অদ্ভুত ব্যাপার! এই তরুণ সন্ন্যাসীর দেবদুর্লভ রূপ আর প্রেমার্ত্তি আজ তাঁহাকে কোন্ যাদুমন্ত্রে বশ করিয়া ফেলিয়াছে? বিদ্যা, প্রতিভা ও আত্মবিশ্বাস আচার্য্যের অসামান্য। কিন্তু সব কিছুই যে এই মহাপ্রেমিক সন্ন্যাসীকে দর্শনের পর একাকার হইয়া গেল।

প্রভু ক্রমে বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া পাইলেন। এবার শুরু হইল তাঁহার কৃষ্ণবিরহের বিলাপ ও কান্না। একান্না যেমন আবেগময়—তেমনি মর্ম্মন্তুদ। শুষ্ক, জ্ঞানমার্গীয় সন্ন্যাসীর হৃদয়কে ইহা মথিত করিয়া ফেলিল। নয়ন দুইটি বারবার অকারণে হইয়া উঠিতেছে অশ্রুসজল। নিজের অজ্ঞাতসারে চৈতন্যের প্রেমে তিনি বাঁধা পড়িয়া গেলেন।

কিছুক্ষণ পর বাহ্যজ্ঞান পাইয়া প্রভু এদিক-ওদিক চাহিতেছেন। প্রবীণ বৈদান্তিকের দৃষ্টি পড়ামাত্র সসম্ভ্রমে তাঁহাকে তিনি প্রণাম নিবেদন করিলেন।

প্রবোধানন্দ শিহরিয়া উঠিলেন। ভাবিলেন, সে কি কথা! এমন প্রেমসিদ্ধ মহাপুরুষের প্রণাম নেওয়া যে মহা-অপরাধ! তাড়াতাড়ি তখনি তাঁহার চরণধূলি গ্রহণ করিলেন!

প্রভু করজোড়ে কহিলেন, "যতিবর, এ আপনি কি কচ্ছেন? জগৎ-গুরুর মত আপনার মর্য্যাদা, আর আমি আপনার শিষ্যের শিষ্য হবার যোগ্য। আমায় প্রণাম করে অপরাধী করবেন না।"

প্রবোধানন্দ এবার দৈন্যভরে উত্তর দিলেন, "না জেনে আপনাকে কত উপহাস করেছি, নিন্দাবাদও কম করিনি। পদধূলি নিচ্ছি সেই সব দোষ স্খালনের জন্য।"

এবার শুরু হয় উভয়ের ধর্ম্মালাপ। আগে হইতেই প্রভুর অলৌকিক শক্তিপ্রভাবে প্রবোধানন্দ পর্য্যুদস্ত হইয়া আছেন, প্রভুর ভাবময় ব্যাক্তিত্বের স্পর্শ করিয়াছে তাঁহাকে সম্মোহিত। এবার তাঁহার শ্রীমুখে ব্যাস-সূত্রের ভক্তিব্যাখ্যা শুনিয়া প্রেমবিহ্বল হইয়া পড়িলেন। কোন্ মহাভাবের স্ফুরণ চৈতন্যের মধ্যে তিনি দেখিলেন তাহা তিনিই জানেন, অবিলম্বে করিলেন আত্মসমর্পণ !

প্রভুর কৃপায় মহাপ্রেমিক সন্ন্যাসীরূপে প্রবোধানন্দের রূপান্তর ঘটে। তাঁহার এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ভক্তদের প্রভাবে কাশীতে এ সময়ে প্রেম-ভক্তি-ধর্ম্ম কিছুটা ছড়াইয়া পড়ে।

চৈতন্য এবার নীলাচলে ফিরিয়া আসিলেন, ভক্ত অনুরাগীদের মধ্যে আনন্দ কলরব পড়িয়া গেল। এখন হইতে জগন্নাথধামে তিনি একাদিক্রমে অবস্থান করেন আঠার বৎসর।

উত্তর ও দক্ষিণ-ভারতের ধর্ম্ম-সংস্কৃতির মিলনভূমি এই সাগরচুম্বিত অঞ্চল। দারুব্রহ্ম শ্রীপুরুষোত্তম এখানে যুগযুগান্ত ধরিয়া অধিষ্ঠিত। এই পৌরাণিক মহাধামে বসিয়া প্রভু এবার ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট লীলা উদ্‌ঘাটিত করিলেন। শ্রীক্ষেত্রের বুকে শুরু হইল তাঁহার প্রেমধর্ম্মের রস-বর্ষণ।

অধ্যাত্ম-ভারতের বিস্মিত দৃষ্টি নৃত্য-কীর্ত্তনপর এই যুগপুরুষের উপর পতিত হইল, আর নীলাচলে তিনি পরিচিত হইয়া উঠিলেন সচল জগন্নাথরূপে। অন্তরঙ্গ ভক্তজনের প্রভু এইবার হইলেন লক্ষ লক্ষ মানবের আরাধ্য—মহাপ্রভু।

মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর অগণিত তীর্থকামী মানুষের স্রোত জগন্নাথ মন্দিরের সিংহদ্বার দিয়া চলিয়া যায়। দূর দূরান্ত হইতে আগত পুণ্যার্থী নরনারীর দল অচল আর সচল—দুই জগন্নাথই দেখিয়া তৃপ্ত হইয়া ঘরে ফিরে।

প্রভু চৈতন্যের নর্ত্তন-কীর্ত্তনের মাধুর্য্য দেখিয়া দর্শনার্থীরা আনন্দ-চঞ্চল হয়, অষ্টসাত্ত্বিক প্রেমবিকার দেখিয়া বিস্ময় তাহাদের চরমে উঠে।

কৃষ্ণপ্রেমের একি আর্ত্তি, একি বিরহ-দহন এই মহামানবের মধ্যে! এ প্রেমের অদ্ভুত সংক্রমণ ছড়াইয়া পড়ে দিকদিগন্তে।

প্রভুর এক একটি পরিকর তাঁহার প্রেমসাম্রাজ্যের এক একটি দিক্‌পাল। ভক্তি ও প্রেমের আলোকে' ত্যাগ বৈরাগ্যের অপরূপ মহিমায় ইঁহারা সমুজ্জ্বল। এই বৈষ্ণব সাধকদের বৈরাগ্যময় আচার আচরণ ও জীবন সাধনার প্রভাব সেদিন চারিদিকের মানুষের উপর সাড়া সমাজের উপর বিস্তারিত হইতে থাকে।

নামপ্রেম-সর্ব্বস্ব প্রাচীন ভক্ত হরিদাস বাস করেন নগরীর এক প্রান্তে। দৈন্যের মূর্ত্ত বিগ্রহ তিনি। প্রভু ও ভক্তগণ তাঁহাকে মহাবৈষ্ণব মনে করিলে কি হয়, মুসলমানকুলে জন্ম বলিয়া স্বেচ্ছায় কখনো তিনি জগন্নাথ-মন্দিরের দিকে অগ্রসর হন না, পাছে স্পর্শদোষ কাহারো গায়ে লাগে। কৃষ্ণনাম-রসে আর কৃষ্ণভাবনায় তিনি সদা বিভোর। রোজ তিন লক্ষ নামজপ সমাপ্ত করেন, আর দূর হইতে মন্দিরের চূড়ায় দিকে চাহিয়া নিবেদন করেন সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত। প্রভু রোজই জগন্নাথের উপলভোগ দর্শনের পর হরিদাসের তত্ত্ব নিতে আসেন। পরম ভক্তের সম্মুখে বসিয়া সানন্দে করেন ইষ্টগোষ্ঠী।

সেবার রূপ নীলাচলে আসিয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছা, প্রভুর সান্নিধ্যে কয়েকটা দিন কাটাইয়া যাইবেন। মুসলমান বাদশাহের সচিব ছিলেন এতকাল, দরবারে ভিন্ন ধর্ম্মীয়দের সাথে অন্তরঙ্গতার সহিত কাটাইতে হইয়াছে। তাই বৈষ্ণবীয় দৈন্যে নিজেকে মনে করেন অস্পৃশ্য। দীনভক্ত হরিদাসের কুটিরই হয় তাঁহার বাসস্থান।

প্রতিভাধর কবি, রূপ রাধাকৃষ্ণ লীলা-নাট্য লিখিতেছেন। প্রভুর তাহাতে মহা উৎসাহ। স্বরূপ, রামানন্দ প্রভৃতি ভক্তসহ রোজ রূপের কাব্যরস তিনি আস্বাদন করেন। প্রেমানন্দ উচ্ছলিত হইয়া উঠে। প্রভুর প্রেরণায় ও শক্তি সঞ্চারণে রূপ রূপান্তরিত হন লীলারসতত্ত্বের এক

প্রধান সংবাহকরূপে। কয়েক মাস পরে প্রভুর আদেশে তিনি বৃন্দাবনে গিয়া স্থায়ীভাবে বাস করিতে থাকেন।

ইহার পর সনাতন উপনীত হন প্রভুর চরণ দর্শনের জন্য। ঝারিখণ্ডের বন পথ দিয়া তিনি আসিয়াছেন, সেখানকার দূষিত জল পান করিয়া দেহে দেখা দিয়াছে দুরারোগ্য চর্ম্মরোগ।

হরিদাসের কুটিরেই সনাতন অবস্থান করিতেছেন। প্রভু প্রতিদিন মন্দির হইতে ফিরিবার পথে তাঁহাকে ও হরিদাসকে দেখিতে আসেন। কাছে আসিলেই, পরমানন্দে সনাতনকে আলিঙ্গন না দিলে তাঁহার তৃপ্ত হয় না। কণ্ডুর ক্লেদ ও পুঁয তাঁহার গায়ে রোজই লাগিয়া যায়। কিন্তু সে দিকে ভ্রুক্ষেপ কই?

সনাতন কিন্তু মরমে মরিয়া যান। প্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে আসিলেই পিছু হটিয়া গিয়া কেবলই বলিতে থাকেন, "প্রভু পায়ে পড়ি, আমায় ছোঁবেন না, ছোঁবেন না। এমনিতেই অস্পৃশ্য আমি। তার ওপর হয়েছে জঘন্য চর্ম্মরোগ। আপনার দেবদুর্লভ দেহে এর ক্লেদ লাগে, তা আমার সহ্য হয় না।"

কিন্তু প্রভুকে নিরস্ত করে কাহার সাধ্য? সবলে প্রিয় ভক্তকে বুকে টানিয়া নেন। হাসিতে হাসিতে বলেন, "সনাতন, তুমি পরম-ত্যাগী মহাবৈষ্ণব, আমি যে তোমার দেহ স্পর্শ করতে আসি নিজে পবিত্র হবার জন্যে।"

বড় কঠিন সমস্যা সনাতনের। চৈতন্য তাঁহাকে নীলাচল ছাড়িয়া যাইতে দিবেন না, আবার আলিঙ্গনও রোজ তাঁহার করা চাই। ফলে শ্রীঅঙ্গ ক্লেদাক্ত হয়। এ বড় দুঃসহ। সনাতন মনে মনে স্থির করিলেন, তাঁহার যে ঘৃণ্য দেহ দিয়া প্রভুর পবিত্র দেহ কলুষিত হইতেছে, তাহাই এবার শেষ করিবেন। সম্মুখে রথযাত্রার উৎসব। সে সময়ে রথচক্র তলে প্রাণ বিসর্জ্জন দিবেন।

প্রভু সর্ব্বজ্ঞ। বলা বাহুল্য, তাঁহার কাছে ভক্ত সনাতনের এ গোপন

বাৎসল্যভাব! ধৈর্য্যের সহিত বহু পরিশ্রমে তিনি শত শত উপাদেয় খাদ্য তৈরী করেন। নানা রকমের শুষ্ক দ্রব্য ঘৃত ও চিনির পাকে ফেলিয়া এ সব প্রস্তুত হয়। প্রভু যাহাতে নীলাচলে বসিয়া মাসের পর মাস এগুলি ভোজন করিতে পারেন, সেজন্য স্ত্রী ভক্তমের যত্ন, শ্রম ও কৌশলের অবধি নাই।

নীলাচলের মন্দির আর বিগ্রহকে কেন্দ্র করিয়া উৎসব প্রায় প্রতিদিন লাগিয়াই আছে। এসব উৎসবে প্রভুর লীলারঙ্গ হয় অফুরন্ত, ভক্তদেরও তেমনি আনন্দের অবধি থাকে না। নানারূপে, নানাভাবে, নানারসে তাঁহারা প্রভুর মোহনমূর্ত্তি দেখেন, আত্মহারা হন।

জগন্নাথের গুণ্ডিচাবাড়ী মার্জ্জন চৈতন্যের এক অপরূপ সেবালীলা। পুরীর রাজার কাছে এ কার্য্যভার তিনি মাগিয়া নিয়াছেন। প্রতি রথযাত্রার আগে নিজে সম্মার্জ্জনী হস্তে এই দেবস্থান পরিষ্কার করিতে অগ্রসর হন। শত শত ভক্ত জলের ভাঁড় ও ঝাঁটা হস্তে তাঁহার সঙ্গে এই মার্জ্জন-কর্ম্মে লাগিয়া যায়। প্রভুর নৃত্য কীর্ত্তনে এ অনুষ্ঠান রূপায়িত হইয়া উঠে মনোজ্ঞ উৎসবে।

রথযাত্রার দিনে দেখা যায় চৈতন্যের দিব্য ভাবাবেশ। চারিদিকে লক্ষ লক্ষ লোকের ভীড়। রমণীয় বেশ-ভূষা ও আভরণে ভূষিত হইয়া শ্রীজগন্নাথ রথে উপবিষ্ট আর উৎকলরাজ প্রতাপরুদ্র সম্মার্জ্জনী হস্তে পথ পরিষ্কার করিতে করিতে চলিয়াছেন। কিন্তু প্রভু শ্রীচৈতন্য হইতেছেন এ বিরাট উৎসবের মধ্যমণি। কীর্ত্তনানন্দে তিনি মাতোয়ারা। মহাভাবে প্রমত্ত হইয়া রথাগ্রে নৃত্য করিয়া চলিয়াছেন। দীর্ঘ সুন্দর সুঠাম দেহটি তরঙ্গায়িত হইতেছে। কনকদণ্ডের মত ভূজদ্বয় উর্দ্ধে প্রসারিত। দুই নয়নে বহিতেছে অশ্রুর প্লাবন। এ অপরূপ দৃশ্য দেখিয়া জনতার উল্লাসের অবধি নাই। শুধু এই উৎসবক্ষেত্রে নয়, সমগ্র শ্রীক্ষেত্র এইদিনে প্রভুর নর্ত্তনে ও আনন্দাবেশে প্রাণচঞ্চল হইয়া উঠে। রথারূঢ় দারু ব্রহ্মও যেন সর্ব্বসমক্ষে হইয়া উঠেন চৈতন্যময়।

প্রতিবৎসরই রথযাত্রার সময় প্রভুকে কেন্দ্র করিয়া বাংলা, উড়িষ্যা

ও অন্যান্য স্থানের ভক্ত ও অনুরাগীদের মিলন ঘটে! ভক্তজন-হৃদয়ের এ মহাসঙ্গমে স্বর্গীয় আনন্দের তরঙ্গ খেলিয়া যায়। তারপর পুলকাঞ্চিত দেহে, অশ্রুসজল নয়নে প্রভুর পুণ্যমধুর স্মৃতি বক্ষে নিয়া আবার তাহারা স্বদেশে প্রত্যাগমন করে।

কৃষ্ণকথা ও প্রেমাবেশে প্রভু সদা বিভোর থাকেন। কিন্তু তাঁহার নিত্যকার দিনচর্য্যায় কোন ফাঁক পড়ার উপায় নাই। প্রত্যুষে ভজন ও কীর্ত্তনের পর জগন্নাথ দর্শনে যান। তারপর প্রিয় ভক্ত হরিদাসের কুটিরে আসিয়া করেন ইষ্টগোষ্ঠী। সাঙ্গোপাঙ্গসহ কোনদিন সমুদ্রে, কোনদিন বা ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে জলকেলি করিয়া কুটিরে ফিরেন।

পুরীর একপ্রান্তে টোটা-গোপীনাথে প্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ গদাধরের ভজন স্থান। এই প্রেমিক ভক্তের সেবানিষ্ঠার ফলে গোপীনাথ বিগ্রহ সেখানে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছেন। গদাধরের ভাগবত পাঠও বড় মধুর। ভক্তদলসহ প্রতিদিন তাই প্রভু উপস্থিত হন, কৃষ্ণকথার রসস্রোত সেখানে বাহিয়া যায়।

প্রতি রজনীতে জগন্নাথ-মন্দিরের আরতি দর্শনের পর নয়নজলে বুক ভাসাইরা চৈতন্য ঘরে ফিরেন। স্বরূপ দামোদর, রামানন্দ ও অন্যান্য অন্তরঙ্গ ভক্তেরা সাগ্রহে আসিয়া জুটেন। কীর্ত্তন, শ্লোকপাঠ ও রসতত্ত্বের বিচার শুরু হয়। রাধাকৃষ্ণ-লীলা স্মরণে প্রেমানন্দ উথলিয়া উঠে।

মধুর ভজন, রাগানুগা ভজনের আদর্শ চৈতন্য প্রচার করেন, আর এ প্রচার তিনি করেন নিজ জীবনলীলারই মাধ্যমে। গুটিকয়েক শ্লোক রচনা ছাড়া কোন ধর্ম্মগ্রন্থ তিনি রচনা করেন নাই। উপদেশ দানেও তেমন উৎসাহী কখনো ছিলেন না। এমন কি একটি ভক্তকেও তিনি মন্ত্রদীক্ষা দান করেন নাই। তবুও শত সহস্র মানুষ তাঁহার দিকে কি এক অজ্ঞাত আকর্ষণে ছুটিয়াছে—সান্নিধ্যে আসিয়া, তাঁহার স্পর্শ পাইয়া পরিণত হইয়াছে একেবারে নূতন মানুষে। ফলে গড়িয়া

উঠিয়াছে প্রেমধর্ম্মের সংবাহক এক বিরাট ভাগবতগোষ্ঠী! এ দেশের ধর্ম্ম, সমাজ ও সাহিত্যের উপর তাঁহার এবং তাঁহার পার্ষদদের প্রভাব হইয়াছে সুদূরপ্রসারী।

নিজ জীবন ও বাণীর মধ্য দিয়া প্রভু এক অপূর্ব্ব ভজনাদর্শ স্থাপন করেন। আনন্দঘন, রসঘন পরমতত্ত্বের যে কথা শ্রুতিতে আছে, সে তত্ত্ব, সে মাধুর্য্যের ধারা ছড়াইয়া দেন তিনি দেশের জনজীবনের ক্ষেত্রে। তাঁহার লৌকিক ও অলৌকিক জীবনে প্রতিফলিত হইয়া প্রেমধর্ম্ম হয় প্রাণবন্ত, বহুবিস্তৃত।

প্রভু কহেন,—'মাধুর্য্য ভগবত্তা-সার'। শ্রীভগবান অনন্ত ঐশ্বর্য্যের অধিপতি বটে, কিন্তু এ ঐশ্বর্য্য তাঁহার মাধুর্য্যের অনুগত।

জীবের কাছে তাঁহার বাণী এক পরম আশ্বাস নিয়া উপস্থিত হয়। এ বাণী ঘোষণা করে—ভগবান শাস্তিদাতা নন, তাঁহাকে ভয় করিবার কিছুই নাই, তিনি পরম করুণ, পরম প্রেমিক। তাঁহার নাম স্মরণ তো দূরের কথা, তাঁহার নামাভাসেই পাপতাপ দূরে যায়। মায়াবদ্ধ জীবের উদ্ধার সাধন করা যে ভগবানেরই নিজ কাজ। এজন্য তিনি নিজেই সদা উৎকণ্ঠিত, কারণ 'লোক নিস্তারিব এই ঈশ্বর স্বভাব'।

প্রভুর মতে—জীব ভগবানের নিত্যদাস, ভগবানের সহিত তাহার নিত্য সম্বন্ধ, আর এই সম্বন্ধেরই মধ্য দিয়া সে ভগবানের স্বরূপ ও মাধুর্য্যের আস্বাদন পাইতে পারে।

নামকীর্ত্তন, বিগ্রহ-সেবা, আর নিরন্তর ব্রজধামের রাধাকৃষ্ণ লীলা স্মরণ মনন—এই সাধনকর্ম্মের মধ্য দিয়া তাঁহার এই নবপ্রচারিত মধুর ভজনের ভিত্তি প্রস্তুত হইল।

চৈতন্যের প্রেম-ভক্তির ধর্ম্ম জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সকলকেই ধর্ম্ম-আচরণে আহ্বান জানাইয়াছে—

নীচ জাতি নহে কৃষ্ণ-ভজনে অযোগ্য।
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য॥

যেই ভজে সেই বড়, অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণ ভজনে নাহি জাতি-কুলাদি বিচার॥

চৈঃ-চঃ

এই তো গেল ভক্তিসাধনার অধিকারীদের সম্বন্ধে তাঁহার উদারতার কথা। সাধনার নির্দ্দেশদাতা গুরুর বেলায়ও প্রভুর মন কম সংস্কার-মুক্ত নয়। তিনি প্রচার করিয়াছেন—

কিবা শূদ্র, কিবা বিপ্র ন্যাসী কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণবেত্তা, সেই গুরু হয়।

তাই প্রভুর ভাগবতগোষ্ঠীতে নরহরি সরকার বৈদ্যবংশীয় হইয়াও এক পরম শ্রদ্ধেয় আচার্য্যরূপে সম্ম নিত। হরিদাস যবনকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও সর্ব্ব বৈষ্ণবের প্রণম্য, প্রভুর নাম প্রচারের মহান্ ব্রতে তিনি অগ্রগণ্য। শুধু তাহাই নয়, শূদ্র রামানন্দ রায়ের মুখ দিয়াই প্রভু নিজে তাঁহার গূঢ় তত্ত্বকথা প্রকাশ করিয়াছেন। সমসাময়িক কালের ধর্ম্ম, সংস্কৃতি ও সমাজের উপর তাঁহার এ উদার নীতির প্রভাব দ্রুত বিস্তারিত হইতে থাকে।

চৈতন্যের প্রদর্শিত ভজনপদ্ধতির অভিনবত্ব বড় কম নয়। আবার এ ভজন যেমন আকর্ষণীয় তেমনি সহজসাধ্য। দেশকালপাত্র-নির্ব্বিশেষে সকলে ইহা গ্রহণ করিতে পারে। বিগ্রহসেবা ও ভক্তি-অঙ্গের যেসব অনুষ্ঠান এ পন্থায় করিতে হয় তাহার ফলে কৃষ্ণপ্রেমের উন্মেষ ক্রমে ক্রমে ঘটিতে থাকে। নামে রুচি আর কৃষ্ণপ্রেম সাধকজীবনে বৃদ্ধি পায় সঙ্গে সঙ্গে বিষয়বাসনা এবং সর্ব্ব আকর্ষণ জীর্ণ বৃক্ষবল্কলের মত খসিয়া ঝরিয়া পড়ে।

কৃষ্ণপ্রেম লাভের সহজ ও স্বচ্ছন্দ পথটির কথা চৈতন্য নিজেই বলিয়া গিয়াছেন—

যেরূপে করিলে নাম প্রেম উপজায়।
তাহার লক্ষণ শুন স্বরূপ রামরায়॥

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মাদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥

—চৈ-চঃ

এ প্রেমধর্ম্মের নিগূঢ় ও সদা-অনুষ্ঠেয় ভজনাঙ্গ হইতেছে অষ্টকালীন লীলা স্মরণ। এ লীলা রসময় বিগ্রহ, ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণের লীলা। ভাগবতী-লীলা তিনি বিস্তারিত করিয়া গিয়াছেন নর-বপুর মাধ্যমে, যেমন তাঁহার সর্ব্বাতিশায়ী মাধুর্য্য, তেমনি তাঁহার অপার রস-বৈচিত্র্য। সাধকজনের চিত্ত অতি সহজেই এ মাধুর্য্য ও এ রসের প্রতি আকৃষ্ট হয়, অষ্টপ্রহর কৃষ্ণের নানা আচরণ ও লীলারঙ্গের স্মরণ মননে তিনি ব্যগ্র হইয়া পড়েন। এ ব্যগ্রতা তাঁহার নিজের আচার-আচরণ বা নিজের ঘর-সংসারের জন্য নয়—কৃষ্ণের লীলা, কৃষ্ণের সংসারই তাঁহাকে ব্যাকুল করে। ক্রমে তিনি ডুবিয়া যান কৃষ্ণ-প্রেমরসের সাগরে।

প্রভুর এ ভজন-পন্থার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য—ভক্ত ও ভগবানের পারস্পরিক সম্পর্কটি। 'আমি ভগবানের', এ ভাব নিয়া এ মধুর সাধন করা হয় না। এ সাধনে রহিয়াছে, 'ভগবান আমার'—এই ভাব। 'নব কিশোর নটবর শ্রীকৃষ্ণ ইষ্টরূপে এখানে সংস্থাপিত, আর জীবের কাজ তাঁহার আনন্দ বর্দ্ধন করা, লীলাসুখ উৎপাদন করা। তাই মধুর ভজনের সাধকের কাছে 'তিনি আমার' এই কথাটিই বড়। ভগবানের প্রীতি-বিধান করার ভেতরই রহিয়াছে ভক্তের সবচেয়ে বড় কর্ত্তব্য, বড় সাধনা! এই মদীয়তা-ভাবকেই প্রভু করিলেন তাঁহার সাধনার ভিত্তি।

ভক্তপ্রবর রঘুনাথ দাস সে-বার প্রভুর চরণে আশ্রয় নিতে নীলাচলে আসিয়াছেন। সপ্তগ্রামের অধিকারীরা তখন বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ জমিদার। ধনাঢ্য ও প্রতিপত্তিশালী বলিয়া ইঁহাদের বিরাট খ্যাতি। রঘুনাথ এ বংশের একমাত্র উত্তরাধিকারী। কিন্তু তরুণ বয়সেই তাঁহার বিষয়বিরক্তি দেখা দিয়াছে। ইতিপূর্ব্বেই তিনি শ্রীচৈতন্যের শরণ নিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু প্রভু তখন তাঁহার আবেদন গ্রাহ্য করেন নাই।

কিছুদিন আগে নিত্যানন্দের করুণা রঘুনাথের ভাগ্যে মিলিয়াছে। এবার বিপুল বিত্তবিষয় ও সুন্দরী তরুণী ভার্য্যা ত্যাগ করিয়া তিনি বৈরাগ্যময় সাধনার পথে পা বাড়াইয়াছেন।

নীলাচলে চৈতন্য একদিন ভক্তদের সঙ্গে ইষ্টগোষ্ঠী করিতেছেন, রঘুনাথ আসিয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। নিজের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরিকরকে চিনিয়া নিতে প্রভুর দেরী হইল না। স্বরূপ দামোদরকে ডাকিয়া তখনই নবাগত ভক্তের সমস্ত ভার অর্পণ করিলেন। তাছাড়া, ভৃত্য গোবিন্দকে বলিয়া দিলেন, রঘুনাথকে যেন তাঁহার প্রসাদান্ন রোজ দেওয়া হয়।

কয়েকদিন অতিবাহিত হইল। ভক্তপ্রবর রঘুনাথের অন্তরে তখন বৈরাগ্যের তীব্র আগুন জ্বলিতেছে। ভাবিলেন, এভাবে প্রভুর প্রসাদান্ন খাইয়া আরামে জীবন ধারণ করা আর নয়, এবার হইতে মন্দিরের সিংহদ্বারে দাঁড়াইয়া ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করিবেন।

উপর্য্যুপরি কয়েকদিন রঘুনাথকে প্রভু প্রসাদ ভোজন করিতে দেখেন নাই। সেদিন গোবিন্দকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

গোবিন্দ উত্তর দিল, "প্রভু, আমি তো রঘুনাথকে তোমার থালার ভোজনাবশেষ বারবারই দিতে চেয়েছি। কিন্তু তিনি স্থির করে বসেছেন, দীন দরিদ্র বৈষ্ণবের মত ভিক্ষে করেই খাবেন, আর এ ভিক্ষে তিনি সংগ্রহ করবেন সিংদ্বার থেকে। খোঁজ নিয়ে জেনেছি, গভীর রাতে জগন্নাথের সেবার শেষে গৃহস্থেরা যখন ঘরে ফিরে যায়, রঘুনাথ একপাশে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে থাকেন। কেউ কেউ দোকানীদের থেকে অন্ন কিনে তাঁকে দেয়। এভাবেই আজকাল তাঁর দিন চলেছে।"

মনে মনে প্রভু বড় খুসী হইলেন। তখনকার দিনের বারলক্ষ টাকা আয়ের জমিদারীর একমাত্র উত্তরাধিকারী এই রঘুনাথ। সমগ্র গৌড় দেশে ধনে-মানে তাঁহার তুলনা নাই। সিংহদ্বারে আপামর জনসাধারণের কাছে ভিক্ষার জন্য দাঁড়ানো তাঁহার মত লোকের পক্ষে কম কথা নয়। এ তাঁহার তীব্র বৈরাগ্য ও অভিমান-শূন্যতারই নিদর্শন।

প্রভু এ সময়ে বৈরাগ্যের প্রশস্তি জানাইয়া যে কথাগুলি কহিলেন, তাহা শুধু বৈষ্ণবদের কাছেই নয়, সর্ব্বকালের সর্ব্বসাধকদের কাছে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে—

বৈরাগী করিবে সদা নাম-সংকীর্ত্তন।
মাগিয়া খাইয়া করে জীবন রক্ষণ ॥
বৈরাগী হইয়া যেবা করে পরাপেক্ষা।
কার্য্যসিদ্ধ নহে, কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা ॥
বৈরাগী হঞা করে জিহ্বার লালস।
পরমার্থ যায় আর রসে হয় বশ ॥
বৈরাগীর কৃত্য সদা নাম-সংকীর্ত্তন।
শাক-পত্র-ফল-মূলে উদর ভরণ ॥
জিহ্বার লালসে যেই ইতি উতি চায়।
শিশ্নোদরপরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায় ॥

—চৈ-চঃ

ভক্ত রঘুনাথদাসের এই কৃচ্ছ্রব্রত, এই ভিক্ষাবৃত্তির কথা সপ্তগ্রামে গিয়া পৌঁছিল। পিতা গোবর্দ্ধনদাস এ সংবাদ পাইয়া মরমে মরিয়া গেলেন। ভাবিলেন, একি পাগলামি রঘুনাথ করিতেছে? এ উঞ্ছবৃত্তি না করিলে কি সাধনভজন হয় না? পুত্রের জন্য অবিলম্বে তিনি চারিশত মুদ্রা ও একটি পাচক ব্রাহ্মণ পাঠাইয়া দিলেন।

রঘুনাথ কিন্তু মহাসঙ্কটে পড়িয়া গেলেন। চিরতরে গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন, বৈরাগ্যসাধনের দ্বারা মুক্তি লাভ করিবেন ইহাই তাঁহার পণ। তাই এ টাকা তাঁহার নিজ কার্য্যে ব্যয় করার তো উপায় নাই! আবার ভাবিলেন, নীলাচলের অনেক ভক্তই তো মাঝে মাঝে প্রভুকে যত্ন করিয়া ভোজন করায়, কৃতার্থ বোধ করে। তিনিও বরং তাহাই করিবেন। এই অর্থ প্রভুর সেবায়ই নিয়োজিত হইবে।

রঘুনাথের ভজন-কুটিরে মাঝে মাঝেই প্রভুর নিমন্ত্রণ চলিতেছে। হঠাৎ একদিন কিন্তু তাঁহার মনে এক ধাক্কা লাগিল। ভাবিলেন, 'ছি-ছি

—এ আমি কি করছি ? বিষয়ীর অর্থে ক্রয় করা যে অন্ন, তাই আমার প্রভুকে নিবেদন করছি। না—আর তো এ কাজ করা হবে না।'

রঘুনাথের নিমন্ত্রণ আজকাল আর হয় না। প্রভু সব কথাই জানেন, তবুও অজ্ঞতার ভান করিয়া স্বরূপকে সেদিন প্রশ্ন করিলেন, "আচ্ছা স্বরূপ, ব্যাপার কি বল তো ? রঘুনাথ তার ওখানে আমায় আর ভিক্ষা গ্রহণে ডাকছে না কেন ?"

স্বরূপ উত্তরে রঘুনাথের মনোভাব জানাইলেন।

প্রভু উৎসাহভরে কহিয়া উঠিলেন, "স্বরূপ, রঘুনাথ তো বড় ভাল কাজ করেছে। সত্যই তো। বিষয়ীর অন্ন খেলে যে মন মলিন হয়। আর, মন মলিন হলে কৃষ্ণের স্মরণও সঙ্গে সঙ্গে কঠিন হয়ে পড়ে। তাছাড়া, বিষয়ীর অন্নের আরও একটা বড় ত্রুটি আছে। রাজসিকতা থাকে এতে জড়িত। তাই দাতা আর ভোক্তা দু'য়েরই মন এতে মলিন না হয়ে পারে না। রঘুনাথ মনে ব্যথা পাবে বলে আমি এতদিন তার এ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে আসছি। ভালই হয়েছে, এবার নিজেই সব কিছু জেনে সে এটা ত্যাগ করলো।"

ইহার পর রঘুনাথ সিংহদ্বারে ভিক্ষা করাও ছাড়িয়া দিলেন। প্রভুর সদাসতর্ক দৃষ্টি কিন্তু তাঁহার উপর নিবদ্ধই রহিয়াছে। কোন কিছু তাঁহার অজানা নয়, তবুও সেদিন কহিতে লাগিলেন, "ভালো কথা, শুনছি রঘুনাথ সিংহদ্বারেও আজকাল আর ভিক্ষা নিতে যায় না। তবে আহারের যোগাড় করছে কোথায় গিয়ে ?"

স্বরূপ দামোদর জানাইলেন, "প্রভু, সে এখন থেকে ছত্রে গিয়ে ভিক্ষুকদের সঙ্গে বসে অন্ন গ্রহণ করছে।"

গম্ভীর কণ্ঠে চৈতন্য উত্তর দিলেন, "ভালই করেছে। ভিক্ষে যদি করতেই হয় এক কোণে বসে করাই ভাল। সিংহদ্বারে ভিক্ষার জন্য দাঁড়িয়ে থাকা, সে যে বেশ্যাবৃত্তিরই মত। ওরকম জনবহুল স্থানে দাঁড়িয়ে দাতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা তো ভালো নয়।"

রঘুনাথের ত্যাগ বৈরাগ্য ও সাধন-নিষ্ঠা দেখিয়া প্রভুর বড় আনন্দ। বৃন্দাবন হইতে আনীত গুঞ্জামালা ও গোবর্দ্ধন শিলা দান করিয়া তিনি তাঁহাকে সম্বর্দ্ধিত করিলেন। নবভক্ত রঘুনাথের উৎসাহ ও আনন্দের সীমা রহিল না।

হৃদয়ে তাঁহার সদাই জাগে এক ভাবনা। বিষয়-কূপে এতকাল অতিবাহিত করিয়া আসিয়াছেন, বাসনার পঙ্ক ছড়ানো ছিল তাঁহার সারা দেহে মনে। চরম দৈন্য ও কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্য দিয়া সে মালিন্যের শেষ চিহ্নটুকু তিনি মুছিয়া ফেলিতে চান। ধ্যান, ভজন ও লীলাস্মরণে কোথা দিয়া দিন রাত চলিয়া যায়, হুঁস থাকে না।

এখন হইতে যেভাবে তিনি উদরপূর্ত্তি করিতে থাকেন তাহা বড় বিস্ময়কর। জগন্নাথমন্দিরের কোণে বহু পসারি প্রসাদান্ন বিক্রয় করে। রোজই সবটা বিক্রয় হয় না, ঝাঁট দিয়া এগুলি তাহারা তেলেঙ্গা গাভীদলের সামনে রাস্তায় ফেলিয়া দেয়। ঐ গাভীদের খাওয়া হইয়া গেলে অবশিষ্ট অন্নকণিকা রঘুনাথ বস্ত্রখণ্ডে বাঁধিয়া আনেন। এক একটি করিয়া দানা ধুইয়া নেন। তারপর গভীর রাত্রে ভজন কুটিরে ইহাই হয় তাহার সারা দিনরাতের আহার।

স্বরূপ ও গোবিন্দের মুখে চৈতন্য রঘুনাথের এ আহার-কৃচ্ছ্রের কথা শুনিলেন। অন্তরে তাঁহার পরম আনন্দ—রঘুনাথের বৈরাগ্যময় সাধনা সত্যই তবে সার্থকতার দিকে যাইতেছে। একদিন নিজে আসিয়া তিনি অতর্কিতে রঘুনাথের এই অদ্ভুত আহার্য্যের উপর হাত দিলেন। সোল্লাসে কহিলেন, "আচ্ছা রঘুনাথ, এ উপাদেয় প্রসাদ তুমি কোথা থেকে সংগ্রহ ক'রছো? এমনটি তো আমি কোনদিনই পাইনে।"

ভক্তপ্রবর রঘুনাথ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠেন। এ যে রাজপথ হইতে কুড়াইয়া আনা অন্নকণা! শেষকালে এই বস্তুই পড়িবে প্রভুর শ্রীমুখে! ক্ষণপরেই বুঝিয়া নিলেন—ইহা প্রভুর এক কৃপা-লীলা। এই কদন্ন গ্রহণের জন্য হাত বাড়ানোর মানে, রঘুনাথের দৈন্য ও বৈরাগ্যকে

সর্ব্ব সমক্ষে সম্বর্দ্ধনা জানানো। পরম ভক্তের গণ্ড বাহিয়া তখন আনন্দাশ্রুর ঢল নামিতে থাকে।

প্রভুর চোখমুখে কিন্তু প্রসন্নমধুর হাসির ছটা। রঘুনাথের এ দুঃসহ কৃচ্ছ্রসাধনই যে তিনি মনে মনে এতদিন চাহিয়াছেন। চরম বৈরাগ্যের মধ্য দিয়া তাঁহাকে চালনা করিয়াছেন। চিরতরে পাশমুক্ত করার জন্য, কৃষ্ণ-প্রেমরসে নিমজ্জিত করার জন্য! সিক্ত করার জন্যই যে ভক্তকে এমন করিয়া রিক্ত করা!

সন্ন্যাসী, তরুণ বৈষ্ণবদের জন্য প্রভুর ছিল কঠোরতম বৈরাগ্য এবং কৃচ্ছ্রব্রতের ব্যবস্থা। ইঁহাদের আচার-আচরণ বা সাধন জীবনে বিন্দুমাত্র শৈথিল্য তিনি কখনো সহ্য করিতেন না।

ভগবান আচার্য্য চৈতন্যের এক বিশিষ্ট ভক্ত। একদিন প্রভুকে তিনি নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। কিন্তু সরু ও সুগন্ধি চাল অবিলম্বে যোগাড় না করিলে তো চলিবে না। খোঁজ খবর নিয়া জানিলেন, প্রভুর পরম ভক্ত, শিখি মাহিতির ঘরে ভাল চাল রহিয়াছে।

ছোট-হরিদাস এক তরুণ বৈষ্ণব ভক্ত। সুকণ্ঠ গায়ক ও ভাবুক বলিয়া চৈতন্যের সে বড় প্রিয়পাত্র। ভগবান আচার্য্যের সহিতও তাঁহার খুব ঘনিষ্ঠতা। আচার্য্য তাঁহাকে কহিলেন, "ভাই, প্রভু আজ আমার এখানে ভিক্ষা গ্রহণ ক'রবেন—আমি তাই বড় ব্যস্ত। তুমি আমার একটা উপকার করবে? শিখি মাহিতির ঘরে নাকি খুব ভাল চাল রয়েছে। আমার নাম করে তাঁর বোন মাধবী দাসীর কাছ থেকে এখনি কিছুটা চাল নিয়ে এসো।"

প্রভুর ভোজনের আয়োজন! ছোট-হরিদাসের তাই উৎসাহের অন্ত নাই। তখনই ছুটিয়া গিয়া চাল নিয়া আসিলেন। ভগবান পণ্ডিতের আনন্দ আর ধরে না, সুগন্ধি সরু চালের অন্ন ও উত্তম ব্যঞ্জনাদি রাঁধিয়া প্রভুকে আসনে বসাইলেন।

ভোজন করিতে করিতে চৈতন্য কহিলেন, "পণ্ডিত, তোমার সব

রান্নাই আজ বড় উপাদেয় হয়েছে। আর সব চাইতে চমৎকার তোমার এই অন্ন। এমন সূক্ষ্ম, সুগন্ধি চাল তো এখানে বড় একটা দেখা যায় না! কোথায় এ বস্তু পেলে?"

"প্রভু, এ চাল শিখি মাহিতির ঘরে ছিল। মাধবী দাসীর কাছ থেকে আজই চেয়ে আনা হয়েছে।"

"তাই নাকি? বেশ, বেশ। তা কে এ চাল সেখান থেকে মেগে আনতে গিয়েছিল?"

"প্রভু, আমি আয়োজনের জন্য ব্যস্ত ছিলাম, তাই ছোট-হরিদাসই আমার হয়ে গিয়েছিল মাধবী দাসীর কাছে।"

নীরবে ভোজন সমাধা করিয়া প্রভু নিজ কুটিরে ফিরিলেন। তারপর ভৃত্য গোবিন্দকে ডাকিয়া গম্ভীর স্বরে আদেশ দিলেন, "শুনে রাখো, আজ থেকে ছোট-হরিদাস যেন এ কুটিরে না ঢোকে, আমার দৃষ্টির সামনে যেন না আসে। আমি আর তার মুখ দেখ্‌বো না।"

এ যেন বিনা মেঘে বজ্রপাত! হঠাৎ প্রভুর এ কি কঠোর আদেশ! এমন তো বড় একটা দেখা যায় না। অন্তরঙ্গ ভক্তেরা সবাই বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া গেলেন।

প্রভুর দ্বার হরিদাসের কাছে রুদ্ধ। দুঃসহ মর্ম্মব্যথা নিয়া তরুণ ভক্ত কেবলই এদিক ওদিক ঘুরিতেছেন। তিনদিন যাবৎ তিনি উপবাসী। ভক্তেরা তাঁহার বিষাদ-খিন্ন মূর্ত্তি দেখিয়া বিচলিত হইয়া পড়িলেন। প্রভু কিন্তু অচঞ্চল। মার্জ্জনার কোন লক্ষণই নাই।

স্বরূপ দামোদর একদিন সাহস সঞ্চয় করিয়া কহিলেন, "প্রভু, ছোট-হরিদাসের কি অপরাধ? কেনই বা তাঁর এমন কঠিন দণ্ড?"

প্রভু সরোষে কহিলেন, "তবে শোন! বৈরাগী হয়ে যে নারী সম্ভাষণ করে, তার মুখ আমি কখনো দেখতে চাইনে। যত সব দুর্ব্বল জীব! মর্কট বৈরাগ্য নিয়ে থাকে, আর সন্ন্যাসের ধর্ম্ম, বৈরাগী-জীবনের নির্দ্দেশ না মেনে যত্রতত্র ঘুরে বেড়ায়।"

ভক্তগণ চিত্রপুত্তলীর মত বসিয়া রহিলেন।

শিখি মাহিতি আর তাঁহার ভগ্নী মাধবী দাসী প্রভুর একনিষ্ঠ ভক্ত। শুধু তাই নয়, ভক্ত সমাজের ধারণা—চৈতন্যের মধুর সাধনার মর্ম্মজ্ঞ, তাঁহার প্রেমরস ধারণের উপযুক্ত পাত্র, নীলাচলে রহিয়াছে শুধু সাড়ে তিনজন। স্বরূপ দামোদর, রায় রামানন্দ, শিখি মাহিতি—এই তিনজন ছাড়া অপর অর্দ্ধপাত্র—শিখির ভগিনী মাধবী। মাধবী দাসী বয়সে বৃদ্ধা, তাছাড়া নীলাচলের ভাগবত সমাজে তাঁহার অপূর্ব্ব সম্মান ও প্রতিষ্ঠা। তাঁহার কাছে প্রভুর জন্য দুটি চাল চাহিয়া আনিতে গিয়া আজ ছোট-হরিদাসের একি দুর্গতি!

কয়েকদিন অতীত হইল। ভক্তগণ সবাই মিলিয়া আবার চৈতন্যকে ধরিয়া বসিলেন। কহিলেন, "প্রভু, লঘু পাপে কেন ছোট-হরিদাসের এ গুরু দণ্ড? এবারকার মত তাঁকে মার্জ্জনা করুন।"

তিনি ক্রুদ্ধকণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন, "তোমরা যার যার কাজে যাও! এমন অনুরোধ আবার যদি কেউ কখনো ক'র, আমায় আর নীলাচলে দেখতে পাবে না, তা জেনো।"

নিজ সঙ্কল্পে শেষ পর্য্যন্ত তিনি অটলই রহিয়া যান। ছোট-হরিদাস কিছুদিন পরে মনোদুঃখে ত্রিবেণীতে গিয়া আত্মবিসর্জ্জন করেন। এ ঘটনায় নীলাচলের ভক্তবৈষ্ণব সমাজে সেদিন মহা চাঞ্চল্য পড়িয়া যায়। বৈরাগ্যসাধন সম্পর্কে প্রভুর এ কঠোরতা সর্ব্বত্র ত্রাসের সঞ্চার করে, নারী সম্ভাষণের ব্যাপারে সাধকগণ আরো সতর্ক হন।

তরুণ বৈরাগী ছোট-হরিদাসের সম্মুখে প্রভুর এই বজ্রকঠোর মুর্ত্তি, আবার রায় রামানন্দের বেলায় ফুটিয়া উঠে তাঁহার অন্যরূপ। রামানন্দ শক্তিধর সাধক—প্রেমভক্তিরসের মহা অধিকারী পুরুষ। তাঁহার ক্ষেত্রে নারী-সান্নিধ্যকে প্রভু মোটেই বিপজ্জনক মনে করেন নাই, কোন নীতিকঠোরতাই কখনো দেখান নাই।

ভক্ত প্রদ্যুম্ন মিশ্র একবার চৈতন্যকে বড় ধরিয়া পড়িলেন, প্রভুর শ্রীমুখ হইতে তিনি কৃষ্ণকথা শুনিবেন।

দৈন্য ও বিনয়ের অভিনয়ে প্রভু সুদক্ষ। কহিলেন, "মিশ্র, কৃষ্ণ-কথার আমি কি জানি? যদি শুন্‌তেই হয়, রামানন্দের কাছে যাও। লীলারসের তিনি ভাণ্ডারী। তাঁর মুখ থেকেই যে আমি শুনি।"

প্রদ্যুম্ন পণ্ডিত সেদিন রামানন্দ রায়ের ভবনে গিয়া উপস্থিত। বহুক্ষণ অপেক্ষা করার পর ভৃত্যদের নিকট শুনিলেন, রায় আজ বড় ব্যস্ত। কৃষ্ণলীলা বিষয়ক এক রসমধুর নাটক তিনি রচনা করিয়াছেন, এ সময়ে তাহারই মহড়া চলিতেছে।

সেখানে বসিয়া মিশ্র অনেক সংবাদ সংগ্রহ করিলেন।—দুইটি পরম রূপসী তরুণী রোজ রামানন্দের কাছে নৃত্যগীত ও অভিনয় শিক্ষা করে। লীলানাট্যের অভিনয় যাহাতে জীবন্ত হইয়া উঠে সেজন্য রাম-রায়ের উৎসাহ উদ্দীপনার অবধি নাই। রোজ নিজ হস্তে তরুণী দেবদাসীদের মনোহর বেশে সাজাইয়া দেন। হাবভাব এবং কটাক্ষের গূঢ় অর্থ ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাহাদিগকে বুঝাইয়া থাকেন। সেবা-বুদ্ধিতে রামরায় সদা বিভাবিত। নাটক তাঁহার কাছে নাটকমাত্র নয়—জীবন্ত লীলা। তাঁহার দৃষ্টিতে এ তরুণী দুইটি হইতেছে নায়িকা—কৃষ্ণসুখ বর্দ্ধনের ভূমিকা তাহাদের, আর রামরায় এ নায়িকাদের সখী।

প্রদ্যুম্ন মিশ্র সবই শুনিলেন, কিন্তু মনে তাঁহার বড় খট্‌কা লাগিয়া গেল। এ কেমন বৈষ্ণবের কাছে প্রভু তাঁহাকে পাঠাইয়াছেন?

কাজকর্ম্ম সারিয়া বহু বিলম্বে রামানন্দ রায় দেখা করিলেন। সামান্য কিছু কথাবার্ত্তার পর মিশ্র পণ্ডিত সেদিন কিছুটা সন্দিগ্ধ মনেই ফিরিয়া আসিলেন!

প্রভুকে সব কথা খুলিয়া বলিলে তিনি উত্তর দিলেন, "আমি সন্ন্যাসী—নারী দর্শন স্পর্শন দূরের কথা, নামও এড়িয়ে চলি, আর ত্যাখো, রাম রায়ের কি অপূর্ব্ব শক্তি। রূপলাবণ্যময়ী তরুণীদের স্পর্শ করেও নির্ব্বিকার! তাঁর মতন সাধকেরই শুধু এ অধিকার রয়েছে। ভক্তি-প্রেম সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেই তাঁর এ উচ্চ অবস্থা।"

পরদিন মিশ্র আবার রাম রায়ের ভবনে উপস্থিত। প্রভুর আদেশ

রহিয়াছে, কৃষ্ণকথা তাঁহাকে শুনাইতে হইবে, রামরায়কে তাই এ দিন মুখ খুলিতে হইল! কৃষ্ণরসের মন্থনে, ভাবের উচ্ছ্বাসে তিনি একেবারে মত্ত হইয়া পড়িলেন। আনন্দ সাগর উথলিয়া উঠিল। রামরায়ের প্রকৃত মাহাত্ম্য বুঝিতে প্রদ্যুম্ন মিশ্রের এবার আর ভুল হইল না।

চৈতন্য নিজে সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসীর ত্যাগ তিতিক্ষা ও সাধন ভজন সম্পর্কে তাই তাঁহার সতর্কতার অন্ত নাই। মধুর ভজন আর ভাবাবেশে মত্ত থাকিলে কি হয়, নিজের আচার আচরণকে তিনি কঠোর নিগড়ে বাঁধিয়া রাখেন। তাঁহার নিজ শিথিলতার ফাঁক দিয়া বা অন্য কোনও সূত্র ধরিয়া ভক্তগোষ্ঠীতে কোন উচ্ছৃঙ্খলতা প্রবেশ না করে, এজন্য তিনি থাকেন সদা সজাগ।

কলাগাছের একগাদা শুষ্ক খোলের উপর প্রভু রোজ শয়ন করেন। শয্যার উপকরণ হিসাবে আর কোন কিছু তিনি গ্রহণ করিতে রাজী নন। অন্তরঙ্গ ভক্ত জগদানন্দ পণ্ডিতের মনে এজন্য বড় কষ্ট। সেবার তিনি স্থির করিলেন, প্রভুর কৃচ্ছ সাধন আর চলিতে দিবেন না।

শয্যাকে কোমল ও আরামপ্রদ করিতে হইবে, তাই সযত্নে তুলার নরম তোষক বালিস তিনি তৈরী করাইলেন। প্রভুর গৈরিক বহির্ব্বাসে এগুলি আবরিত হইল। পণ্ডিত ভাবিলেন, এ ব্যবস্থায় নিশ্চয়ই তাঁহার কোন আপত্তি হইবে না।

শয়ন করিতে আসিয়াই চৈতন্য রোষে গর্জ্জিয়া উঠিলেন। কহিতে লাগিলেন, "কোন রকমে নিজের সন্ন্যাসধর্ম্ম আমি পালন করে যাচ্ছি, কিন্তু এরা দেখ্‌ছি কিছুতেই তা করতে দেবে না। জগদানন্দ আমায় বিষয় ভোগ করাতে চায়, বিলাসে ডুবিয়ে ধর্ম্মচ্যুত করতে চায়!"

শয্যার নূতন উপকরণ কুটিরের বাহিরে ছুঁড়িয়া দিয়া কহিলেন, অবিলম্বে তিনি নীলাচল ত্যাগ করিবেন!

প্রভুকে তো বুঝাইয়া সুঝাইয়া শান্ত করা হইল। কিন্তু ভক্তদের মনোব্যথা কি করিয়া দূর হয়? অবশেষে স্বরূপ দামোদরের মধ্যস্থতায়

আপোষের এক সূত্র আবিষ্কার করা গেল। স্থির হইল, ভক্তগণ কদলী বৃক্ষের শুষ্কপত্র সরু করিয়া নখে চিরিয়া দিবেন, তারপর গৈরিক কাপড়ে এগুলি আবরিত হইবে। এবার হইতে এই অভিনব তোষক ও বালিসই প্রভু ব্যবহার করিতে থাকেন।

প্রেমিক ভক্ত জগদানন্দ পণ্ডিতের সঙ্গে প্রভুর মান অভিমানের পালাটি কিন্তু লাগিয়াই আছে। পণ্ডিত আর একদিন এক নূতন কাণ্ড করিয়া বসিলেন। কিছুদিন আগে তিনি গৌড়ে গিয়াছিলেন। সেখান হইতে প্রভুর জন্য এক হাঁড়ি সুগন্ধি চন্দন-তেল নিয়া আসিয়াছেন! সারা দিনের নৃত্য কীর্ত্তনে প্রভু পরিশ্রান্ত হন, মাঝে মাঝে ভাবাবেগে অস্থির হইয়া পড়েন। জগদানন্দের বড় সহজ প্রেমের ভাব। দুঃখিত চিত্তে প্রায়ই ভাবেন, আহা, প্রভুর উষ্ণ মস্তিষ্কে যদি ভাল কবিরাজী চন্দন তেল মাখানো যাইত!

এবার তোড়জোড় করিয়া সুদূর গৌড় হইতে বহুকষ্টে মৃৎ-ভাণ্ডে তিনি এই তেল বহিয়া আনিয়াছেন।

প্রভুর সেবক গোবিন্দের হাতে হাঁড়িটি অর্পণ করিয়া জগদানন্দ কহিলেন, "ভাই তোমার ওপর সমস্ত ভার রইলো। প্রভুর শিরে এ তেল রোজ কিছুটা মাখাবে, এতে ভুল না হয়।"

এ প্রস্তাব শুনিবামাত্র প্রভু উত্তেজিত স্বরে কহিলেন, "তোমরা কি জানো না, সন্ন্যাসীর পক্ষে তেল ব্যবহার একেবারে নিষিদ্ধ! তার ওপর সুগন্ধি তেল ব্যবহার! এ যে চরম নিন্দার কথা!"

সকলে সেদিন চুপ করিয়া গেলেন। কিন্তু জগদানন্দ ছাড়িবার পাত্র নন। প্রভুর সেবককে আবার তিনি খোঁচাইতে লাগিলেন।

দিন দশেক গত হইয়াছে, গোবিন্দ আবার একথা উঠাইলেন, "প্রভু, জগদানন্দ পণ্ডিতের বড় ইচ্ছে, চন্দন-তেল আপনার মাথায় মাখানো হয়। বহু কষ্ট করে দেশ থেকে ভাণ্ডটি টেনে এনেছেন।

চৈতন্য সরোষে কহিলেন, শুধু তেল ব্যবহার করা কেন, এবার

আরামের জন্য একজন তেল-মর্দ্দনের লোক নিযুক্ত কর। এসব সুখের জন্যই তো আমি সন্ন্যাস নিয়েছি। দেখ্‌ছি আমার সর্ব্বনাশ করেই তোমাদের আনন্দ। এই সুগন্ধি তেল মেখে রাজপথ দিয়ে যাই, আর লোকে উপহাস করে আমায় বলুক—ভোগী সন্ন্যাসী।"

জগদানন্দকে তখনি ডাকিয়া কহিলেন, "শুন্‌লাম তুমি গৌড় থেকে আমার জন্য চন্দন তেল বয়ে নিয়ে এসেছ। কিন্তু আমি সন্ন্যাসী—এসব আমার ব্যবহার করা তো চলে না। তুমি বরং এক কাজ কর। এ তেল জগন্নাথমন্দিরে দিয়ে এসো, সেখানে এ দিয়ে দীপ জ্বালানো হবে, তোমার শ্রমও সফল হবে।"

অভিমানী জগদানন্দ এ পরামর্শ শুনিবার পাত্র নন। ক্রোধে, ক্ষোভে তাঁহার দেহ তখন কাঁপিতেছে। উত্তেজিত কণ্ঠে উত্তর দিলেন, "কে তোমায় বলেছে যে, গৌড় থেকে আমি তোমার জন্য তেল এনেছি? এ তেল কারুর মাখ্‌বার প্রায়োজন নেই।"

কিন্তু সরলস্বভাব জগদানন্দ নিজেকে আর বেশীক্ষণ সংযত রাখিতেও পারিলেন না। প্রভুর কুটিরে ঢুকিয়া চন্দন তেলের ভাঁড়টি আঙ্গিনায় টানিয়া আনিলেন। তারপর সর্ব্ব সমক্ষে তখনই উহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া, আপন ঘরে গিয়া কপাট দিলেন।

জগদানন্দ তিনদিন যাবৎ উপবাসী। সকলে প্রমাদ গণিলেন। কি করিয়া তাঁহাকে শান্ত করিবেন, ভাবিয়া পাইতেছেন না।

ভক্তের প্রেমাভিমান প্রভুকে টলাইয়া দেয়। নিজেই সেদিন জগদানন্দের কুটিরে আসিয়া উপস্থিত! দ্বারে করাঘাত করিয়া কহিলেন, "পণ্ডিত, শীগ্‌গীর বাইরে এসো! আজ যে তোমার এখানেই আমি ভিক্ষে গ্রহণ করবো। তাড়াতাড়ি রান্নার যোগাড় কর, আমি শ্রীমন্দির থেকে ফিরে আসৃছি।"

প্রভু তাঁহার গৃহে অতিথি! জগদানন্দের ক্রোধ ও অভিমান মুহূর্ত্তে কোথায় ভাসিয়া গেল। পরম যত্নে স্বহস্তে তিনি অনেক কিছু রন্ধন করিলেন। বলা বাহুল্য, প্রভুকে সেদিন দণ্ড কম গ্রহণ করিতে হয় নাই।

পণ্ডিতের ভয়ে সাধ্যাতিরিক্ত ভোজন করিয়া তবে তিনি নিষ্কৃতি পান! ভক্তের মানভঞ্জনের পালা সেদিন এভাবে সমাপ্ত হয়।

রামচন্দ্র পুরী শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীর অন্যতম শিষ্য। লঘু গুরু জ্ঞান ইঁহার নিতান্ত কম, কথাবার্ত্তায়ও সংযমের বড় অভাব। অপরের ছিদ্র খুঁজিয়া বেড়ানোই ইঁহার প্রধান কাজ। মাধবেন্দ্র পুরীর মত কৃপালু ও সহিষ্ণু ব্যক্তিও মরদেহ ত্যাগ করার আগে তাঁহার এই দুর্ব্বিনীত শিষ্যকে দূর করিয়া দিতে বাধ্য হন। এই রামচন্দ্র সে-বার পুরী ধামে আসিয়া উপস্থিত।

প্রভু ও তাঁহার ভক্তেরা পুরীজীকে শ্রদ্ধাভক্তি দেখাইলে কি হয়, নিজ স্বভাব অনুযায়ী তিনি সকলেরই নিন্দা সমালোচনা শুরু করিয়া দিলেন। স্বয়ং চৈতন্যও এ দুর্ম্মুখের কাছে রেহাই পাইলেন না।

প্রভু প্রায়ই ভক্ত গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করেন! বলাবাহুল্য, সকলেই সাধ্যমত আয়োজনের ত্রুটি করেন না। রামচন্দ্র পুরী প্রভুর এই ভোজন সম্পর্কেই কথা উঠাইলেন—সন্ন্যাসীর এত ভোজনের নিমন্ত্রণ কেন? এই ভোজন পারিপাট্যই বা কেন?

গোবিন্দকে ডাকিয়া চৈতন্য কহিলেন, "আজ থেকে যে ভক্তের বাড়ীতেই আমার ভিক্ষার নিমন্ত্রণ হোক্, বলে দিও—এক চতুর্থাংশের বেশী অন্নব্যঞ্জন যেন না দেওয়া হয়।"

ভক্তগণ মহা উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। রামচন্দ্র পুরীর ছিদ্রান্বেষী স্বভাবের কথা জানিতে তাঁহাদের বাকী নাই। প্রভুকে সকলে কহিলেন, "প্রভু, সবাই জানে, পুরীজী এক বিশ্বনিন্দুক, এঁর কথায় আপনি কেন শুধু শুধু অর্দ্ধাশন শুরু করেছেন?"

উত্তর হইল, "তোমরা বৃথা পুরী মহারাজকে দোষ দিচ্ছ, তাঁর ওপর রুষ্ট হ'চ্ছ। তিনি তো সত্য কথাই বলেছেন। সন্ন্যাসী হয়ে তো জিহ্বার লাম্পট্য রাখতে নেই! সন্ন্যাসধর্ম্ম রাখতে হলে আহারের পরিমাণ করতে হবে খুব অল্প।

প্রভুকে এমন স্বল্পাহারী দেখিয়া ভক্তদের হৃদয় ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। তাঁহারা তুমুল আন্দোলন শুরু করিলেন। ফলে প্রভু তাঁহার নিয়মিত আহারের পরিমাণ কিছুটা না বাড়াইয়া পারিলেন না।

ইহার কিছুদিন পরে রামচন্দ্র পুরী নিজেই নীলাচল ত্যাগ করেন। ভক্তগণও হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচেন।

সন্ন্যাসধর্ম্ম রক্ষণ ও নিয়মানুবর্ত্তিতার দিক দিয়া চৈতন্যের পার্ষদগণও কম যাইতেন না। কোন কোন সময় ইঁহাদের নীতিনিষ্ঠার আদর্শ প্রভু নিজেও মানিয়া নিতেন, অনুগামী বৈষ্ণবদের মধ্যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করিতেন।

সে-বার একটি সুদর্শন উড়িয়া বালক প্রায়ই প্রভুর কাছে যাতায়াত করিতে থাকে। বড় ভক্তিপরায়ণ সে। প্রভু যেন তাঁহার প্রাণস্বরূপ, রোজই আসিয়া সে তাঁহার চরণ বন্দনা করে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়া থাকিয়া তাঁহার প্রেমমধুর কথা শুনিতে থাকে। বালকটির উপর প্রভুরও খুব স্নেহ পড়িয়া গিয়াছে।

দামোদর পণ্ডিত চৈতন্যের এক অন্তরঙ্গ পার্ষদ। আচারনিষ্ঠ ও বৈরাগ্যবান বৈষ্ণব সাধক বলিয়া তিনি সর্ব্বত্র খ্যাত। দামোদর কিন্তু এই নবাগত উড়িয়া বালকটির এখানে ঘন ঘন যাওয়া-আসা তেমন পছন্দ করিতেছেন না। বালককে ইতিমধ্যে নিষেধও করিয়াছেন, কিন্তু সে তাহাতে বড় একটা কাণ দেয় না, প্রভুর প্রতি তাহার এক দুর্নিবার আকর্ষণ। প্রভুকেই বা পণ্ডিত একথা কি করিয়া বলেন?

সেদিনও এই সুদর্শন বালকটি আসামাত্র প্রভু খুব উল্লসিত হইয়া উঠিলেন। তাহাকে কাছে ডাকিয়া আনিয়া স্নেহভরে নানা কথাবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। প্রভুর সান্নিধ্যে বহুক্ষণ কাটানোর পর বালকটি চলিয়া গেল।

এদিন কিন্তু দামোদর আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিলেন না। ধাঁ করিয়া বলিয়া বসিলেন, "'প্রভু' 'প্রভু' বলে সবাই অস্থির—এবার লোকে

প্রভুর গুণ ভাল ক'রেই গাইতে থাকবে, সারা নীলাচলে তাঁর প্রতিষ্ঠা বেড়ে উঠবে।"

চৈতন্য কহিলেন, "দামোদর, তুমি যেন কি একটা বল্‌তে চাচ্ছো! পরিষ্কার করে বল তো, আমি শুনি।"

"কি আর ব'ল্‌বো। তুমি স্বেচ্ছাময়—ঈশ্বর। ইচ্ছেমত আচার-আচরণ তুমি করতে পার, তা ঠিক। কিন্তু বিচার করে ছাখো, এ বালকের সঙ্গে তোমার ঘনিষ্ঠতা রাখা ঠিক কিনা। সবাই জানে, এর মা ব্রাহ্মণ ঘরের বিধবা। শুধু বিধবা নয়— তরুণী, পরমাসুন্দরী। হতে পারে, মহিলাটি সুচরিতা, ধর্ম্মপরায়ণা। কিন্তু তবুও বিচার করলে দেখা যাবে, সে একে রূপসী তাতে যুবতী। এদিকে তুমিও পরমসুন্দর যুবা। এ নিয়ে দুষ্ট লোকে তো কাণাকানি করতেও পারে। প্রভু, ভেবে ছাখো, সে কাণাকাণির সুযোগ তুমি নিজেই কি করে দিচ্ছ না?"

চৈতন্যের মুখে ফুটিয়া উঠিল অপার সন্তোষের হাসি। দামোদর যে তাঁহাকে প্রাণাপেক্ষা বেশী ভালবাসে, তাই তো ধর্ম্মের মত তাঁহাকে সে সদাই ঘিরিয়া রাখিতে চায়—কোন ছিদ্র দিয়াই যেন প্রভুর ক্ষতি সাধন কেহ কখনো না করিতে পারে। এই ভালবাসার জোরেই তো সে আজ তাঁহাকে সতর্ক করিতে সাহসী হইয়াছে। আর দামোদর তো অন্যায় বা অযৌক্তিক কিছু বলে নাই। যথার্থ কথাই সে বলিয়াছে। তাঁহার এ সতর্কবাণী প্রভু গ্রহণ করিলেন।

নিষ্ঠাবান, কঠোর তপস্বী দামোদর পণ্ডিতকে চৈতন্য অতঃপর এক বড় দায়িত্বের ভার দিলেন। নবদ্বীপে জননী শচীদেবী আর পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়া অবস্থান করিতেছেন, আর সেখানে রহিয়াছে অগণিত ভক্ত। ইঁহাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একজন শক্ত মানুষ চাই।

তাই দামোদর পণ্ডিতকে সেদিন নিভৃতে ডাকিয়া প্রভু কহিলেন—

তোমা সম নিরপেক্ষ নাহি মোর গণে।
নিরপেক্ষ না হৈলে ধর্ম্ম না যায় রক্ষণে॥

আমা হৈতে যে না হয়, সে তোমা হৈতে হয়।
আমাকে করিলে দণ্ড আন কেবা হয়॥
মাতার গৃহে রহ, চাহ মাতার চরণে।
তব আগে নাহি কার স্বচ্ছন্দাচরণে॥

প্রভুর মধুর সান্নিধ্যের লোভ ছাড়িয়া দামোদর প্রভু-প্রদত্ত দায়িত্ব ভার বহনের জন্য গৌড়ে চলিয়া গেলেন। মাঝে মাঝে তিনি নীলাচলে আসিয়া প্রভুর চরণ দর্শন করিতেন। আবার গিয়া অধিষ্ঠিত হইতেন নবদ্বীপে তাঁহার নবলব্ধ অভিভাবকত্বের আসনে।

রামানন্দ ও বাণীনাথের ভ্রাতা গোপীনাথ পট্টনায়ক একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী। সেবার তিনি এক মহা বিপদে পড়িয়াছেন। রাজ সরকারের প্রাপ্য প্রায় দুই লক্ষ কাহন তাঁহার কাছে বাকী। অনেক চাপ দিয়াও এ টাকা আদায় করা যায় নাই। শুধু তাই নয়— গোপীনাথ যেমন বিষয়ী তেমনি দাম্ভিক। এই সময়ে রাজা প্রতাপরুদ্রের এক পুত্রকেও তিনি হঠাৎ অপমান করিয়া বসিলেন।

রাজকুমার ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে 'চাঙে' চড়াইয়াছেন। হাত পা বাঁধিয়া গোপীনাথকে উচ্চ মঞ্চে উঠানো হইল। উহার নীচে বৃহদাকার খড়্গ স্থাপিত। উপর হইতে নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে হত্যা করা হইবে। রাজার প্রাপ্য অর্থ শোধ করা হয় নাই, তাই এ দণ্ড। গোপীনাথের অন্যান্য ভাইদেরও গ্রেপ্তার করিয়া আনা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে প্রভুর একনিষ্ঠ ভক্ত বাণীনাথও আছেন।

সকলে ছুটিয়া আসিয়া কহিলেন, "প্রভু, সমগ্র পরিবারটি তোমার অনুগত ও আশ্রিত। অথচ তুমি এখানে উপস্থিত থাকতে চাঙে চড়িয়ে গোপীনাথকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হচ্ছে!"

শুনিয়া প্রভু তো মহা ক্রুদ্ধ। কহিতে লাগিলেন, "রাজার বিষয় খেয়ে যে ফাঁকি দেয়, তার প্রাণ রক্ষা কি করে হবে? রাজার তো দোষ দেওয়া যায় না, তাঁর প্রাপ্য টাকাকড়ি তিনি আদায় করবেনই।

তাছাড়া, আমি এ ব্যাপারে কি করবো ? আমি বিষয়-বিরক্ত সন্ন্যাসী —ভিক্ষুক। আমি কি করতে পারি ? যদি গোপীনাথকে তোমরা রক্ষা করতেই চাও, বেশ তো, সকলে মিলে শ্রীজগন্নাথের চরণে প্রার্থনা কর। আমি এসব ঝঞ্ঝাটের ভেতর নেই।”

ভক্তগণ দুঃখিত চিত্তে ফিরিয়া গেলেন। এদিকে অমাত্য হরিচন্দন রাজা প্রতাপরুদ্রকে গিয়া ধরিলেন। কহিলেন, “গোপীনাথ যত দোষই করুক, সে আপনার সেবক। তা ছাড়া, তার প্রাণ নিয়ে আপনার কি লাভ ? এতে তো রাজসরকারের পাওনা টাকা আদায় হবে না ! যাতে তাঁর প্রাণ রক্ষা হয়, টাকাও ফেরৎ পাওয়া যায়, বরং সেই ব্যবস্থাই দয়া করে আপনি করুন।”

রাজা এ যুক্তি মানিয়া নিলেন। গোপীনাথের প্রাণ রক্ষার সঙ্গে পাওনা টাকা ধীরে ধীরে আদায়ের ব্যবস্থা হইল।

রাজ-গুরু কাশীমিশ্র প্রতিদিনকার মত সেদিনও চৈতন্যের চরণ দর্শনে আসিয়াছেন। প্রভু তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, “মিশ্র, এরা দেখ্‌ছি সবাই মিলে আর আমায় এখানে থাকতে দেবে না। পুরী ছেড়ে এবার আলালনাথে গিয়ে থাকা ছাড়া আর আমার কোন উপায় নেই। শ্রীজগন্নাথের মন্দির-চূড়া সেখান থেকে রোজ দেখবো, আর নিভৃতে ভজন কীর্ত্তন করবো। সেই আমার ভাল। গোপীনাথ প্রভৃতি রাজার প্রাপ্য ফাঁকী দেবে, আর এসব বিষয়ী বার্ত্তা নিয়ে এসে সবাই আমায় বিরক্ত করবে—এ আমার আর সহ্য হয় না।”

“সে কি কথা, প্রভু! কে এমন মূর্খ যে, তোমার কাছে তুচ্ছ বৈষয়িক কথা নিয়ে আসবে—বৈষয়িক ফল মাগ্‌বে। লোকে কি চোখ চেয়ে দেখে না—রামানন্দ তোমার সঙ্গলোভে রাজমহেন্দ্রীর শাসন-কর্ত্তার পদ ত্যাগ করে এসেছেন, বাদসাহের সচিব রূপ সনাতন আজ তোমার জন্য পথের কাঙাল, রাজপুত্র রঘুনাথ তোমার চরণ পাবার জন্য ছত্রে ছত্রে ভিক্ষা মেগে খাচ্ছেন ! না প্রভু, তোমায় কেউ সাংসারিক

কথা নিয়ে আর বিরক্ত করবে না। বাণীনাথের বন্ধু ও সেবকেরা বিপদে দিশেহারা হয়েছিল, তাই তোমার কাছে তারা ছুটে এসেছে। তাছাড়া, প্রভু, এসব তো চুকেই গেছে।"

"না মিশ্র, চুকে যায়নি! শুনলাম, স্থির হয়েছে—বাণীনাথ কিস্তী-বন্দী ক'রে রাজার প্রাপ্য অর্থ এখন থেকে শোধ করবে। সে অমিতব্যয়ী—টাকা শোধ কখনো করতে পারবে না, আবার লোকে আমার কাছে এ নিয়ে ছুটে আসবে, বিরক্ত করবে।"

কাশীমিশ্র অতঃপর প্রভুকে নানা প্রবোধ বাক্য কহিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

রাজা প্রতাপরুদ্র রোজই মধ্যাহ্নে আসিয়া গুরু কাশীমিশ্রের পদ-সম্বাহন করেন। সেদিনও আসিয়াছেন। মিশ্র পণ্ডিত তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, "মহারাজ, প্রভু বোধকরি শ্রীক্ষেত্র ছেড়ে আলালনাথেই চলে যাবেন। গোপীনাথের দণ্ডাদেশের কথা শুনে সবাই গিয়ে তাঁকে ধরেছিল। তিনি সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী। ক্রুদ্ধ হয়ে বলেছেন, এসব বৈষয়িক ঝঞ্চাট যেখানে রয়েছে সেখানে আর তিনি থাকবেন না।"

রাজা চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন, "সে কি কথা গুরুদেব, প্রভুর চরণ দর্শনের জন্য অবলীলায় সমস্ত বিষয়-আশয় আমি ত্যাগ করতে পারি—দুই লক্ষ কাহন এমন কি একটা বড় কথা হ'ল? গোপীনাথের দেয় টাকা আমি সব ছেড়ে দিচ্ছি।"

"কিন্তু, মহারাজ, আপনার প্রাপ্য টাকা ছেড়ে দিলে তো প্রভু সন্তুষ্ট হবেন না। ভাব্‌বেন, তিনিই আপনার এ ক্ষতির কারণ হলেন।"

"আপনি প্রভুকে বুঝিয়ে বলবেন, গোপীনাথের পিতা ও ভ্রাতারা সবাই আমার প্রিয়, আমার তারা আপন জন। আমি নিজেই ইচ্ছা করে এ অর্থ তাদের ভোগ করতে দিয়েছি।"

প্রতাপরুদ্র গোপীনাথের সমস্ত দেনা মাপ করিয়া দিলেন। পূর্ব্বে-কার দায়িত্বপূর্ণ কাজেই আবার তাঁহাকে নিযুক্ত করা হইল, বরং এখন হইতে বেতন কিছু বাড়িয়া গেল।

প্রভুকে আর কেহ কখনো এ ধরণের বৈষয়িক ব্যাপার নিয়া বিরক্ত করে নাই।

নাম-মন্ত্রের শ্রেষ্ঠ প্রচারক, প্রভুর পরমপ্রিয় পার্ষদ, হরিদাস এখন খুব বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। জন সংস্পর্শ হইতে নিজেকে তিনি সযতনে দূরে রাখেন। নিভৃত কুটিরে বসিয়া রোজ তিন লক্ষ নাম জপ করেন, তারপর গ্রহণ করেন মহাপ্রসাদ। এবার জরাজীর্ণ দেহে নির্দ্দিষ্ট নাম-সংখ্যা পূরণ করা যাইতেছে না, ইহাই তাঁহার বড় দুঃখ।

প্রভু সেদিন সাঙ্গোপাঙ্গসহ হরিদাসের কুটিরে আসিয়া উপস্থিত। কহিলেন, "হরিদাস, এ সিদ্ধ দেহে আর কেন এত জপতপ? নামের মহিমা প্রচার অনেক করেছো। বৃদ্ধ হয়েছো, এবার জপ কমিয়ে দাও। আর আমায় বলো, অন্তরে কি তোমার অভিলাষ।"

"প্রভু আমার মত অস্পৃশ্য পামরকে কোথা থেকে টেনে এনে তুমি কোথায় তুলেছো। তোমার কাছে আর কি চাইবার আমার আছে? তবে মনে একটা ইচ্ছে জাগ্‌ছে, তাই তোমায় বলি।"

"বল, বল হরিদাস, তোমায় আমার অদেয় কিছুই নেই।"

"প্রভু, আমি বুঝতে পেরেছি, তুমি শীগ্‌গীর লীলা সম্বরণ করবে।"

চৈতন্য নির্ব্বাক—অন্তর্মুখীন। ভক্তগণ হরিদাসের কথাটি শুনামাত্র শিহরিয়া উঠিয়াছে। নীরব বিস্ময়ে প্রবীণ ভক্ত হরিদাসের দিকে সবাই নির্নিমেষে তাকাইয়া আছেন।

হরিদাস বলিয়া চলিলেন, "প্রভু, কৃপা করে আমায় আজ এই ভিক্ষা দাও—তোমার লীলা সাঙ্গ হবার আগেই যেন এ দেহের পতন হয়। আর কিছু চাইবার আমার নেই।"

প্রশান্ত কণ্ঠে প্রভু কহিলেন, "হরিদাস, কৃষ্ণ আমার বড় কৃপাময়। তোমার মত মহাভক্তের মনোবাঞ্ছা নিশ্চয় পূরণ করবেন।"

পরদিন সকালেই চৈতন্য পার্ষদগণসহ হরিদাসের অঙ্গনে আসিয়া উপস্থিত। তুমুল নামকীর্ত্তন সেখানে শুরু হইল। প্রভু কীর্ত্তন শেষে

হরিদাসের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতে লাগিলেন। পরম ভক্তের গুণগানে তিনি পঞ্চমুখ।

সমবেত ভক্তগণ বুঝিলেন, আজ মহাবৈষ্ণব হরিদাসের মনোবাঞ্ছা পূরণের পালা। প্রভুকে তিনি তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইতে কহিলেন। বক্ষে রাখিলেন তাঁহার চরণযুগল, নয়নদ্বয় নিবদ্ধ করিলেন তাঁহার শ্রীমুখপঙ্কজে, কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হইতে লাগিল তাঁহার চৈতন্যময় নাম। তারপর মহাপ্রেমিক হরিদাস প্রবিষ্ট হইলেন নিত্যলীলায়।

নৃত্য ও কীর্ত্তনের মধ্য দিয়া হরিনামের বন্যা উৎসারিত হইয়া উঠিল। প্রিয় পার্ষদ হরিদাসের মরদেহটি প্রভুর কোলে স্থাপিত। প্রেমাবেশে তিনি নিত্য করিয়া চলিয়াছেন! এ দৃশ্য যে দেখিতেছে, সে-ই আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া উঠিতেছে।

সমুদ্রতীর লোকে লোকারণ্য। মহাসমারোহে সেখানে হরিদাসের সমাধি দিয়া প্রভু আপন কুটিরে ফিরিয়া আসিলেন।

সেদিন হরিদাস ঠাকুরের মহোৎসব হইবে। প্রভু স্বয়ং সিংহদ্বারে দাঁড়াইয়া পসারিদের কাছে ভিক্ষার জন্য আঁচল পাতিলেন। চারিদিকে তখন মহা আলোড়ন পড়িয়া গেল—প্রয়োজনীয় কোন দ্রব্যেরই অভাব রহিল না। আকণ্ঠ পুরিয়া সকলে প্রসাদ ভোজনে তৃপ্ত হইল। উৎসব শেষে দেখা গেল, ভক্ত-বৎসল প্রভু যেন কল্পতরু হইয়া বসিয়াছেন। প্রেমাবিষ্ট হইয়া তিনি বর দান করিলেন—

হরিদাসের বিজয়োৎসব যে কৈল দর্শন।
যেই তাহা নৃত্য কৈল, যে কৈল কীর্ত্তন॥
যে তারে বালুকা দিতে করিল গমন।
তাঁর মহোৎসবে যেই করিল ভোজন॥
অচিরে হইবে তা সবার কৃষ্ণ প্রাপ্তি।
হরিদাস দরশনে ঐছে হয় শক্তি॥

সজল চক্ষে চৈতন্য সবাইকে কহিতে লাগিলেন, "কৃপা ক'রে কৃষ্ণ

আমায় হরিদাসের মত বৈষ্ণবের সঙ্গ দিয়াছিলেন, সে সঙ্গ হতে তিনিই আবার নিলেন সরিয়ে। হরিদাসের নিজেরই চ'লে যাবার ইচ্ছা হ'লো, তাই তাকে আর ধরে রাখতে পারলুম না। তার এ মহাপ্রয়াণ যেন ভীষ্মের ইচ্ছামৃত্যুর মতন! স্বেচ্ছামত হ'লো প্রাণ নিক্রমণ।"

প্রভুর প্রকট লীলার শেষ অধ্যায় এবার আসিয়া পড়িয়াছে। এ অধ্যায় অপ্রাকৃত বৃন্দাবনলীলার রসে পূর্ণ—বড় মধুর, বড় করুণ!

নিভৃত 'গম্ভীরা' গৃহে রাধাভাবে বিভাবিত হইয়া তিনি দিন যাপন করেন। অন্তরতলে নিরন্তর চলে ব্রজের যুগলমিলন আর মাথুর বিরহের জোয়ার-ভাটা। কখনো বিরহবেদনা বিষে জর্জ্জর হইয়া তিনি উন্মত্ত, কখনো বা মিলনের আনন্দে উচ্ছল, মধুর সম্ভোগে ডগমগ। বিরহের দহন যত বাড়ে, মিলনের রস ততই হয় উচ্ছলিত। আবার বিরহ, আবার মিলন—এমনি করিয়াই মহাভাব সমুদ্রের মন্থন চলে পর্য্যায়ক্রমে। দিনের পর দিন উদ্‌গত হইতে থাকে কৃষ্ণ-সুধারস। এ গম্ভীরালীলা বার বৎসর ব্যাপিয়া প্রকট হয়।

এ সময়কার লীলার প্রধান দুই সাথী, স্বরূপ দামোদর ও রামানন্দ। স্বরূপ ব্রজরসের অদ্বিতীয় মর্ম্মজ্ঞ সাধক, প্রভুর পরমপ্রিয় পার্ষদ—তাঁহার 'দ্বিতীয় স্বরূপ'। আবার কৃষ্ণ-লীলা তত্ত্বের বিচারে রামানন্দের জুড়ি নাই। বিরহ-সন্তপ্ত প্রভু উভয়ের গলা ধরিয়া কাঁদেন, হৃদয়ের কথা উঘারিয়া বলিতে গিয়া আকুল হন। ভক্তদ্বয় তাঁহাকে আশ্বাসিত করেন, শান্ত করিতে প্রয়াস পান। স্বরূপের মধুর সঙ্গীতে ও রামরায়ের লীলা-বর্ণনে প্রভু মাঝে মাঝে কিছুটা প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠেন।

প্রভুর এ যেন 'রাই-উন্মাদিনী'র দশা। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাসের কাব্যে এ প্রেমোন্মত্ততার রসঘন চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। জয়দেব ও বিল্বমঙ্গলও শ্রীমতীর দশা নিয়া করুণ রসের বিস্তার কম করেন নাই। কিন্তু প্রভু এ বিরহ-রস জীবকে বুঝাইলেন আপন মর্ম্মজ্বালার উদ্‌ঘাটন করিয়া, আর অষ্টসাত্ত্বিক বিকারের মধ্য দিয়া। শুধু কথায় নয়,

কাব্যে নয়, জীবনের পরতে পরতে ব্রজরস আর কৃষ্ণবিরহের স্বরূপ তিনি ফুটাইয়া তুলিলেন। এ যেন মর্ত্তের ধূলিধূসর অঙ্গনে স্বর্গের অমৃত বিতরণ! এমন করিয়া এ অমৃত কে কবে বিলাইয়াছে? অপ্রাকৃত বৃন্দাবনকে কে এমন মূর্ত্ত করিয়া তুলিয়াছে? এমন কৃপা আর কাহার? চৈতন্যলীলার প্রত্যক্ষদর্শী ভক্ত, পদকর্ত্তা বাসুঘোষ প্রভুর এ কৃপার কথা উল্লেখ করিয়া তাই গাহিয়াছেন—

যদি গৌরাঙ্গ না হ'ত কেমন হইত
কেমনে ধরিতাম দে।
রাধার মহিমা প্রেমরস সীমা
জগতে জানাত কে॥
মধুর-বৃন্দাবিপিন-মাধুরী
প্রবেশ-চাতুরী-সার।
বরজ-যুবতী-ভাবের ভকতি
শকতি হইত কার॥

রসমধুর ব্রজলীলা প্রভুর মধ্যে রূপায়িত! একদিকে কৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য, অপরদিকে রাধার সর্ব্বাতিশায়ী প্রেম—এ মাধুর্য্য, এ প্রেমের মাখামাখি তাঁহার সারা দেহ, মনে ও অন্তরসত্তায়। মহা-ভাবের পরাকাষ্ঠা সেদিন দেখা যায় তাঁহার মধ্যে।

গম্ভীরা-গৃহে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত প্রভু এ নিগূঢ় ব্রজ-রসের বিস্তার করেন। হৃদয়বিদারী আর্ত্তি, ক্রন্দন ও প্রেমবিকারের মধ্য দিয়া রচিত হয় কৃষ্ণবিরহের জীবন্ত ভাষ্য। রাধাকৃষ্ণ-প্রেম ও যুগল ভজনের আদর্শটি ধীরে ধীরে জনচৈতন্যে ফুটিয়া উঠিতে থাকে।

কিন্তু কেন প্রভুর নিজ জীবনের এ আকুলতা, কেন এ মর্ম্মভেদী কান্না? কোথায় তাঁহার মর্ম্মব্যথা? কৃষ্ণরসে যিনি রসায়িত, সচ্চিদানন্দ সাগরে যিনি সদা ভাসমান তাঁহার আবার কোথায় অভাব? কোথায়ই বা তাঁহার সত্যকার অভাববোধ?

কৃষ্ণরস ভুঞ্জনের অনন্ত আকাঙ্ক্ষাকে প্রভু সদা জাগ্রত রাখিয়াছেন, কারণ, রাধাগোবিন্দের মিলন বিরহ আর যুগ্মলীলার বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়াই যে এ রসের চিরন্তন স্ফূর্ত্তি! ভক্তকবি কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভুর এ ভাবচাঞ্চল্যের বর্ণনায় বলিয়াছেন—

"যদ্যপিহ প্রভু কোটি সমুদ্র গম্ভীর
নানা ভাব চন্দ্রোদয়ে হয়েন অস্থির।

মহাভাবসিন্ধু শ্রীচৈতন্যের এ অস্থিরতা, প্রেমবিরহের এ উদ্বেলতা যে কৃষ্ণলীলারস আস্বাদনের জন্য, জনমানসে এ রস উৎসারিত করার জন্য।

নির্ব্বিশেষ পরমতত্ত্ব নয়, ঐশ্বর্য্যময় ভগবান নয়—রস-স্বরূপ, মাধুর্য্যময় ভগবানের উপাসনা প্রভু নূতন ভাবে, নূতন ভঙ্গিমায় প্রচার করিয়া যান। রস ও মাধুর্য্য যেখানে চরম তত্ত্ব, সেখানে লীলা না থাকিলে চলিবে কেন? তাছাড়া, যুগল না হইলে যে এ লীলা জমে না, রসের আস্বাদনও হয় না পরিপূর্ণ।

চৈতন্য পন্থীদের মতে, এই লীলা ও ভেদ পরমসত্তার অদ্বয়তার কোন হানি করে না। অভেদ এবং ভেদ দুই-ই ইহার পক্ষে সত্য। এ ভেদাভেদ অচিন্ত্যনীয়—অনির্ব্বচনীয়।

প্রভুর কৃষ্ণ অপ্রাকৃতিক ব্রজলোকের কৃষ্ণ। যিনি 'সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ', যিনি 'অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্'—তিনিই তাঁহার কৃষ্ণ। আবার তাঁহার রাধাও তেমনি এই কৃষ্ণেরই স্বরূপ-শক্তি—হ্লাদিনী। দুই হইয়াও স্বরূপতঃ ইঁহারা এক। কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায়—

রাধা পূর্ণ শক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান্।
দুই বস্তু ভেদ নাই শাস্ত্র পরমাণ॥
মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি জ্বালাতে তৈছে কভু নহে ভেদ॥
রাধা কৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ॥

রসাস্বাদনের এ শাশ্বত লীলা অনুষ্ঠিত হয় অপ্রাকৃতিক ব্রজে। কৃষ্ণ আর তাঁহার স্বরূপশক্তির প্রেম ও বিরহের পালা অবিরাম ধারায় বহিয়া চলে। বিরহের পর মিলনে রসস্ফূর্ত্তি হয়, মিলনের পর আবার আসে বিরহ, বাড়ে প্রেমের তীব্রতা। রাধার চোখের জল গোবিন্দ মোছান বারবার, কিন্তু আবার তাহা উদ্গত হয়। চিরতরে শুকায় না। লীলার ধারা এমনিভাবে অনন্ত কালের বুকে বহিয়া চলে।

রাধাপ্রেমে বিভাবিত প্রভু এই লীলারই বিরহে মিলনে উদ্বেলিত। উন্মত্ত হইয়া একবার ডুবিয়া যান আবার ভাসিয়া উঠেন। অধ্যাত্ম-জীবন-সাগরের তলদেশ তাঁহার নিস্তরঙ্গ—পরমপ্রাপ্তির চির-প্রশান্তি সেখানে বিরাজিত। আর এই সাগরের উপরকার স্তরে উঠিতেছে তরঙ্গের পর তরঙ্গোচ্ছ্বাস, রাধাগোবিন্দের লীলারঙ্গে তাহা সদাচঞ্চল!

প্রভুর গম্ভীরার বৎসরের পর বৎসর প্রকটিত হইয়া উঠিয়াছে এই অনির্ব্বচনীয় লীলা—প্রেমবিকার আর মহাভাবের মন্থন।

অপ্রাকৃত রাধাপ্রেম এতদিন সাধারণ মানুষের মনে ছিল একটা অমূর্ত্ত তত্ত্বভাবনারূপে। এবার তাহা মূর্ত্ত হইয়া উঠিল প্রভু শ্রীচৈতন্যের মহাজীবনে। কৃষ্ণ বিরহের মর্ম্মজ্বালা দিনের পর দিন সর্ব্বসমক্ষে উদ্ঘাটিত করিয়া জীবকে তিনি করিলেন ভববন্মুখী, আর ভক্তিপ্রেম সাধনার পুরোভাগে রাধাকে, কৃষ্ণের স্বরূপশক্তিকে রাখিয়া—ভগবানকে করিতে চাহিলেন জীবন্মুখী।

রাধা কৃষ্ণশক্তি, কৃষ্ণপ্রেমস্বরূপিণী। এই রাধাকে চৈতন্য স্থাপন করিলেন সাধ্যসাররূপে। তাছাড়া, রাধাকৃষ্ণের যুগলভজনের সাধনাকে নবভাবে, নব উদ্দীপনায় তিনি প্রবর্ত্তিত করিলেন। ভারতের অন্যান্য বৈষ্ণবসমাজে এই রাধাতত্ত্ব এমন করিয়া দেখা দেয় নাই। শ্রী, নিম্বার্ক বল্লভী প্রভৃতি সম্প্রদায়ে কৃষ্ণের সহিত রাধা আছেন, তাঁহার আরাধনাও রহিয়াছে বটে, কিন্তু প্রাধান্য তেমন নাই। কান্তাশিরোমণি রাধার প্রেম ছাড়াও সেখানে শান্ত-দাস্য-সখ্য প্রভৃতি ভক্তিভাবের উপর যথেষ্ট

গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু চৈতন্য জোর দিলেন ভগবানের মাধুর্য্য-উপাসনা ও লীলাবাদের উপর। তাই তো মদনমোহন-মোহিনী রাধাকে তিনি তুলিয়া ধরিলেন এমন লীলাময়ীরূপে, সাধ্যসার-রূপে। এই রাধাভাবে বিভাবিত হইয়াই প্রভুর বুকে এমন বিরহের দহন, আর নয়নে তাঁহার এমন অশ্রুবন্যা।

গোপী প্রেমের কথা, মহাভাবের কথা লোকে ভক্তিশাস্ত্রে পড়িয়াছে, ভক্তসাধক ও ভক্তকবিদের কাছে শুনিয়া আসিতেছে। কিন্তু এ প্রেমের প্রকাশ কবে কোথায় এমনভাবে ঘটিয়াছে? কোন্ মানব দেহে এভাবে ইহা স্ফুরিত হইয়াছে? এইবার প্রভুর ভাগবতী-তনুতে এ প্রেমের পূর্ণতা দেখা গেল। দেখিয়া মানুষ ধন্য হইল।

এ প্রেম স্বভাবতঃ বড় মধুর—'রতিরানন্দরূপৈব'। কারণ, ইহাই যে হ্লাদিনীর বৃত্তি আর তাহার বৈশিষ্ট্য। এ প্রেম যত গভীর হয়, যত গাঢ় হয় মাধুর্য্য ততই বাড়িয়া উঠে। কিন্তু সাধারণ মানুষ এ মাধুর্য্য উপলব্ধি করিবে কিরূপে?

মানুষ এ প্রেমের প্রমাণ পাইবে, তাৎপর্য্য কিছুটা বুঝিবে অশ্রু-কম্পপুলকাদি সাত্ত্বিক প্রেমবিকারের মধ্য দিয়া। চৈতন্যের দেহে বারবার তাহারা এই মহাভাবময় প্রেম-চিহ্নই দেখিয়াছিল।

মহাপ্রেমে প্রভু ঘন ঘন উদ্বেলিত হইয়া উঠেন। আয়ত নয়নকমল হইতে পিচ্‌কারীর ধারার মত অশ্রু নিসৃত হইতে থাকে। ভাবপ্রদত্ত অবস্থায় তিনি ঘুরিয়া ফিরিয়া নৃত্য করেন, কীর্ত্তন-সঙ্গীরা সিক্ত হইয়া উঠেন তাঁহার নেত্রনীরে।

পুলকের তীব্রতায় দেহের রোম খাড়া হইয়া উঠে। রোমকূপে দেখা দেয় অজস্র ব্রণ, আর তাহা হইতে রক্ত ক্ষরিত হইতে থাকে। মাঝে মাঝে দেখা যায়, প্রভুর সুগৌর দেহবর্ণ একেবারে শ্বেত-শঙ্খের মত শাদা হইয়া গিয়াছে। কখনো বা এ বর্ণ হয় রক্তজবার মত লাল।

কম্পনের তীব্রতাই বা কী অদ্ভুত! সুঠাম দীর্ঘায়ত দেহটি বেতস-লতার মত কাঁপিতে থাকে, তীব্র ভাবাবেশে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন

কোন সময় হয়তো তাঁহার গ্রন্থিসমূহ শিথিল হইয়া দেহটি দীর্ঘতম হয়। আবার এক এক সময়ে দেখা যায়, সুন্দর সুঠাম দেহটি সঙ্কুচিত হইয়া কূর্ম্মাকৃতি ধারণ করিয়াছে।

সাত্ত্বিক প্রেম বিকারের এসব দুর্লভ লক্ষণ চৈতন্যের দেহে গোপনে বা নিভৃতে প্রকটিত হয় নাই, শত সহস্র দর্শনার্থী ইহা বারবার প্রত্যক্ষ করিয়াছে। এ মহাভাব দর্শনে মানুষ বিস্মিত হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে হইয়াছে প্রলুব্ধ। এ প্রেমবিকার প্রত্যক্ষ করার ফলে অগণিত ভাগ্যবানের অন্তরসত্তায় কৃষ্ণরস উপজিত হইয়াছে।

চৈতন্যকে নিয়া তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্ষদদের হইয়াছে মহা বিপদ। দিব্যোন্মাদের অবস্থায়ই আজকাল প্রায় সব সময়ে তিনি থাকেন। স্বরূপ দামোদর আর রামানন্দ রায় প্রভুর বিলাপ ও কান্নায় সান্ত্বনা প্রদান করেন। কৃষ্ণ-কর্ণামৃত, বিদ্যাপতি আর গীতগোবিন্দের মধুর শ্লোক ও সঙ্গীত উভয়ে তাঁহাকে শ্রবণ করান। সঙ্গীত সম্মোহিত ভুজঙ্গ যেমন ফণা উঁচাইয়া স্থির হইয়া থাকে, প্রভুও তেমনি তখন ভাবাবেশে থাকেন নীরব, নিশ্চল। তারপরই আবার শুরু হয় তাঁহার প্রেমার্ত্তি আর মর্ম্মভেদী বিরহ-বিলাপ।

মিলন ও বিরহের রসমন্থনে নিত্য উৎসারিত হইয়া উঠে নব-ভাব, নব রসোদ্গার—উদ্গত হয় কৃষ্ণমাধুর্য্য সার। প্রতিদিনই গভীর রাতে প্রভুকে বহুতর সান্ত্বনা দিয়া, গম্ভীরাগৃহে শোয়াইয়া রাখিয়া তবে হয় স্বরূপ আর রাম রায়ের ছুটি।

একদিন নিশীথে চৈতন্য শয্যায় বসিয়া আছেন—বাহির হইতে তাঁহার উচ্চকণ্ঠের নাম কীর্ত্তন শোনা যাইতেছে। হঠাৎ এক সময়ে তিনি একেবারে নীরব হইয়া গেলেন। স্বরূপ ও প্রভুর সেবক গোবিন্দ কুটিরের বহির্দ্বারেই রোজ শয়ন করেন, তাঁহাকে পাহারা দেন। উভয়ের মনে বড় সন্দেহ জাগিল। তাই তো! প্রভু হঠাৎ এমন অস্বাভাবিকভাবে চুপ করিয়া গেলেন কেন?

পাছে চৈতন্য ভাবাবেশে হঠাৎ কোথাও ছুটিয়া বাহির হন, তাই ভিতর হইতে পর পর তিনটি কপাট রাতে বন্ধ থাকে। কিন্তু প্রভু তো শয্যায় নাই। সব দ্বারই বন্ধ, স্বরূপ ও গোবিন্দ সম্মুখভাগেই শায়িত ছিলেন, অথচ প্রভু সবার অজ্ঞাতে কোথায় উধাও হইলেন? চারিদিকে মহা সোরগোল পড়িয়া গেল। আলো নিয়া সকলে চারিদিকে খুঁজিতে বাহির হইলেন।

প্রভুকে পাওয়া গেল মন্দিরের সিংহদ্বারের সন্নিকটে। সবিস্ময়ে ভক্তেরা দেখিলেন, এক অদ্ভুত প্রেমবিকারে তিনি অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া আছেন। সমস্ত অস্থি-গ্রন্থি শিথিল। দেহের দৈর্ঘ্য বাড়িয়া গিয়াছে। চক্ষু-তারকা ঊর্দ্ধদিকে স্থির। মুখ হইতে অবিরাম লালা নিঃসরণ হইতেছে। এ অবস্থা দেখিয়া সঙ্গীরা কাঁদিয়া আকুল।

স্বরূপ দামোদর প্রভুর কাণে কৃষ্ণনাম শুনাইতে লাগিলেন। ধীরে ধীরে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল। দেহের স্বাভাবিকত্ব ফিরিয়া পাইতেও অতঃপর বেশী দেরি হইল না। সুস্থ হইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রভু 'হরিবোল' বলিয়া নৃত্য শুরু করিয়া দিলেন। ভক্তদের বুক হইতে দুশ্চিন্তার পাষাণভার নামিয়া গেল।

অপ্রাকৃত বৃন্দাবনের দিব্য দৃশ্য সতত প্রভুর নয়ন সমক্ষে উদ্ঘাটিত হইতেছে। রাধা গোবিন্দের নিত্যলীলা আর তাহার বৈচিত্র্যের রসে তিনি উন্মত্ত হইয়া উঠিতেছেন। কোন কোন দিন দেখা যায়, প্রেমবিকারের ঘোরে মন্দিরদ্বারে জড়পিণ্ডবৎ তিনি পড়িয়া আছেন। সারা দেহ হইয়া উঠিয়াছে কুষ্মাণ্ডের মত। কখনো বা প্রভু পরমচঞ্চল, উন্মাদনা ও ভাবউচ্ছ্বাসের অবধি নাই। সেদিন চটক পর্ব্বত দেখিয়াই তাঁহার গোবর্দ্ধনের স্মৃতি জাগিয়া উঠে। অমনি ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া গিয়া সেখানে ভূপতিত হন। সারা অঙ্গে দেখা দেয় সাত্ত্বিক বিকারচিহ্ন।

রোজই এই ধরণের এক একটি অভিনব ও চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে, আর ভাবোন্মত্ত প্রভুকে নিয়া অন্তরঙ্গ পার্ষদদের উদ্বেগের অবধি থাকে না।

সেদিন পূর্ণিমার নিশি। আইটোটার দিকে চৈতন্য একাকী উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থায় ঘুরিতেছেন। দূর হইতে জোছ্‌নাপ্লাবিত সমুদ্র দেখিয়া তিনি উদ্দীপিত হইয়া উঠিলেন। ভাবনিধির ভাবতরঙ্গ উচ্ছলিয়া উঠিল—ভাবিলেন, শারদ-পূর্ণিমার রাতে যমুনা ঝল্‌মল করিয়া উঠিয়াছে—আর তাঁহার প্রাণপ্রভু শ্যামসুন্দরের বাঁশীতে উজান বহিতেছে। উন্মত্তের মত ছুটিয়া গিয়া সমুদ্রগর্ভে দিলেন ঝাঁপ।

দেহখানি তাঁহার সেদিন যেন শুষ্ক কাঠের মত লঘুভার হইয়া গিয়াছে। তরঙ্গে তরঙ্গে, স্রোতের আকর্ষণে ক্রমে তিনি কোনার্কের দিকে ভাসিয়া চলিলেন।

এদিকে প্রভুকে কোথাও না দেখিয়া ভক্তেরা পাগলের মত ছুটাছুটি করিতেছেন। কোন স্থানই খুঁজিতে বাকী রহিল না।

ভাবিয়া চিন্তিয়া একদল ভক্ত সমুদ্রতীর ধরিয়া অগ্রসর হইলেন। প্রভু সাগরে ঝাঁপ দিয়াছেন, না সৈকত ধরিয়া কোথাও চলিয়া গিয়াছেন, তাহা কে বলিবে?

পথে এক ধীবরের সঙ্গে তাঁহাদের দেখা—স্কন্ধে তাহার মাছ ধরার জাল। তটে দাঁড়াইয়া লোকটি পাগলের মত হাসিতেছে নাচিতেছে। আবার কখনো বা সে কাঁদিয়া বিহ্বল। মাঝে মাঝে শুনা যাইতেছে তাহার মুখে কৃষ্ণনাম।

স্বরূপ দামোদর মুহূর্ত্তে বুঝিয়া নিলেন—এসব প্রভুরই কাণ্ড। চৈতন্য পরশমনির স্পর্শ এই জেলের দেহে লাগিয়াছে, আজ তাই সে এক মহাভক্তে রূপান্তরিত।

সকলে ব্যগ্র হইয়া প্রশ্ন করিলেন, "ভাই, বল তো, তুমি এমন করছো কেন? এ দশা তোমার কবে থেকে হ'লো, কি ক'রেই বা হ'লো, শীগ্‌গীর সব খুলে বল।"

ধীবর উত্তর দিল, "কি ব'লবো, জাল বাইতে গিয়েছিলুম সাগরে। এক অদ্ভুত মানুষ কোথা থেকে ভেসে এসে আমার জালে আট্‌কে পড়লো। দীঘল তার দেহ, বর্ণ শাঁখের মত সাদা। কখনো অচেতন

হয়ে থাকে, কখনো বা নেচে নেচে অস্ফুট স্বরে কৃষ্ণনাম গেয়ে ওঠে, আবার গোঁ-গোঁ শব্দ করে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। তার শরীরের ছোঁয়া লাগ্‌বার পর থেকে আমার মাথাও বিগড়ে গেছে।"

ভক্তেরা এ সংবাদে যেন প্রাণ পাইলেন। যাক্, তবে আর ভয় নাই—প্রভু নিকটেই আছেন। অচিরে তাঁহার দর্শন পাইয়া সকলের আনন্দের সীমা রহিল না। ক্রমে তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করা হইল।

স্বরূপের ব্যাকুল প্রশ্নের উত্তরে তিনি কহিলেন, "কালিন্দীর স্মৃতি জেগে উঠেছিলো আমার মনে, অমনি চলে গেলাম বৃন্দাবনে। বহুক্ষণ রাধা-গোবিন্দের যমুনা-লীলাই যে আমি সম্ভোগ করছিলাম। তারপর হঠাৎ বাহ্যজ্ঞান হ'লো। শুনলাম, তোমরা ডাকাডাকি ক'রছো।"

'মাধুর্য্য ভগবত্তা-সার'—এ পরমতত্ত্বের প্রচার চৈতন্য সারা জীবন ব্যাপিয়া করিয়া যান। সঙ্গে সঙ্গে নিজ জীবনে এবং নিজ সাধনায়ও এই লীলামাধুর্য্য তিনি কম প্রকটিত করেন নাই। এবার আসন্ন হইয়া উঠিল তাঁহার নরলীলা অবসানের পালা।

অন্তর্গূঢ় লীলার আস্বাদনে একাদিক্রমে প্রভুর বার বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। মহাভাবময় জীবনের অমৃত-মন্থন পর্ব্ব এবার ধীরে ধীরে আসিল সমাপ্তির পথে।

১৪৫৫ শকাব্দ। আষাঢ় মাস। বেলা প্রায় তৃতীয় প্রহর। এক দিব্য ভাবাবেশে আবিষ্ট হইয়া প্রভু জগন্নাথদেবের মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। নাটমন্দিরে গরুড় স্তম্ভের নীচে প্রতিদিন গিয়া তিনি দাঁড়ান, যুক্তকরে দাঁড়াইয়া পুরুষোত্তম বিগ্রহের চিন্ময় রূপসুধা পান করেন, নয়ন জলে সারা দেহ ভিজিয়া যায়। কিন্তু আজ কেন সরাসরি মূল বেদীকোঠায় ঢুকিয়া পড়িলেন? কেন এই ব্যতিক্রম?

ভক্তগণ সবিস্ময়ে তাঁহার কাণ্ড লক্ষ্য করিতেছেন। হঠাৎ এক সময়ে অন্তর্গৃহের দ্বার বন্ধ হইয়া গেল। সবাই বাহিরে—ভিতরে রহিলেন শুধু প্রভু আর তাঁহার শ্রীজগন্নাথ।

সম্মুখে বিরাজিত পরম জাগ্রত দারুব্রহ্ম, চৈতন্যের ধ্যানের ধন, 'ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণ'-এর দিব্য শ্রীবিগ্রহ। ভাবোদ্বেল প্রভু হুঙ্কার দিয়া সেদিকে ধাবিত হইলেন।

বাইশ বৎসর পূর্ব্বে, প্রথম দর্শনের দিনটিতে এমনি আত্মহারা, এমনি পাগলপারা হইয়া এই পুরুষোত্তম বিগ্রহকে কোলে নিতে তিনি ছুটিয়াছিলেন। সেদিন ঘটিয়াছিল নীলাচল-লীলার উদ্বোধন। আজ আবার এ কোন্ পর্ব্ব? একি নিত্যলীলায় প্রবেশের সূচনা?

এইদিনও শ্রীবিগ্রহকে চৈতন্য বুকে তুলিয়া নিতে গেলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে এক মহা অলৌকিক কাণ্ড ঘটিয়া গেল! চিরতরে তিনি হইলেন অন্তর্হিত।

বহু খোঁজাখুঁজিতেও প্রভুর মরদেহের সন্ধান আর পাওয়া যায় নাই। লক্ষ লক্ষ ভক্তের ব্যাকুল অনুসন্ধান, উড়িষ্যারাজ প্রতাপরুদ্রের আপ্রাণ প্রয়াস, সব কিছু সেদিন ব্যর্থ হয়। এ রহস্যময় অন্তর্দ্ধান চির-দুর্ব্বোধ্য রহিয়া যায়।

সহস্র সহস্র ভক্তের আকুল ক্রন্দন সেদিন মিলাইয়া যায় সাগরের অশ্রান্ত কল্লোলে। ভুবনমোহন রূপটি নিয়া, প্রেমের মোহন ইন্দ্রজাল বিস্তার করিয়া আর প্রভু এ মরজগতে ফিরিয়া আসিবেন না!

প্রাকৃত লীলার অবসান ঘটিয়া গেল। কিন্তু প্রভুর অপ্রাকৃত লীলা? সে লীলার ধারা যে চিরন্তন—শাশ্বত! সাধক কবি এই সত্যেরই জয়গান গাহিয়া গিয়াছেন—

অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গোরা রায়।
কোন কোন ভাগ্যবান দেখিবারে পায়॥

কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ

নিস্তব্ধ গভীর রাত্রি। চারিদিকে অমানিশার সূচীভেদ্য অন্ধকার। নবদ্বীপের একপ্রান্তে, গঙ্গাতীরের নির্জ্জন শ্মশানে বসিয়া কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ ধ্যানমগ্ন।

লোকালয় হইতে বহু দূরে এই শ্মশান। আশেপাশে জনমানবের সাড়া শব্দ নাই। শুধু মাঝে মাঝে ভাসিয়া আসে পেচক, শিবা আর সারমেয়ের অতর্কিত কণ্ঠস্বর। বট-পাকুড় আর শেওড়ার শাখায় শাখায় গাঢ় অন্ধকারের জটাজাল রহিয়াছে এলায়িত। জনবিরল এ শ্মশান বড় ভীতিপ্রদ। গভীর রাত্রে সহসা কেউ এদিকে আসে না।

প্রতি অমাবস্যা নিশীথে কৃষ্ণানন্দ এখানে বসিয়া শ্যামা মায়ের পূজা সম্পন্ন করেন। তারপর ধ্যান জপে প্রহরের পর প্রহর কাটিয়া যায়। প্রত্যূষে গঙ্গাস্নান সারিয়া তিনি ঘরে ফিরিয়া আসেন।

আগম-বিশারদ, মাতৃসাধক কৃষ্ণানন্দের মনে বড় ক্ষোভ—তন্ত্রসাধনা বড় অবনতির, বড় দুর্গতির পথে আজ আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কদাচার ও দুর্নীতির প্রাবল্য চারিদিকে। শক্তি-সাধনার মহান ক্ষেত্র ক্লেদাক্ত ও পঙ্কিল হইয়া উঠিয়াছে। সাধকপ্রবর তাই জগজ্জননীর চরণে বারবার মিনতি জানান, তন্ত্রসাধনার ধারা আবার যেন তাঁহার কৃপায় উজ্জীবিত হইয়া উঠে।

আরও একটি বড় অভাববোধ রহিয়াছে কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের অন্তরে। ঘট বা যন্ত্র প্রভৃতি প্রতীক পূজায় তাঁহার মন ভরিতে চায় না। ব্রহ্মময়ী শ্যামামায়ের রূপময়ী বিগ্রহ তিনি অর্চ্চনা করিতে চান, সারা বাংলার জনসমাজে এই মাতৃমূর্ত্তিকে, এই আদর্শ বিগ্রহকে প্রচারিত করিতে চান। নহিলে মনে তাঁহার শান্তি নাই। শক্তিসাধনাকে মাতৃ-

ভাবনায় উদ্বুদ্ধ করিয়া, ভক্তিরসে রসায়িত করিয়া তিনি উহাকে সার্থকতর করিয়া তুলিতে বদ্ধপরিকর।

আজিকার অমাবস্যা তিথির পূজা-অনুষ্ঠান এইমাত্র সাঙ্গ হইয়াছে। ইষ্টদেবীর চরণে অন্তরের প্রার্থনা নিবেদন করিয়া কৃষ্ণানন্দ ধ্যানস্থ হইলেন। বড় দুর্নিবার তাঁহার এই দিনকার সঙ্কল্প।

আদ্যাশক্তির প্রত্যাদেশ অবশেষে মিলিল। পূর্ণমনস্কাম সাধক 'মা-মা' আরাবে শ্মশানভূমি কম্পিত করিয়া তুলিলেন।

দেবী কহিলেন, "বৎস, তন্ত্রধৃত এই বাংলায় তন্ত্রসাধনার মূল ধারাটি আজো অব্যাহতই রয়েছে। তা যে অন্তঃসলিলা। আমার বীর সাধকদের পারম্পর্য্যের ভেতর দিয়ে এধারা চিরদিন এখানে বয়ে চলবে। কিন্তু আজ এ সাধনার বহিরঙ্গ স্তরে জমে গিয়েছে নানা পঙ্কিলতা ও কলুষের কালিমা, তার অনেকটা দূর হবে তোমারই প্রচেষ্টায়। আমার মাতৃরূপিণী বিগ্রহের পূজা তুমি নিজে শুরু করে দাও, অচিরে বাংলার ঘরে ঘরে তা প্রচলিত হবে। বৎস, আরো একটা বড় কাজ তোমার রয়েছে। তন্ত্রশাস্ত্রের পুনরুদ্ধার আর তার এক সঙ্কলন-গ্রন্থের রচনা তুমি সম্পন্ন কর। আমার বরে তোমার প্রচেষ্টা সার্থক হবে।"

কৃষ্ণানন্দ ব্যগ্রস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "কিন্তু মাগো, তোমায় কোন্ রূপে আমি পূজো ক'রবো? কোন্ মূর্ত্তি এদেশে সর্ব্বজন গ্রাহ্য হয়ে উঠবে? কৃপা করে তা আমায় দেখিয়ে দাও। ধ্যানের ধারণায় নয়, স্থূল জগতের আরাধ্য বিগ্রহকে স্থূল ভাবেই আজ আমায় দেখিয়ে দাও। তারই পূজো আমি সর্ব্বত্র প্রচার করবো।"

"বৎস, তাই হবে। যে মূর্ত্তিতে, যে ভঙ্গীতে আমার এই বিগ্রহের পূজো তোমাদ্বারা প্রচলিত হবে, তা মানবদেহের মাধ্যমেই তোমায় দেখিয়ে দেব। নিশাবসানে কাল সর্ব্বপ্রথমে যে নারী মূর্ত্তিটি, যে রূপে যে ভঙ্গীতে তোমার নয়নগোচর হবে, তাই হবে আমার সাধকজনের হৃদয়বিহারিণী রূপ। বাংলার ঘরে ঘরে সবাই তা আরাধনা ক'রবে।"

পরদিন প্রত্যুষে কৃষ্ণানন্দ গঙ্গার দিকে চলিয়াছেন। কিছুটা অগ্রসর হইয়াই অস্ফুট উষালোকে দেখিলেন, অদূরে এক শ্যামাঙ্গিনী গোপকুমারী অপরূপ ভঙ্গিমায় দাঁড়ানো। তাহার দক্ষিণ পদটি কুটিরের অনুচ্চ বারান্দার উপর স্থাপিত। বামপদ রহিয়াছে ভূতলে। দক্ষিণ করতলে একতাল গোময়। এমনভাবে উহা সে উঁচু করিয়া ধরিয়া আছে, মনে হয় যেন হস্তের বরাভয় মুদ্রারই এক প্রতিচ্ছবি। বামহাতটি তাহার কর্ম্মচঞ্চল, এ হাত দিয়া বেড়ার গায়ে দিতেছে মাটির প্রলেপ। রমণীর কেশরাশি কৃষ্ণবর্ণ, নিটোল দেহের চারিদিকে তাহা আলুলায়িত। পরিধানে ক্ষুদ্র অপরিসর একটি শাড়ী। আচার্য্য কৃষ্ণানন্দকে দেখিয়া লজ্জায় জিব্ কাটিয়া সে ফিরিয়া দাঁড়াইল।

কৃষ্ণানন্দের অন্তস্তল যেন বিদ্যুৎ-আলোকে চমকিয়া উঠিল। মনে পড়িল ইষ্টদেবী শ্যামামায়ের প্রত্যাদেশ। প্রত্যুষে উঠিয়া সর্ব্বপ্রথমে আজ যে এই নারী মূর্ত্তিটিই তিনি দেখিলেন। তবে তো ইহারই মধ্য দিয়া ঐশী নির্দ্দেশ তাঁহার জন্য আসিয়া গিয়াছে। এই ভঙ্গিমায়ই জগন্মাতার বিগ্রহ তাঁহাকে তৈরী করিতে হইবে।

এবার প্রশ্ন, কোন্ কর্ম্মপদ্ধতি নিয়া কৃষ্ণানন্দ কাজে নামিবেন। স্থির করিলেন, শক্তি আরাধনাকে জনমানসের সম্মুখে তিনি তুলিয়া ধরিবেন প্রতিমা পূজার মধ্য দিয়া। ঘট ও যন্ত্রের স্থলে শক্তিরূপিণী মাতৃমূর্ত্তিতে সাধকের ভাবকল্পনা ও পূজা-ধ্যান দানা বাঁধিয়া উঠিবে। এই মাতৃ-আরাধনা তিনি প্রচলিত করিবেন বাংলার গ্রামে গ্রামে, প্রতিটি হাটে বাজারে ও বারোয়ারীতলায়। শক্তিসাধনার সঙ্গে ভক্তিরসের ঘটাইবেন সংমিশ্রণ। 'মা—মা' আরাবে দেশের দিঙ্‌মণ্ডল মুখরিত হইয়া উঠিবে, তন্ত্রসাধনার ঘটিবে পুনরুজ্জীবন। জননী কাল শ্মশানে আবির্ভূত হইয়া এই বরই যে তাঁহাকে দিয়া গেলেন।

সাধক কৃষ্ণানন্দের এ সঙ্কল্প অচিরে সিদ্ধ হয়। তাঁহার প্রচারিত শ্যামাপূজার পদ্ধতি ও রীতি সারা বাংলাদেশ গ্রহণ করে, সেদিনকার তন্ত্রসাধনার শুষ্ক খাতে প্রবাহিত হয় মাতৃসাধনার উচ্ছলিত রস-ধারা।

তন্ত্রশাস্ত্রের সঙ্কলনে, তান্ত্রিক আচার আচরণের শুদ্ধতা সম্পাদনে কৃষ্ণানন্দ অপূর্ব্ব সফলতা অর্জ্জন করেন। কয়েক শত বৎসরের ব্যবধানেও দেশ তাঁহার সে অবদান ভুলিতে পারে নাই।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ পাদের কথা। নবদ্বীপের পণ্ডিত সমাজে মহেশ্বর ভট্টাচার্য্যের তখন প্রবল প্রতিষ্ঠা। ধর্ম্মনিষ্ঠ আচার্য্য তন্ত্রবিদ-রূপে তিনি সে অঞ্চলের সর্ব্বত্র পরিচিত। মহেশ্বরের পূর্ব্বপুরুষদের আদি নিবাস ছিল উত্তর বঙ্গে, মণ্ডলজানির মৈত্র হিসাবে এক সময়ে খ্যাতি প্রতিপত্তি কম ছিল না। নবদ্বীপে আসার পর হইতে তন্ত্রশাস্ত্রে সুপণ্ডিত বলিয়া এই বংশের প্রসিদ্ধি আরও বাড়িয়া যায়। মহেশ্বর পণ্ডিতকে উপাধি দেওয়া হয় গৌড়াচার্য্য। এই পণ্ডিতেরই জ্যেষ্ঠ পুত্ররূপে কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ আবির্ভূত হন। নবদ্বীপের আগমেশ্বরী-তলা আজিও এই তন্ত্রসিদ্ধ সাধক ও বহুবিশ্রুত আচার্য্যের পবিত্র স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া আছে।

সমকালীন বাংলায় প্রেমভক্তি ও শক্তিসাধনার দুইটি উৎসমুখ—চৈতন্য ও কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ। প্রায় একই সময়ে উভয়ে নবদ্বীপে আবির্ভূত হন, বিদ্যাচর্চ্চার একই ক্ষেত্রে ও সামাজিক পরিবেশে তাঁহারা বর্দ্ধিত হইয়া উঠেন। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে দুইটি বিশিষ্ট ধারায় প্রবাহিত হইয়া এই দুই মহাজীবন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। উভয়ের মধ্যে রচিত হয় এক দুরতিক্রম্য ব্যবধান।

কৃষ্ণানন্দের একমাত্র ধ্যানজ্ঞান তন্ত্রশাস্ত্রের সংস্কার ও উন্নয়ন। দিকে দিকে শুদ্ধাচারী শক্তিসাধকদের আবির্ভাব তিনি কামনা করেন। তাছাড়া, ঘরে ঘরে জগন্মাতার পূজার প্রচলন করিয়া শক্তিধর্ম্মের মধ্যে প্রাণ প্রবাহ তিনি সঞ্চারিত করিতে চান। এজন্য তাঁহার উৎসাহ ও উদ্দীপনার অন্ত নাই। তাই একদিকে যেমন সারা তন্ত্রশাস্ত্র মন্থন করিয়া সঙ্কলন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন, অপর দিকে তেমনি গড়িয়া তুলিলেন শক্তিমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ গৃহী সাধকের দল।

এক সময়ে নিজ ব্রত উদযাপনের উৎসাহে আচার্য্য কিছুটা উগ্রপন্থী হইয়া পড়েন। শ্যামামায়ের দৃষ্টিতে সেদিন ইহা এড়ায় নাই। প্রিয় ভক্ত কৃষ্ণানন্দের সংশোধনের জন্য তাই মা এক অলৌকিক লীলা প্রদর্শন করিলেন।

কৃষ্ণানন্দ আগমশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। তন্ত্রবিশারদ পিতা মহেশ্বর ভট্টাচার্য্যের ধারাটি নিজ জীবনে তিনি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সহস্রাক্ষ হইয়াছেন এক ব্যতিক্রম। শক্তি আরাধনায় তাঁহার মোটেই উৎসাহ নাই, বরং বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতি এক সহজাত আকর্ষণ নিয়াই জন্মিয়াছেন। গৃহের একপাশে নিজস্ব এক ক্ষুদ্র কুটিরে গোপাল বিগ্রহ স্থাপন করিয়া, তাঁরই পূজা-অর্চ্চনা নিয়া তিনি দিন কাটান।

আর কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ থাকেন দিনরাত মাতৃধ্যানে বিভোর। প্রতি অমাবস্যা নিশীথে জগজ্জননীর আদিষ্ট বিগ্রহ তিনি স্বহস্তে নির্ম্মাণ করেন। মায়ের পূজা সাঙ্গ হইলে গঙ্গাজলে এই মূর্ত্তিকে আবার দেন বিসর্জ্জন। এই নিভৃত পূজা অনুষ্ঠিত হয় পরম শ্রদ্ধা ও শুদ্ধাচারের সহিত। দেবীর সেবা পূজার উপচার ও উপকরণ সংগ্রহে কৃষ্ণানন্দের উৎসাহের অভাব কোনদিনই দেখা যায় না।

সেদিন অমাবস্যা তিথি। গভীর রাত্রিতে কৃষ্ণানন্দের শ্যামাপূজা অনুষ্ঠিত হইবে। তাই ভোরবেলা হইতেই অন্তর তাঁহার উৎসাহ ও উদ্দীপনায় ভরপূর। পূজার উপকরণ সংগ্রহের জন্য গৃহসংলগ্ন উদ্যানের এদিকে ওদিকে তিনি ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। হঠাৎ লক্ষ্য করিলেন, অদূরে একটি গাছে এক কাঁদি সুপুষ্ট কলা বেশ পাকিয়া রহিয়াছে। এ সময়ে এ রকম ভাল কলা সহসা পাওয়া যায় না। কৃষ্ণানন্দের মন খুসীতে ভরিয়া উঠিল। ভাবিলেন, আজ রাতে মায়ের পূজা ও ভোগে এগুলি কাজে লাগাইবেন। বিকাল বেলায় অবসরমত এই কদলীর কাঁদিটি নামাইয়া নিলেই চলিবে।

দিন শেষে ঐ বাগানে প্রবেশ করিয়া কিন্তু তাঁহার খেদের সীমা

রহিল না। সুপক্ক কদলীগুলি কে যেন ইতিমধ্যে কাটিয়া নিয়া গিয়াছে। মনে বড় দুঃখ ও অনুতাপ হইল, সঙ্কল্প করা বস্তুটি মায়ের ভোগে আর লাগানো গেল না।

ঘরে গিয়া কৃষ্ণানন্দ শুনিলেন, ভ্রাতা সহস্রাক্ষ এই কদলী তাঁহার ইষ্ট-বিগ্রহের পূজায় নিবেদন করিয়াছে, গোপালের ভোগে উহা এইমাত্র লাগানো হইয়াছে। ভ্রাতাকে কোন কিছু না বলিয়া মনের ব্যথা মনেই তিনি চাপিয়া রাখিলেন।

মধ্যরাত্রে শ্যামাপূজার অনুষ্ঠান শেষ হইয়া গেল। কৃষ্ণানন্দ ধ্যানে বসিলেন, কিন্তু আজিকার ধ্যান যেন মোটেই জমিতেছে না। বারবার তাঁহার মনে পড়িতেছে, সেই কদলীর কথা। মনে অনুশোচনাও কম হয় নাই। নিজেরই গৃহের বস্তু জগন্মাতাকে ভোগ দিবেন বলিয়া স্থির করিয়া রাখিলেন, কিন্তু তাহা নিবেদন করিতে পারিলেন কই ? শুধু তাহাই নয়, মায়ের ভোগে না লাগিয়া ইহা লাগিয়া গেল বালগোপালের ভোগে। ভ্রাতা সহস্রাক্ষের আরাধিত এ বিগ্রহটিকে কৃষ্ণানন্দ বড় একটা আমল দেন না। নিজের ইষ্টদেবী ব্রহ্মময়ী শ্যামা মায়ের তুলনায় এ বালগোপালের গুরুত্ব তাঁহার কাছে তেমন কিছু নয়। সত্য কথা বলিতে কি, শক্তি আরাধনার তুলনায় ভক্তি সাধনা তাঁহার নিকট চিরদিনই মনে হইয়াছে নিতান্ত তুচ্ছ।

আচার্য্যের মনের খেদ এখনো যায় নাই, তাই তো ধ্যানও তেমন গাঢ় হইতেছে না। পূজাগৃহের কাজকর্ম্ম চুকাইয়া, দুয়ার বন্ধ করিয়া অঙ্গনে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

কিন্তু একি অদ্ভুত ব্যাপার! অনতিদূরেই ছোটভাই সহস্রাক্ষের স্থাপিত গোপাল-বিগ্রহের কুটির, এই গভীর রাতে সেখানে আলো জ্বলিতেছে কেন ? সহস্রাক্ষ কি এখনো ধ্যানজপ করিতেছে ?

গোপালের পূজাকক্ষে ঢুকিয়া কৃষ্ণানন্দ যে দৃশ্য দেখিলেন তাহাতে বিস্ময়ে তাঁহার বাক্স্ফূর্ত্তি হইল না।—তাঁহার ইষ্টদেবী শ্যামা-মা বাল-গোপালকে কোলে তুলিয়া নিয়াছেন, আর সম্মুখে রক্ষিত নৈবেদ্যের

থালা হইতে একটি একটি করিয়া কদলী তুলিয়া খাওয়াইতেছেন। এ দৃশ্য যেমন অলৌকিক, তেমনই প্রাণস্পর্শী।

আগমবাগীশের দৃষ্টির সম্মুখ হইতে মুহূর্ত্তমধ্যে একটি আবরণ অপসৃত হইয়া গেল। দেখা দিল নূতনতর সত্যের আলোক-উদ্ভাস। শ্যামা ও শ্যামের পার্থক্যবোধ কোথায় সেদিন বিলীন হইয়া গেল। হৃদয়ে উদ্গত হইল শক্তি-আরাধনার এক উদার সার্ব্বভৌম অনুভূতি—কালী ও কৃষ্ণ সেখানে একাকার!

তন্ত্রসাধক ও আচার্য্যদের সুবিধার্থ আগমবাগীশ এসময়ে মন্ত্র এবং কৌলিক আচার ও ক্রিয়া পদ্ধতির এক সঙ্কলন করিতেছিলেন। এবার ত্রস্তেব্যস্তে এই নিশীথ রাত্রেই নিজের পাঠগৃহে প্রবেশ করিলেন। নব-উপলব্ধ সত্যের স্বীকৃতি অবিলম্বে সঙ্কলিত শাস্ত্রগ্রন্থে সন্নিবেশিত না করিয়া মন তাঁহার শান্ত হইতে পারিতেছে না। গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিটি টানিয়া নিয়া নূতন করিয়া লিখিলেন—

নত্বা কৃষ্ণপদদ্বয়ং ব্রহ্মাদিসুর পূজিতম্
গুরুঞ্চ জ্ঞানদাতারং কৃষ্ণানন্দেন ধীমতা!

মাতৃসাধক আগমবাগীশের অধ্যাত্ম-অনুভূতি এবার আরো গভীর খাতে প্রবাহিত হয়। একদিকে চলিতে থাকে জগজ্জননীর স্মরণ, মনন ও অনুধ্যান, অপর দিকে অনুষ্ঠিত হয় দিব্যাচারী, নিষ্ঠাবান সাধকের তান্ত্রিক আরাধনা। এবার আর তিথি অনুসারে নয়, প্রতি নিশীথে তিনি মায়ের পূজা অনুষ্ঠান করিতে থাকেন। উদ্যানের এক প্রান্তে রহিয়াছে তাঁহার নিভৃত সাধনস্থল—পঞ্চমুণ্ডীর আসন ও ধ্যানকুটির। এখানে গঙ্গামৃত্তিকা দিয়া নিজের হাতেই কৃষ্ণানন্দ রোজ দেবীমূর্ত্তি গঠন করেন, প্রাণ ঢালিয়া সমাপণ করেন অর্চ্চনা। শক্তিমান সাধকের আবাহন ও ধ্যান জপে মৃন্ময়ী বিগ্রহ হইয়া উঠেন চিন্ময়ী। জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তিতে আবির্ভূ তা হইয়া এক একদিন তাঁহার পরমভক্তের কত আবদার কত মান অভিমান জননী শ্রবণ করেন। তারপর রাত্রিশেষে আগমবাগীশ

লোকচক্ষুর অগোচরে ইষ্ট বিগ্রহ গঙ্গার জলে বিসর্জ্জন দেন, আপন গৃহে ফিরিয়া আসেন।

জগন্মাতার কৃপায় কৃষ্ণানন্দের অধ্যাত্মজীবনের সহিত এবার যুক্ত হইয়া উঠে এক মহাকৌল সাধকদের শক্তি ও প্রেরণা। জটাধারী পরমহংস নামে তন্ত্র-সাধকের মধ্যে ইনি পরিচিত। অসামান্য যোগ-বিভূতির অধিকারী ছিলেন এই সিদ্ধ মহাপুরুষ। অলৌকিক শক্তির বহুতর প্রকাশ দেখা যাইত তাঁহার জীবনে, তাই সাধারণ লোকে তাঁহাকে অভিহিত করিত জটিয়া-যাদু নামে।

সেদিন কার্ত্তিকী অমাবস্যা। জঙ্গলাকীর্ণ বাগিচায়, পঞ্চমুণ্ডীর আসন-যুক্ত গৃহটিতে আগমবাগীশ শ্যামাপূজার আয়োজন করিয়াছেন। এই পুণ্যতিথিতে অনুষ্ঠানের বড় সমারোহ। বহু উপচার নিয়া ভক্ত-সাধক ইষ্ট বিগ্রহের সম্মুখে বসিয়া আছেন।

কথিত আছে, পূজারত হইলে আগমবাগীশের মন্ত্র হইয়া উঠিত চৈতন্যময়, আত্মহারা 'মা-মা' রবে বিগ্রহ জাগ্রত হইয়া উঠিতেন। মৃন্ময়ী দেবী জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তিতে আবির্ভূতা হইয়া পুষ্পার্ঘ্য ও ভোগান্ন গ্রহণ করিতেন। সেদিনও ইহার ব্যতিক্রম ঘটিল না। পঞ্চমুণ্ডীর আসনে আচার্য্য ধ্যানাবিষ্ট হইয়া আছেন। দিব্য-প্রভায় সারা ঘর উদ্ভাসিত করিয়া জগন্মাতা গৃহমধ্যে আবির্ভূতা হইয়াছেন।

কৃষ্ণানন্দের তখন অর্দ্ধবাহ্য অবস্থা। আনুষ্ঠানিক সব কিছু কাজই করিতেছেন যন্ত্রচালিতের মত। বেহুঁসভাবেই তাড়াতাড়ি পূজা সমাপ্ত করিলেন। ভোগের পায়সান্ন নিবেদন করিয়া দেবীকে আচমন-জল নিবেদন করিতে যাইবেন, এমন সময়ে কক্ষের ভিতর হইতে গম্ভীর কণ্ঠে কে যেন বলিয়া উঠিল, "কৃষ্ণানন্দ, দেখ্‌ছো না, মায়ের ভোগ গ্রহণ এখনো সম্পন্ন হয়নি! এরই মধ্যে তাঁকে আচমনের জল এগিয়ে দিয়ে বিদায় দিচ্ছো? ভালো করে তাকিয়ে ছাখো, পুষ্প, পত্র ও

নির্ম্মাল্যের ভীড়ে তোমার নিবেদিত পায়সান্ন চাপা পড়ে গিয়েছে, আর মা তা হাৎড়ে বেড়াচ্ছেন।”

কৃষ্ণানন্দ সবিস্ময়ে দেখিলেন, সত্যই তো! মায়ের ভোজন তখনো শেষ হয় নাই! নিষ্ঠাভরে আবার তিনি নূতন করিয়া ভোগ নিবেদন করিয়া দিলেন।

এবার হুঁস হইল। কাহার কণ্ঠস্বর তিনি শুনিলেন? তাড়াতাড়ি পিছনে দৃষ্টি ফিরাতেই দেখা গেল, রহস্যময় এক অপরিচিত অতিথি দণ্ডায়মান। দীর্ঘবপু, কপালে রক্ত-চন্দনের ফোঁটা। মাথায় শুভ্র জটাজাল পরিধানে রক্তাম্বর। নিষ্পলক নেত্রে কৃষ্ণানন্দের দিকে তিনি চাহিয়া আছেন। কে এই তান্ত্রিক সন্ন্যাসী?

শ্যামা-মায়ের এ বিশেষ পূজাটি কৃষ্ণানন্দ বৃক্ষ-বাটিকার এক প্রান্তে একান্ত নিভৃতে সম্পন্ন করেন। এ সময়ে পঞ্চমুণ্ডী আসনযুক্ত ঘরটি থাকে ভিতর হইতে অর্গলবদ্ধ। তবে এই তান্ত্রিক সাধক ইহার মধ্যে কি করিয়া প্রবেশ করিলেন? ক্ষণপরেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হইয়া উঠিল। আগমবাগীশ বুঝিলেন—শক্তিধর মহাপুরুষ আপন বিভূতি বলেই এই রুদ্ধদ্বার কক্ষে ঢুকিয়া পড়িয়াছেন।

সবিনয়ে তিনি পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

স্মিতহাস্যে মহাপুরুষ জানাইলেন, “বাবা, তোমরা যাকে জটিয়া-যাদু ব'লে জানো, আমি সেই। আমার নিজের যাদু কিছু থাক্ না থাক্ শ্যামা মায়ের যাদুতে যে আমি পড়েছি তাতে সন্দেহ নেই। কৃষ্ণানন্দ, তোমার সাধনার কথা, তন্ত্রাচার ও তন্ত্রশাস্ত্রের সংস্কার সাধনের কথা আমি অনেক শুনেছি। তাইতো ভাবলাম, মায়ে-পোয়ে একান্তে বসে যে আনন্দ তোমরা উপভোগ করো তাতে আজ কিছুটা ভাগ বসাই। তোমার এ পূজা অনুষ্ঠান, তোমার হৃদয়ের এ আকুল আকুতি আমি এতক্ষণ ধরে দেখ্‌ছি, আর নয়ন জলে ভাস্‌ছি! আশীর্ব্বাদ করি, তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হোক, বাংলার শক্তিসাধনা আবার তোমার মত সাধকের ভেতর দিয়ে উজ্জীবিত হয়ে উঠুক।”

ভক্তি গদগদচিত্তে আগমবাগীশ এই সিদ্ধ কৌলাচার্য্যের চরণে লুটাইয়া পড়িলেন।

জটাধারী পরমহংস নবদ্বীপে কিছুকাল অবস্থান করিতে স্বীকৃত হন। কৃষ্ণানন্দ এই সুযোগে তাঁহার কাছে শক্তিসাধনার নানা গূঢ় ও দুরূহ তত্ত্ব শিক্ষা করেন। অচিরে তন্ত্রসিদ্ধির আলোকে তাঁহার অধ্যাত্ম-জীবন প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। তন্ত্রসাধনা ও তন্ত্রশাস্ত্রের অন্যতম দিক্‌দর্শকরূপে তিনি চিহ্নিত হইয়া উঠেন।

নবরচিত গ্রন্থ 'তন্ত্রসার' ও 'শ্রীতত্ত্ববোধিনী' প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণানন্দ প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করেন! পণ্ডিত ও সাধক সমাজে তাঁহার রচনা সমাদৃত হইতে থাকে। তাঁহার কাছে কৌল সাধনার দীক্ষা নিয়া শত শত সাধক কৃতার্থ হয়।

এখন অবধি কৃষ্ণানন্দের প্রভাব পড়িতেছে শুধু সমাজের উচ্চস্তরে, সাধক, পণ্ডিত ও শিক্ষিতদের মধ্যে। জনসাধারণ তাঁহার এই সংস্কার আন্দোলন গ্রহণ করে নাই, শ্যামাবিগ্রহের পূজা ব্যাপক হইয়া উঠে নাই। কৃষ্ণানন্দের মনে তাই ক্ষোভের সীমা নাই। নিভৃত আরাধনার সময়ে প্রতিদিন মায়ের চরণে কাতরকণ্ঠে নিবেদন করেন, "জননী, তোমার আশীর্ব্বাণী তাড়াতাড়ি সফল করে তোলো, তোমার মূর্ত্তি পূজা বাংলার ঘরে ঘরে, সমাজের সর্ব্বস্তরে ছড়িয়ে দাও।"

তিনি বুঝিলেন, তন্ত্রসাধনাকে জনপ্রিয় করিয়া তুলিতে হইলে আগে ইহার ভিতরকার অনাচার ও ক্লেদ দূর করিতে হইবে। বামাচারী সাধকেরা এ সময়ে এই সাধনার সঙ্গে যুক্ত করিয়াছেন বহু অবাঞ্ছিত আচার অনুষ্ঠান। সংস্কারপন্থী আচার্য্য কৃষ্ণানন্দ তাই সর্ব্ব প্রথমে তান্ত্রিক সাধকদের অনুষ্ঠেয় কর্ম্মশুদ্ধির উপর জোর দিলেন। তাঁহার শাস্ত্র ব্যাখ্যান, ব্যক্তিত্ব ও সাধন সাফল্য অল্পকাল মধ্যে জনজীবনে নূতনতর চেতনা আনিয়া দিল। এ চেতনাকে তিনি উজ্জীবিত করিলেন মাতৃসাধনার ভাবপ্রবাহে। এই প্রবাহেরই রসসিঞ্চনে

পুষ্ট হইয়া উঠে উত্তরকালের তন্ত্রপ্রভাবিত বাঙ্গালী সমাজের একটা বড় অংশ।

কৃষ্ণানন্দের তিরোভাবের পরও তাঁহার প্রবর্ত্তিত তন্ত্রসাধনার বেগ প্রশমিত হয় নাই। অনতিকাল মধ্যে মহাসমারোহে তাঁহার নির্দ্দেশিত পদ্ধতিতে শ্যামা বিগ্রহের পূজা সম্পন্ন হইতে থাকে। দেশের দিকে দিকে, শহরে, গ্রামে ও বারোয়ারীতলায় এই মাতৃমূর্ত্তির আরাধনা সাড়ম্বরে শুরু হইয়া যায়।

শক্তি-পীঠবহুল বাঙ্গলা দেশের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে আচার্য্য কৃষ্ণানন্দের শক্তিসাধনার প্রভাব, জগন্মাতার অনুধ্যান করিয়া দেশবাসী ধন্য হয়। আপন শক্তিবলে শক্তিসাধনার গূঢ়, অন্তঃসঞ্চারী ধারাকে কৃষ্ণানন্দ আনিয়া দেন সর্ব্বজনের দুয়ারে, ধীরে ধীরে দেশের জনচৈতন্যে ইহা বিস্তারিত হইয়া উঠে।

তুকারাম

পন্ঢরপুরে সেদিন উৎসবের মেলা বসিয়া গিয়াছে। পুণ্যতোয়া ভীমা নদীর তীরে অসংখ্য স্নানার্থীর ভীড়। কাছেই বিঠ্‌ঠল দেবের শ্রীমন্দির। প্রভুজী আজ সেখানে নয়নাভিরাম বেশে সাজিয়া বসিয়া আছেন। আশেপাশে সাজসজ্জা ও জাঁক-জমকের অন্ত নাই।

মালা চন্দন আর নৈবেদ্যর থালি হাতে হাজারে হাজারে নর-নারী পূজা নিবেদন করিতে আসিয়াছে। ভক্তদের নৃত্য কীর্ত্তনে ও বিগ্রহের জয়গানে আকাশ বাতাস মুখরিত।

এই উৎসবের দিনে আর পাঁচজনের মত ভক্ত তুকারামও ছুটিয়া আসিয়াছেন। বৈরাগ্যবান, মুমুক্ষু এই মারাঠী যুবকের জীবনে প্রভু বিঠ্‌ঠলজীই হইয়া উঠিয়াছেন সর্ব্বস্বধন। লীলামগ্ন ঠাকুর কোন ফাঁকে সঙ্গোপনে আসিয়া যে তাঁহার হৃদয়বেদীতে আসন পাতিয়া বসিয়াছেন, তাহা নিজেও তিনি জানেন না।

তুকার একুশ বৎসরের এই জীবনে পর পর আসিতেছে দুঃখ দুর্দ্দৈবের নানা লাঞ্ছনা। শোক দারিদ্র্যের কষাঘাতে বারবার তিনি জর্জ্জরিত হইয়াছেন। কিন্তু পন্ঢরপুরে আসিলেই এই জাগ্রত বিগ্রহের কৃপায় পাইয়াছেন পরম শান্তি, পরম আশ্রয়।

বিঠ্‌ঠলজীর অমৃতনিষ্যন্দী নয়ন বারবারই তাঁহাকে এখানে টানিয়া আনিতেছে, কিন্তু জীবনের পাত্রটি পূর্ণ হইয়া উঠে কই ?

তুকার অন্তর আজ বড় চঞ্চল হইয়াছে। প্রাণ-প্রভু তাঁহাকে নিয়া এ যাবৎ কম পরীক্ষা করেন নাই। দিনের পর দিন চলিয়াছে এই ভক্তজীবনের নিষ্করুণ মন্থন। হলাহল তাহাতে ঠিকই উঠিয়াছে। কিন্তু কই ? অমৃত তো তুকার জীবনে আজিও উদ্‌গত হয় নাই ? কবে প্রভুর

সত্যকার কৃপা হইবে, দর্শনলাভে অভীষ্ট হইবে পূর্ণ—এই প্রশ্নটি আজ তাঁহাকে পাগল করিয়া তুলিয়াছে। ইষ্ট বিগ্রহের কাছে ইহারই উত্তর তুকা শেষবারের মত জানিয়া যাইতে চান।

ভজন, কীর্ত্তন ও নৃত্যের পালা শেষ হইল। শ্রান্ত-ক্লান্ত দেহে তিনি নদীতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। স্নান সমাপনের পর যখন প্রাচীন বটবৃক্ষের মূলে আসিয়া বসিলেন, রক্তরাঙা সূর্য্য তখন পশ্চিম গগনে হেলিয়া পড়িয়াছে।

ভাবিলেন, এবার একটু বিশ্রাম করা যাক্। গা এলাইয়া দিবার সঙ্গে সঙ্গে নয়ন দুটি মুদিয়া আসিল। উৎসবের কোলাহলও তখন ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। অচিরে তিনি তন্দ্রাভিভূত হইয়া পড়িলেন।

তন্দ্রার ঘোরে ভক্ত তুকারাম সেদিন এক অদ্ভুত স্বপ্ন দর্শন করেন। এ স্বপ্ন তাঁহার জীবনে আনিয়া দেয় পরম সত্য উদ্ঘাটনের গূঢ় ইঙ্গিত, প্রভুজীর মিলনকুঞ্জের দুয়ারটি করে উন্মোচন। সঙ্গে সঙ্গে তুকার লৌকিক জীবনের বন্ধনটি সেদিন কি করিয়া যেন ছিন্ন হইয়া যায়! মহাভক্তের মানসপটে স্বপ্নের অলৌকিক দৃশ্যগুলি একের পর এক ভাসিয়া উঠিতে থাকে—

তুকারাম দেখেন, দেবদুর্লভকান্তি এক বৈষ্ণব সন্ন্যাসী বটবৃক্ষের গায়ে হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। দিব্য প্রেমের আবেশে নয়ন ঢুলু-ঢুলু, শ্রীমুখ হইতে নিরন্তর নিঃসৃত হইতেছে হরিনাম।

ভক্ত সাধকের সারা অস্তিত্বের মূলে হঠাৎ সাড়া পড়িয়া গেল। আনন্দঘনমূর্ত্তি এই সন্ন্যাসীর আকর্ষণ বড় অমোঘ। তুকার সারা দেহমন কেন্দ্রীভূত হইয়া এই দিব্য পুরুষের চরণে লুটাইতে চায়।

ভাববিহ্বল ভক্তকে বৈষ্ণব সন্ন্যাসী নিবিড় আলিঙ্গন দিলেন, আর দিলেন নাম-দীক্ষা ও আশীর্ব্বাদ।

তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। অপূর্ব্ব আনন্দাবেশে তুকা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছেন। বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিলে দেখিলেন, দীক্ষাগুরুর চিহ্ন কোথাও নাই, কিন্তু সর্ব্বসত্তায় তরঙ্গিত হইতেছে মন্ত্রচৈতন্যময় নাম।

স্বপ্নলব্ধ এই নাম তরুণ ভক্তের জীবনে ঘটায় এক অপরূপ রূপান্তর শুধু তাহাই নয়, তুকার সাধনা, তাঁহার নাম-প্রেমের প্রচার, আর প্রেমরসসিক্ত অগণিত অভঙ্ পদাবলী মহারাষ্ট্রের জনজীবনে নূতনতর অধ্যাত্মচেতনা জাগাইয়া তোলে।

ভক্ত তুকারাম তাঁহার স্বরচিত অভঙ-এ সেদিনকার স্বপ্ন-দীক্ষার কথাটি বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন—

রাঘবচৈতন্য কেশবচৈতন্য
সাঙ্গি তলি খুন মাড়ি কেচি।
বাবাজী আপনে সাঙ্গিতলে নমোঙ্গ
মন্ত্র দিলা রাম কৃষ্ণ হরি।
মাঘ শুক্লা দশমী পাহুনী গুরুবার
কেলা অঙ্গীকার তুকা ভনে।

অর্থাৎ রাঘবচৈতন্য আর কৃষ্ণচৈতন্য ব'লে প্রভু আমায় জানালেন তাঁর গুরুপরম্পরা, তাঁর নিজের নাম বলিলেন—বাবাজী, আর জপ করতে দিলেন আমায় পবিত্র নাম—'রাম কৃষ্ণ হরি'। মাঘ শুক্লা দশমীর পবিত্র গুরুবারে আমায় তিনি করলেন অঙ্গীকার।

এই স্বপ্নদীক্ষা ও পথনির্দ্দেশ তুকারামের সাধন জীবনে এক স্বর্গীয় অবদানরূপে আসিয়া উপস্থিত হয়। এ সম্বন্ধে নিজ অভঙে তিনি লিখিয়া গিয়াছেন,—'গুরু আমার সর্ব্বজ্ঞ। জানতেন তিনি কোন্ নামমন্ত্র আমার প্রিয়, আর কোন্ মন্ত্র জপ করতে পারবো আমি অনায়াসে। কৃপা করে তা-ই তিনি দান করলেন আমায়। সত্যিই তা সহজে খুলে দিয়েছে আমার সাধনার পথ। শুধু তাই নয়, এ মন্ত্র পার করে দিয়েছে এ ভবার্ণবে কত সাধককে। তারা জানুক আর না-ই জানুক এর মর্ম্ম, ভেলারূপে ভরিয়ে দিয়েছে তাদের। সত্য-সত্যই এই পবিত্র ভেলায় আশ্রয় মিলেছিল আমার—আর এ আশ্রয় পেয়েছিলাম প্রাণপ্রভু পাণ্ডুরঙ্গের অপার কৃপায়।'

স্বপ্নে আবির্ভূত তুকার গুরুদেব এই 'বাবাজী' স্বপ্নলোকের পুরুষ

নন! লৌকিক জীবনে এক মহাবৈষ্ণব সাধকরূপে তিনি অবতীর্ণ হন মহারাষ্ট্রভূমে। তাঁহার পবিত্র সমাধি আজও দেখা যায় বোম্বাই রাজ্যের ওতুর গ্রামে। এই পরম ভাগবত বৈষ্ণব সন্ন্যাসীর প্রকৃত পরিচয় আজো রহিয়াছে অনুদ্‌ঘাটিত। কেহ কেহ বলেন, তাঁহার এই 'বাবাজী' নাম গৌড়ীয় বৈষ্ণবধারায় কোন সিদ্ধ সাধকেরই পরিচয় জ্ঞাপন করে—রাঘবচৈতন্য ও কেশবচৈতন্য নামের মধ্য দিয়া চৈতন্যদেবের শিষ্য-পরম্পরার নিদর্শন পাওয়া যায়। মারাঠী গবেষক রাণাডের মতে, বাবাজী ছিলেন জ্ঞানদেবের শিষ্য, সচ্চিদানন্দ বাবার সাধন ধারার এক বিশিষ্ট সংবাহক।

তুকারামের আবির্ভাব হয় আনুমানিক ১৫৯৮ খ্রীষ্টাব্দে! পুণার আট ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে দেহু নামক স্থানে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বংশের উপাধি ছিল 'মোরে'। জাতিতে তাঁহারা বণিক।

মোরে পরিবার পন্ঢরপুরের বিঠোবাজীর পরম ভক্তরূপে পরিচিত ছিলেন। এই বংশেরই ভক্তিমান সন্তান বোহ্লাবা। ইঁহারই পুত্ররূপে সাধক তুকারাম ভূমিষ্ঠ হন। সাধ্বী ও ধর্ম্মপরায়ণা মহিলারূপে তাঁহার মাতা কনকাবাঈর খ্যাতিও কম ছিল না।

বোহ্লাবা বড় নিষ্ঠাবান পুরুষ, জপ ধ্যানেই সদা তাঁহার দিন কাটে। জ্যেষ্ঠ পুত্র সাওজী সংসার-বিরক্ত ও উদাসীন। মধ্যম পুত্র তুকারামকে পিতা তাই অল্প বয়সে ব্যবসায়ে ঢুকাইয়া দেন। বিবাহও তাঁহার দেওয়া হয় নিতান্ত অল্প বয়সে। কিন্তু তুকার প্রথমা স্ত্রী রুক্মাবাঈর ক্ষয়রোগ দেখা দেওয়ায় আবার তাঁহাকে দারপরিগ্রহ করানো হয়। এই দ্বিতীয় স্ত্রীর নাম জিজাবাঈ।

তুকার আঠারো বৎসর অবধি তাঁহাদের সংসারে দুঃখদৈন্যের কোন ছায়া পড়ে নাই। কিন্তু ইহার পরই আসে উপর্য্যুপরি নানা দুর্দ্দৈবের আঘাত। প্রথমে আকস্মিকভাবে তাঁহার পিতা ও মাতার মৃত্যু ঘটে, দুই চোখে তিনি অন্ধকার দেখিতে থাকেন। দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া এ সময়ে সারা মহারাষ্ট্রে বিস্তারিত হয়। দরিদ্র সংসারে দুঃখ দুর্গতির সীমা

থাকে না। এ দুঃসময়ে জ্যেষ্ঠভ্রাতা সাওজী একদিন গৃহত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গেলেন।

দুর্দ্দশা অতঃপর চরমে আসিয়া পৌঁছিল। বাহিরের ঘাত-প্রতিঘাত তুকার জীবনকে এসময়ে তীব্রভাবে মন্থন করিতেছে, আর অন্তরের অন্তস্তলে ধীরে ধীরে সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে পরমতমের জন্য অনুরাগের অমৃত। বহিরঙ্গ জীবনে বারবার পড়িতেছে ঝটিকার আঘাত, কিন্তু তাঁহার অন্তর্জীবনের মর্ম্মকোষে রচিত হইয়া উঠিতেছে অধ্যাত্মজীবনের এক নিভৃত নীড়।

ব্যবসায়টি কিন্তু একেবারে নষ্ট হইয়া গেল, তুকা দেউলিয়া হইলেন। ঋণের দায়ে তিনি আকণ্ঠ নিমজ্জিত। জিজাবাঈ সঙ্গতিপন্ন ঘরের মেয়ে, চেষ্টাচরিত্র করিয়া স্বামীকে কিছু অর্থ এসময়ে যোগাড় করিয়া দিলেন। ভাবিলেন, আবার তাঁহাকে ব্যবসায়ের কাজে প্রবৃত্ত করাইবেন। কিন্তু সংসারের বন্ধন যাঁহার শিথিল হইয়া গিয়াছে সাংসারিক কাজের ডোরে তাঁহাকে সহজে বাঁধা যাইবে কেন?

একদিকে অভাব অনটন আর একদিকে পত্নী জিজার গঞ্জনা। তুকারাম অনন্যোপায় হইয়া আবার নূতন করিয়া এক দোকান খুলিয়া বসিলেন। কিন্তু তাহাতেই বা সমস্যার সমাধান হয় কই? ক্রেতারা প্রায়ই ধারে জিনিসপত্র কিনিয়া নিয়া যায়। সত্য হোক, মিথ্যা হোক, তাহাদের কষ্ট শুনিলেই তুকার হৃদয় কাঁদিয়া উঠে, টাকা পরিশোধের জন্য চাপ দেওয়া আর হইয়া উঠে না। বলা বাহুল্য, দুষ্ট প্রবঞ্চকেরা তুকার কোমলতার পুর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিতে থাকে। ফলে অচিরে এ ব্যবসায়টিও নষ্ট হয়।

অতিকষ্টে পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদন চলিতেছে, তাছাড়া, বাজারের ধার-দেনাও কম হয় নাই। মহা দুশ্চিন্তায় তুকারামের দিন কাটিতেছে। এ সময়ে হঠাৎ একটা মালের কেনাবেচা করিয়া তিনি বেশ কিছু অর্থ লাভ করিলেন। নব উপার্জ্জিত অর্থ নিয়া সানন্দে সেদিন বাড়ী ফিরিতেছেন, পথে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের সঙ্গে দেখা। ঋণের দায়ে

তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ব্রাহ্মণের পত্নীও সেখানে উপস্থিত। মহিলাটি নিরুপায়, কি আর করিবে ? কেবলি কাঁদিয়া আকুল হইতেছে !

এ দৃশ্য দেখিয়া তুকার হৃদয় বিগলিত হইয়া উঠিল। নিজের সব টাকাকড়ি ব্রাহ্মণের ঋণ পরিশোধের জন্য দান করিয়া রিক্ত অবস্থায় তিনি বাড়ী ফিরিলেন। বলা বাহুল্য, পাওনাদারদের অত্যাচার ও পত্নী জিজার গঞ্জনার অবধি রহিল না।

লীলাময় প্রভু বিঠোবা এমনি করিয়াই সেদিন দুঃখের আগুনে তাঁহার পরম ভক্ত তুকারামের জীবনকে বারবার পুড়াইয়া নিতেছেন, নিষ্কলুষ করিয়া তুলিতেছেন।

ভক্ত তুকার জাগতিক বন্ধনগুলিও এইবার একে একে যেন ছিন্ন হইতেছে। দারিদ্রের সহিত কঠোর সংগ্রামে নিজে জর্জ্জরিত। ক্ষয়-রোগে আক্রান্ত প্রথমা স্ত্রী আগেই মারা গিয়াছেন, এবার জ্যেষ্ঠপুত্র সন্তোজীও ভুগিয়া ভুগিয়া শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল।

সংসারের কোলাহল হইতে মাঝে মাঝে তুকা নিজেকে সরাইয়া নেন। দেহুর নিকটেই ভাম্বনাথ পাহাড়, এখানকার নিভৃত অরণ্যে প্রায়ই তাঁহাকে দেখা যায়। প্রকৃতির শান্ত উদার পরিবেশে পর্ব্বতের নিভৃত কন্দরে প্রাণ-প্রিয় ইষ্ট বিঠোবার ধ্যানে তিনি বিভোর থাকেন। মাথার উপর দিয়া দিন-রাত্রি সমভাবে চলিয়া যায়। অনশন, অনিদ্রা কোন কিছুতেই তুকার ভ্রূক্ষেপ নাই।

কনিষ্ঠ সহোদর কাহ্নাইয়া দেখিলেন—বড় বিপদ। বিষয়-বিরক্ত ভ্রাতাকে দিয়া সংসারের কোন কাজই আর হইবার নয়। এদিকে দুর্ভিক্ষের নিষ্পেষণে সারা দেশ একেবারে নিমজ্জিত হইয়া পড়িয়াছে। ঘরে এক মুষ্টি অন্নেরও সংস্থান নাই।

বহু চেষ্টায় কাহ্নাইয়া এবার পৈত্রিক সম্পত্তির কিছুটা উদ্ধার করিলেন। জমিজমা সংক্রান্ত কতকগুলি জরুরী দলিলপত্র সঙ্গে নিয়া তিনি উপস্থিত হইলেন ভাম্বনাথ-এ। তাঁহার বড় ইচ্ছা, তুকাকে গৃহের দিকে আবার টানিয়া আনিবেন। কিন্তু বিষয়বিরক্ত ভক্ত সাধককে

বুঝানো বড় কঠিন ব্যাপার। ভ্রাতার কোন বৈষয়িক কথাবার্ত্তায়ই তুকা কাণ দিলেন না, চক্ষু মুদিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। তারপর হঠাৎ তাঁহার নিজের অংশের দলিলপত্রগুলি তুলিয়া নিয়া নদীগর্ভে দিলেন বিসর্জন। কাহ্নাইয়া সংসারী জীব, সভয়ে সে তাহার হিস্যার কাগজপত্র গুছাইয়া নিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিল।

ইন্দ্রায়ণীর তীরে বসিয়া তুকারাম নামজপ ও ধ্যান করেন। একদিন এক কৃষক অনুরোধ জানাইয়া বলে—"তুকা, তুমি তো এখানে বসে নিষ্কর্ম্মা হয়েই দিন কাটাচ্ছো, আমার ক্ষেতের শস্যগুলো তুমি পাহারা দাওনা কেন? এজন্য মজুরী অবশ্য তুমি পাবে—তোমার ঘরে আমি কিছু শস্য দিয়ে আসবো।"

তুকারাম রাজী হলেন। কিন্তু পাহারা দেবেন কি, পাখীর দল শস্যের উপর উড়িয়া আসিয়া বসে—আর তাঁহার হৃদয় বিগলিত হয়। ভাবেন, 'আহা, ভগবান তো পৃথিবীর বুকে শস্য ঢেলে দিচ্ছেন তাঁর সৃষ্ট জীবেরই জন্য। তবে অনাহারে বেচারারা কেন মরবে?'

ফলে ক্ষেতের শস্য উজাড় হইয়া গেল, তারপর পঞ্চায়েতের বিচারে তুকার লাঞ্ছনার সীমা রহিল না।

হরিকথা ও হরিকীর্ত্তন যখন যেখানে অনুষ্ঠিত হয় ভক্ত তুকা সেখানে ছুটিয়া যান। অপূর্ব্ব তাঁহার দৈন্য ও সেবানিষ্ঠা। কীর্ত্তনস্থলীতে আগত ভক্তদের চরণে কাঁকরের আঘাত লাগে—তুকা তাই স্বহস্তে মন্দির চত্বর ঝাঁট দিয়া পরিষ্কার রাখেন। গ্রীষ্মের দিনে গায়ক ও শ্রোতাদের দেহ ঘর্ম্মাক্ত হয়, তিনি ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহাদের ব্যজন করেন। ব্যঙ্গ বিদ্রূপের কোন কষাঘাতই তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।

ভক্ত তুকার পরমধন ইষ্ট বিঠ্ঠলজা, আর তাঁহার জীবনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা—নিরন্তর প্রাণপ্রভুর লীলাকীর্ত্তন। সাধক শ্রেষ্ঠ জ্ঞানেশ্বর, নামদেব, একনাথ প্রভৃতির অপূর্ব্ব ভক্তিসঙ্গীতের আস্বাদনে হৃদয় তাঁহার উথলিয়া উঠে। এক একদিন মনে অভিলাষ জাগে, প্রভুজীর

চরণে প্রাণের আকুতিটি নিবেদন করিবেন নিজের রচিত অভঙ-এর মধ্য দিয়া। কিন্তু সে আশা যে দুরাশা। নিতান্ত দীনহীন তিনি। প্রকৃত ভক্তি নিবেদনের সামর্থ্য তাঁহার কোথায়? তাছাড়া, কোথায় তাঁহার রচনাশক্তি ও ভাবের মাধুর্য্য? শব্দের লালিত্য আর সুরের মধু ঝঙ্কারই বা কই? ভক্ত তুকা কেবলই ভাবিয়া আকুল হন, প্রভুর প্রীতিবর্দ্ধনের কোন উপকরণই যে তিনি সংগ্রহ করিতে পারেন নাই।

ক্রমে এক অদ্ভুত উদ্দীপনা জাগে তুকার মধ্যে। মারাঠী ভক্ত-সাধকদের গ্রন্থপাঠে তিনি তৎপর হন। শাস্ত্র পড়া নাই বটে, কিন্তু মর্ম্মার্থ গ্রহণের সহজাত শক্তি নিয়া তিনি জন্মিয়াছেন। অল্পকাল মধ্যে তাই গীতা ও ভাগবতের তত্ত্বে তাঁহার ব্যুৎপত্তি জন্মিল। জ্ঞানেশ্বরী, একনাথের ভাগবতভাষ্য, নামদেবের অভঙ প্রভৃতি পাঠের ফলে ভক্তিশাস্ত্রে তিনি নিপুণ হইয়া উঠিলেন।

রসজ্ঞ ভক্তের নূতনতর অধ্যাত্ম-প্রস্তুতির সঙ্গে হঠাৎ একদিন বিঠ্‌ঠলজীর আদেশও আসিয়া গেল।

কার্ত্তিক মাসের এক স্নিগ্ধ রাত্রি, চারিদিক চাঁদের আলোয় ঝলমল করিয়া উঠিয়াছে। বিঠোবাজীর দর্শনে তুকা পন্‌ঢরপুরে চলিয়াছেন। হঠাৎ এক দিব্য আনন্দ তরঙ্গে পথিমধ্যে তাঁহার চেতনা বিলুপ্ত হইল। স্বপ্নে দেখিলেন,—বিঠোবাজী স্নেহভরে কহিতেছেন, "তুকা, আমার ভক্ত নামদেব যতগুলো অভঙ্‌ রচনা করবে বলে সঙ্কল্প করেছিল, তাতে সে সফল হয়নি। তুমি সে অপূর্ণ সংখ্যাকে পূর্ণ করে তোল!"

আদিষ্ট অভঙ্‌ রচনায় তুকারাম এবার অগ্রসর হইলেন। ভাগবত অনুসরণে শ্রীকৃষ্ণের লীলা-পদাবলী রচনার পর অজস্র ভক্তিরসাত্মক অভঙ্‌ তিনি রচনা করিয়া চলিলেন।

এবার ভক্ত তুকার অনুরাগীর দল ক্রমে বাড়িতে থাকে। বিঠোবাজীর মন্দির আর তুকার গৃহের অঙ্গনে যেন ভক্তিগঙ্গার বান ডাকিয়া উঠে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি উচ্চবর্ণের অনেকে তাঁহার ভক্ত হইয়া পড়েন।

তাঁহার পায়ের ধূলাও সোৎসাহে ইঁহারা গ্রহণ করিয়া থাকেন। রক্ষণশীল সমাজপতিরা মহা বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে।

সৎ ও ধর্ম্মনিষ্ঠ বলিয়া স্থানীয় ব্রাহ্মণদের মধ্যে গঙ্গাধর পান্তের খ্যাতি যথেষ্ট। আর ব্যবসায়ীদের মধ্যে গণ্যমান্য সন্তোজী তেলী-- এই দুই প্রভাবশালী শিষ্য হইতেছেন তুকার পার্শ্বচর। বীণা ও করতাল বাজাইয়া ইঁহারা তুকার নামকীর্ত্তনের আসর মাতাইয়া তুলেন। অথচ গুরু তুকা হইতেছেন নীচ জাতীয়। অনেকেরই ইহা অসহ্য হয় এবং তাহারা শত্রুতা সাধন করিতে থাকে।

মম্বাজি গোঁসাই দেহু গ্রামের এক প্রতিপত্তিশালী মোহান্ত। তুকার উপর তিনি জাতক্রোধ হইয়া উঠিলেন। শূদ্রের এই প্রাধান্য কেন? কেনই বা সকলে তাঁহার কাছে আশ্রয় নিতে যায়? এ অনাচার তিনি কিছুতেই ঘটিতে দিবেন না। কুচক্রীর চক্রান্ত ক্রমে দানা বাঁধিয়া উঠিল, শুরু হইল তুকার উপর অত্যাচার।

একদিন ভাবাবেগে বিঠ্‌ঠলজীর নাম করিতে করিতে তুকারাম গ্রামের পথে চলিয়াছেন। নিভৃতে সুযোগ বুঝিয়া মম্বাজী এক কাঁটা গাছের ডাল নিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন! আঘাতের পর আঘাতে তুকার পিঠ বাহিয়া রক্ত ঝরিতে লাগিল। কিন্তু নাম-প্রেমের রসে তুকা মাতোয়ারা! কোন হুঁসই তাঁহার নাই।

মম্বাজী প্রায়ই তুকারামের হরিকীর্ত্তনের আসরে উপস্থিত থাকেন। আসল উদ্দেশ্য, এই শূদ্র ধর্ম্মনেতার আচরণ ও ভাবভঙ্গী লক্ষ্য করা। সেদিন সন্ধ্যায় কিন্তু তুকার কীর্ত্তনে তাঁহাকে দেখা গেল না। নিজের অপকর্ম্ম ও নিষ্ঠুরতার কথা বারবার এই মোহান্তের মনে হইতে থাকে, অনুতাপ এবং লোকলজ্জা ভয়ও দেখা দেয়।

তুকা কিন্তু রাত্রে মম্বাজীর গৃহে গিয়া উপস্থিত। চরণে লুটাইয়া পড়িয়া কহিলেন—"গোঁসাই, দোষ আমারই। বহুক্ষণ ধরে আমায় প্রহার করে আপনাকে শ্রান্ত হতে হয়েছে। আমি পদসম্বাহন করছি। আপনি আমায় ক্ষমা করুন, দয়া করে কীর্ত্তনাঙ্গনে এসে বসুন।"

এমনিতেই অনুতাপের জ্বালায় মন্বাজী গোঁসাই জ্বলিতেছেন এবার তুকার এই অমানুষী দৈন্য ও ভক্তি দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। কহিলেন, "তুকা, তুমি ভক্ত, তুমি মহৎ, একথা শুনেছি। কিন্তু এত মহৎ তুমি, তা বুঝতে পারিনি। বিঠোবার চরণে নিজের অহংবোধকে অর্পণ করে তুমি তাঁকে পেয়েছো। আর আমি রয়েছি নিজের আত্ম-ম্ভরিতায় অন্ধ হয়ে। এ অন্ধকে কি তুমি আলো দেখাতে পারবে? তোমার কাছেই আজ থেকে নিজেকে আমি ছেড়ে দিলাম।"

তুকা পরমানন্দে তাঁহাকে আলিঙ্গন দান করিলেন!

তুকারামের খ্যাতি এসময়ে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। দূর দূরান্ত হইতে প্রায়ই ভক্ত, মুমুক্ষুর দল তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়। সেবার এক ব্রাহ্মণ সাধক পন্ঢরপুরের মন্দিরে আসিয়া ধর্না দেয়। সকাতর প্রার্থনা জানায়, "বিঠ্ঠলজী, আর যে প্রভু এ আঁধারে থাকতে পারিনি। আমায় কৃপা কর, জ্ঞানের দীপটি জ্বালিয়ে দাও।"

ঠাকুরের আদেশ আসিল—"বৎস, সিদ্ধ মহাত্মা জ্ঞানেশ্বরের আরাধনা কামনা ক'র, কামনা তোমার পূর্ণ হবে।"

জ্ঞানেশ্বরের সমাধিতে উপস্থিত হইয়া ব্রাহ্মণ ধ্যান জপে মগ্ন হইলেন। এখানে যে দৈববাণী শুনিলেন, তাহাতে তাঁহার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। ঠাকুর কহিলেন,—"বৎস, দেহুতে গিয়ে আমার পরম ভক্ত তুকারামের শরণ নাও, মনস্কামনা তোমার সিদ্ধ হবে।"

সাধকটি এবার তুকারামের কাছে উপস্থিত হইলেন। তুকা তাঁহাকে দিলেন ভক্তিসাধনার কতকগুলি নিগূঢ় নির্দ্দেশ। এই সঙ্গে তাঁহার জন্য রচনা করিয়া দিলেন এগারটি বিশেষ ধরণের অভঙ্। ভগবৎ প্রসাদস্বরূপ একটি নারিকেলও দিলেন ভক্ত ব্রাহ্মণকে।

ব্রাহ্মণের কিন্তু বড় খটকা লাগিয়া গেল। ভগবানের স্তবস্তুতি সংস্কৃত ভাষায় হইবে। তা নয়। এ আবার কি? তুচ্ছ মারাঠী রচিত এ সব অভঙ্ এবং এই সামান্য নারিকেল প্রসাদ তাঁহার ভাল

লাগে নাই। এগুলি উপেক্ষা করিয়া আবার তিনি জ্ঞানদেবের সমাধি মন্দিরে চলিয়া আসেন।

কোণ্ডবা নামে এক ব্রাহ্মণ এই অভঙ্ ও নারিকেলটি ভক্তিভরে গ্রহণ করেন। কথিত আছে, ভাবসমৃদ্ধ অভঙ-পদগুলির সঙ্গে সেদিন নারিকেলের ভিতর রক্ষিত প্রচুর গুপ্তধনও তিনি পাইয়াছিলেন। কোন এক ধনাঢ্য ভক্তের বাসনা ছিল, ভক্তবর তুকারামকে কিছু ধনরত্ন দান করিয়া ধন্য হইবেন। কিন্তু বৈরাগীপুরুষ তুকাকে এ যাবৎ কোন অর্থ বা বিত্ত-বিষয় গ্রহণ করানো যায় নাই। ভক্তটি এবার তাই তুকা ও তাঁহার সেবকদের জন্য নারিকেলের অভ্যন্তরে গোপনে স্বর্ণ ও রত্নাদি পুরিয়া দেন।

তুকার রচিত ঐ অভঙ্ উত্তরকালে জনপ্রিয় হইয়া উঠে এবং 'উত্তমজ্ঞান' নামে পরিচিত হয়।

মম্বাজীর মত আরও এক ব্যক্তি তুকারামের উপর অত্যাচার শুরু করিয়া দেয়। ইনি উগ্র ধরণের রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ, নাম রামেশ্বর ভট্ট। ব্রাহ্মণেরা শূদ্র তুকার পদধুলি গ্রহণ করিতেছে। তদুপরি সনাতন সংস্কৃত ভাষায় না লিখিয়া তুকা তাঁহার অভঙ্ লিখিয়া চলিয়াছেন মারাঠী ভাষায়। এ যে এক মস্ত সামাজিক বিপ্লবের সূচনা! সনাতনপন্থী রামেশ্বর ভট্টের কাছে ইহা অসহ্য হইয়া উঠিল। এখানকার জমিদারও ভিড়িলেন তাঁহার পক্ষে। উভয়ে মিলিয়া ঠিক করিলেন, তুকারামকে গ্রাম হইতে বিতাড়িত করিবেন।

রামেশ্বরের মতিগতির কথা তুকার অজানা নাই। তবু একদিন তিনি তাঁহার গৃহে গিয়া উপস্থিত। দৈন্যভরে চরণ বন্দন করিয়া কহিলেন, "শুনলাম, প্রভু আমার ওপর ক্রুদ্ধ হয়েছেন। হবারই কথা। সত্যিই তো। বিঠোবাজীর নাম করে বেড়াই, কিন্তু প্রকৃত ভক্তির উদয় যে আজও হ'লো না। আপনি আমায় যেন পায়ে ঠেলবেন না। আপনার আজ্ঞা এখন থেকে হবে আমার শিরোধার্য্য।"

ভট্ট হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন,—"তুকা, তোমার দুঃসাহস দেখে অবাক হয়ে গিয়েছি! নীচু জাত হয়ে তুমি ব্রাহ্মণকে পদধূলি দিচ্ছ। তোমার উপদেশ আর অভঙের মধ্য দিয়ে সনাতন ধর্ম্মের উচ্ছেদ করে চলেছো। অথচ মুখে ব'লছো, আমার আদেশ মেনে চলবে। বেশ, এ যেন শুধু কথার কথা হয়ে না থাকে। তোমার সত্য রক্ষা কর! এক্ষুণি তোমার সমস্ত অভঙ্-রচনা ইন্দ্রায়ণীর জলে ফেলে দাও।"

সত্য রক্ষা না করিয়া সেদিন তুকারামের আর কোন উপায় রহিল না। বিরোধী দল পরম উৎসাহে তখনই সমস্ত অভঙের পাণ্ডুলিপি তাঁহার বাড়ী হইতে নিয়া আসিল। এ অমূল্য রত্নরাজী নিক্ষিপ্ত হইল নদীগর্ভে!

পরক্ষণেই ভক্ত তুকারামের হৃদয়ে জ্বলিয়া উঠিল তীব্র অনুতাপের জ্বালা। এ তিনি কি করিয়া বসিলেন? প্রভু বিঠোবার চরণেই যে তাঁহার সমস্ত অভঙ্ নিবেদিত। নিজের স্বত্ব-স্বামিত্ব তাহাতে কি আছে? কেন তিনি মিছামিছি এ সত্যরক্ষার মোহে পড়িলেন?

তের দিন তুকার অনাহারে কাটিয়া গেল।

মনে খেদের আর অন্ত নাই। রামেশ্বর ভট্টের সেদিনকার চক্রান্তের ফলে তাঁহার অভঙ্গুলি চিরতরে নদীগর্ভে সমাহিত হইয়া গিয়াছে। ভক্ত প্রাণের কত আকুতি, কত রসোচ্ছ্বাস সংবেদনে এই সঙ্গীত ছিল সমৃদ্ধ। ইহা শুধু তাঁহার ভক্তদেরই উপকারে আসিত না, তিনি নিজেও গাহিয়া কত উদ্দীপিত হইতেন।

বিঠোবার চরণে তুকা সেদিন ব্যাকুল মিনতি জানাইলেন, "প্রভু, তোমার চরণে উৎসর্গ করা অভঙ্গুলো যে তোমারই নিজস্ব বস্তু। মূর্খ আমি, এ মহা সম্পদের মর্য্যাদা আগে বুঝতে পারিনি। তোমার ধন এবার তুমিই আবার উদ্ধার করে দাও।"

পরম ভক্তের এ আবেদন বিঠোবা সেদিন না শুনিয়া পারেন নাই। সেই রাত্রেই স্বপ্নযোগে দেহুর এক বিশিষ্ট ভক্তের সম্মুখে তিনি

আবির্ভূত হন। তাঁহাকে কহেন, "তুকাকে তার অনশন ভাঙতে ব'ল। তাকে আরো জানিয়ে দাও, অভঙ্‌গুলো নষ্ট হয়নি। আমার প্রিয় ভক্তের নিবেদিত ধন আমি সযত্নে রক্ষা করছি। তোমরা শিগ্‌গীর জলের নীচ থেকে তা তুলে নিয়ে এসো।"

এ স্বপ্ন-কাহিনী শুনিয়া গ্রামে সেদিন চাঞ্চল্য পড়িয়া যায়। অবিলম্বে নদীতে জাল ফেলিয়া তুকার অভঙ্‌-গানের পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করা হয়। সকলে সবিস্ময়ে দেখেন, এতদিন জলগর্ভে থাকার পরও পাণ্ডুলিপির একটি পাতা নষ্ট হয় নাই।

যে রামেশ্বর ভট্টের শত্রুতা ও অত্যাচারে তুকা জর্জ্জরিত, অতঃপর তাঁহার দুর্গতিও কম হয় নাই। দুর্ব্যবহার করার ফলে তিনি এক ফকিরের কোপে পড়েন, সারা দেহে দেখা দেয় ঘৃণ্য মারাত্মক ব্যাধি।

ভট্টজীর সর্ব্ব দেহ ও মন তখন বিধ্বস্তপ্রায়। বারবার তাঁহার মনে পড়িতেছে, বিঠ্‌ঠলজীর প্রিয়জন তুকারামের কথা। কত শত্রুতাই না তিনি তাঁহার সঙ্গে করিয়াছেন। আজ এ মহাভক্তের শরণ নিলে কি প্রভুজীর কৃপা মিলিবে না?

আর্ত্ত রামেশ্বর তুকারামের চরণতলে আসিয়া পতিত হইলেন। বলা বাহুল্য, মার্জ্জনা পাইতে তাঁহার একটুও দেরী হয় নাই, ভক্তবর পরম আনন্দে তাঁহাকে আলিঙ্গন দিলেন।

ইহার পর হইতেই রামেশ্বর ভট্ট ধীরে ধীরে রোগমুক্ত হইয়া উঠেন, তাঁহার জীবনধারারও পরিবর্ত্তন ঘটে। উত্তরকালে তুকার এক বিশিষ্ট ভক্তরূপে ইনি পরিচিত হন।

গৃহিণী জিজাবাঈর হইয়াছে মহা বিপদ। স্বামী উদাসীন। কখনো ভাবাবেশে, কখনো বা অর্দ্ধবাহ্য অবস্থাতেই তিনি থাকেন! সংসারের দিকে দৃষ্টি একেবারে নাই। এদিকে দুটি অন্নসংস্থানের জন্য দিনের পর দিন জিজাকে দুশ্চিন্তায় কাটাইতে হয়। ইহার উপর তাঁহাদের গৃহে সাধুসন্ত, ভক্ত অভ্যাগতের আসা-যাওয়া তো রোজ লাগিয়াই রহিয়াছে।

স্বামীর এই বৈরাগ্যময় জীবন, তাঁহার এই অধ্যাত্মসাধন সম্বন্ধে জিজার ধারণা চিরদিনই বড় অস্পষ্ট, ইহা নিয়া মাথা ঘামাইতেও তিনি চান না। কিন্তু দারিদ্র্যের জ্বালায় বিশেষতঃ পুত্র-কন্যাদের কষ্টে অধীর হইয়া এক একদিন তাঁহাকে বিদ্রোহ করিতে হয়।

একবার দাম্পত্য কলহ চরমে পৌঁছিল। তুকারাম নিতান্ত বিরক্তিভরে সেদিন গৃহত্যাগ করিয়া দেহু হইতে কিছুটা দূরে এক অরণ্যে চলিয়া গেলেন। ভাবিলেন, ভালই হইল, চিরতরে সংসার ত্যাগ করিয়া নিভৃতে এখানে সাধন-ভজনে দিন কাটাইতে পারিবেন।

বেশ কিছুদিন চলিয়া গিয়াছে। স্বামীর আর ঘরে ফিরিবার কোন লক্ষণই দেখা যাইতেছে না, জিজাবাঈ মনে মনে প্রমাদ গণিলেন। অন্তরে অনুতাপও খুব হইল। বুঝিলেন, সর্ব্ব আসক্তি ও মায়ার বন্ধন যাঁহার শিথিল হইয়া গিয়াছে, তাঁহাকে সংসারী করিয়া তোলার চেষ্টা বৃথা। বরং স্বামী যেমনভাবে চলিতে চান, তাহাই মানিয়া নেওয়া ভাল। ঘরে থাকিয়া তিনি তাহার সাধন ভজন করুন।

জিজা তুকারামের অরণ্যাবাসে গিয়া কাঁদিয়া পড়িলেন। পত্নীর স্বভাব তুকারামের অজানা নাই—অনুতাপের তাপ কমিলেই আবার হয়তো সে উল্টা সুর গাহিতে থাকিবে। জিজাকে তাই বুঝাইয়া কহিলেন, "ছাখো, তোমার ও আমার দৃষ্টিভঙ্গী এক নয়। তবে কেন শুধু শুধু এই দ্বন্দ্ব আর অশান্তিকে বারবার ডেকে আনা? জিজা, তুমি আমায় মাপ কর। এই নিভৃতবাসেই আমায় আমার নিজ সাধনায় রত থাকতে দাও।"

পত্নী এবার ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। কাঁদিয়া কহিতে লাগিলেন, "ওগো, আমি শপথ করে বলছি, আর আমি তোমার কোন কাজে বাধা দেব না। তুমি তোমার নিজের ঘর সংসারে ফিরে এসো। যেমনভাবে থাকতে চাও, তেমনি থাকো।"

তুকারাম আবার দেহুতে ফিরিয়া আসিলেন।

তিনি চাহেন, পত্নী তাঁহারই মত বিঠোবাজীর নামরসে মত্ত হইয়া

উঠুক, প্রকৃত শান্তি ও আনন্দের আস্বাদ সে গ্রহণ করুক। সস্নেহে নানা তত্ত্বোপদেশও তাঁহাকে দিলেন। তারপর কহিলেন, "ওগো, সংসারের মায়া এবার ছাড়ো। সংসার যে কেবল সরে সরেই যায়—চিরদিনের বস্তু তো এ নয়। চিরন্তন পরমবস্তু হচ্ছে আমার বিঠোবা, তাঁর চরণে সব কিছু উৎসর্গ করে দাও। দেখবে, তাঁকে পাবে, আর তাঁর ভেতর দিয়ে আসবে শান্তি—আসবে সব কিছু।"

কথা কয়টি জিজার অন্তর স্পর্শ করিল। সাময়িকভাবে তিনি নরম হইয়া উঠিলেন। ভাবিলেন, সত্যই তো! কি কাজ নিত্যকার জীবনের এই জঘন্য কাড়াকাড়িতে? সব কিছু বিলাইয়া দিয়া ভারমুক্ত হইলে মন্দ কি?

দেহুতে ফিরিয়া আসার পর তুকারাম স্ত্রীকে সেদিন সৎপরামর্শ দিলেন, "ছাখো, আর দেরী করা নয়। ঘরের সমস্ত কিছু তৈজসপত্র দীনদুঃখীদের মধ্যে বিলিয়ে দাও। এসো, এবার আমরা হাল্‌কা হয়ে প্রকৃত বৈরাগ্যময় জীবন বরণ করি, বিঠোবার নাম-কীর্ত্তনে মত্ত হই। পরম আনন্দে দিন কাটাই।"

স্বামীর চোখে মুখে দিব্য আনন্দের ছটা। কথাগুলিও বড় মধুময়। জিজার অন্তর গলিয়া জল হইয়া গেল। এ প্রস্তাবে সম্মতি না দিয়া সেদিন তাঁহার আর উপায় রহিল না।

প্রচণ্ড উৎসাহে তুকা গৃহের সমস্ত কিছু বিতরণ করিতে লাগিলেন। সব শেষে পত্নীর একমাত্র জীর্ণ বস্ত্রখানিও যখন তিনি দান করিতে গেলেন, তখন জিজাবাঈর আর সহ্য হইল না। ক্রোধে ফাটিয়া পড়িলেন। গৃহকোণে ছিল একটি ইক্ষু দণ্ড, তাহাই যষ্টিরূপে নিয়া স্বামীর পিঠে সজোরে প্রহার করিতে লাগিলেন।

তুকা কিন্তু নীরব, অচঞ্চলভাবেই বসিয়া আছেন। গোটা আখটি তাঁহার পিঠের উপর দুইখণ্ড হইয়া গেল। জিজার চীৎকার শুনিয়া ইতিমধ্যে গৃহের অঙ্গনে প্রতিবেশীরা ভীড় করিয়াছে। ভাঙ্গা আখের

টুকরা দুইটি হাতে নিয়া তুকারাম শুধু স্মিতহাস্যে কহিলেন, "দ্যাখো, আমার জিজার কি বিবেচনা। আমাদের দুজনের দু'খণ্ড আখ দরকার, তাই সে হঠাৎ একটা অজুহাত সৃষ্টি করে, এটাকে দু'খণ্ড করে নিল।"

বীতরাগভয়ক্রোধ ভক্তপ্রবরের এ আচরণ দেখিয়া দেহুর লোকদের বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

লোহাগাঁও-এর সিবাবা কাসার গোড়ার দিকে এক বৈরিতার মধ্য দিয়াই তুকারামের সম্মুখে উপস্থিত হন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তুকার ভাগবত জীবনের প্রকৃত স্বরূপ তিনি বুঝিতে পারেন, অচিরে তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হন।

সিবাবা কাসারের স্ত্রী বড় উদ্ধত ধরণের, স্বামীর এ পরিবর্ত্তন সে মোটেই পছন্দ করে নাই। মনে কিছুটা আতঙ্কও হইয়াছে। তুকারামের প্রভাবে একবার পড়িলে স্বামী কি আর ব্যবসায়ের কাজে আগের মত মনোযোগ দিবে? দিবারাত্র নামগানে মত্ত হইয়া বরং বিষয় আশয় ছাড়িয়া দিতেই সে চাহিবে। যে করিয়াই হোক, এ বিপদ না এড়াইলে চলিবে না। তুকারামের প্রাণনাশের জন্য এই নারী তাই এক ফন্দি আঁটিয়া বসিল।

তুকা সেদিন সিবাবা কাসারের গৃহে কীর্ত্তন করিতে আসিয়াছেন। নাম গান শেষ হইয়া গেলে ভক্তগণসহ তিনি বাড়ীর বাহিরে আসিয়া দাঁড়ান। ঠিক এ সময়ে কাসারপত্নী বাড়ীর ছাদ হইতে তুকার গায়ে এক হাঁড়ি ফুটন্ত গরম জল ঢালিয়া দেয়। ফলে তুকারামের সর্ব্বশরীরে ফোস্কা পড়িয়া যায়, মারাত্মক ঘা হয়। এই ঘা নিয়া বহুদিন তাঁহাকে ভুগিতে হইয়াছিল।

ভক্ত তুকা কিন্তু অম্লানবদনে সেদিনকার এ অত্যাচার সহ্য করেন। শুধু তাহাই নয়, তাঁহার নির্দ্দেশে এই কোপনস্বভাব রমণীকে সেদিন কেহ কোন দুর্ব্বাক্যও বলিতে পারে নাই। পরে কিন্তু অনুতপ্ত হইয়া কাসার-পত্নী তুকারামের চরণে আত্মসমর্পণ করে।

তুকার সাধনার পথ দৈন্য ও বৈরাগ্যের পথ। এ পথে সহজে আসে শরণাগতি, জীবনকে রাঙাইয়া তোলে পরমতমের অনুরাগে—উত্তরণ ঘটে বিঠোবার দর্শন ও পরমপ্রাপ্তিতে।

তাঁহার ভক্তিসাধনা গ্রহণে অভিলাষী হইয়া ধনী ও প্রতিপত্তিশালী লোকেরাও অনেকে উপস্থিত হন। তাঁহারা প্রশ্ন করেন, কেন ভক্তপ্রবর তুকার এই কৃচ্ছ্রব্রত? তাঁহার সাধনপথে দুঃখ দৈন্যের এ তীব্র কষাঘাত কি গ্রহণ না করিলেই নয়?

তুকা বলেন,—এই দুঃখ দারিদ্র্যের নিষ্পেষণ ভগবানের অভিশাপ নয়—ইহা যে তাঁহার আশীর্ব্বাদ। সমস্ত কিছু আবরণ আভরণের ব্যবধান ঘুচাইয়া দিয়া প্রভু এই পথেই যে টানিয়া নেন ভক্তকে একেবারে তাঁহার বুকের কাছে। স্বীয় অভঙ-এ তুকা গাহিয়াছেন—

"ওগো, জীবনের সুখ আর স্বাচ্ছন্দ্যময় পথে ভগবান চলতে দেন না তাঁর প্রিয়তম ভক্তকে। সাংসারিক স্নেহপ্রেমের সমস্ত পাশকে তিনি করে দেন অপসারিত। তিনি যে জানেন, ভক্তের বিত্তবিভব বাড়ালে তা শুধু স্ফীত ক'রে তোলে তার অভিমান, তাই তো দারিদ্র্যের চৈতন্যময় আঘাত বারবার পাঠান আমার প্রভু!"

তুকা দাস্য-ভক্তির প্রচারক। কিন্তু কোন দিনই দুর্ব্বলের ভক্তিবাদ তিনি প্রচার করেন নাই। দৈন্যময়, প্রপত্তিময় জীবনের মধ্য দিয়া সর্ব্বসমর্পিত প্রাণ সাধক তাঁহার ইষ্টেরই তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হন, ইষ্টেরই মতন পরম জ্ঞানী ও শক্তিধর তিনি হইয়া উঠেন। এই বাণীও তাঁহার অভঙ-এ পাওয়া যায়—

"ভাই, নিরন্তর গোবিন্দের নাম করে যাও জপ, এ জপের ফলে তুমি হয়ে উঠবে গোবিন্দ-স্বরূপ। তোমার আর তোমার প্রভুর মধ্যে সকল পার্থক্যই যাবে ঘুচে। সারা অন্তর সদা ঝল্‌মল্ করবে আনন্দে, নয়ন প্লাবিত হবে প্রেমের অশ্রুধারায়।"

"ওরে ভাই, নিজেকে কেন ভাবছো ক্ষুদ্র ব'লে? তুমি যে এ বিশ্ব-সৃষ্টির মতই মহান্। পার্থিব জীবনের গণ্ডীকে দাও অপসারিত করে এই

মুহূর্ত্তেই। নিজেকে নিয়ত ভাবছো বদ্ধ ও ক্ষুদ্র, তাইতো আঁধারে তুমি নিমজ্জিত, তাইতো দুঃখময় হয়েছে তোমার জীবন।”

ভক্তিরসপিপাসু নর-নারীর কাছে তাঁহার এসব অভঙ্, অপূর্ব্ব উদ্দীপনা ও আশ্বাসবাণী নিয়া উপস্থিত হয়।

সাধনার দীর্ঘ বন্ধুর পথ বাহিয়া তুকারাম তাঁহার পরম প্রভুর দিকে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছেন। এবার পথপরিক্রমা তাঁহার সমাপ্তপ্রায়। সিদ্ধির সাফল্য অরুণোদয়ের আলোকচ্ছটার মত তাঁহার জীবনসত্তাকে আজ রাঙ্গাইয়া তুলিয়াছে। ভক্তির মাধুর্য্যে, শক্তির ঐশ্বর্য্যে, জ্ঞানের প্রভায় তিনি আজ ভরপুর।

এ সাফল্যের কথা, ভগবৎ দর্শনের কথা তাঁহার স্বরচিত অভঙ-এ ধ্বনিত হইতে শুনি—

“ওগো, আমি যে নয়নভরে দেখ্ছি ভগবানের আননখানি, আর এ দর্শনে মিল্‌ছে আমার অপার অফুরন্ত আনন্দ। আমার নয়ন রয়েছে ঐ শ্রীমুখে কেন্দ্রীভূত, আমার হাত দু'টি স্পর্শ ক'রে আছে তাঁর চরণ। একবার তাঁর দর্শন লাভ হলে অন্তরের সব তাপ যায় নিশ্চিহ্ন হয়ে। তাই তো আনন্দের স্তর থেকে স্তরে কেবলই চলছে আমার উত্তরণ।”

তুকা তাঁহার আর একটি প্রসিদ্ধ পদে ঘোষণা করিয়াছেন—

“আজ ধন্য আমি, আমার প্রয়াস হয়েছে সার্থক, প্রার্থিত পরিণতি হয়েছে আমাতে রূপায়িত। ঈশ্বরের চরণতলে হৃদয় স্থাপন করেছি —মন হয়ে গিয়েছে শান্ত। মৃত্যু আর বার্দ্ধক্যের জরা গিয়েছে ঘুচে, দেহের ঘটেছে রূপান্তর—তার ওপর পড়েছে ভাগবত আলোকের ধারা। সীমাহীন ঐশ্বর্য্যের আমি হয়েছি অধিকারী, দেখেছি কায়াহীন পরম পুরুষের পরমপদ। শাশ্বত সম্পদ হয়েছে আমার করায়ত্ত।”

তুকার প্রেমভক্তিময় সাধনার খ্যাতি, তাঁহার অলৌকিক শক্তির নানা বিস্ময়কর কাহিনী এসময়ে দিকে দিকে প্রচারিত হইতে থাকে। তাঁহার

চারিদিকে আসিয়া জড় হয় সহস্র সহস্র দর্শনার্থী ও সাধনকামী মুমুক্ষু নরনারী! ভক্ত তুকার এ সময়কার জীবন তাঁহার সাধনৈশ্বর্য্যের নানা অলৌকিকত্বে ভরপুর।

একদিন লোহাগাঁও নামক স্থানে তুকারাম নামকীর্ত্তনে মত্ত হইয়া আছেন। প্রভু পাণ্ডুরঙ্গের স্তুতি ও জয়গানে জনতার মধ্যে এক বিরাট উদ্দীপনার সৃষ্টি হইয়াছে।

এই সময়ে একটি দরিদ্রা নারী তাঁহার মৃত পুত্রকে কোলে করিয়া সেখানে উপস্থিত। মৃতদেহটি তুকারামের সম্মুখে শোয়াইয়া রাখিয়া পুত্র-শোকাতুরা মাতা চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। এ দৃশ্য বড় করুণ, বড় মর্ম্মন্তুদ!

কীর্ত্তন-নর্ত্তন থামাইয়া তুকা নীরবে সেদিকে চাহিয়া রহিলেন। রমণী কাতরকণ্ঠে তাঁহাকে কহিতে লাগিল, "বাবা, আমার এ পুত্রের প্রাণ ফিরিয়ে দাও, এ দুঃখিনীরে বাঁচতে দাও। বিঠ্ঠলজীর সত্যিকার ভক্ত যদি হও, তা'হলে আমার পুত্রের জীবনভিক্ষা অনায়াসে তুমি দিতে পারবে। আর এ কাজ না পারলে বুঝবো, প্রভুকে উদ্দেশ করে যত কিছু নামকীর্ত্তন করছো তা একেবারে নিরর্থক—এ সবই তোমার ভণ্ডামী।"

অভাগিনীর আর্ত্তি ও ক্রন্দন কোনমতেই থামিতে চায় না। তুকা করুণায় গলিয়া গেলেন, গণ্ড বাহিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। এই সঙ্গে প্রভু বিঠোবার করুণাধারাও করিল অবতরণ।

ধীর পদক্ষেপে মৃত বালকের কাছে গিয়া তুকা তাহার দেহ স্পর্শ করিলেন। সকলে সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল, মৃতের দেহে প্রাণসঞ্চার হইতেছে। ধীরে ধীরে সে দুই চক্ষু উন্মীলন করিল। ভক্তশ্রেষ্ঠ তুকা ও তাঁহার প্রভু বিঠোবার জয়ধ্বনিতে সেদিন লোহাগাঁও প্রকম্পিত হইয়া উঠিল।

সাধনার ফলে একি বিপুল শক্তি সঞ্চারিত হইয়াছে ভক্ত তুকারামের

সত্তায়! এক বিশিষ্ট ভক্ত প্রশ্ন করিয়া বসেন, "আচ্ছা, আপনার এ অলৌকিক শক্তির উৎস রয়েছে কোথায়? কোন্ নিগূঢ় সাধনার বলে অর্জ্জন করেছেন এ অদ্ভুত ক্ষমতা?"

ভক্তবর তুকা তাঁহার সদ্য রচিত এক অভঙ-এর মাধ্যমে এ কথার চমৎকার উত্তর দেন—

"ভক্তির রস-সাগরে নিহিত রয়েছে কত অমূল্য মণিমুক্তা, ভাগবত করুণার কত ঐশ্বর্য্য। রাজা স্বেচ্ছামত সব কিছু দাবী করে বসেন, কেউ তাতে দিতে পারে না বাধা। ভক্তি আর সেবা দিয়ে ভৃত্যই হয়ে পড়ে এই রাজার মত শক্তিমান—অপ্রতিরোধ্য। কারণ, সাধক তখন হয়েছে প্রভুর সাথে একাত্মক। আর তখন উঁচু সিংহাসনের ওপর বসে নীচের দিকে সবাইকে সে তাকিয়ে দেখে। ওগো, বিশ্বাস আর শরণাগতির জোরেই তুকা পেয়েছে তার সিংহাসন, তাইতো মানুষ তাঁকে নিবেদন করছে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য।"

"প্রভুকে আমার পেয়ে গিয়েছি আমার এই বুকের ভেতর, আয়ত্তের ভেতর। যে প্রশ্ন আমি করি পাই তারই উত্তর। সংসার আমি ছেড়েছিলাম, তাই তো পেয়েছি সংসারের সার। যা কিছু আমি করি প্রার্থনা, তা-ই তিনি করেন পূর্ণ।"

তুকারাম ত্যাগী সাধক, ঈশ্বরের চরণে তিনি সর্ব্ব সমর্পিতপ্রাণ। একান্ত নিভৃতে বসিয়া প্রেমময়ের সাথে তিনি দিবানিশি অতিবাহিত করিবেন, ইহাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু করিতেছেন ঠিক ইহার বিপরীত! নিজের ঘরে সহস্র নরনারীর ভীড় জমাইয়া বসিয়াছেন।

জনৈক দর্শনার্থী তাঁহাকে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। তুকারাম তাঁহার অভঙ-এর মধ্য দিয়া উত্তর দেন—

"সংসারকে এড়িয়ে কোথায় আমি ছুটে পালাবো, বলতো? যে দিকেই চাই, দেখি প্রভু আমার বিরাজ করছেন সেখানেই। একি অদ্ভুত তাঁর লীলা? নির্জ্জনতা থেকে আজ তিনি বঞ্চিত করেছেন আমাকে—অথচ তাঁকে ছাড়া কোন স্থানই যে আমি দেখতে পাইনে।

একথাও তো রয়েছে জানা—ঘুম থেকে কোন মানুষ যখন জেগে ওঠে তখন সে দেখে, নিজেরই ঘরে সে করছে অবস্থান।"

সিদ্ধপুরুষরূপে তুকারাম এখন সর্ব্বত্র খ্যাত। যেসব ভক্ত একে একে তাঁহার চরণে আশ্রয় নেন তাঁদের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। এই সব ভক্ত এবং শিষ্যের মধ্যে আছেন—নিলোবা, সন্তাজী তেলী, গঙ্গারাম মাভল, রামেশ্বর ভট্ট, সিবাবা কাসার, মহাদাজী পন্ত, বহিনাবাঈ প্রভৃতি চারিত্রিক ধ্বতি, মহত্ত্ব, গুরুনিষ্ঠা ও ভক্তি সাধনার সাফল্যে ইঁহারা সকলেই স্বনামধন্য হইয়া উঠেন।

তুকার বৈরাগ্যময় জীবন, তাঁহার ভক্তি ও প্রেমের ভাবৈশ্বর্য্য সারা মহারাষ্ট্রকে ধীরে ধীরে উদ্দীপিত করিয়া তোলে। অন্তর সাধনার এক নবতর চেতনা সেখানে জাগ্রত হয়, সাধারণ মানুষের মধ্যে উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠে নূতন প্রাণের জোয়ার। তুকার শত শত ভক্তিমূলক অভঙ্ সমাজের উচ্চ-নীচ সমস্ত স্তরে প্রচারিত হইতে থাকে। বিশেষ করিয়া নিম্নশ্রেণীর ও সাধারণ মারাঠীদের মধ্যে তাঁহার ধর্ম্মাদর্শ প্রবল আত্মপ্রত্যয় আনয়ন করে। মারাঠা জাতির পুনরুজ্জীবনে ইহা কম সহায়ক হয় নাই। রানাড়ে প্রভৃতি মনিষীগণ একবাক্যে ভক্ত সাধক তুকার এ অবদানের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। ইঁহাদের অনেকের মতে, মহারাষ্ট্রের সাহিত্যের বিপুল সম্ভাবনা সেদিন বীজাকারে নিহিত ছিল তুকারই অভঙ-এ।

চারিদিকে তখন সাধু তুকারামের খ্যাতি প্রতিপত্তির অন্ত নাই। অগণিত ভক্ত ও শিষ্য নিয়া দেহু ও লোহাগাঁও-এ তিনি সর্ব্বদা নাম-কীর্ত্তন করিয়া বেড়ান। মারাঠা-নায়ক শিবাজীর অন্যতম আবাসস্থল পুণা এই দেহু ও লোহাগাঁও-এরই মধ্যবর্ত্তী। বয়সের দিক দিয়া শিবাজী তখন নিতান্ত তরুণ। সবেমাত্র তোরাণা দুর্গ জয় করিয়াছেন, ধর্ম্মরাজ্য স্থাপনের স্বপ্নে রহিয়াছেন ভরপুর। তাই এ সময়ে তুকার সহিত মাঝে মাঝে তিনি সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন।

সিদ্ধসাধক তুকা কিন্তু বুঝিয়া নিয়াছিলেন—তাঁহার নিজের সাধনপথ আর শিবাজীর অধ্যাত্ম-আদর্শ সমধর্ম্মী নয়। শিবাজীকে তাই তিনি রামদাস স্বামীর নির্দ্দেশে চলিতে এবং তাঁহারই আশ্রয় গ্রহণ করিতে পরামর্শ দেন। এ পরামর্শের ফল কল্যাণকর হয়, মারাঠার জাতীয় জীবনের উন্মেষে ইহা সাহায্য করে।

ভক্তবর তুকা ও শিবাজীর গুরু কর্ম্মযোগী রামদাসের একবার মিলন ঘটে। প্রবীণ সাধক তুকার জীবন তখন অন্তর্ম্মুখীন হইয়া পড়িয়াছে। পন্ঢরপুরে বিঠ্ঠল মন্দিরের কাছেই তিনি বেশী সময় থাকেন। আর রামদাস সাধনা করেন কৃষ্ণা নদীর তীরে কুটির বাঁধিয়া।

বিঠ্ঠল মন্দিরে তুকার সহিত রামদাস সাক্ষাৎ করেন, তাঁহাদের এ মিলন বড় মর্ম্মস্পর্শী হইয়া উঠে। দর্শনমাত্রেই উভয়কে ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িতে দেখা যায়। নিগূঢ় অধ্যাত্মভাবের আদান-প্রদানের মধ্য দিয়া দুই মহাপুরুষের আনন প্রসন্নতার দীপ্তিতে ভরিয়া উঠে।

১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দের ফাল্গুন মাস। দিকে দিকে নূতন প্রাণের সাড়া নূতন জীবনের স্পন্দন জাগিয়া উঠিয়াছে। তরুলতার কচি কিশলয়ের হাতছানি, আকাশে বাতাসে অজানালোকের দিব্য মধুর স্পর্শ। ইন্দ্রায়ণী নদীর কলগানে অবিরাম শোনা যায় ঘর-পালানো গানের সুর। দেহু গ্রামের নিভৃত কুটিরটিতে বসিয়া তুকার হৃদয়েও জাগে সেই সুরের অনুরণন। জীবনে তাঁহার ওপারের ডাক আসিয়া গিয়াছে।

এবার শুধু আর আলোক-সঙ্কেত নয়—আলোকের প্লাবন নামিয়া আসে মহাভক্তের জীবনে। এ প্লাবনের বেগ মরজীবনের প্রাকারটি একেবারে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ফেলিতে চায়।

জীবনে আসিয়াছে পরমপ্রাপ্তি। সাধক তুকারামের এবার আপ্তকাম। এসময়কার রচিত অভঙ্-এ তিনি বলিতেছেন—

"ওগো, দিন-রাতের মধ্যে কোন পার্থক্যই আজ আর আমি খুঁজে পাইনে! নিখিল বিশ্বে ওতপ্রোত হয়ে আছে আলোকের একি মহা

উদ্ভাসন ! যে পরমশান্তি আমি করছি উপভোগ, কি করে করবো তার বর্ণনা ? প্রভু, তোমার নামের অলঙ্কার করেছি আমি পরিধান। তোমার শক্তি, আর তোমার ঐশ্বর্য্য আমার দোরগোড়ায় এনে জড়ো করেছে সব কিছু। কোন অভাব তো আর আমার নেই।

এবার একাকারের পালা ! প্রভু ও ভৃত্য, ইষ্ট ও ভক্ত এবার একই পরম রসে একীভূত হইয়া যাইতেছেন। মরলীলার উপর যবনিকা টানিয়া দিয়া ভক্তরাজ তুকা বিদায় নিতে উন্মুখ। শেষ অভঙ্‌গুলিতে ইহারই ইঙ্গিত ফুটিয়া উঠিয়াছে—

"দেখ্‌ছি, ঈশ্বরই সব কিছুর দাতা—আবার ভোক্তাও শুধু তিনিই নিজে। অনুভূতির আর কি থাকে বাকী ? প্রকাশ করবো এই পরম তত্ত্ব—এমন ভাষাই বা কই আমার কণ্ঠে ? ওরে ভাই, আজ নয়ন দু'টি মেলে দেখলে, কেবলি চোখে পড়ে আমার নিজেরই রূপ !"

"অতল গভীর আজ ডাক দিয়েছে আমার গভীরকে। সব কিছু মিশে গিয়েছে এক পরমসত্তায় ! তরঙ্গ আর মহাসাগর হয়ে গিয়েছে এক। এ বিশ্বজগতে কোন কিছুই হয় না আবির্ভূত—তিরোহিতও হতে পারে না কোন কিছু। আত্মা নিজেকে নিরন্তর বেষ্টন করে চলেছে। চারদিকে নিজেকেই দিয়ে। মহাবিরতির লগ্ন এসে গিয়েছে ! কোথায় আজ সূর্য্যের উদয়—কোথায়ই বা তার অস্ত ?"

এককারের মহাবন্যা উত্তাল হইয়া ছুটিয়া আসিয়াছে !

ভক্তশ্রেষ্ঠ তুকারামের দেহের প্রাকারটি এবার টুটিয়া গেল। প্রভু বিঠ্‌ঠলজীর নিত্যধামে ঘটিল তাঁহার উত্তরণ, চিরমিলনের বেদীতে গিয়া তিনি দাঁড়াইলেন।

সাশ্রুনয়নে ভক্তের দল তাঁহার মরদেহটি সেদিন ইন্দ্রায়ণীর পবিত্র স্রোতধারায় ভাসাইয়া দিল।

গোস্বামী তুলসীদাস

আকাশে মেঘের ঘনঘটা। সন্ধ্যার অন্ধকারও নামিয়া আসিয়াছে। তুলসীদাস দ্বিবেদা বড় চিন্তিত হইয়া উঠিলেন। যজমান বাড়ীর কাজে এত দূরে আসিয়া পড়িয়াছেন, দেরীও কম হয় নাই। এবার স্বগ্রাম রাজাপুরে না ফিরিলে নয়। ত্রস্তপদে তাঁহাকে ছুটিতে হইল।

ফিরিয়া আসিয়া দেখেন, স্ত্রী ঘরে নাই। সে কি কথা। এমন অসময়ে রত্নাবলীর তো কোথাও যাইবার কথা নয়! ঘর অঙ্গন তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া তুলসী প্রতিবেশীদের বাড়ীতে স্ত্রীর সন্ধানে গেলেন। শুনিলেন, তাঁহার শ্বশুরের অন্তিম সময় উপস্থিত—এ সংবাদ পাইয়া রত্না তাড়াতাড়ি পিত্রালয়ে চলিয়া গিয়াছে।

শিশুকালেই তুলসী পিতৃমাতৃহীন হইয়াছেন। সত্যকার আপনার বলিতে রত্না ছাড়া আর তাঁহার কেহ নাই। আজিকার নিঃসঙ্গ সংসারে এই পত্নীই হইয়া উঠিয়াছে তাঁহার জাবনসর্ব্বস্ব, তাহাকে চোখের আড়াল করা তুলসীর পক্ষে তাই বড় কঠিন।

স্ত্রী তাঁহার পরম রূপলাবণ্যবতী, গুণপনার দিক দিয়াও কম নয়। সারা মনপ্রাণ দিয়া তুলসী তাহাকে ভালবাসিয়াছেন, আর তাহাকে কেন্দ্র করিয়াই তুলসীর জীবন হইতেছে আবর্ত্তিত।

বিবাহের পর বারবার শ্বশুরালয় হইতে রত্নাকে নিতে আসিয়াছে। কিন্তু পত্নী বিরহ কোন মতেই সহ্য করিতে পারিবেন না, তাই কখনো তাহাকে ছাড়িয়া দেন নাই। পাড়ার লোকে স্ত্রৈণ, মোহান্ধ বলিয়া কত গালি দিয়াছে, তাহাতে তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই।

রত্না যদি আজ পিত্রালয়ে গেলই, তুলসীর জন্য একটু অপেক্ষা করা তাহার সহিল না? অভিমানের কান্নায় তিনি ফাটিয়া পড়িলেন।

শ্বশুরের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। স্ত্রীকে কতদিন থাকিতে হইবে কে জানে? অন্তরে জাগিয়া উঠিল অধীর উন্মত্ততা।

ঝটিকার বেগ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। তবুও ইহারই মধ্যে এক বস্ত্রে তুলসী বাহির হইয়া গেলেন।

ঝড়-বাদলের মহাতাণ্ডবে তাঁহার আজ কোন হুঁসই নাই। আকাশের বুক চিরিয়া বিদ্যুৎনাগিনীরা গর্জ্জিয়া ফিরিতেছে। বজ্র-পাতের শব্দে কান পাতা দায়। মড়্মড় শব্দে ঘরবাড়ী গাছপালা ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। তুলসীর দেহ ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল। ঝটিকার মত্ততা আজ পাইয়া বসিয়াছে বুঝি তাঁহাকেও।

সিক্ত দেহে, ছিন্ন বস্ত্রে উদ্‌ভ্রান্তের মত তিনি শ্বশুরালয়ে আসিয়া উপস্থিত। হঠাৎ এ অবস্থায় তাঁহাকে দেখিয়া সকলের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। স্ত্রৈণ স্বামীর একি অকারণ উন্মত্ততা? লজ্জায় ক্ষোভে-দুঃখে রত্না যেন মাটিতে মিশিয়া যায়। কুটুম্বের দল শ্লেষ ও বিদ্রূপ বর্ষণের জন্য তুলসীকে ঘিরিয়া দাঁড়ায়।

রত্নার আয়ত নয়ন দুইটি ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। সব পাগলামিরই একটা সীমা আছে। নাঃ—আর ইহা সহ্য করা যায় না। কঠোর স্বরে স্বামীকে সে ভৎসনা করিয়া উঠিল—"শোন, আমি আজ ঠিকই বুঝতে পেরেছি, আমার প্রতি তোমার এ আকর্ষণ মোহের, প্রেমের নয়। এই হাড়-মাসের দেহটার পেছনে যে আসক্তি, যে অনুরাগ আজ অবধি দেখিয়েছ, তা ভগবান রামচন্দ্রের চরণে নিবেদন করলে বেঁচে যেতে, পেতে পারতে সর্ব্বসিদ্ধি! আজ থেকে তোমার এই উন্মত্ততা থেকে আমায় বাঁচাও। আমায় তুমি মুক্তি দাও।"

বড় অতর্কিত, বড় তীব্র রত্নার এ আঘাত! এ আঘাত নিমেষমধ্যে তুলসীকে নিস্তেজ করিয়া ফেলিয়াছে। ধীর পদক্ষেপে মোহাবিষ্টের মত তিনি পথে আসিয়া দাঁড়াইলেন। এদিকে রত্না সশব্দে গৃহের দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

তুলসীদাসের সম্মুখে বাহির-দুয়ার সেদিন বন্ধ হইলেও ভিতর-দুয়ার

কিন্তু হঠাৎ খুলিয়া যায়। মহালগ্ন যে সেদিন তাঁহার জীবনে উপস্থিত তাইতো রত্নাবলীর এ অপমান হইয়া উঠিয়াছে চৈতন্যময়। দুঃসহ বেদনায় তুলসী নয়ন মুদিলেন। জীবনের কেন্দ্র হইতে আজ তিনি বিচ্যুত, একেবারে নিরাশ্রয়! সহসা মানসলোকে এ সময়ে ভাসিয়া উঠিল নবদূর্ব্বাদল-শ্যাম শ্রীরঘুনাথের মূর্ত্তি। হাতছানি দিয়া এ মূর্ত্তি তাঁহাকে কোথায় টানিয়া নিতে চায়?

পথের কথা কিছু জানা নাই, কিন্তু তুলসীদাসকে ঘর ছাড়িয়া পথে বাহির হইতে হইল। অন্তরাত্মার আহ্বান আসিয়া গিয়াছে, আর যে তাহা প্রত্যাখানের উপায় নাই।

শ্বশুরালয় হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া দ্রুতপদে আগাইয়া চলিলেন। পিছন হইতে অনুতপ্তা স্ত্রীর ক্ষীণ কণ্ঠধ্বনি তখনো ভাসিয়া আসিতেছে। কিন্তু আজ আর তো ফিরিবার উপায় নাই। বন-বাদাড় ভাঙ্গিয়া তিনি গ্রামের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

সেদিনকার এই গৃহত্যাগী যুবকই উত্তরকালের গোস্বামী তুলসীদাস। উত্তর ভারতের শ্রেষ্ঠ ভক্তকবিরূপে লক্ষ লক্ষ মানবের জীবনমূলে তিনি রামনামের যে রসধারা সিঞ্চন করেন, সমাজের সর্ব্বস্তরে তাহা বেগবতী ভক্তি-প্রবাহ উৎসারিত করিয়া দেয়।

তুলসীর সমগ্র অধ্যাত্মজীবনটি হইয়া উঠে এক পবিত্র তুলসীতরু বিশেষ। ভক্ত সাধকের এ কল্যাণময় রূপ সমসাময়িক কালের মহা-বৈদান্তিক মধুসূদন সরস্বতীর শ্লোকে ফুটিয়া উঠিয়াছিল—

আনন্দকাননেহ্যস্মিন্ জঙ্গমঃ তুলসী তরুঃ।
কবিতা মঞ্জরী যস্য রাম-ভ্রমর-ভূষিতাঃ॥

—বারাণসীর আনন্দকাননে তুলসীদাস হইতেছেন একটি চলমান তুলসীতরু, এ তরুর কবিতা-মঞ্জরী রামরূপ ভ্রমরকূলে ভূষিত।

রামভক্তিরসের অমৃত তুলসী অকৃপণ হস্তে বিলাইয়াছেন। সেই সঙ্গে গাহিয়া গিয়াছেন 'কলিবিটপ কুঠারী'—কলিরূপ বৃক্ষের বিনাশ-কারী কুঠার, রামশক্তির প্রশস্তি। ভাবের ঐশ্বর্য্যে, ভাষার লালিত্যে

রামরাজ্যের বর্ণনাকে তিনি করিয়া তুলিয়াছেন অবিস্মরণীয়। যে ধর্ম্ম-রাজ্য বা রামরাজ্যের বাণী তুলসী ভারতের অধ্যাত্মক্ষেত্রে প্রচার করিয়া যান, দুই শত বৎসর পরে এদেশের রাজনীতির ক্ষেত্রে মহাত্মা গান্ধী সেদিন সেই আদর্শ ই স্থাপন করেন।

রঘুনাথজীর সাধনায় মহাসাধক তুলসীদাস সিদ্ধিলাভ করেন, নানা অলৌকিক যোগ-বিভূতি লাভেও তিনি সমর্থ হন। তারপর ব্রতী হন আদিষ্ট রামনাম প্রচার-কর্ম্মে।

প্রয়াগের নিকটে বান্দা জেলার রাজপুর গ্রাম। এই গ্রামে ১৬৪৬ খ্রীষ্টাব্দে তুলসীদাস জন্মগ্রহণ করেন।

তাঁহার পিতা ছিলেন পণ্ডিত আত্মারাম দ্বিবেদী, আর মাতা হুলসী দেবী। দ্বিবেদী মহাশয় পরাশর গোত্রীয় ব্রাহ্মণ। ধর্ম্মপ্রাণ ও সুপণ্ডিত বলিয়া স্থানীয় অঞ্চলে তাঁহার খ্যাতি ছিল।

নিজের রচিত দোঁহাতে তুলসীদাস লিখিয়া গিয়াছেন, 'মাতু পিতা জগ জায় তজ্যো'। অর্থাৎ তাঁহার জন্মের কিছুকাল পরেই জনক-জননীর লোকান্তর ঘটে। শুধু তাহাই নহে, প্রধানতঃ দুঃখ কষ্ট ও অবহেলার মধ্য দিয়া শৈশবে তিনি বাড়িয়া উঠেন। এই খেদ তাঁহার কবিতা ও গানে পাওয়া যায়।

মাতা-পিতা উভয়ের মৃত্যুর পর তুলসী তাঁহার পিতার গুরুদেব নরসিংদাসের আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইতে থাকেন। এই সুদর্শন, নিরাশ্রয় বালকের উপর বৃদ্ধের স্নেহ পড়ে, পুত্র-নির্ব্বিশেষে তাঁহাকে পালন করিতে থাকেন। বালকের শিক্ষা-দীক্ষা, শাস্ত্রাধ্যয়ন প্রভৃতি তাঁহারই তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়।

তুলসীদাস বয়সে তখনো নিতান্ত তরুণ, কিন্তু সংসারশ্রমে তাহাকে না ঢুকানো অবধি নরসিংদাসের স্বস্তি নাই। তোড়জোড় করিয়া তিনি তাহার বিবাহ দিয়া দিলেন।

কয়েকখানি গ্রামের পরেই দীনবন্ধু পাঠকের বাস। সৎ ও ধার্ম্মিক

বলিয়া সকলে তাঁহাকে জানে। এই ব্রাহ্মণের কন্যা রত্নাবলীকে তুলসী বিবাহ করিলেন।

কিশোরী রত্নার রূপের তুলনা নাই, আবার তেমনি মধুর তার স্বভাব! তুলসীর জীবনে সে হইয়া উঠিল শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ।

ছেলেবেলা হইতেই তুলসী বড় ভাবপ্রবণ, কাব্যে তাঁহার অসাধারণ অনুরাগ। রত্নার রূপের মোহ, রত্নার ভালবাসা তাই বড় সহজে তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছে। তাহার অদর্শন এক মুহূর্ত্তের জন্যও তিনি সহ্য করিতে পারেন না। সে-ই কিনা আজ চরম আঘাত হানিয়া গেল!

এ আঘাত সেদিন আনিয়া দেয় সত্যকার চৈতন্য, তুলসীদাসকে ঠেলিয়া বাহির করে ইষ্ট-প্রাপ্তির পরম পথে।

অন্তরে সেদিন ঝলকিয়া উঠিয়াছে নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, রঘুবীরজীর মূর্ত্তি। চরম আহ্বান জীবনের দ্বারে আসিয়া গিয়াছে। পাগলের মত তুলসী বাহির হইয়া পড়িলেন। কোথায় যাইবেন, কে ইষ্টলাভের পন্থা জানাইয়া দিবে, কিছুই জানা নাই। শৈশব হইতে শুনিয়া আসিতেছেন, বারাণসী ভারতের প্রাণকেন্দ্র, বহু সাধক ও আচার্য্যের বাসভূমি। সেই দিকেই পা বাড়াইলেন। অন্তরে নিলেন মুক্তির সঙ্কল্প, বদনে নিরন্তর রামনাম জপ।

আকাশে প্রকৃতির তাণ্ডব শেষ হইয়া গিয়াছে। তুলসার জীবনেও বিক্ষোভ শেষে আসিয়াছে এক পরম প্রশান্তি। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া বহু কষ্টে কাশীতে আসিয়া পোঁছিলেন। ইষ্টনামের অস্ফুট গুঞ্জন তখন নিরন্তর তাঁহার কণ্ঠে ধ্বনিত হইতেছে।

আশ্রয় মিলিতে বেশী দেরী হয় নাই। বিখ্যাত শাস্ত্রবিদ্ সনাতনদাসের দৃষ্টি এই ভক্তিমান সর্ব্বত্যাগী যুবকের উপর পড়িল। পরম স্নেহে আচার্য্য তাঁহাকে নিজের টোলে আশ্রয় দিলেন।

তুলসী এখানে শাস্ত্র অধ্যয়নে ব্রতী হন, আর সঙ্গে সঙ্গে চলিতে থাকে ইষ্টদেব রঘুনাথজীর নাম কীর্ত্তন ও লীলা-বিবরণ পাঠ। এ টোলে

নানা দিগ্-দেশাগত ছাত্রের ভীড় লাগিয়াই আছে। সাধন ভজনের জন্য যে নিভৃতির প্রয়োজন তাহা মোটেই নাই। তুলসী তাই নগরীর প্রান্তে এক বনে আসিয়া আশ্রয় নিলেন।

দৈহিক সুখ দুঃখ, অশন বসনের দিকে দৃষ্টি নাই। একান্ত নিষ্ঠায় দৈন্যভরে তুলসী সাধনায় রত হইয়াছেন। কিন্তু কোথায় পথ? কোথায় আলো? পরম প্রভুর দর্শন কি করিয়া মিলিবে? দুশ্চিন্তায় ক্রমে তিনি অধীর হইয়া উঠিলেন।

প্রত্যুষে ভজনকুটিরের কাছেই এক ঝোপে তুলসীদাস শৌচকার্য্য করেন। তারপর সম্মুখস্থ এক গাছের নীচে ঘটির অবশিষ্ট জলটুকু ঢালিয়া দিয়া আসেন। ইহাই তাঁহার নিত্যকার অভ্যাস।

ঐ বৃক্ষে বাস করে এক ব্রহ্মদৈত্য। রোজ তুলসীদাসের প্রদত্ত জলে সে তাহার পিপাসা মিটায়। সেদিন গভীর রাত্রে প্রেতটি হঠাৎ তুলসীর সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করে। বলে, "তুলসী, তোমার ওপর আমি বড় প্রসন্ন হয়েছি। এই গাছের গোড়ায় রোজ তুমি জল সিঞ্চন কর, তাতে আমি তৃপ্ত হই। তোমার কি উপকার আমি করতে পারি, বল।"

তুলসী সবিনয়ে কহেন, "সূক্ষ্মলোকচারী যিনিই আপনি হোন, আপনাকে আমার প্রণাম নিবেদন করছি। সত্যিই যদি আমার কোন উপকার করতে চান, বর দিন যেন ইষ্টলাভ হয়।"

প্রেত খল্ খল্ করিয়া হাসিয়া উঠে। বলে, "সেকি গো, এত শক্তিই যদি থাকবে, নিজে এমন দুর্ভোগ ভুগবো কেন? তা পারবো না, ভাই। তবে তোমায় আমি তোমার রঘুনাথজীর সত্যকার পথ-প্রদর্শকের সন্ধান দিতে পারি।"

তুলসী সাগ্রহে এ সন্ধান জানিতে চাহিলেন।

ব্রহ্মদৈত্য কহিল, "কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাটের কিছুটা উত্তরে রোজ রামায়ণ পাঠ হয়। সেই সভার এক কোণে দেখ্‌বে এক জরাজীর্ণ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ নীরব নিশ্চল হয়ে বসে আছেন। রোজকার পাঠের তিনি

একনিষ্ঠ শ্রোতা। সকলের আগে রামায়ণ সভায় প্রবেশ করেন, নিভৃতে নাম-গান শোনেন, আর সকলের শেষে তাঁকে দেখা যায় স্থান ত্যাগ করতে। তিনিই তোমায় প্রার্থিত বস্তুর সন্ধান দিতে পারবেন।"

তুলসীদাস বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া চাহিয়া আছেন।

প্রেতপুরুষ স্মিতহাস্যে বলিয়া উঠিলেন, "তুলসী, তবে শোন, এই ছদ্মবেশী বৃদ্ধই ভক্তরাজ পবননন্দন হনুমান। তাঁর শরণাগত হও, প্রভু শ্রীরামচন্দ্র অচিরে দেবেন দর্শন।"

নির্দ্দিষ্ট রামায়ণের আসরে গিয়া তুলসী দেখিলেন,—সত্যই তাই। একটি বৃদ্ধ পরম ভক্তিভরে সভার কোণটিতে বসিয়া আছেন, সমাহিত চিত্তে পাঠ শুনিতেছেন।

পাঠ শেষ হইল। সভাস্থল প্রায় জনশূন্য। সর্ব্বশেষে বৃদ্ধ শ্রোতাটিকে নির্গত হইতে দেখা গেল। দূরে এক নিভৃত স্থানে গিয়া তুলসীদাস তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। পরমভাগবত তুলসীর আর্ত্ত ক্রন্দন সেদিন আর থামিতে চায় না। ভক্তরাজ মারুতি করুণার্দ্র হইয়া আত্মপ্রকাশ করিলেন। তুলসীর শিরে বর্ষিত হইল তাঁহার কৃপার ধারা।

ভক্তবীর মারুতিই যে প্রভু রঘুনাথজীর দ্বার অধিকার করিয়া আছেন! তুলসীর ভাগ্য ভাল, তাঁহাকেই সদ্‌গুরুরূপে প্রাপ্ত হইলেন।

তুলসীর ভক্তদের মতে, মারুতিই কৃপাভরে নরবপু ধারণ করিয়া তুলসীকে সাধনমার্গের সঙ্কেত প্রদান করিয়া যান। তাঁহারই উদ্দেশে তুলসী লিখিয়া গিয়াছেন—

বন্দউঁ গুরুপদ কল্প
কৃপাসিন্ধু নবরূপ হরি

ভক্ত তুলসীর ধ্যান-কল্পনায় ভক্তরাজ অঞ্জনাতনয় হইতেছেন শৈব শক্তির এক মূর্ত্ত বিগ্রহ। তাঁহার মতে, স্বয়ং মহেশ্বরই রামনাম কীর্ত্তনের লোভে মহাবীর হনুমানের রূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন।

সূক্ষ্মলোকচারী মহাবীরজীর আশীর্ব্বাদ হয় তুলসীর জীবনের পরম

সম্পদ। শুধু তাহাই নয়, তুলসীর সাধনজীবনের সর্ব্ব প্রয়োজনে তাঁহার মঙ্গলময় আবির্ভাব ঘটিতে দেখা যাইত, কৃপা করিয়া অনেক কিছু সমস্যার সমাধান তিনি করিয়া দিতেন।

এই রঘুনাথ-দূত সম্বন্ধে তুলসী লিখিয়া গিয়াছেন—

ধীর বীর রঘুবীর প্রিয়
সুধীন সমীরকুমার।
আগম সুগম সব কাজকর
করতল সিদ্ধিবিচার।

অর্থাৎ, রঘুবীরের প্রিয়পাত্র, ধীর ও বীর পবনকুমার হনুমানের ধ্যান কর, সর্ব্বসাধনা এবং সর্ব্বসিদ্ধি হবে তোমার করতলগত।

মাসের পর মাস কাটিয়া যায়। কিন্তু যে জন্য সকল কিছু ত্যাগ করিয়া তুলসী আসিয়াছেন, তাহা কই? ইষ্ট সাক্ষাৎ তো এখনো হইতেছে না। তিনি ক্রমেই বড় ব্যগ্র হইয়া পড়িতেছেন।

ছদ্মবেশী মহাবীরজীকে একদিন খুব চাপিয়া ধরিলেন। রঘুনাথজীর দর্শন করাইয়া দিতেই হইবে নতুবা তুলসী কিছুতেই ছাড়িবেন না। সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘপথ সেদিন তাঁহাকে অনুসরণও করিলেন।

মহাবীরজীর আননে খেলিয়া গেল রহস্যময় হাসি।

কহিলেন, "বৎস, আর আমার অনুসরণ ক'রো না, ফিরে যাও। আগামী পরশু পবিত্র রামনবমী তিথি। ঐদিন নিজের কুটিরে বসেই তুমি প্রভু রামচন্দ্রজীর দর্শন লাভ করবে।"

রামনবমী তিথি সমাগত। প্রতীক্ষা বহুক্ষণই করা হইল, কিন্তু ইষ্টদেবের আবির্ভাব তো হইল না! মহাবীরজীর বাণী কি তবে মিথ্যা হইবে? অথবা আবাহনের কোন ত্রুটি হইয়াছে, তাই কি প্রভু অসন্তুষ্ট হইয়াছেন?

হঠাৎ বাহিরে শোনা গেল এক কোলাহল। তিনি অঙ্গনে ছুটিয়া আসিয়া দাঁড়াইলেন। এক বেদে ও বেদিনী সেখানে বাঁদর নাচ দেখাইতে

আসিয়াছে—আর পিছে রহিয়াছে ভিক্ষা-ঝুলি স্কন্ধে এক সুদর্শন তরুণ। গোস্বামীজীকে তাহারা নৃত্য না দেখাইয়া ছাড়িবে না।

এ আবার কি আপদ জুটিল! সারাদিন প্রতীক্ষা আর উৎকণ্ঠায় কাটিয়াছে। এবার হতাশায় তুলসী যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছেন। ক্রুদ্ধস্বরে কহিলেন, "যাও, এখনি চলে যাও এখান থেকে! নাচের কোন প্রয়োজন নেই।" সঙ্গে সঙ্গে গৃহের দরজাও হইল রুদ্ধ।

অন্তর তাঁহার অনুশোচনার দহনে জ্বলিতেছে। তিনি নীচ, নিতান্ত হীনবুদ্ধি—তাই তো আজ মারুতির বাণীও মিথ্যা হইয়া গেল।

রামায়ণ পাঠ ভাঙ্গিয়া গেলে সেইদিনই ছদ্মবেশী পবননন্দনকে তুলসী চাপিয়া ধরিলেন। মহাবীরজী বলিলেন, "সে কি কথা, তুলসী! রামচন্দ্রজী, মা জানকী, লক্ষ্মণ আর আমি—সবাই তো গিয়েছিলাম! প্রমাণ চাও? চেয়ে ছাখো, আমার গলায় এখনও দড়ির দাগ রয়েছে। বেদের দলকে তুমি চিনতে পারোনি। জ্যোতির্ম্ময় দর্শন তুমি এখন সহ্য করতে সমর্থ হবে কেন, তুলসী? তাই তো ছদ্মবেশে কৃপাময়ের এই দর্শন দান! সাধনার গভীরে এবার থেকে তুমি ডুবে যাও, পরম প্রভুর চিন্ময় রাজ্যে প্রবেশ কর। আমি দ্বার ছেড়ে দিচ্ছি।"

নাম জপ আর কঠোর তপস্যায় তুলসী নিমজ্জিত হন। আর এই সঙ্গে চলিতে থাকে তাঁহার ভজন আর কাতর প্রার্থনা। এক একটি দিন কাটিয়া যায় আর ব্যর্থতার বেদনায় তুলসী অঝোর ধারে কাঁদিতে থাকেন। আর্ত্তস্বরে ইষ্টদেবকে কহেন—

সঠ সেবক কী প্রীতি রুচি রখিহহিঁ রাম কৃপালু।
উপল কিয়ে জলযান জেহিঁ সচিব সুমতি কপি ভালু॥

অর্থাৎ, হে কৃপালু শ্রীরাম, আমার মত শঠ-সেবকের প্রতি রেখো তোমার অগাধ প্রীতি। প্রভু! তুমি মহাশক্তিধর, অসাধ্য তোমার কিছুই নেই। শিলা তুমি জলে ভাসালে, বানর-ভালুককে বানালে বুদ্ধিমান মন্ত্রী, আবার আমার মত অভাজনকেও করলে করুণা।

কঠোরতপা তুলসী এবার হইলেন নামসিদ্ধ। তাঁহার দেহমন-প্রাণে, সর্ব্ব অস্তিত্বে রামনামের মালা অবিরাম আবর্ত্তিত হইয়া চলিয়াছে। সারা সাধনসত্তা হইয়া উঠিয়াছে রামনামের আলোকে ঝলমল। এই আলোকের জয়গান শোনা যায় তাঁহার গানে—

রামনাম-মণি দীপ ধরু জীহ দেহরীদ্বার।
তুলসী ভীতর বাহরহুঁ জৌচাহসি উজিয়ার॥

দেহ তুলসী দেউল, জিহ্বা তাঁহার দ্বার। যদি দেহের ভিতর-বাহির আলোকময় করতে চাও, তবে রামনামের মণিদীপ জিহ্বায় ক'র স্থাপন। তুলসীর ভিতর বাহির উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, তাই সর্ব্ব সৃষ্টিকে রামময় জানিয়া তিনি তাঁহার প্রণাম নিবেদন করিতেছেন।

সাধনার তীব্রতা দেখিয়া মহাবীরজী খুসী হইলেন। কহিলেন, "তুলসী, তুমি এবার চিত্রকূট পর্ব্বতে যাও। শ্রীরামের অবতারলীলার শুরু এই পর্ব্বতাঞ্চল থেকে। এখানকার ভূমি হয়েছে তাঁর পদস্পর্শে পবিত্র। পরিবেশও সাধনার বড় অনুকূল। এখানে বসে তুমি কিছুদিন তপস্যা কর, কমললোচন তোমায় দর্শন দিয়ে কৃতার্থ করবেন।"

তখন সূর্য্যগ্রহণের মেলা। চিত্রকূটে অগণিত সাধু-সমাগম হইয়াছে। রামনাম কীর্ত্তনে, রামায়ণের ব্যাখ্যানে আকাশ বাতাস মুখরিত। তুলসী পাহাড়ের এক কোণে একটি ক্ষুদ্র ভজন কুটির নির্ম্মাণ করিয়া মনের আনন্দে কিছুদিন বাস করিতে থাকেন।

কিছুদিনের মধ্যে মেলা ভাঙ্গিয়া গেল। চিত্রকূটের বনস্থলী এবার প্রায় জনশূন্য। তুলসীদাস একান্ত নিষ্ঠায়, আরো কঠোর তপস্যা শুরু করিয়া দিলেন।

রোজ প্রত্যূষে ঝর্ণার জলে স্নান করিয়া তিনি ভজনে বসেন। সারা দিনের শেষে সামান্য কিছু অরণ্য-ফলে হয় ক্ষুধার নিবৃত্তি।

একদিন প্রভাতে তুলসী তাঁহার সঙ্কল্পিত পূজার আয়োজনে বড় ব্যস্ত আছেন। ঝুলি হইতে চন্দন কাঠ ও শিলা নিয়ে একমনে তিনি

চন্দন ঘষিতেছেন। হঠাৎ এক নয়নাভিরাম বালক কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল।

সুন্দর সুঠাম শ্যামতনু এই বালক। সারা দেহে তাহার অপরূপ লাবণ্যের ছটা, শিরে জটাভার, পরণে বল্কল। আয়ত নয়নে দিব্য দ্যুতি! আর আজানুলম্বিত বাহুতে রহিয়াছে ক্ষুদ্র একটি ধনু।

দুষ্ট বালক হয়তো আজ অরণ্যের পাখী শিকারে বাহির হইয়াছে। তুলসীদাস তাহাকে নিয়া মহা বিপদে পড়িলেন। আব্দার ও অত্যাচারের সীমা নাই, তুলসীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া বায়না তুলিয়াছে, "ওগো, তোমার নিজহাতে আমায় চন্দন পরিয়ে দাও।"

এড়ানোর যো নাই। ইষ্টদেবের জন্য যে চন্দন তুলসী ঘষিতেছেন, তাহার উপরই বালকের মহা ঝোঁক!

অকস্মাৎ তুলসীর মনশ্চক্ষে খেলিয়া গেল রামনবমী দিবসে লীলাময়ের সেই ছলনার কথা। সঙ্গে সঙ্গে ভক্তরাজ মারুতির আশীর্ব্বাদও জাগিয়া উঠিল তাঁহার স্মৃতিপটে। পুলকাঞ্চিত দেহে, ভাবাবিষ্ট সাধক ধনুর্দ্ধারী বালকের ললাটে চন্দনের ফোঁটা আঁকিয়া দিলেন। তারপর কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—

বালক শুনহু বিনয় মম এহুঁ।
তুম্ শ্রীরামচন্দ্র কি তুসর কেহুঁ?

বালকের কমলনয়নে হাসির ঝলক্। কণ্ঠস্বরে সুধা ছড়াইয়া সে শুধু উত্তর দিল—"সফল শ্রীরাম অবতারা!"

একি বিস্ময়কর অনুভূতির স্রোত উৎসারিত হইতেছে তুলসীর সর্ব্ব সত্তায়? জ্যোতির্লোকের সীমাহীন বিস্তারে তিনি কোথায় ভাসিয়া চলিয়াছেন? এ জ্যোতির, এ আনন্দের যে আর পারাপার নাই। তুলসী আত্মসম্বিৎ হারাইয়া ফেলিলেন।

বহুক্ষণ পরে বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল। কিন্তু ততক্ষণে তাঁহার সব কিছু একাকার করিয়া দিয়া চঞ্চল বালক বনপথ দিয়া কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে।

নয়নে কেবলি প্রেমাশ্রুর ধারা বহিয়া যাইতেছে। বারবার তাহা মুছিয়া তুলসী লিখিয়া রাখিলেন—

চিত্রকূট কে ঘাট পর ভই সন্তন কী ভীড়।
তুলসিদাস চন্দন ঘসৈ তিলক দেই রঘুবীর।

তুলসীর কাঁদন আর থামে না। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে কহেন, "হে পরম প্রভু, কি তোমার ছলনা লীলাময়! তুলসীর জীবনে তুমি অনন্ত লীলাবিলাস নিয়ে কেন বিরাজ করছো না?"

এ সময়ে প্রভু রঘুনাথজী আর একদিন তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। কৃপাভরে তাঁহাকে কহিলেন, "তুলসীদাস, ভেবো না। আমায় তুমি পাবে, আমার লীলাও তোমার হৃদয়ে থাক্‌বে চিরজাগরূক হয়ে। এবার আমার লীলা কাহিনীকে তুমি জনমানসের সাম্‌নে তুলে ধর, তোমার অপরূপ ভাবৈশ্বর্য্য ও কাব্যসুষমায় মণ্ডিত করে সমাজের সর্ব্বস্তরে তা বিতরণ কর। কলিযুগের উপযোগী করে, কলির কলুষ মোচনের জন্য রচনা কর আমার নব-রামায়ণ!

রামনাম ও রামলীলা প্রচারের আদেশ মিলিয়াছে। তুলসী এবার চিত্রকূট ও দণ্ডকারণ্যে প্রভুর লীলাস্থলগুলি পরিক্রমা করিয়া বেড়ান। রঘুনাথজীর পদধূলিপূত এসব তীর্থ। অগণিত সাধক এখানে উদ্ধার পাইয়া যাইতেছে। প্রভুর এ স্মৃতিবিজড়িত স্থানে বিচরণ করার ফলে তুলসীর দেহ-মন-প্রাণে লীলামাহাত্ম্য ওতপ্রোত হইয়া গেল।

দণ্ডকবন দর্শনে ইষ্টদেব রামচন্দ্রের স্মৃতি তাঁহার হৃদয়ে উথলিয়া উঠিল? এই অপরূপ স্মৃতি ও অনুভূতিই কাব্যের মালিকায় গাঁথিয়া ভক্তবীর গাহিলেন—

দণ্ডকবন প্রভু কীনূহ সোহাবন।
জন-মন অমিত নাম কিয় পাবন।
নিসিচর-নিকর দলে রঘুনন্দন।
নামু সকল কলি কলুষ নিকন্দন॥

অর্থাৎ, দণ্ডকারণ্যের শোভা প্রভু আমার সত্যিই দিয়েছিলেন বাড়িয়ে। কিন্তু এই দণ্ডক তো একটি মাত্র বন—তাঁর নাম যে অগণিত মানবের মনোবনকেই করেছে পবিত্র। বীর বিক্রমে সেদিন রঘুনন্দন দলিত করেছেন রাক্ষসকুল, কিন্তু তাঁর নাম আজ করেছে কলির পাপরূপ সকল রাক্ষসকে বধ।

নাম প্রচারের জন্য নূতনতর রামায়ণ লিখিতে হইবে। এজন্য প্রস্তুতও তিনি হইয়াছেন। ইষ্টদেব রঘুবরের ধ্যানে ও জপে সদাই তিনি থাকেন বিভোর। বুকে আঁকিয়া নিয়াছেন প্রভুজীর 'মঞ্জুল-মঙ্গল-মোহময়' মূর্ত্তি। চোখে পুরিয়াছেন তাঁহার 'নীলকঞ্জ' নয়নের জ্যোতি, কণ্ঠে রাখিয়াছেন তাঁহার অমিয়-মধুর নাম। তুলসীর সর্ব্বসত্তা হইয়া উঠিয়াছে আজ রামময়।

তিনি স্থির করিলেন, এই নব রামায়ণ রচনায় হাত দিবার আগে একবার উত্তর ভারতের সমস্ত তীর্থ দর্শন করিবেন। পরিক্রমার ফলে ইষ্টপদে মতি জন্মিবে, তেমনি প্রভুর মনোরম লীলাকাহিনীর উপকরণও সংগ্রহ করা যাইবে।

রঘুনাথজীর জন্মস্থান অযোধ্যায় সরযূতীরে তিনি কিছুদিন বাস করেন। এই সময় হইতে শ্রীরামচন্দ্রের কৃপা এবং অপ্রাকৃত দর্শন তাঁহার জীবনে ঘটিতে থাকে নিরন্তর ধারায়।

মহাসাধকের জীবনে তখন নানা যোগ-বিভূতি উপজিত হইতেছে কিন্তু তাহাতে মনোযোগ দিবার অবসর তাঁহার কোথায়? রামভক্তিতে তিনি তখন রসায়িত। চিন্ময় ইষ্টমূর্ত্তির সহিত পরমভক্তের আনন্দলীলার ধারা বহিয়া চলিয়াছে অবিরাম।

নানা তীর্থভ্রমণ করিতে করিতে তুলসীদাস সেবার বৃন্দাবনে আসিয়া উপস্থিত। চারিদিকেই শুনেন রাধাকৃষ্ণ নামের ধ্বনি। কোন মন্দিরেই তাঁহার আরাধ্য সীতারামের নাম কীর্ত্তন হয় না। তুলসী প্রায়ই বড় ম্রিয়মান হইয়া বসিয়া থাকেন। সেদিন বৃন্দাবনে উৎসব হইতেছে।

মন্দিরে মন্দিরে সমারোহ, মহা ধূমধাম। পরম রমণীয়বেশে শ্রীবিগ্রহ সাজানো হইয়াছে। এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু তুলসীদাসকে সোৎসাহে মদনগোপালজীর মন্দিরে নিয়া গেলেন।

শ্রীবিগ্রহ প্রণাম করিতে হইবে, তুলসী বেদীর সম্মুখে আগাইয়া গেলেন। কিন্তু একি অদ্ভুত কাণ্ড? এ রূপে তো তাঁহার মন ভরিতেছে না, শির তাঁহার এ মূর্ত্তির সামনে নত হইতে চাহে না। যে রূপ, যে ভঙ্গীর সহিত তুলসীদাসের নিরন্তন যোগ, যে লীলাস্মৃতি তাঁহার সর্ব্ব সত্তায় জড়াইয়া আছে, আজ তাহাই যে তিনি চান। চিরপ্রিয় রঘুবীরজী না হইলে তো তাঁহার ভক্তি, ভাব জন্মিবে না। ভক্তচূড়ামণি তখন বংশীধারী মদনমোহন মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া করযোড়ে বলিলেন—

কহা কহোঁ ছবি আজকী ভলে বনো হো নাথ।
তুলসী মস্তক জব নবৈ ধনুষ বান লো হাথ॥

অর্থাৎ, হে নাথ! আজকের এ শোভার কি বর্ণনা আমি দেব? অপরূপ রমণীয় বেশে তুমি সেজে রয়েছ। কিন্তু প্রভু, তুলসী যখন চরণে মস্তক নোয়াবে তখন কিন্তু তোমায় ধনুর্ব্বাণ হাতে নিতেই হবে—বাঁশীতে আর চলবে না।

কথিত আছে, মদনগোপালজী সেদিন এই মহাভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য ধনুর্দ্ধারীরূপেই সেখানে প্রকট হন। তুলসীদাস নিজের লেখায় ইহার প্রমাণ রাখিয়া গিয়াছেন—

ক্রীট মুকুট মাথে ধর্য়ো ধনুষ বান লিয় হাথ।
তুলসী নিজ জন কারণে নাথ ভয়ে রঘুনাথ।

অর্থাৎ, নিজ ভক্ত তুলসীদাসের আব্দার রাখার জন্য প্রভু সেদিন রঘুনাথরূপে শিরে ধরেন রাজকিরীট, হাতে তুলে নেন গাণ্ডীব।

বৃন্দাবন ও নৈমিষারণ্য প্রভৃতি ভ্রমণের পর তুলসী কাশীতে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। গোড়ার দিকে তিনি নিজের চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন কাশীর হনুমান ফটকে। কিন্তু স্থানীয় লোকেদের অনাচারে

বিরক্ত হইয়া শীঘ্রই এ অঞ্চল তিনি পরিত্যাগ করেন এবং কিছুদিনের জন্য এসময়ে গোপালমন্দিরে আশ্রয় নেন।

এখানকার বল্লভকুলী গোস্বামীরা বড় সাম্প্রদায়িক বুদ্ধিযুক্ত। ইঁহাদের সহিত মতভেদ হওয়ায় তুলসী অসিঘাটে চলিয়া যান। এ ঘাটের গুহা ও মন্দিরটিতে জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত তিনি অবস্থান করেন।

তুলসীদাসের এই সাধনস্থল বারাণসীর ধর্ম্ম ও সমাজ-জীবনে তখনকার দিনে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। অসিঘাটে আজিও তাঁহার সাধনগুহা ও নানা স্মৃতি-চিহ্ন বর্ত্তমান রহিয়াছে।

কাশীধামে বসিয়া তুলসী প্রথমে সংস্কৃত ভাষাতেই রামায়ণ রচনা শুরু করেন। কথিত আছে, এসময়ে প্রভু বিশ্বনাথজী সাধারণের কথ্য ভাষাতেই তাঁহাকে রামচরিত বর্ণনার প্রত্যাদেশ দেন।

কাশীধাম হইতে তুলসীদাস সেবার অযোধ্যা তীর্থে আসিয়াছেন। এখানে এক যোগীর সঙ্গে ভাগ্যক্রমে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। প্রথম দর্শনেই যোগীবর তাঁহাকে 'নবযুগের বাল্মীকি' বলিয়া আবাহন করেন। ইঁহারই উৎসাহ ও উদ্দীপনায় তুলসীদাস অমর কীর্ত্তি 'রামরচিত মানস' রচনায় ব্রতী হন।

তুলসীদাসের এই নবলব্ধ যোগী-বন্ধুটি যোগশক্তিবলে এসময়ে স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ করেন। তারপর অযোধ্যার সরযূতটে ইঁহারই পরিত্যক্ত পর্ণকুটীরে বসিয়া তুলসী রামায়ণ রচনায় হাত দেন।

'রামচরিত মানস'-এর কাজ এবার পূর্ণোদ্যমে শুরু হয়। শুধুমাত্র রাম-চরিত্র ও রামায়ণকথার মধ্যে তাঁহার এ রচনাকে নিবদ্ধ না রাখিয়া ভক্ত-কবি গ্রহণ করেন এক বৃহত্তর পটভূমিকা।

এই মহাগ্রন্থে তুলসী শ্রুতিসম্মত আদর্শ ও আচারানুষ্ঠানের মাহাত্ম্য তুলিয়া ধরেন। এই মহান সাহিত্যকর্ম্মের জন্য তাঁহাকে দোহন করিতে হয় বাল্মীকি রামায়ণ, যোগবাশিষ্ঠ, অধ্যাত্মরামায়ণ এবং প্রাচীন সংস্কৃত ধর্ম্মগ্রন্থ, পুরাণ ও বহুতর কাব্য। তাছাড়া, প্রসন্ন রাঘব, হনুমন্নাটিকা

রঘুবংশ, শ্রীমদ্ভাগবত ও উত্তর রামরচিত মন্থন করিয়াও তিনি অজস্র তত্ত্ব ও রসবস্তু সংগ্রহ করেন। এই মধুকর-বৃত্তির ফলে রচিত হয় এক অনবদ্য সৃষ্টি। সর্ব্বোপরি আউধী হিন্দী ও ব্রজবুলির সংমিশ্রণের ফলে এ গ্রন্থ সহজবোধ্য হয়, অপূর্ব্ব জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করে।

তুলসীদাস একাধারে কবি ও দার্শনিক, ভক্ত সাধক ও শক্তিমান যোগী। দিগ্বিদিকে তাই তাঁহার খ্যাতির অন্ত নাই। তাঁহার চতুষ্পাঠিতে ছাত্র, অভ্যাগত ও দর্শনার্থীর ভীড় সর্ব্বদা লাগিয়াই আছে।

এ খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা কাশীর একদল গোঁড়া ব্রাহ্মণের চক্ষুশূল হইয়া উঠে। নানারূপে তাহারা তুলসীর অনিষ্ট সাধনে লাগিয়া যায়।

হিন্দীতে লেখা তুলসীর রামচরিত মানস-এর উপরই ইহাদের বেশী আক্রোশ। এ গ্রন্থ সাধারণের কাছে রামায়ণকে সহজ করিয়া দিয়াছে। তাই পাঠ ও ব্যাখ্যার মাধ্যমে যাহারা জীবিকা অর্জ্জন করে তাহারা বড় চিন্তিত হইয়া উঠিল।

দুইটি কুখ্যাত চোরের সহিত এই দুষ্টের দল ষড়যন্ত্র করে। স্থির হয় ঐ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি এবং আশ্রমের তৈজসপত্র তাহারা চুরি করিবে।

তস্করদ্বয় রাত্রিযোগে আশ্রমে ঢুকিতে যাইতেছে, হঠাৎ তাহারা থামিয়া গেল। সম্মুখে দণ্ডায়মান এক দিব্যকান্তি শ্যামল কিশোর। হাতে তাঁহার ধনুর্ব্বাণ। তুলসীর আশ্রমের চারিদিকে ঘুরিয়া তিনি পাহারা দিতেছেন! বারবার চেষ্টার পরও তস্করেরা তাঁহাকে এড়াইতে পারে না। ধনুর্দ্ধারী এ তরুণের যেন শ্রান্তি ক্লান্তি বলিয়া কিছু নাই, সারা রাতই তিনি জাগিয়া আছেন!

পরদিন তস্কর দুইটি গোস্বামী তুলসীদাসের নিকট গিয়া উপস্থিত। আশ্রমের এই তরুণ রক্ষীটি কে, সে কথা জানিতে তাহাদের কৌতূহল হইয়াছে। এমন তেজঃপুঞ্জকলেবর দিব্যকান্তি মানুষ সচরাচর তো চোখে পড়ে না। কি জানি কেন, বারবারই তাঁহার মূর্ত্তিটি উভয়ের মন জুড়িয়া বসে! কৌতূহলের সহিত আত্মগ্লানিও তাহাদের হইয়াছে।

চোর দুইটি অকপটে তাহাদের অভিসন্ধি ও পূর্ব্বরাত্রির অভিজ্ঞতা বিবৃত করিল।

তুলসী এক মনে তাহাদের কাহিনী শুনিতেছেন, আর দরদরধারে তাঁহার নয়ন বহিয়া অশ্রু ঝরিতেছে। আর্ত্তস্বরে কহিলেন, "ভাই, তোমরা ধন্য। তোমাদের দেখা পেয়ে আর কথা শুনে আমিও ধন্য। বহু জন্মের সঞ্চিত পুণ্যবলে তোমরা আমার রঘুনাথজীর দর্শন পেয়েছো। এসো, আলিঙ্গন দিয়ে আমায় পবিত্র কর।"

স্বয়ং প্রভু রামচন্দ্র তুলসীর সামান্য বিত্ত রক্ষণের জন্য রাত জাগিয়া পাহারা দিতেছেন! এ চিন্তা যে তাঁহার অসহ্য। আশ্রমের ভোগরাগ ও পূজার বাসনপত্র সবই সেদিন তিনি দরিদ্রদের বিলাইয়া দিলেন। হস্তলিখিত রামচরিত-মানস পুঁথিটি পাছে অপহৃত হয়, এই ভয়ে তাহা স্থানান্তরিত করিলেন এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর গৃহে। এবার তিনি হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

তুলসীর নীতি-নিষ্ঠা এবং সদাচার রক্ষার কঠোরতাও কিছু সংখ্যক শত্রু সৃষ্টি করিয়া বসে। একদল তান্ত্রিক এ সময়ে অভিচার প্রয়োগ দ্বারা তাঁহার প্রাণনাশের চেষ্টা করে। কিন্তু তুলসীর অভিভাবক মহাবীরজীর কৃপায় এ সময়ে তাঁহার প্রাণরক্ষা হয়।

রামনামের প্রচারে তুলসীদাস একেবারে মাতোয়ারা। বাকসিদ্ধ মহাপুরুষ বলিয়া দিকে দিকে তাঁহার খ্যাতি রটিয়া গিয়াছে। তাঁহার প্রদত্ত রামমন্ত্র সর্ব্বত্র হইয়া উঠিতেছে চৈতন্যময়। নানা বিস্ময়কর কাণ্ড এই মন্ত্রের মাধ্যমে দিনের পর দিন সঙ্ঘটিত হইতেছে।

সেদিন প্রত্যূষে এক ব্যক্তি কাঁদিতে কাঁদিতে তুলসীর কাছে আসিয়া উপস্থিত। ব্রাহ্মণ হত্যা করিয়া সে মহাপাপ করিয়াছে। অনুতাপের জ্বালা দুঃসহ, কিন্তু কোন্ প্রায়শ্চিত্ত করিলে এ পাপ দূর হইবে তাহা সে জানে না। কাশীর রক্ষণশীল পণ্ডিতেরা বিধান দিয়াছেন, আত্মহত্যা ছাড়া এ পাপ হইতে মুক্তি নাই।

লোকটি তুলসীদাসের চরণতলে আসিয়া কাঁদিয়া পড়িল। তিনি অভয় দিয়া কহিলেন, "সেকি কথা, ভাই। সর্ব্বপাপহর রামনাম থাকতে তোমায় আত্মহত্যা করতে হবে কেন ?"

তুলসী তাঁহার কানে দিলেন রামনাম মহামন্ত্র।

রক্ষণশীলেরা একথা মানিতে রাজী নয়, অথচ তুলসী ঘোষণা করিতেছেন যে, এ ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে পাপমুক্ত হইয়া গিয়াছে। তাঁহার মতে পৃথিবীতে এমন কোন পাপই নাই, যাহা রামনামে ভস্মীভূত না হয়।

তুলসী প্রশ্ন করিলেন, কি নিদর্শন দেখিলে এই মহাপাপ স্খালনের কথা তাঁহারা মানিয়া নিবেন ? পণ্ডিতেরা উত্তেজিত হইয়া কহিলেন, "বেশ, তুলসী, তোমার দেওয়া রামনামের যদি এতই শক্তি হয়, তার প্রমাণ আমরা পেতে চাই অলৌকিক শক্তি স্ফুরণের মধ্য দিয়ে। ব্রহ্মবধের পাতকী মন্দির প্রাঙ্গণের এ শিলানির্ম্মিত বৃষটিকে তৃণ ভক্ষণ করতে দিক্—আর ঐ বৃষ জীবন্ত হয়ে তা গ্রহণ করুক। তবেই বুঝবো তোমার রামমন্ত্রের মাহাত্ম্য। তবেই স্বীকার করবো—ব্রহ্মহত্যার পাপ থেকে এ ব্যক্তি নিষ্কৃতি পেয়েছে।"

তুলসী বলিলেন, "তথাস্তু !"

কথিত আছে, সমবেত জনতার সম্মুখে, তুলসীর আশ্রিত ঐ ব্যক্তির হস্ত হইতে পাষাণ-বৃষ সেদিন আহার্য্য গ্রহণ করে।

মণিকর্ণিকার ঘাটে সেদিন এক বিধবা নারী মৃত পতির সহিত সহমরণে যাইবার জন্য আসিয়াছে। তুলসী ঘাটের পাশ দিয়া কোথায় চলিয়াছেন। পতিহারা নারী এ সময়ে তাঁহার পদবন্দনা করে। পরনে তাহার রহিয়াছে লালপাড় শাড়ী, সিঁথিতে সিঁদুরের রেখা।

তুলসী ভাবাবেশে ছিলেন, ভাবিলেন রমণী তাঁহার আশীর্ব্বাদ চায়। মুখ হইতে অমনি বাণী নির্গত হইল, "মা, পতিপুত্রবতী হয়ে আনন্দে তুমি সংসার কর।"

একি অদ্ভুত আশীষ! মৃত পতির দিকে তুলসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইলে যোগৈশ্বর্য্যবলে ঐ শবকে সেদিন তিনি বাঁচাইয়া তোলেন।

শ্রীরামচন্দ্রের ঐশ্বর্য্যস্মৃতিতে তুলসীর হৃদয় সদা পরিপূর্ণ। তাই দরিদ্রের কোন দুঃখকষ্টই তিনি সহ্য করিতে পারেন না। তাঁহার গানে শোনা যায়—নহিঁ দরিদ্র সম দুঃখ জগমাহীঁ।

সুযোগ পাইলেই মহাসাধক তুলসী আর্ত্ত ও দরিদ্রের দুঃখ-মোচনে অগ্রসর হন।

একবার কাশীর এক নিরন্ন ব্রাহ্মণ তুলসীকে অসামান্য যোগ বিভূতির অধিকারী জানিয়া তাঁহার নিকট নিজ দুঃখ মোচনের জন্য ক্রন্দন করিতে থাকেন। তুলসী তখন গঙ্গার ধারে এক মনে রামনাম জপ করিতেছেন। এই সময় গঙ্গামাইকে অনুরোধ জানাইয়া ব্রাহ্মণের জন্য কতকটা জমি তিনি সংগ্রহ করিয়া দেন—গঙ্গার স্রোত তট হইতে দূরে সরিয়া যায়, আর ঐ জলমুক্ত জমিখণ্ড ব্রাহ্মণকে দানের ব্যবস্থা তিনি করেন।

চিত্রকূটে ধ্যানস্থ থাকাকালীন এক দরিদ্রের প্রতি কৃপা করিয়া তিনি তাঁহাকে একটি দারিদ্র-মোচন শিলাদান করেন। শোনা যায়, এ শিলার প্রভাবে এ ব্যক্তির সংসার ধনধান্যে পূর্ণ হইয়া উঠে।

তুলসীদাসের শেষ জীবনের যোগৈশ্বর্য্য বহু লোককে তাঁহার চরণ-তলে টানিয়া আনে। তাঁহার সম্পর্কে নানা বিস্ময়কর জনপ্রবাদের সৃষ্টিও এ সময়ে হয়। এই সব জনশ্রুতি শুনিয়া দিল্লীর সম্রাট সাহজাহান তাঁহাকে একবার রাজধানীতে আনয়ন করেন। সম্রাট তাঁহাকে কিছু অলৌকিক শক্তি প্রদর্শন করিতেও অনুরোধ জানান।

তুলসী সবিনয়ে উত্তর দেন, "সম্রাট, আমি রামচন্দ্রজীর এক দীন সেবক। আমি অলৌকিকত্বের কি জানি!"

বাদশাহ্ কিন্তু তুলসীদাসের এ কথায় বড় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। ভাবিলেন, তুলসী তাঁহাকে অগ্রাহ্য করিতেছেন। বাদশাহের আজ্ঞায় তাঁহাকে সেদিন কারারুদ্ধ হইতে হয়। কথিত আছে, ইহার অব্যবহিত

পরেই রাজধানী বানরের উৎপাতে অতিষ্ঠ হইয়া উঠে। বিশিষ্ট হিন্দু নেতারা বাদশাহকে বুঝাইতে থাকেন, এ সব রামভক্ত তুলসীদাসেরই যোগবিভূতির লীলা! সত্বর তাঁহাকে মুক্ত না করিলে রাজ্যের অমঙ্গল ঠেকানো যাইবে না। বাদশাহ তুলসীকে ছাড়িয়া দিলেন।

তুলসী এবার দীর্ঘ জীবনের শেষ পর্য্যায়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। প্রভু রামচন্দ্রের নাম মাহাত্ম্য, আর ধর্ম্মরাজ্যের আদর্শ প্রচারে তিনি ছিলেন আদিষ্ট। আদেশ তিনি পালন করিয়াছিলেন, মহাব্রত হইয়াছে উদ্‌যাপিত।

এ সময়ে দেহে দেখা দেয় মারাত্মক ব্রণের আক্রমণ। জীর্ণ দেহও আর যুঝিতে পারে না। তবে কি রঘুনাথজী এবার প্রিয় ভক্তকে বুকে টানিয়া নিতে চান? তুলসী সেদিন সেবকদের কহিলেন—

রামনাম জস বরনিকৈ হোন চহঁত অব মৌন।
তুলসীকে মূখ দীজিয় অবহা তুলসী সৌন॥

—অর্থাৎ, যে জিহ্বা রামনামের যশ করতো বর্ণনা, আজ তা হতে চায় মৌন! এবার তুলসীর মুখে তুলে দাও তুলসীপাতা আর সোনা।

অসিঘাটের আশ্রম কক্ষে তুলসীদাস তাঁহার শেষ শয্যায় শুইয়া আছেন। মিলন-বিরহের তরঙ্গায়িত জীবনের শেষে চিরমিলনের লগ্নটির জন্য তিনি প্রতীক্ষমাণ।

অদূরে শ্রাবণ মাসের ভরা গঙ্গা উচ্ছল হইয়া ছুটিয়াছে অভিসারে, সাগরসঙ্গমের দিকে। মহাভাগবত তুলসীর জীবনধারাও এমনিভাবে আজ মিলাইতে চায় প্রিয়মিলন সাগরে।

১৭৩৭ খৃষ্টাব্দের বর্ষাঘন দিনটিতে এ মিলনযাত্রা সার্থক হইয়া উঠিল। শুক্লা সপ্তমী তিথিতে ভক্তকবি তুলসী চিরতরে তাঁহার মর দেহ ত্যাগ করিয়া গেলেন।

মাতৃসাধক রামপ্রসাদ

বাংলার শক্তিসাধনার চারণ-কবিরূপে, মাতৃনাম-যজ্ঞের হোতারূপে আবির্ভূত হন রামপ্রসাদ। তন্ত্রের গূঢ় গহন সাধনলোকে ছিল তাঁহার অনায়াস বিচরণ, যে সুধা সেখান হইতে তিনি আহরণ করিয়া আনেন, সহজ স্বচ্ছন্দ প্রাণময় সঙ্গীতের মধ্য দিয়া দিগ্‌বিদিকে তাহা ছড়াইয়া যান। বাংলার পথে প্রান্তরে, আকাশে বাতাসে এই সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা জাগিয়ে উঠে। পণ্ডিত-মূর্খ, ধনী-দরিদ্র সকলেরই কণ্ঠে ঝঙ্কৃত হয় মধুস্রাবী প্রসাদী গান, মাতৃনামের মহাপ্রসাদে তৃপ্ত হয় সবাই।

বাংলার সাধনায়, বাংলার সমাজ চেতনায় শক্তিবাদ আর ভাবুকতা এ দুয়েরই রহিয়াছে সমন্বয়। রামপ্রসাদের সাধন জীবনে এ সমন্বয় অপরূপ হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। রুক্ষ কঠোর কৌলসাধনাকে তিনি স্নিগ্ধমধুর করিয়াছেন ভক্তিপ্রেমের রসধারায়।

শ্যামা-মা রামপ্রসাদের ইষ্টদেবী। তত্ত্বদর্শী সাধকের দৃষ্টিতে এই মা হইতেছেন ব্রহ্মরূপিণী মহাশক্তি। এ মহাশক্তিকে রামপ্রসাদ বারবার আবাহন জানাইয়াছেন, চিন্ময়ীরূপে করাইয়াছেন আবির্ভূত।

আদুরে শিশুর মত অবলীলায় তাঁহার আঁচল ধরিয়া বসিয়াছেন।

দেবী অসুরনাশিনী—ভীমা ভয়ঙ্করা প্রলয়ঙ্করী! কিন্তু রামপ্রসাদের কাছে তাঁহার আরো বড় পরিচয়, তিনি—মা! মাতৃভাবনায় উদ্বুদ্ধ সাধক তাই মাতিয়াছেন মান-অভিমানের লীলাখেলায়। মায়ের কোলে বসিয়া গাঁথিয়াছেন অপরূপ ভক্তিসঙ্গীতের মালা। এ মালা শুধু শক্তিমান সাধকদের কণ্ঠেই নয়, অগণিত সাধারণ মানুষের কণ্ঠেও তিনি দোলাইয়া দিয়াছেন।

প্রসাদী-গান বাংলা সাহিত্যের এক অক্ষয় সম্পদ। আবার

বাঙালীর অধ্যাত্মজীবনকেও ইহা করিয়াছে প্রভাবিত। কমলাকান্ত, বামাক্ষেপা ও রামকৃষ্ণের মত মহাসাধকদের যেমন এ গান উদ্দীপিত করিয়াছে তেমনি মাতাইয়াছে সাধারণ ভক্ত মানুষকে। বাংলার পথে-প্রান্তরে হাটে-বাজারে আজো এ গানই আমরা শুনি, কৃষাণ মজুর আর নৌকার মাঝির মুখে ধ্বনিত হয় ইহারই সুর-গুঞ্জন।

ভাগীরথীর পূর্ব্ব তটে হালিসহরে শক্তিসাধক রামপ্রসাদ আবির্ভূত হন। চৈতন্যের দীক্ষাগুরু, বৈষ্ণবাচার্য্য ঈশ্বরপুরীর জন্মও এই জনপদে। শ্যাম ও শ্যামার নামামৃত দুই-ই দীর্ঘদিন এই পুণ্যভূমিতে ছড়ানো রহিয়াছে।

১১২৭ সালের আশ্বিন মাসে, এক শুভদিনে রামরাম সেনের পুত্ররূপে রামপ্রসাদ ভূমিষ্ঠ হন। সেন মহাশয় ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি, সাধন ভজনেও বেশ উৎসাহী। তাছাড়া, তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপের জন্য তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদের সে অঞ্চলে বেশ প্রতিষ্ঠা ছিল।

পিতার ইচ্ছা, রামপ্রসাদ তাঁহার পৈত্রিক বৈদ্যব্যবসায় শিক্ষা করুক, টাকাকড়ি, প্রতিষ্ঠা সে অর্জ্জন করুক। কিন্তু পুত্রের সেদিকে কোন মনোযোগ নাই; অথচ সে অসাধারণ মেধাবী। অল্পদিনেই ব্যাকরণ ও কাব্য আয়ত্ত করিয়াছে। তখনকার দিনে ফার্সী ও উর্দ্দূ না শিখিলে উন্নতি করা যাইত না—এই দুইটি ভাষা শিখিতেও রামপ্রসাদের বেশী সময় লাগে নাই।

ঘর-সংসারে পুত্রের কোন আকর্ষণ নাই, বৈষয়িক কাজেও তেমন উৎসাহ দেখা যায় না। এদিকে বয়স বাড়িয়াই যাইতেছে।

বাইশ বৎসর পার হইলে পিতা ব্যস্ত হইয়া তাড়াতাড়ি বিবাহের ব্যবস্থা করিলেন। ভাবিলেন, যদি বা ছেলের মন কিছুটা ফিরে। সুলক্ষণা বধূ সর্ব্বাণীকে সাদরে ঘরে আনা হইল।

বংশের রীতি অনুযায়ী কিছুদিন পরে রামপ্রসাদ সস্ত্রীক কুলগুরুর নিকট শক্তিমন্ত্রের দীক্ষা নিলেন।

রামপ্রসাদের পিতা হঠাৎ এ সময়ে একদিন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। এই মৃত্যু সংসারে আনিয়া দিল এক বিপর্য্যয়!

পিতার ব্যবস্থায় এতদিন কোন প্রকারে দিন চলিতেছিল। কিন্তু এইবার উপায়? অভাবের তাড়নায় রামপ্রসাদ বড় বিব্রত হইয়া পড়িলেন। একটা কিছু কাজকর্ম্ম যোগাড় না করিলে চলে না। এত বড় পরিবারের অন্নসংস্থান কিরূপে হইবে? শেষটায় চাকুরীর খোঁজে তিনি কলিকাতায় চলিয়া গেলেন।

কাব্য ও দর্শনশাস্ত্রে রামপ্রসাদের বরাবরই অনুরাগ! গান ও কবিতা লেখায় ইতিমধ্যেই কিছুটা পারদর্শিতা হইয়াছে। তাছাড়া ফার্সী ও উর্দ্দু তিনি বেশ ভালই জানেন। এতগুলি গুণ থাকিতে কোন একটা কাজ জোটানো অবশ্যই কঠিন কথা নয়। কিন্তু এ অপরিচিত নগরে কে তাঁহাকে জানে? কেই-ই সাহায্য করিবে? রামপ্রসাদ বড় চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। অবশেষে গরাণহাটার জমিদার দুর্গাচরণ মিত্রের দপ্তরে ত্রিশ টাকা বেতনে এক মুহুরীর কাজ যোগাড় হইল।

অল্প কয়েকদিন পরের কথা। শ্যামা মায়ের কৃপায় গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা হইয়াছে। এবার তিনি খানিকটা নিশ্চিন্ত। দপ্তরে বসিয়া রোজ খাতা লিখিতে বসেন। কিন্তু হিসাবের অঙ্ক লিখিবেন কি, কবিচিত্ত হইতে কেবলি উৎসারিত হইতে থাকে ভক্তি সঙ্গীত।

রামপ্রসাদ মায়ের স্বভাবভক্ত। সদাই তিনি আনমনা ও উদাসীন থাকেন। মুহুরীর কাজে তাঁহার মন বসিবে কেন? অজ্ঞাতসারে মায়েরই সঙ্গীত কলমের গোড়ায় আসিয়া পড়ে। ভাব-তন্ময়তা তাঁহার দিন দিন বাড়িতেই থাকে, হিসাবের খাতা ভরিয়া উঠে গানে কবিতায়।

মনিবের খাতায় জমা খরচের অঙ্ক হয়তো তেমন বসিতেছে না। কিন্তু শ্যামামায়ের খাতায় রামপ্রসাদের জমার হিসাব নিঃসন্দেহে সেদিন ভারী হইয়া উঠিতেছিল।

কিন্তু বিষয়ী মানুষের দল এ হিসাব মানিতে চাহিবে কেন? কাজে

এমন অমনোযোগ দেখিয়া দপ্তরের কর্ম্মচারীরা কানাকানি করে—হিসাবের বইগুলি কেন সে নষ্ট করিতেছে! এ আবার কি পাগলামী? মনিবের কাণেও এ কথা উঠিতে থাকে।

প্রায়ই নূতন মুহুরীর বিরুদ্ধে অভিযোগের পর অভিযোগ আসে। মনিব সেদিন বড় চটিয়া গেলেন। খাস কামরায় বসিয়া গম্ভীরকণ্ঠে রামপ্রসাদকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

হিসাবের খাতা হস্তে নূতন মুহুরী উপস্থিত। আশঙ্কায় বুক তাঁহার দুরু দুরু করিতেছে। তবে কি চাকুরিটিই আজ যাইবে? বেকার হইয়া পড়িলে পরিবারের যে আর দুর্গতির সীমা থাকিবে না, জমিজমা যা কিছু ছিল সবই গিয়াছে।

জমিদার সেরেস্তায় সেদিন চাঞ্চল্য পড়িয়া গিয়াছে। মনিব এমনিতেই রাশভারি লোক। তদুপরি আজ যে ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা। সবাই বলাবলি করিতে থাকে, রামপ্রসাদের আজ আর রক্ষা নাই!

মনিব খাতাখানি হাতে নিয়া বেশ করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিলেন। পাতায় পাতায় ছড়াইয়া আছে কালী দুর্গার নাম, আর ভক্তিরসাত্মক গান। নূতন কবির কবিত্বসম্পদের ভারে হিসাবের অঙ্ক অনেক জায়গায় চাপা পড়িয়া গিয়াছে।

অবশেষে মিত্র মহাশয়ের চোখ পড়িল একটি অপূর্ব্ব রচনার উপর। এক নিঃশ্বাসে তিনি পড়িয়া চলিলেন—

আমায় দাও মা তবিলদারী, আমি নিমকহারাম নই শঙ্করী।
পদ রত্ন ভাণ্ডার সবাই লুটে, ইহা আমি সইতে নারি॥
ভাঁড়ার জিম্মা যার কাছে মা, সে যে ভোলা ত্রিপুরারি।
শিব আশুতোষ স্বভাব দাতা, তবু জিম্মা রাখ তারি॥
অর্দ্ধ অঙ্গ জায়গীর, তবু শিবের মাইনে ভারী।
আমি বিনা মাইনের চাকর কেবল চরণ ধূলার অধিকারী॥

যদি তোমার বাপের ধারা ধর তবে বটে আমি হারি।
যদি আমার বাপের ধারা ধর তবে তোমা পেতে পারি ॥

মিত্র মহাশয়ের তুই চোখ ততক্ষণে জলে ভরিয়া উঠিয়াছে। একি অদ্ভুত প্রাণগলানো মাতৃসঙ্গীত! এমনটি তো আর দেখেন নাই!

খুঁজিয়া পাঁতিয়া আরও কতকগুলি রসমধুর পদের সন্ধান তিনি এই হিসাবের খাতায় পাইলেন। এ আবিষ্কারের আনন্দে ও বিস্ময়ে তাঁহার যেন বাক্‌রোধ হইয়া গিয়াছে। আর কেবলি থাকিয়া থাকিয়া অন্তরে চলিতেছে একটি অবিস্মরণীয় কলির গুঞ্জরণ—

আমি বিনা মাইনের চাকর,
কেবল চরণ ধূলার অধিকারী।

রামপ্রসাদ এতক্ষণ ভয়ে জড়সড় হইয়াছিলেন, এবার প্রাণে কিছুটা বল আসিল। মিত্র মহাশয় ধীর কণ্ঠে তাঁহাকে কহিলেন, "শোন, রামপ্রসাদ, এই হিসেবের অঙ্ক কষ্‌তে তোমার জন্ম হয় নি। তোমার ভেতর রয়েছে অনেক বড় বস্তু। এ বস্তু নষ্ট হোক্ তা আমি চাইনে। যে ত্রিশ টাকা এখানকার কাজ করে পেতে, তাই তুমি আমার সরকার থেকে পাবে। দেশে ফিরে যাও। সেখান থেকে মায়ের নাম গান কর। মনের আনন্দে তোমার কাব্যের ফুল ফোটাও।"

রামপ্রসাদ হালিসহরে ফিরিয়া আসিলেন। সংসারের অভাব অনটন এবার কিছুটা কমিল। সোৎসাহে তিনি শ্যামা মায়ের নাম গান আর জপ-ধ্যানে লাগিয়া গেলেন।

প্রাণে জাগিয়াছে ভক্তিরসের জোয়ার! মাতৃনামের অমৃতধারা তিনি চারিদিকে ছড়াইয়া চলিয়াছেন। কখনো গঙ্গায় আবক্ষ নিমজ্জিত হইয়া ভক্ত সাধক জগজ্জননীর উদ্দেশে তাঁহার গানের অর্ঘ্য ঢালিয়া দেন। কখনো বা নিজের নিভৃত সাধন-কুটিরে বসিয়া একেবারে ভাবতন্ময় হইয়া থাকেন।

রামপ্রসাদের গান যেন যাদুতে ভরা। ভক্তপ্রাণের এ আকুতি, এ স্বরলহরী কাণে আসিলেই গঙ্গাবক্ষচারী নৌকারোহীরা আত্মহারা হইয়া যায়, দাঁড়ির হাতের দাঁড় নিশ্চল হইয়া পড়ে।

এমনি পাগলপারা ভক্তিসঙ্গীতের সুর একদিন নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে আকর্ষণ করিয়া আনে।

কৃষ্ণচন্দ্র প্রকৃত জহুরী। রামপ্রসাদের প্রকৃত মূল্য বুঝিতে তাই তাঁহার দেরী হয় নাই। ভক্ত কবিকে তাঁহার রাজসভায় যাইতে বারবার তিনি অনুরোধ জানান। কিন্তু আপন সাধনায় রত রামপ্রসাদ এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন মাতৃসাধনা ও নিভৃত কাব্য-কুজন ফেলিয়া রাজসভায় যাইতে তিনি স্বীকৃত নন। তাছাড়া, রামপ্রসাদ তখন হালিসহরে নিজের সাধন-আসন প্রস্তুত করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে কোথাও বাহিরে গিয়া থাকা আর সম্ভব নয়।

ভক্তকবির নিরাসশক্তি, শ্যামা-মায়ের প্রতি এই ঐকান্তিকী ভক্তি দেখিয়া কৃষ্ণচন্দ্র মুগ্ধ হন। এ সময়ে প্রায় একশত বিঘা নিষ্কর জমি তিনি তাঁহাকে দান করেন। প্রতিদানে রাজাকে রামপ্রসাদ "বিদ্যাসুন্দর" নাটক রচনা করিয়া উপহার দেন।

সে-বার নবাব সিরাজদ্দৌলা নৌকাযোগে গঙ্গার উপর দিয়া চলিয়াছেন। রামপ্রসাদ তখন ঘাটে বসিয়া শ্যামা-সঙ্গীত গাহিতে-ছিলেন। প্রাণগলানো এ গান শুনিয়া সিরাজ মুগ্ধ হন। সাদরে তাঁহাকে নৌকায় আনাইয়া গান গাহিতে অনুরোধ করেন।

নবাবের রুচি অনুমান করিয়া রামপ্রসাদ ফার্সী ও হিন্দীতে গান ধরিলেন। কিন্তু নবাবের তাহাতে মন ভরিল না। রামপ্রসাদ নিজস্ব সুর ও ভাব নিয়া যে শ্যামা-সঙ্গীত গাহেন, তাহাই তাঁহার প্রাণ স্পর্শ করিয়াছে। তিনি বলিলেন, "না, রামপ্রসাদ, তুমি তোমার নিজের গান গাও, সে-গানই আমি আজ শুনতে চাই।"

রামপ্রসাদ তন্ময় হইয়া গাহিলেন। শুনিয়া নবাবের মন তৃপ্তিতে ভরিয়া উঠিল।

এবার রামপ্রসাদের সাধনজীবনে আসিতে থাকে সাধনার নিগূঢ়তর পর্ব্ব। নব প্রেরণায় তিনি উদ্বুদ্ধ। জগন্মাতার উদ্দেশে ভক্তিভরা গানের অর্ঘ্য নিবেদন করেন দিনের পর দিন। আবার তেমনি একনিষ্ঠভাবে গভীর নিশীথে তন্ত্রোক্ত কালী সাধনা তাঁহার অগ্রসর হইয়া চলে। গৃহ সন্নিহিত জঙ্গলে রামপ্রসাদ এক পঞ্চবটী প্রস্তুত করাইয়াছেন। উহাতে স্থাপিত হয় তাঁহার বিখ্যাত পঞ্চমুণ্ডীর আসন।

সাধকের হৃদয়-কন্দর ভাবৈশ্বর্য্যের দ্যুতিতে ঝলমল করিয়া উঠিতে থাকে। মায়ের নামে নূতন নূতন হৃদয়স্পর্শী গান রচনা করিয়া তাঁহার উদ্দেশে অঞ্জলি দেন। ভক্তিভরে নিজ হস্তে রোজ মহাকালীর মূর্ত্তি গড়াইয়া করেন অর্চ্চনা।

সাধন সাগরের গভীরে রামপ্রসাদ এবার ধীরে ধীরে নিমজ্জিত হইতেছেন। 'হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে' ডুব দিতেছেন বারবার। কিন্তু কোথায় তাহার তল ? তাইতো গাহিয়া উঠেন—

কে জানেরে কালী কেমন
ষড়দর্শনে না পায় দরশন !

শুধু তাহাই নয়, এক একবার ভাবিতে বসেন, মহাশক্তি ব্রহ্মময়ীর দর্শন—এ যে বামন হইয়া চাঁদে হাত দেওয়ারই মতন। সখেদে রচনা করেন মাতৃ-সঙ্গীত—

মায়ের উদর ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ড
প্রকাণ্ড তা জান কেমন।
মহাকাল জেনেছেন কালীর মর্ম্ম
অন্য কেবা জানে তেমন।
প্রসাদ ভাবে লোকে হাসে
সন্তরণে সিন্ধু গমন।
আমার প্রাণ বুঝেছে মন বুঝে না
ধরবে শশী হয়ে বামন।

এ মহাসিন্ধুর শেষ কোথায় তাহা কে জানে? আদুরে ছেলের দাবী ও আব্দার নিয়া ভক্তিমান সাধক আগাইয়া আসেন। সীমাহীনা ব্রহ্মময়ীকে সীমার মধ্যে ধরিতে প্রয়াস পান। নিরাকারকে দিতে চান আকার। নিতান্ত সহজ অধিকারে, সহজ সম্বন্ধের মধ্য দিয়া জগজ্জননী মহামায়াকে তিনি পাইতে চাহেন। তাই ভক্তি নিবেদনের সাথে থাকে তাঁহার ভীতি প্রদর্শন, আব্দারের সহিত থাকে তাঁহার কলহের ঝাঁজ। প্রসাদের গান ও কবিতায় সর্ব্বত্র দেখা যায় এই লীলারঙ্গ। 'মায়ে পোয়ের' আত্মিক যোগাযোগের মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠে এক অপরূপ মাধুর্য্য! জগতের খুব কম ধর্ম্মসাহিত্যেই এই ভাবময়তার তুলনা মিলিবে, সাধক ও ইষ্টের মধ্যেকার এমন অন্তরঙ্গতার সুরও সহজে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। প্রসাদ গাহিয়াছেন—

অভয় চরণ সব লুটালে,
কিছু রাখলে না মা তনয় বলে।
ভাড়ার জিম্মা যাঁর কাছে মা
সে জন তোমার পদতলে।
সদা ভাঙ্ খেয়ে সে মত্ত ভোলা
তুষ্ট কেবল বিল্বদলে।
মা হয়ে মা জন্মে জন্মে
কত দুঃখ আমায় দিলে।
প্রসাদ বলে এবার মোলে
ডাকবো সর্ব্বনাশী বলে।

মা ব্রহ্মময়ী বিশ্ব-প্রসবিনী, বিশ্ব-পালয়িত্রী, বিশ্ব-সংহারিণী। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, তিনি যে ভক্ত রামপ্রসাদেরই মা, তাঁহার একান্ত আপনার জন। তাই তো সন্তানের চিরন্তন দাবী নিয়া তিনি কখনো মাকে ভয় দেখান, কখনো শাসাইতে থাকেন—

মায়ে-পোয়ে মোকদ্দমা ধূম হবে রামপ্রসাদ বলে।
আমি ক্ষান্ত হব যখন আমায় শান্ত ক'রে ল'বে কোলে।

মায়ের চরণ-সম্পদ নিয়া রামপ্রসাদ বাবা আশুতোষের সঙ্গেই না কত কলহ করিতেছেন—

এবার আমি বুঝবো হরে,
মায়ের ধরবো চরণ ল'ব জোরে।
ভোলানাথের ভুল ধরেছি,
ব'লবো এবার যারে তারে।
ভোলা আপন ভাল চায় যদি সে
চরণ ছেড়ে দিক আমারে।

প্রতিদিন এমনি মান-অভিমান ও দ্বন্দ্বের পালা চলে। কিন্তু 'হৃদি রত্নাকারের অথৈ জলে' দিবানিশি ডুবিয়াও রামপ্রসাদ তো ঈপ্সিত মণিমুক্তার সন্ধান পাইতেছেন না! পরম অভীষ্টলাভ তো হইতেছে না! আশা নিরাশার দোলায় সারা অস্তিত্ব তাঁহার দোদুল্যমান।

এমন সময়ে একদিন ছদ্মবেশিনী ইষ্টদেবীর আবির্ভাব ঘটিল। এক অলৌকিক লীলার স্পর্শ বুলাইয়া দিয়া জগজ্জননী রামপ্রসাদকে সচকিত করিয়া গেলেন।

আগের দিন রাত্রে হালিসহরে প্রচণ্ড ঝড় বহিয়া যায়। ফলে রামপ্রসাদের ঘরের বেড়া ভাঙ্গিয়া পড়ে।

গৃহে তখন অর্থাভাব। মজুর লাগাইয়া মেরামতি-কাজ সম্পন্ন করার সাধ্য নাই। তাছাড়া, মজুরের অপেক্ষায় ইহা একদিনও ফেলিয়া রাখা চলে না। রামপ্রসাদ নিজেই তাই ঘরের বেড়া বাঁধিতে বসিলেন। কনিষ্ঠ কন্যা জগদীশ্বরীকে রাখিলেন উল্টাদিকে। দড়ির খুঁটটি বার বার ফিরাইয়া দিয়া সে পিতাকে সাহায্য করিতে থাকে।

একমনে রামপ্রসাদ বেড়া বাঁধিয়া চলিয়াছেন, আর কণ্ঠে চলিতেছে মাতৃসঙ্গীতের অস্ফুট গুঞ্জন!

হাতের কাজ আর নামগানে তিনি নিবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন, এদিকে চঞ্চলা বালিকা কন্যা খেয়াল খুসীমত কোথায় চলিয়া গেল।

অনেকক্ষণ কাটিয়া গিয়াছে। জগদীশ্বরীর হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল, সত্যিই তো, বেড়া-বাঁধার কাজে পিতাকে সে যে অনেকটা সাহায্য করিতেছিল! সেদিকে যাওয়ার কথা এতক্ষণ মনেই পড়ে নাই। তাড়াতাড়ি সে তখনি ছুটিয়া গেল।

গিয়া দেখে, বেড়া সংস্কারের কাজ অনেকটা আগাইয়া গিয়াছে। বিস্মিত হইয়া পিতাকে প্রশ্ন করে,—"বাবা তোমার বেড়া বাঁধা তো প্রায় শেষ হয়েছে দেখ্‌ছি। একলা কি করে এতটা এগুলে। কে-ই বা তোমার দড়ির খুঁট ফিরিয়ে দিচ্ছিল, বলতো?"

"কেন, মা, তুই-ই তো ওপাশ থেকে বরাবর দিয়ে যাচ্ছিস্।"

"সে কি কথা বাবা! আমি তো অনেকক্ষণ এখান থেকে উঠে গেছি। ওঘর থেকে খেয়েদেয়ে এই মাত্র যে এলুম।"

কন্যা জগদীশ্বরীর কথা শুনিয়া রামপ্রসাদের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। বুঝিলেন, তাঁহার ধ্যানের ঠাকুরাণীর আসন টলিয়াছে। জগন্মাতা ভক্তের ভক্তিপ্রেমের ডোরে বাঁধা পড়িয়াছেন—তাহারই টানে আজ তাঁহাকে নামিয়া আসিতে হইয়াছে। পুত্রের গৃহকাজে লীলাচ্ছলে একটু সাহায্য করিয়া আবার দেবী অন্তর্দ্ধান হইয়াছেন। ভক্তের কাছে, অবোধ সন্তানের কাছে মায়ের এ কি অদ্ভুত লুকোচুরি। হৃদয়ে তরঙ্গ তুলিয়া দিয়া জগদম্বা কোথায় আত্মগোপন করিলেন? রামপ্রসাদের অন্তরে উঠে প্রবল ঝড়,—দুই নয়নে বহিতে থাকে অশ্রুধারা।

ভক্তের আকর্ষণে ব্রহ্মময়ীকে নামিয়া আসিতে হইয়াছে। শ্যামা-মায়ের একি অপার করুণা! কন্যারূপে আবির্ভূতা হইয়া রামপ্রসাদের ঘরের বেড়া নিজেই বাঁধিয়া দিয়া গেলেন। ভক্ত সাধকের অন্তর্লোকে সেদিন তাই অতি সহজে পরম বন্ধনের যোগ্যসূত্রটি গাঁথা হইয়া গেল। সাশ্রু-নয়নে রামপ্রসাদ গাহিলেন—

মন কেন মায়ের চরণ ছাড়া?
ও মন ভাব শক্তি, পাবে মুক্তি,
বাঁধ দিয়ে ভক্তি-দড়া

নয়ন থাক্‌তে দেখলে না মন
কেমন তোমার কপাল পোড়া।
মা ভক্তে ছলিতে তনয়ারূপেতে
বেঁধে গেলেন ঘরের বেড়া।

অন্তরের তীব্র ব্যাকুলতায় রামপ্রসাদ যত অধীর হইয়া উঠেন, ছলনাময়ী মায়ের লীলারঙ্গও তেমনি চলে বিচিত্র ধারায়।

সেদিন তিনি গঙ্গার ঘাটে স্নান করিতে যাইতেছেন, হঠাৎ এক অপরিচিতা নারী তাঁহার অঙ্গনে আসিয়া দাঁড়ান। সুন্দর সুঠাম শ্যাম তনুতে দিব্য লাবণ্যশ্রী টলমল করিতেছে। সুমধুর স্বরে নারী অনুরোধ জানান, "বাবা, তোমার কণ্ঠের শ্যামাসঙ্গীত যেন সুধামাখা। সেই সঙ্গীত আমি শুনতে এলাম। আমায় কিছু শোনাও।"

প্রসাদের তখন বড় তাড়াতাড়ি। বেলা গড়াইয়া যাইতেছে, এখনি গঙ্গাস্নান সারিয়া না আসিলে মায়ের দ্বিপ্রহরের ভোগ নিবেদনে আরো দেরী হইয়া যাইবে। মিনতি করিয়া কহিলেন, "মা, তুমি একটু অপেক্ষা ক'র। গঙ্গা থেকে এসেই তোমায় গান শোনাচ্ছি!"

স্নানের ঘাট হইতে ফিরিয়া আসিয়াই দেখেন, রমণী অন্তর্হিত। অনেক খুঁজিয়াও তাঁহার সন্ধান পাওয়া গেল না।

পূজামণ্ডপে মায়ের ভোগ আরতি হইয়া গেল, রামপ্রসাদ ধ্যানাবিষ্ট হইলেন। এবার নয়ন সমক্ষে ফুটিয়া উঠিল সেই নারীমূর্ত্তি। অঙ্গের জ্যোতির ছটায় চারিদিক উদ্ভাসিত। এ কি? এ যে মা অন্নপূর্ণা!

অনুযোগের সুরে মা কহিলেন, "বাবা প্রসাদ, তোমার মধুর গান শোন্‌বার লোভেই যে কাশী থেকে এসে তোমার দুয়ারে অতিথি হয়েছিলাম। তোমার নিবেদিত গান আমি তোমারই কণ্ঠে শুনতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমাকে তো শোনালে না, বাবা!"

একি রঙ্গ ছলনাময়ীর। রামপ্রসাদের অন্তর অব্যক্ত ব্যথায় ভরিয়া উঠিল। চঞ্চল চরণে বারাণসীর পথে তখনই রওনা হইলেন। জননী অন্নপূর্ণাকে যে তাঁহার প্রসাদীসঙ্গীত শুনাইতেই হইবে!

পদব্রজে ছুটিয়া চলিতেছেন। সম্মুখেই পড়িল ত্রিবেণীর ঘাট। শ্রান্ত দেহে রামপ্রসাদ এখানে বিশ্রাম করিতে বসিলেন।

আবার বিশ্বজননীর সেই সুধামাখা স্বর। কহিলেন, "রামপ্রসাদ, কাশীর পথে ছুটতে গিয়ে কেন নিজেকে এমন করে শ্রান্ত-ক্লান্ত করছো। বাবা, আমি কি শুধু কাশীতেই থাকি? সারা সৃষ্টি পূর্ণ করে কি আমি বিরাজ করছিনে? আমি রয়েছি বিশেষ করে আমার ভক্তেরই হৃদয়-বেদীতে। তুমি আমার পরম ভক্ত। তোমায় হৃদয়েই আমায় খোঁজো! কাশীতে আস্‌বার দরকার কি? এই ত্রিবেণীর ঘাটে বসেই প্রাণভরে আমায় গান শোনাও।"

রামপ্রসাদ আনন্দে একেবারে আত্মহারা হইয়া গেলেন। ভক্তি-রসে অভিসিঞ্চিত যে কয়খানি গান এ সময়ে তাঁহার কণ্ঠ হইতে উৎসারিত হয়, তাহা এদেশের শাক্তসঙ্গীতের মধ্যমণি হইয়া থাকিবে।

অতঃপর কাশীযাত্রায় নিরস্ত হইয়া রামপ্রসাদ হালিসহরে ফিরিয়া আসিলেন।

ত্রিবেণীসঙ্গমে সেদিন যে তত্ত্ব রামপ্রসাদের মাতৃসঙ্গীতে স্ফুরিত হইয়া উঠে, ভক্তজনের তাহা চিরস্মরণীয়—

আর কাজ কি আমার কাশী?
মায়ের পদতলে পড়ে আছে
গয়া গঙ্গা বারাণসী।
হৃৎ-কমলে ধ্যানকালে
আনন্দসাগরে ভাসি।
ওরে কালীপদ কোকনদে
তীর্থ রাশি রাশি!

রামপ্রসাদের মা সর্ব্বেশ্বরীদেবী এ সময়ে পরলোকগমন করিলেন। গর্ভধারিণীর এই মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা বড় জাগতিক বন্ধন টুটিয়া গেল।

প্রসাদের পুত্র রামদুলাল বুঝিলেন, পিতাকে দিয়া সংসারের কাজ আর চলিবে না। তিনি তাঁহাকে নিষ্কৃতি দিলেন।

তীব্রতম বৈরাগ্য এ সময়ে দেখা দিয়াছে প্রসাদের জীবনে। সর্ব্ব বন্ধন ও বোধের উর্দ্ধে, সীমাহীন নভোলোকে জীবন-বিহঙ্গ তাঁহার কেবলি উড়িয়া চলিয়াছে। উগ্রতম তপস্যা ও বীরাচারী সাধনার মধ্যে তিনি মত্ত হইয়া গিয়াছেন।

মা জগদম্বার চিন্ময়ী মূর্ত্তির দর্শন তাঁহার চাই, সর্ব্ব মনপ্রাণ এজন্য অধীর হইয়া উঠিয়াছে। তামসী অমাবস্যা পরপর আবর্ত্তিত হইয়া আসে, গভীর নিশীথে পঞ্চমুণ্ডীর সিদ্ধাসনে বসিয়া জপধ্যানে প্রসাদ ডুবিয়া যান। মাতৃনামের আরাবে বনভূমি উচ্চকিত হইয়া উঠে।

পঞ্চবটীর সিদ্ধাসনে তমিস্রাঘন এক অমানিশায় প্রসাদ জীবনমরণ পণ করিয়া উপবিষ্ট হইলেন। জগন্মাতা এইদিন আর তাঁহার বীর সাধককে এড়াইতে পারেন নাই।

ধ্যানমগ্ন সাধকের সম্মুখে জননী আবির্ভূতা হইয়াছেন। অমৃত-জ্যোতির প্লাবন বহিয়া যাইতেছে চারিদিকে। রামপ্রসাদের সমস্ত সত্তা তাহাতে ডুবিয়া যাইতে চায়। মাতৃমূর্ত্তির সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়া সেদিন তিনি উপনীত হইলেন বোধাতীত চিন্ময় রাজ্যে।

পরদিন প্রভাতে তাঁহার অচেতন দেহে যখন সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল পঞ্চবটীতে তখন লোকের ভীড় জমিয়া গিয়াছে।

বড় অপরূপ আনন্দময়ীর এ দর্শন। জ্যোতির্লোকের দুয়ার ইহা ভক্তের নয়ন সমক্ষে খুলিয়া দিয়াছে। নূতনতর চেতনা, নূতনতর জীবনের আস্বাদে প্রসাদ এবার পূর্ণ নব নব ভক্তি সঙ্গীতের ডালা সোৎসাহে তিনি সাজাইতে বসিলেন। কণ্ঠে তাঁহার মধু—রচনায় ভক্তি ও জ্ঞানের অপূর্ব্ব সমাহার! যে একবার তাঁহার শ্যামাসঙ্গীত শুনে, অলৌকিক ভাবরসে আপ্লুত হইয়া যায়। সিদ্ধদেহে দিব্য কান্তি ও ঔজ্জ্বল্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। শক্তিমান কালীসাধক বলিয়া সর্ব্বত্র তিনি

খ্যাত হইয়া পড়িয়াছেন। তাই তাঁহাকে দর্শনের জন্য, তাঁহার সঙ্গীত শোনার জন্য অঙ্গনে ভীড়ের অন্ত নাই।

গুণগ্রাহী মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র এ অঞ্চলে আসিলেই মাঝে মাঝে সাধক কবির পঞ্চবটীতলে আসিয়া বসেন। শ্যামামায়ের নাম গানে প্রহরের পর প্রহর কাটিয়া যায়। মায়ের পরম অনুগৃহীত ভক্ত এই রামপ্রসাদ। মহারাজ তাই তাঁহারই অনুগ্রহের প্রত্যাশায় উন্মুখ হইয়া থাকেন।

সুরসিক বলিয়া হালিসহরের আজু গোঁসাইর খুব নাম। তাঁহার উপস্থিতি মাঝে মাঝে রামপ্রসাদ ও কৃষ্ণচন্দ্রের ধর্ম্মালোচনার ফাঁকে ফাঁকে হাস্যরসের জোগান দেয়। আজু গোঁসাই বৈষ্ণব কবি, তাঁহার ভাল নাম, অযোধ্যানাথ গোস্বামী। তেমন প্রতিভাবান না হইয়াও প্রসাদের সান্নিধ্যে থাকিয়া তিনি খ্যাতি অর্জ্জন করিয়া যান।

হালিসহর শাক্ত-প্রধান স্থান। কিন্তু ইহার আশেপাশে বৈষ্ণবদের বাসও তখন কম ছিল না। প্রায়ই এইসব স্থানীয় বৈষ্ণব ও শাক্তের মধ্যে বাদ বিসম্বাদ চলিত। এই সময়ে আজু গোঁসাই হাস্যরসের ভিয়ান চড়াইতেন।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রামপ্রসাদের কাছে উপস্থিত হইলেই আজু গোঁসাইর ডাক পড়ে। প্রসাদ ভাবোন্মত্ত হইয়া নব নব সাধন-সঙ্গীত রচনা করেন, উচ্চকণ্ঠে সকলকে গাহিয়া শোনান। আর সঙ্গে সঙ্গে আজু গোঁসাই এক একটি বিদ্রূপাত্মক ছড়া বাঁধিয়া ফেলেন। রামপ্রসাদ হয়তো গাহিতেছেন—

ডুব দেরে মন কালী বলে
হৃদিরত্নাকরের অগাধ জলে।
রত্নাকর নয় শূন্য কখন
দু'চার ডুবে ধন না পেলে।
তুমি দম সামর্থ্যে এক ডুবে যাও,
কুলকুণ্ডলিনীর কূলে।

যেমন আজু গোঁসাইর অদ্ভুত উপস্থিত বুদ্ধি তেমনি তাঁহার পরিহাস নিপুণতা, কৌতুকোজ্জ্বল গানের পদ রচনা করিয়া তখনই মুখে মুখে তিনি উত্তর দেন—

ডুবিস্‌নে মন ঘড়ি ঘড়ি,
দম আটকে যাবে তাড়াতাড়ি।
একে তোমার কফের নাড়ী,
ডুব দিও না বাড়াবাড়ি।
হলে পরে জ্বরজ্বারি মন,
যেতে হবে যমের বাড়ী।

রামপ্রসাদের প্রসিদ্ধ গান, 'এ সংসার ধোঁকার টাটি'কে পরিহাস করিয়া আজু গোঁসাই গাহিতেন—

এ সংসার রসের কুটি—
হেথা, খাই দাই আর মজা লুটি।

রঙ্গরস ও হাস্য বিদ্রূপের পালা শেষ হইলে আজু চলিয়া যাইতেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সম্মুখে অতঃপর উন্মোচিত হইত রামপ্রসাদের আর এক মূর্ত্তি! রাত্রির গভীর অন্ধকারে আপন সিদ্ধাসনে ধীরে ধীরে গিয়া তিনি উপবিষ্ট হইতেন। মায়ের আরাধনা ও সাধনার নিগূঢ় ক্রিয়াদি একান্তে বসিয়া সম্পন্ন করিতেন।

মায়ের দর্শন রামপ্রসাদ লাভ করিয়াছেন। কিন্তু শুধু এ দর্শনে তাঁহার মন যে ভরে না! জগন্মাতার নিরন্তর সান্নিধ্যের জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠেন। অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য ব্রতী হন নিগূঢ় তান্ত্রিক ক্রিয়ায়। পরম নিষ্ঠায় আগাইয়া চলে তাঁহার শক্তিসাধনা।

প্রথমে বাহ্যিক পঞ্চ-মকারযুক্ত বীরভাবের সাধনায়ই তিনি ব্রতী হন। আট দশ বৎসরকাল কোলাচারের এই পন্থা অনুসরণের পর দিব্যাচারী তান্ত্রিক সাধনার স্তরে তাঁহার উত্তরণ ঘটে।

বীরাচারী সাধনার কালে রামপ্রসাদ তাঁহার গুরুরূপে বরণ করেন আগমবাগীশ আখ্যাধারী সে সময়কার এক তন্ত্রাচার্য্যকে। শুনা যায়,

ইনি ছিলেন ষোড়শ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ তন্ত্রসিদ্ধ মহাপুরুষ কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের সাধনধারার এক সংবাহক।

শক্তিসাধনার সিদ্ধির স্তরগুলি রামপ্রসাদ একটির পর একটি ভেদ করিয়া চলিয়াছেন। এবার প্রয়োজন নূতন পথপ্রদর্শকের। এই নিগূঢ় সাধনার পথে জগজ্জননী কোন্ সদ্‌গুরুকে আজ পাঠাইবেন, কে জানে? প্রসাদ বড় ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন।

গুরু অচিরেই একদিন মিলিয়া গেল, ঈশ্বরপ্রেরিত হইয়াই সেদিন ঘটিল তাঁহার আবির্ভাব। একলা শ্যামনগরের পথে গঙ্গার ধার দিয়া তিনি পথ চলিতেছেন। হঠাৎ গঙ্গার তটে দিব্যকান্তি, দীর্ঘকায় এক তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ। এই মহাপুরুষেরই নির্দ্দেশে এসময়ে শব-সাধনায় তিনি সিদ্ধ হন, তারপর শক্তি-সাধনার উচ্চতম স্তরে হন অধিষ্ঠিত। বর্ত্তমানের ইছাপুর ও শ্যামনগরের মাঝখানে, বড়তির বিলের নিকটে ছিল এক পুরাতন শ্মশান। সেখানে অমাবস্যার নিশীথে শক্তিধর গুরু নিগূঢ়তম ক্রিয়াগুলি তাঁহাকে অনুষ্ঠান করান।

রামপ্রসাদের দেহে এসময়ে দিব্য কান্তি ফুটিয়া উঠে। নয়ন দুইটি ভাববিভোর, বেশী সময় মৌনীভাবেই অতিবাহিত করেন, অধ্যাত্ম-চেতনার গভীরতর স্তরে দিনের পর দিন ডুবিয়া চলিয়াছেন, ব্রহ্মময়ী শ্যামা-মা ওতপ্রোত হইয়াছেন সর্ব্ব অস্তিত্বে।

শক্তিধর সাধকের জীবনে এ সময়ে বহু অলৌকিক বিভূতির প্রকাশ ঘটিতে দেখা যায়। দূর দূরান্ত হইতে আর্ত্ত, ভক্ত ও মুমুক্ষুর দল তাঁহার হালিসহরের অঙ্গনে জড়ো হইতে থাকে।

সেদিন পঞ্চবটীর সিদ্ধাসনে বসিয়া রামপ্রসাদ ব্যাকুলকণ্ঠে মাকে আহ্বান জানাইতেছেন। হঠাৎ চতুর্দ্দিক আলোয় আলোময় হইয়া উঠিল, জগন্মতা সম্মুখে আবির্ভূতা হইলেন।

মায়ের চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিতে হইবে, রামপ্রসাদ ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। কিন্তু উপায় কই? নিশীথে কোন পুষ্প-উপচারই যে আর

অবশিষ্ট নাই। যাহা কিছু ছিল, পূজা-অনুষ্ঠান শেষে ফুরাইয়া গিয়াছে। অথচ মায়ের পায়ে তু'টি ফুল যে না দিলেই নয়।

কথিত আছে, সিদ্ধ পুরুষের এ আকুলতা ও ইচ্ছাশক্তি সেদিন এক অঘটন ঘটাইয়া দেয়। পঞ্চবটীর পাশেই একটি গাব গাছ। রামপ্রসাদ ইহারই নীচ দিয়া ফুলের সন্ধানে যাইতেছেন, হঠাৎ দেখিলেন এক অলৌকিক কাণ্ড। এই গাব গাছটির শাখায় ফুটিয়া রহিয়াছে মায়ের প্রিয় কয়েকটি রক্তজবা!

আর এক অমাবস্যা রাত্রির কথা। প্রসাদ মায়ের আরাধনায় মগ্ন রহিয়াছেন। এসময়ে হালিসহর অঞ্চলে প্রচণ্ড এক ঝড় বহিয়া যায়। এই ঝড়-বাদলের তাণ্ডবে গঙ্গার তুই তীরের অধিকাংশ গৃহ ও বৃক্ষাদি বিনষ্ট হয়। কথিত আছে, মাতৃধ্যানে বিভোর রামপ্রসাদের পঞ্চবটী ও গৃহ-চত্বরে এই ঝড়ের বেগ সে সময়ে একটুও বুঝা যায় নাই। এক ফোঁটা বৃষ্টিও সেখানে পড়ে নাই। পরের দিন ভোর বেলায় তাঁহার বাসভবন ও বাগান সম্পূর্ণরূপে অক্ষত দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইয়া যায়।

মাতৃসঙ্গীতের সঞ্জীবনী শক্তিতে, নিজের আশীর্ব্বাদ ও করস্পর্শে রামপ্রসাদ যে কত শুষ্ক জীবনে ফুল ফুটাইয়া গিয়াছেন, কত মানুষের মুক্তির তুয়ার উন্মোচিত করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই।

সিদ্ধ সাধকের দৃষ্টির কাছে ভেদবুদ্ধির গণ্ডী এখন আর নাই। এক অখণ্ড বোধের রাজ্যে তিনি উপনীত। শ্যামা ও শ্যামের সমন্বয়ের তত্ত্ব ঘোষণা করিয়া রামপ্রসাদ তাই গাহিতেছেন—

মন ক'রো না দ্বেষাদ্বেষি যদি হবিরে বৈকুণ্ঠবাসী।
আমি বেদাগম পুরাণ করিলাম কত খোঁজ তালাসি,
ঐ যে কালী কৃষ্ণ শিব রাম—সকল আমার এলোকেশী।
শিবরূপে ধর শিঙা কৃষ্ণ রূপে বাজাও বাঁশী।
ওমা, রামরূপে ধর ধনু, কালীরূপে করে অসি।

সর্ব্বভেদ ও দ্বন্দ্বের অতীত এ পরম দর্শনের তত্ত্ব প্রসাদের আরও দুই একটি প্রসিদ্ধ সঙ্গীতে রহিয়াছে। পরমানন্দে সেখানে তিনি গাহিয়াছেন, 'কালী হ'লি মা রাসবিহারী, নটবর বেশে বৃন্দাবনে।'

'জান না রে মন পরম কারণ. কালী কেবল মেয়ে নয়'—এই সঙ্গীতেও অনুরূপ ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রসাদের সাধনলব্ধ সঙ্গীতের এ অখণ্ড বোধ বাংলার সমাজ, সাহিত্য ও ধর্ম্মজগৎকে প্রভাবিত করিয়াছে, উত্তরকালে সমন্বয়বাণীর প্রচার সম্ভব করিয়াছে।

সাধন জীবনের পরবর্ত্তী স্তরে, এক অখণ্ড চৈতন্যের রসে রামপ্রসাদ নিমজ্জিত হইয়া যান, ধীরে ধীরে আপনাকে তিনি হারাইয়া ফেলেন নিঃসীম পারাবারে।

তাঁহার এই সময়কার সঙ্গীতগুলি ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তির অভেদতত্ত্বের বর্ণনায় ভরপুর। 'তারা আমার নিরাকারা', 'এবার শ্যামার নাম ব্রহ্ম জেনে ধর্ম্ম কর্ম্ম সব ছেড়েছি' প্রভৃতি মনোহর সঙ্গীতে তাঁহার চরম অনুভূতির পরিচয় মিলে।

প্রথম জীবনে রামপ্রসাদ তাঁহার ইষ্টদেবী শ্যামা-মাকে বাঁধিয়া ফেলেন ভক্তির ডোরে। তারপর তান্ত্রিক গুরুর উপদিষ্ট সাধনার মধ্য দিয়া বীরভাবের অধ্যাত্মস্রোত তাঁহার জীবনে প্রবাহিত হয়। সর্ব্বশেষে আসে দিব্যভাব আর কৌলসাধনার চরম সাফল্য।

শেষ জীবনে কিন্তু রামপ্রসাদের অধ্যাত্ম-সত্তায় নূতন এক রূপান্তর দেখা দেয়। এ সময়ে তিনি হইয়া পড়েন জগন্মাতার এক অবোধ শিশু। চিন্ময়ী জননীর সাথে সর্ব্ব সত্তা তাঁহার জড়াইয়া গিয়াছে। ভক্তির ভাবে তিনি সদা বিভোর! বালকবৎ এই ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের মুখে শুনা যায় শুধু মায়ের নাম। এ নামামৃতের প্রভাবে তিনি সমসাময়িক এবং উত্তরকালের শক্তিসাধকদের জীবনে এক অফুরন্ত রসের প্রস্রবণ যোগাইয়া যান। রামপ্রসাদের এই সময়কার গানগুলি মা ও ছেলের নিবিড়, অন্তরঙ্গ সম্পর্কটি ধরিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। তাই তাঁহাকে গাহিতে শোনা যায়—

আমার অন্তরে আনন্দময়ী সদা করিতেছেন কেলি,
আমি যে ভাবে সে ভাবে থাকি নামটি কভু নাহি ভুলি।

এবার তিনি বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। মায়ের ইঙ্গিতে, মায়ের নাম মুখে করিয়া, মায়েরই ভাব বুকে বাঁধিয়া তাঁহাকে চলিতে হয়। কণ্ঠে তাঁহার ধ্বনিত হয়—'ওরে তত্ত্বমসির উপরে সেই মহেশ-মহিষী'।

এ সময়কার সাধন জীবনে রামপ্রসাদ শুদ্ধাভক্তির এক রসভাণ্ডার উজার করিয়া দিয়াছেন। শক্তি ও জ্ঞানমার্গের পথ দুর্গম নয়, ইহা যে মহাশক্তির চরণে ভক্তিহৃদয়ের রক্ত-জবা অর্পণেরই পথ। প্রসাদের ভাবময়তা, তাঁহার ভক্তির দাক্ষিণ্য ভক্ত সাধারণের জন্য এই সহজ রাজপথ সেদিন উন্মুক্ত করিয়া দেয়। মাতৃনামের চারণ গাহেন—

প্রসাদ বলে, ভক্তের আশা পুরাইতে অধিক বাসনা।
সাকারে সাযুজ্য হবে, নির্ব্বাণে কি গুণ বল না।

আবার কখনো বা ভক্তিবাদের মূল কথাটি উদ্ঘাটন করিয়া দিয়া, রস ও রসিকের মাধুর্য্য-আস্বাদনের তত্ত্বটি জানাইয়া দেন—

ওরে, সকলের মূল ভক্তি,
মুক্তি হয় মন তার দাসী।
নির্ব্বাণে কি আছে ফল
জলেতে মিশায় জল॥
ওরে, চিনি হওয়া ভাল নয়।
মন, চিনি খেতে ভালবাসি॥

সব কিছু তত্ত্ববিশ্লেষণ, আর বিচার-বিতর্কের অবসানের দাবী জানাইয়া ভক্ত রামপ্রসাদ তাঁহার এক অবিস্মরণীয় সঙ্গীতে ভাবময়ী মায়ের তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া বলেন—

মন কি কর তত্ত্ব তারে, ওরে উন্মত্ত আঁধার ঘরে।
সে যে ভাবের বিষয়, ভাব ব্যতীত
অভাবে কি ধরতে পারে ?

শক্তি-সিদ্ধ মহাপুরুষ রামপ্রসাদ প্রায় আশী বৎসরকাল জীবিত ছিলেন। ইহার পর আসে তাঁহার জীবনলীলার শেষ অঙ্ক।

বহুদিন আগের কথা। সাধক-জীবনের মধ্যযুগে এক সময়ে মায়ের কাছে প্রাণের আকাঙ্ক্ষা নিবেদন করিয়াছিলেন, 'প্রাণ যাবার বেলা এই কোরো মা, ব্রহ্মরন্ধ্র যায় যেন ফেটে'। জগজ্জননী তাঁহার প্রিয় পুত্রের এ আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেন।

শেষের দিনটির কথা রামপ্রসাদ বুঝিতে পারেন। জানাইয়া দেন,—এবার তাঁহার মরদেহ ত্যাগ করার পালা। দাবানলের মত এ সংবাদ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। গঙ্গার তট লোকে লোকারণ্য হইয়া যায়। পবিত্র গঙ্গাবারিতে আবক্ষ নিমজ্জিত করিয়া সানন্দে মাতৃনাম গাহিতে গাহিতে সাধক দেহরক্ষা করেন। ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া প্রাণবায়ু বহির্গত হয়।

'আমায় দাও মা তবিলদারী' বলিয়া প্রসাদ রচনা করেন তাঁহার প্রথম প্রার্থনা সঙ্গীত। ভক্তের সে প্রার্থনা ব্রহ্মময়ী পূর্ণ করেন, আর এ তহবিলের বিপুল ঐশ্বর্য্য ভক্ত সাধক অকৃপণ হস্তে চারিদিকে বিলাইয়া দিয়া যান। সর্ব্বোপরি, শক্তি-সাধনার ঊষর পথকে তিনি সিঞ্চিত করেন কালীনামের অমৃতধারায়।

পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধ। দীর্ঘদিনের সুষুপ্তি আর জড়তা কাটাইয়া জাতি সবেমাত্র জাগিয়াছে—ধর্ম্ম, সংস্কৃতি ও সমাজের ক্ষেত্রে মুক্তির প্রাণধারা ছড়াইতেছে। ভারতীয় জীবন-নির্ঝরের ঘটিয়াছে সেদিন স্বপ্নভঙ্গ।

বহু বিশিষ্ট সাধক ও মনীষী সে সময়ে এদেশে আবির্ভূত হন। ইঁহাদের জীবন ও সাধনাকে কেন্দ্র করিয়া দিকে দিকে গড়িয়া উঠে নূতন প্রাণ-তরঙ্গ। পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী ছিলেন এই কীর্ত্তিমানদেরই অন্যতম। শক্তিধর আচার্য্যরূপে, এ দেশের ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির এক শ্রেষ্ঠ সংবাহকরূপে তিনি আত্মপ্রকাশ করেন। ভারত-ধর্ম্মের উজ্জীবনের জন্য শুরু হয় তাঁহার ঐকান্তিক প্রয়াস। স্বামী বিবেকানন্দেরও অনেক আগে এই শক্তিধর সন্ন্যাসী জাতিকে উদ্বুদ্ধ করেন নবতর চেতনায়।

ওজস্বিনী বাগ্মিতা, অধ্যাত্মশক্তি ও সংগঠনের বলে পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ সারা উত্তর ভারত আলোড়িত করিয়া তোলেন। সনাতন ধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য যে ত্যাগ তিতিক্ষা তিনি বরণ করেন তাহার পরিমাপ আজো করা হয় নাই সম্ভব।

বাংলা ও হিন্দী ভাষায় তিনি ছিলেন অদ্বিতীয় ধর্ম্মবক্তা। শাস্ত্রবিদ্ হিসাবেও প্রতিষ্ঠা তাঁহার ছিল অসামান্য। তাঁহার দর্শন ও ভাষণ অগণিত মানুষের হৃদয়ে উদ্দীপনা জাগাইয়া তুলিল।

স্বামীজীর শক্তিকে কেন্দ্র করিয়া উত্তর ভারতের ধর্ম্মান্দোলনে এই সময়ে আত্মনিয়োগ করেন আত্মানন্দ পরমহংসজী, মহামহোপাধ্যায় রামমিশ্র শাস্ত্রী, পণ্ডিত অম্বিকাদত্ত ব্যাস, শশধর তর্কচূড়ামণি, শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব, মদনগোপাল গোস্বামী প্রভৃতি ধর্ম্মনেতা।

প্রায় পাঁচ শতাধিক আর্য্যসভা, হরিসভা শ্রীকৃষ্ণানন্দের প্রেরণায় গড়িয়া ওঠে। জ্ঞান ও ভক্তিবাদের প্রচারে, ধর্ম্মসঙ্গীতের যাদু স্পর্শে সমগ্র দেশ তিনি মাতাইয়া তোলেন, সহস্র সহস্র লোক ধন্য হয় তাঁহার অনুপ্রেরণায়।

সিদ্ধাবধূত বাবা-দয়ালদাসজীর আশীষ কোন্ শুভ মুহূর্ত্তে একদিন ঝরিয়া পড়ে কৃষ্ণানন্দের উপর, অধ্যাত্মসাধনার বীজটি তাঁহার জীবনে রোপিত হয়। তারপর কর্ম্মময়, ভাবময় সাধনার পথ বাহিয়া উত্তরকালে এ জীবন সার্থক হইয়া উঠে। গুরুকৃপার কল্যাণধারাকে দেশের দিকে দিকে তিনি ছড়াইয়া দেন।

পশ্চিমবঙ্গের ভাগীরথীর তীরে অবস্থিত গুপ্তিপাড়া শ্রীকৃষ্ণানন্দের জন্মস্থান। এই গ্রামে ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে তিনি আবির্ভূত হন। প্রবীণ চিকিৎসক ঈশ্বরচন্দ্র সেনের তিনি দ্বিতীয় পুত্র। মাতার নাম ভবসুন্দরী। বালককালে তাঁহাকে ডাকা হইত কৃষ্ণপ্রসন্ন নামে। তাঁহার এ সময়কার জীবনে প্রতিভার ছাপ তেমন কিছু দেখা যায় নাই! আঠার বৎসর অবধি পড়াশুনা করার পর বাধ্য হইয়া তিনি স্কুল ত্যাগ করেন। সংসারে তখন দারুণ অভাব অনটন চলিতেছে, তাড়াতাড়ি তাই চাকুরী না নিয়া উপায় রহিল না।

তরুণ বয়স হইতেই কৃষ্ণপ্রসন্নের মর্ম্মমূলে রহিয়াছে এক অজানা লোকের আকর্ষণ। এ আকর্ষণ তাঁহাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তোলে :

জীবনের অন্তস্থলে কোন্ এক ফল্গুধারা বহিয়া চলিয়াছে। মাঝে মাঝে ইহারই খানিকটা উচ্ছলিত হইয়া উঠে। পূর্ব্বজন্মের সাত্ত্বিক সংস্কার আত্মপ্রকাশ করিতে চায়। এ বয়সেই বহু অধ্যাত্ম-রসের কবিতা তিনি রচনা করিয়া ফেলেন, সঙ্গী সাথীদের কাছে হইয়া ওঠেন বিস্ময় ও সম্ভ্রমের বস্তু।

সেদিন কৃষ্ণপ্রসন্ন একটি নৌকা নিয়া গঙ্গাবক্ষে ভ্রমণ করিতে গিয়াছেন। সঙ্গে দুই-তিনটি অন্তরঙ্গ বন্ধু। দিগন্তের দিকে চাহিতেই

মন উধাও হইয়া গেল অনন্তের পানে। মহামায়ার অলৌকিক শক্তির কথা ভাবিতে ভাবিতে চৈতন্যের এক অতল গভীরে তিনি তলাইয়া গেলেন, কোন বাহ্যজ্ঞান রহিল না। এক দিব্য অনুভূতিতে হৃদয় তাঁহার পূর্ণ হইয়া উঠিল। কৃষ্ণপ্রসন্ন বলিতেন, উত্তর জীবনের আত্মিক পাথেয়রূপে সেদিনকার এ অনুভূতি তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিল।

গৃহে অর্থাভাব। পড়াশুনার খরচ চালানোর কোন উপায় নাই। পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনই বা কি করিয়া চলিবে? বহু ধরাধরি করিয়া কৃষ্ণপ্রসন্ন জামালপুরে রেলঅফিসের এক চাকুরী গ্রহণ করিলেন।

অফিসের কাজকর্ম্ম শেষ হইলেই বাসায় ফিরিয়া আসেন। তারপর চলে বিদ্যাভ্যাস ও শাস্ত্রচর্চ্চা। যে অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসা তরুণ হৃদয়ে জাগ্রত হইয়াছে, তাহা তাঁহাকে চঞ্চল করিয়া তোলে। ভগবৎ-দর্শনের আকাঙ্ক্ষা ক্রমে উদগ্র হইয়া উঠে।

সহরে কোন ভাল সাধু-সন্ন্যাসী আসিলেই কৃষ্ণপ্রসন্ন সেখানে ছুটিয়া যান। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাছে গিয়া বসিয়া থাকেন, সোৎসাহে সেবা-যত্ন করেন।

অন্তরে গুমরিয়া উঠিতেছে মুক্তির দুর্নিবার ইচ্ছা। জনবিরল গঙ্গা-সৈকতে যখনই তিনি উপস্থিত হন, তখনই কি জানি কেন মর্ম্মতল হইতে জাগিয়া উঠে এক অস্ফুট কান্না। অব্যক্ত বেদনায় অধীর হইয়া পড়েন। কে তাঁহাকে বলিয়া দিবে পরম পথের বার্ত্তা?

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাস। মুঙ্গেরের গঙ্গাতটে সেদিন সাধু-সন্ন্যাসীর ভীড় জমিয়া উঠিয়াছে। শত শত গৈরিকধারী দণ্ডী সন্ন্যাসী গঙ্গাসাগর মেলার যাত্রী। সহরের উপকণ্ঠে দুই-একদিন তাঁহারা বিশ্রাম করিয়া যাইবেন। কষ্টহারিণী ঘাটে বিশিষ্ট সাধুসন্ন্যাসীর এক জমায়েৎ বসিয়াছে। কৃষ্ণপ্রসন্ন প্রায়ই এখানে বসিয়া থাকেন, ভক্তিভরে করেন মহাপুরুষদের সেবা-যত্ন। পুণ্য সঙ্গ পাইয়া তাঁহার মহা আনন্দ।

সেদিন গঙ্গার ঘাটের কোণে হঠাৎ এক জটাজূটধারী দিব্যকান্তি সাধুকে দেখিয়া তিনি থমকিয়া দাঁড়াইলেন। খোঁজ নিয়া জানিলেন, ইনি এক উচ্চকোটি সাধু—পরমহংস। সম্মুখে গিয়া ভক্তিভরে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। অনেক কিছু কথাবার্ত্তা হইল। কিছুটা ঘনিষ্ঠ হওয়ার পর সন্ন্যাসীকে ধরিয়া পড়িলেন, তাঁহার আবাসে গিয়া কৃপা করিয়া একদিন ভোগ চড়াইতে হইবে।

পরমহংসজী এ অনুরোধ শুনিলেন বটে কিন্তু উচ্চবাচ্য করিলেন না। কৃষ্ণপ্রসন্নও ছাড়িবার পাত্র নন, পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। মহাপুরুষ এবার হাসিয়া কহিলেন, "বাচ্চা, নদী সাগরমে মিল্‌তি হ্যায়, লেকিন সাগর কোভি নদীমে আ কর নেহি মিল্‌তি হ্যায়"—অর্থাৎ, বাবা, স্বভাবধর্ম্ম অনুসারে নদীই সাগরে গিয়া পড়ে। সাগর কিন্তু কখনো উল্টা পথ বেয়ে নদীর দিকে এগিয়ে আসে না, সে থাকে নিজেকে নিয়ে অপার সন্তোষে।

কৃষ্ণপ্রসন্নকে হটানো বড় সহজ নয়। তৎক্ষণাৎ তিনি জবাব দিলেন, "মহারাজ, পশ্চিম দেশে হয়তো এ নিয়ম খাটে, আমাদের বাংলাদেশে কিন্তু অন্য রকম ব্যাপার। সাগরসঙ্গমে গিয়ে দেখতে পাবেন, সাগরই নিজের গরজে তার জোয়ারের জল নদীর বুকে এনে পৌঁছে দেয়।"

চমৎকার উত্তর এ প্রতিভাদীপ্ত যুবকের। চোখে মুখে মুক্তিকামী সাধকের ছাপ। পরমহংসজী খুসী হইয়া পড়িলেন। এবার আর তাঁহার আবাসে গিয়া ভিক্ষা গ্রহণে আপত্তি দেখা গেল না। এ তরুণকে তিনি প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া গেলেন।

কৃষ্ণপ্রসন্নের জীবন নদীতে সাগরের জল কিন্তু সত্যই এবার আসিয়া উপস্থিত হয়। এই কষ্টহারিণী ঘাটেই অপ্রত্যাশিতভাবে তিনি সদ্‌গুরুর সাক্ষাৎ পান।

সাধুদের জমায়েতে ঘুরিতে ঘুরিতে তিনি একদিন যোগী দয়ালদাস বাবার দর্শন পাইলেন। মহাত্মার যোগবিভূতির খ্যাতি তখন চারিদিকে। দিনের বেলায় তাঁহার কাছে লোকের ভীড়ে আগাইবার উপায় নাই।

একদিন তাই গভীর রাত্রে নিভৃতে কৃষ্ণপ্রসন্ন তাঁহার আসনের সামনে আসিয়া দাঁড়ান।

সাশ্রুনয়নে প্রাণের আকাঙ্ক্ষা নিবেদন করিয়া কহেন, "বাবা, ঈশ্বরলাভ ছাড়া জীবনে আমার আর কোন কাম্য নেই। এ অধমকে কৃপা করুন, দেখিয়ে দিন অভীষ্ট সিদ্ধির পথ।"

ঋদ্ধি সিদ্ধি সব কিছুই মহাপুরুষের করতলগত। নিগূঢ় যোগসাধনার তিনি এক সর্ব্বজনমান্য পথপ্রদর্শক। অথচ কি সহজ তাঁহার আচরণ, আর কি মধুর তাঁহার বাণী! চরণতলে বসামাত্র মুমুক্ষু কৃষ্ণপ্রসন্নের তাপিত হৃদয় শীতল হইয়া গেল।

মহাপুরুষ স্মিত হাস্যে তাঁহাকে কহিলেন, "শোন বাচ্চা, তোমায় আমি একটা গল্প শোনাচ্ছি।—এক ব্রাহ্মণ তাঁর যজমান বাড়ী থেকে ফিরছেন। ভারী ধনী যজমান। অনেক টাকাকড়ি তাঁকে প্রণামী দিয়েছে। সব কিছু তাঁর একটা পোঁট্‌লায় বেঁধে নিয়ে তিনি এগিয়ে চলেছেন। পথে রাত হ'লো অনেক। সাম্‌নে পড়লো এক অরণ্য পথ! রাত কাটাবার জন্য এক জীর্ণ পরিত্যক্ত কুটিরে তিনি আশ্রয় নিলেন। কিন্তু ঘুমন্ত অবস্থায় তাঁর পোঁট্‌লাটি চুরি হয়ে গেল। জেগে উঠে ব্রাহ্মণ তো কেঁদে আকুল! চারদিকে অনেক ছুটাছুটি করেও তাঁর পোঁট্‌লার কোন সন্ধান হ'লো না। অনন্যোপায় হয়ে তিনি রাজার শরণ নিলেন। এবার কিন্তু কাজ হ'লো, কয়েকদিনের ভেতর চোর ধরা পড়লো। টাকাকড়ি ফেরৎ পেয়ে ব্রাহ্মণের মুখে ফুটে উঠ্‌লো তৃপ্তির হাসি।"

গল্প বলা শেষ হইল। দয়ালদাসজী কহিলেন, "আচ্ছা বাবা, বল তো, এ থেকে তুমি কি বুঝ্‌লে।"

মর্ম্মার্থ বুঝিয়া নিতে কৃষ্ণপ্রসন্নের দেরী হইল না। কহিলেন, "বাবা, আমি আপনার বালক। বেশ, যেটুকু বুঝেছি, তা-ই ব'লবো। আপনার এই রূপক গল্পের ব্রাহ্মণটি হচ্ছে জীব। সাত্ত্বিক সংস্কারের নানা সম্পদ নিয়েই সে পৃথিবীতে আসে। পথমধ্যে কাম-ক্রোধ ইত্যাদি রিপু তার সে সম্পদ হরণ করে নেয়। এর পুনরুদ্ধার শুধু হ'তে পারে ঐ ব্রাহ্মণেরই

মত রাজার শরণ নিলে। অর্থাৎ, ভগবানের চরণে শরণাগতি না হওয়া অবধি হৃত সম্পদ ফিরে পাবার উপায় নেই!"

সাক্ষাৎমাত্রেই এ ভক্তিমান তরুণকে দয়ালদাসজী ভালবাসিয়া ফেলিয়াছেন। এবার এই উত্তরে খুসী হইয়া তাঁহাকে বারবার আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন।

সেদিনকার এ বিংশতি বৎসর বয়স্ক যুবকের জীবনে দয়ালদাসজী কৃপাভরে যে বীজমন্ত্র রোপণ করেন, উত্তরকালে তাহাই পরিণত হয় এক বিরাট মহীরুহে। কৃষ্ণপ্রসন্ন হন শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী।

দীক্ষা দানের পরই দয়ালদাস-বাবা সহাস্যে শিষ্যকে কহিলেন, "ব্যস, যে কাজের জন্য আমার এখানে আসা, পরমাত্মার ইচ্ছায় তা পূর্ণ হ'লো। এবার আমায় ডেরা-ডাণ্ডা উঠাতে হবে। একটা কথা স্মরণ রেখো, বাবা। আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে কখনো ব্যস্ত হ'য়ো না। প্রয়োজন মত এবং উপযুক্ত সময়ে আমার সাক্ষাৎ মিলবে।"

গুরুপ্রদর্শিত সাধনপথ এবার শ্রীকৃষ্ণানন্দের সম্মুখে প্রসারিত। সিদ্ধির সঙ্কল্প বুকে নিয়া নির্ভীক সাধক ব্রতী হইলেন তপস্যায়!

অন্তরাত্মার গভীর হইতে মাঝে মাঝে আসে অস্ফুট আহ্বান—'শ্রীকৃষ্ণানন্দ, ওঠো, জাগো। ভারত-ধর্ম্মকে করে তোল উজ্জীবিত।' চমকিয়া উঠেন। এ কোন্ ঐশী ইঙ্গিত? কি ইহার তাৎপর্য্য।

এ কাজে চাই কঠোর সাধনার প্রস্তুতি! ব্রহ্মচর্য্যব্রত ধারণ করিয়া প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্র মন্থন তাঁহাকে করিতে হইবে। সনাতনধর্ম্মের উজ্জীবন—ইহা যে তাঁহার চির-আকাঙ্ক্ষিত বস্তু! এই উজ্জীবনের মধ্য দিয়া ভারতভূমিতে আসিবে লোকমঙ্গলের প্রবাহ! আগামী দিনের অদ্বিতীয় ধর্ম্মবক্তা, আচার্য্য শ্রীকৃষ্ণানন্দের মনোলোকে এ চিন্তাধারা ক্রমে দানা বাঁধিয়া উঠিতে থাকে।

চিরকুমার থাকার ব্রত কৃষ্ণানন্দ গ্রহণ করিলেন, ঝাঁপ দিলেন ধর্ম্মান্দোলনের বন্যায়। প্রথমে মুঙ্গেরের জনজীবন তাঁহার প্রবর্ত্তিত

আর্য্যসভা ও হরিসভার কর্ম্ম প্রচণ্ড বেগে শুরু হয়, তারপর উহা ছড়াইয়া পড়ে সমগ্র উত্তরভারতে।

শ্রীকৃষ্ণানন্দের ধর্ম্মপ্রচারের বজ্রনির্ঘোষ শোনা যায় দিকে দিকে। অতুলনীয় বাগ্মিতা আর মনীষাদীপ্ত শাস্ত্রব্যাখ্যায় শিক্ষিত সমাজ আলোড়িত হইয়া উঠে, তাঁহার প্রবর্ত্তিত নামকীর্ত্তনের ধারা দিগ্‌বিদিকে বিস্তারিত হয়। যেমন অফুরন্ত তাঁহার প্রাণশক্তি, তেমনি বিস্ময়কর তাঁহার সংগঠন-প্রতিভা। আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভা ও হরিসভাগুলি দেশবাসীর ক্লৈব্য ও ধর্ম্মবুদ্ধির শিথিলতা দূর করিতে থাকে। তাঁহার সম্পাদিত পত্রিকা, 'ধর্ম্ম প্রচারক' জাগাইয়া তোলে প্রবল উদ্দীপনা।

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের হরিদ্বারের কুম্ভমেলা। শ্রীকৃষ্ণানন্দ এখানে সোৎসাহে যোগদান করেন। এই বিশাল ধর্ম্মক্ষেত্রের সাধু-জমায়েৎ তাঁহার প্রাণে এক অপূর্ব্ব আত্মবিশ্বাস জাগাইয়া তোলে।

দয়ালদাসবাবাও এই ধর্ম্মমেলায় উপস্থিত হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিভরে যোগীবরের চরণতলে গিয়া উপবেশন করিলেন, নূতনতর নানা সাধননির্দ্দেশ পাইয়া অন্তর তাঁহার নবভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিল। গুরুদেবের এ সময়কার ঋদ্ধিসিদ্ধির অলৌকিক লীলা সম্বন্ধে তিনি লিখিয়া গিয়াছেন:

"শ্রীমদ্ গুরুদেবের আশ্রমে গিয়া দেখি, তথায় সহস্রাধিক পরমহংস ও অবধূত বাস করিতেছেন। তাঁহারা অগ্নি ও মুদ্রা স্পর্শ করেন না, যাচ্ঞাও তাঁহাদের নিয়মবিরুদ্ধ, অথচ ভক্তবৎসল ভগবান তাঁহাদের জন্য উত্তম ঘৃতপক্ক মিষ্টান্নাদি আয়োজন করিয়া দিতেন। তখন তথাকার দৈনিক ব্যয় অন্যূন দুইশত টাকা। যিনি কল্পতরুমূলে বাস করেন তাঁহার আর অভাব কি? গুরুদেব নানা উপদেশ দানের পর আমায় একটি সারগর্ভ উপদেশ দিলেন, 'বৎস! যদি অরূপের রূপ দেখিতে চাও, দৃষ্টিকে অন্তঃবৃত্তিশীল কর'।"

শ্রীকৃষ্ণানন্দের বুকে জ্বলিয়া উঠে মুমূক্ষার আগুন, প্রাণ চঞ্চল

হইয়া উঠে। বৈষয়িক পরিবেশ হয় অসহ্য। ভবিষ্যৎ জীবনের কর্ম্মপন্থা তাড়াতাড়ি স্থির করিয়া ফেলেন। চাকুরী পূর্ব্বেই ত্যাগ করিয়াছেন। এবার উপনীত হন ভারতের প্রাণকেন্দ্র কাশীধামে, সেখানেই স্থাপিত হয় তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবনের কর্ম্মক্ষেত্র।

শ্রীকৃষ্ণানন্দের আর্য্যধর্ম্ম-প্রচারণী সভার শক্তি ক্রমে বাড়িতে থাকে। পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণিকে সভার ধর্ম্মাচার্য্যরূপে তিনি নিযুক্ত করেন। শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবও তাঁহাকে এ সময়ে যথেষ্ট সাহায্য করিতে থাকেন। বিশিষ্ট আচার্য্যদের শক্তি ও সহযোগিতাকে স্বামীজী কেন্দ্রীভূত করেন তাঁহার গঠনমূলক কর্ম্মে। অসাধারণ ব্যক্তিত্ববলে শুরু করেন সনাতন ধর্ম্মের সঙ্ঘবদ্ধ প্রচার। এদিক দিয়া আধুনিক ভারতে এক অনন্যসাধারণ কীর্ত্তি তিনি রাখিয়া যান।

পিতা পূর্ব্বেই স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে মাতাও কাশীধামে দেহরক্ষা করিলেন। জাগতিক বন্ধনগুলি এভাবে স্খলিত হইয়া গেল। এবার হইতে সারা দেহমনপ্রাণ তিনি ধর্ম্ম ও জাতির কল্যাণে নিয়োজিত করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণানন্দের বক্তৃতা ও শাস্ত্রব্যাখ্যায়, হরি কীর্ত্তনের ভাববন্যায় সেদিন উত্তর ভারত টলমল করিয়া উঠে। জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তির অপূর্ব্ব সমাহার ঘটে এই সন্ন্যাসীর জীবনে, ধীরে ধীরে জনগণের হৃদয় তিনি জয় করিয়া নেন।

দেশে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের অভ্যুদয় তখনো ঘটে নাই। শিক্ষিত ভারতীয়দের জীবনে বহিতেছে ধর্ম্মবিমুখতার স্রোত। এই স্রোতেরই বিরুদ্ধে কৃষ্ণানন্দ দাঁড়ান একক শক্তিতে, ধ্বনিত করেন ভারতাত্মার মহাবাণী। তাঁহার উদ্দীপনা ও প্রেরণা ভারতের নব্য সমাজের বুকে নূতনতর চেতনা আনিয়া দিতে থাকে।

কলিকাতায় আসিয়া শ্রীকৃষ্ণানন্দ একবার ঠাকুর রামকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ করেন! পরমহংসদেবের ভক্ত রামদত্ত মহাশয়ের সহিত তাঁহার

কিছুটা ঘনিষ্ঠতা জন্মে। প্রধানতঃ তাঁহারই সাহায্যে ঠাকুর সম্বন্ধে নানা তথ্য তিনি সংগ্রহ করেন। কেশব সেন মহাশয় যেমন ইংরেজী শিক্ষিত সমাজে শ্রীরামকৃষ্ণের কথা প্রচার করেন, তেমনি শ্রীকৃষ্ণানন্দও তাঁহার 'ধর্ম্ম প্রচারক' পত্রিকার মাধ্যমে শিক্ষিত ভারতের সম্মুখে ঠাকুরের দিব্য জীবনের আলেখ্যটি তুলিয়া ধরেন।

রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে তিনি লিখেন—"যাঁহার বাবা (শ্মশানবাসী শিব) পাগল—মা (কালী) যাঁহার পাগলিনী, তিনি পাগল না হইয়া কিরূপে থাকিবেন ? যেখানে পাগলের খেলা, পাগলের হাট-বাজার, পাগলের বাণিজ্য, সেখানে যে কোন গ্রাহক যাউক না কেন, সে পাগল হইয়া যায়। মহাত্মা রামকৃষ্ণ সেই বাজারের পাগল।...

"এক-একদিন তিনি তাঁহার প্রাণের পিপাসা সহ্য করিতে না পারিয়া মায়ের নিকট কাঁদিতেন ও সাশ্রুলোচনে জাহ্নবীতটে বালুকারাশিতে আপনার মুখ ঘর্ষণ করিতেন। আর বলিতেন, 'মা ! আমাকে ভক্তি দেও, আমি ভক্তি ভিন্ন আর কিছুই চাহি না। কখন কখন তিনি প্রান্তরে মাথা কুটিতেন। ভক্ত তুমিই ধন্য ! ভক্তির প্রকৃত মাহাত্ম্য তুমিই বুঝিয়াছ, তোমার নিকট ইন্দ্রত্ব, ব্রহ্মত্ব আদি ঐশ্বর্য্য তুচ্ছ হইতে তুচ্ছ !...

"মহাত্মা রামকৃষ্ণ এক্ষণে রামকৃষ্ণ পরমহংস নামে এদেশে প্রসিদ্ধ। পাঠক ! ইনি গৈরিক কৌপীনধারী নহেন, ইঁহার মস্তক মুণ্ডিত নহে। অথচ ইঁহাকে লোকে কেন পরমহংস বলে বুঝিয়াছ ? ইনি পরিচ্ছদে পরমহংস নহেন, কিন্তু কার্য্যে পরমহংস।..

"যদি কেহ তাঁহার নিকটে ভগবানের গুণগান করেন, তাহা হইলে দেখিতে দেখিতে তাঁহার সংজ্ঞার বিলোপ হইয়া যায়। শরীর নিস্পন্দ, শ্বাস বন্ধ, ধমনীতে রক্ত-চলাচল-শক্তি রুদ্ধ হইয়া যায়। আবার তাঁহাকে ঘন ঘন প্রণবধ্বনি শুনাইলে পুণশ্চেতনা জাগ্রত হইয়া থাকে।...

"পরমহংস মহাশয়েরই উপদেশগুণে ব্রাহ্মসমাজের অধিনায়ক কেশববাবুর শেষ জীবনে হিন্দুধর্ম্মের রঙ ধরিয়াছিল।"

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন সম্বন্ধে প্রত্যক্ষদর্শী স্বামীজীর এই বর্ণনা তাঁহার নিজেরই গুণ-গ্রাহিতা ও ভক্তিরসমধুর জীবনের পরিচয় জ্ঞাপন করে।

সহবাস-সম্মতি আইন নিয়া এক সময়ে সারা দেশে এক তুমুল আন্দোলন গড়িয়া উঠে। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে শ্রীকৃষ্ণানন্দ কলিকাতায় গড়ের মাঠের এক সভায় ইহার বিরুদ্ধে যে বাগবিভূতি প্রদর্শন করেন, আজিও তাহা স্মরণীয় হইয়া আছে। তাঁহার ওজস্বিনী বক্তৃতা শুনিয়া জনমণ্ডলী মহা উত্তেজিত হয়, লাটপ্রাসাদের দিকে ছুটিয়া যায়। 'আমরা আইন চাই না' বলিয়া বারবার দাবী ঘোষণা করিতে থাকে। ভারতীয় জনসাধারণের উপর স্বামীজীর ব্যক্তিত্বের এই প্রভাব সেদিনকার সরকারকে দুশ্চিন্তায় ফেলিয়াছিল।

১৮৯১ খৃষ্টাব্দের কথা। স্বামীজী কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিয়া হরিদ্বারের পূর্ণকুম্ভে উপস্থিত হইলেন। উদ্দেশ্য, গুরুর দর্শন ও উপদেশ লাভ। গঙ্গা-সৈকতে দয়ালদাসজী সমাসীন উচ্চকোটি সাধুদের দ্বারা তিনি পরিবৃত। শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিভরে সদ্‌গুরুর চরণতলে আসিয়া উপবেশন করিলেন। গুরুকৃপার অমৃতে প্রাণকুম্ভটি পূর্ণ করিয়া আবার জনকল্যাণের ক্ষেত্রে তিনি অবতীর্ণ হইতে চান।

একুশ বৎসর ব্যাপিয়া কঠোর ব্রহ্মচর্য্যব্রত তিনি পালন করিয়াছেন। এইবার গঙ্গার পবিত্র তটে গুরু দয়ালদাস-বাবা শিষ্যের লৌকিক জীবনের রূপান্তর সাধন করিলেন। জাতিকুল ও শিখা সূত্র সমস্ত কিছু ত্যাগ করাইয়া তাঁহাকে দিলেন পূর্ণ সন্ন্যাস। এই সময়েই তাঁহার নামকরণ হইয়াছিল শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী।

দয়ালদাসজী মহারাজ ছিলেন এ মেলার এক দর্শনীয় বস্তু। গঙ্গার সৈকতে, নবনির্ম্মিত আশ্রমে তিনি অবস্থান করিতেছেন। সঙ্গে কয়েক শত সন্ন্যাসী। পরমহংস ও অবধূতশ্রেণীর মহাত্মাও বহু আছেন।

অগণিত ভক্ত ও দর্শনার্থী এই মহাপুরুষের পায়ে আসিয়া লুটাইয়া

পড়িতেছে। দয়ালদাস বাবা নিজে কপর্দ্দকহীন। কাহারো কাছে কোন কিছু যাচ্ঞা করা, কাহারো গৃহে পদার্পণ করা তাঁহার রীতি বিরুদ্ধ। অথচ প্রতিদিন কয়েক সহস্র সন্ন্যাসী, গৃহীভক্ত. অভ্যাগত ও কাঙাল আশ্রমে আশ্রয় পাইতেছে, ভোজনে তৃপ্ত হইতেছে। কোথা হইতে খাদ্য আসিতেছে, কে জোগাইতেছে তাহা বুঝিবার উপায় নাই।

শুধু আশ্রয় ও অন্নদানই নয়—ভজন, কীর্ত্তন ও শাস্ত্রালাপে সারা মেলাক্ষেত্রে মহাপুরুষ আনন্দের স্রোত বহাইয়া দিয়াছেন।

নিকটেই গঙ্গার বাঁকের উপর এক মহাত্মা অবস্থান করেন। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ বলিয়া সাধকমহলে তাঁহার খুব খ্যাতি। দয়ালদাসজীর সহিত তাঁহার দীর্ঘ দিনের যোগাযোগ। প্রিয় শিষ্য শ্রীকৃষ্ণানন্দকে তিনি মহাত্মার কাছে আশীর্ব্বাদ নিতে পাঠাইলেন।

শিবকল্প সাধককে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণানন্দের আনন্দের সীমা রহিল না। ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া কহিলেন, "বাবা, আপনার উপদেশ দিয়ে আজ আমায় কৃতার্থ করুন।"

মহাত্মা সস্নেহে আশীর্ব্বাদ জানাইলেন। শান্তস্বরে কহিলেন, বাচ্চা, লোকে ব'লে থাকে, চক্ষু উন্মীলন করলে বস্তু দেখা যায়। কিন্তু এ তাদের ভ্রম। মানুষ যখন মায়ের গর্ভে থাকে, দুই চক্ষু নিমীলিত থাকে। 'বস্তু' অর্থাৎ শাশ্বত পুরুষের বসতি দেখা যায় তখনই। যেদিন থেকে দুই চোখ মেলে সে চায়, সেদিন থেকে দৃষ্টিতে কেবলই পড়ে 'অবস্তু' অর্থাৎ মায়াময় জগৎপ্রপঞ্চ। যে 'বস্তু' এর আগে দেখা যাচ্ছিল, তার সন্ধান আর তখন পাওয়া যায় না। তাই বলি—বৎস, গুরুর উপদেশ পেয়েছ, এবার চক্ষু মুদিত কর—সমাধিস্থ হও, প্রকৃত বস্তুর দর্শন পাবে।"

আত্মজ্ঞানী মহাসাধকের আশীর্ব্বাদ শিরে ধারণ করিয়া স্বামীজী কাশীতে ফিরিয়া আসিলেন।

অধ্যাত্মজ্ঞানের প্রচার ও লোকোদ্ধার কার্য্যে আত্মনিয়োগ করার অনুমতি গুরুদেব আগেই দিয়াছেন। স্বামীজীর উপদেশে আকৃষ্ট হইয়া

বহু লোক এখন হইতে তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিতে থাকে, সাধন লাভ করিয়া ধন্য হয়।

আশ্রিতেরা আসে নানা দেশ দেশান্তর হইতে। ইহাদের অনেকেরই অলৌকিক অভিজ্ঞতার কাহিনী আজো লোকলোচনের অন্তরালে রহিয়া গিয়াছে।

বর্দ্ধমানের মহড়া গ্রামের সৌদামিনী দেবী বড় দুর্ভাগিনী। স্বামী আগেই লোকান্তরে গিয়াছেন। এবার পালিত পুত্রটিও হঠাৎ মারা গেল। মহিলাটি শোকে মুষড়িয়া পড়িলেন। ধীরে ধীরে তীব্র সংসার-বিতৃষ্ণা তাঁহার জীবনে আসিয়া গেল।

কিন্তু কোথায় মুক্তির পথ, কোথায় পথপ্রদর্শক গুরু? ব্যাকুল হইয়া বৈদ্যনাথধামে আসিয়া তিনি 'হত্যা' দেন। এখানে প্রত্যাদেশ মিলে—পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দের উপদেশেই তাঁহার ইষ্টলাভ হইবে। জাগ্রত বিগ্রহ, বাবা-বৈদ্যনাথ তাঁহার ভবিষ্যৎ গুরুর মূর্ত্তিটিও চিনাইয়া দিলেন। এ মূর্ত্তির চারিদিকে জ্বলিতে দেখা গেল আগুনের শিখা!

এই মহিলাটি শ্রীকৃষ্ণানন্দকে জানেন না, কখনো তাঁহার নামও শুনেন নাই। নানা স্থানে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া কাশীধামে তাঁহার সন্ধানে উপস্থিত হইলেন। স্বামীজী তখন হরিদ্বার, জলন্ধর ও কাংড়া অঞ্চলে পরিক্রমা করিতেছেন। মহিলাটি তাঁহার উদ্দেশে জ্বালামুখী অবধিও ছুটিয়া যান। কিন্তু একি দুর্ভাগ্য তাঁহার? কোথাও তো চিহ্নিত গুরুর সন্ধান মিলিতেছে না!

এসময়কার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞার বর্ণনা দিয়া মহিলা ভক্তটি যাহা লিখিয়াছেন তাহা বড় বিস্ময়কর—

"মার পীঠস্থান দর্শন করিয়া একদিন কাঁদিতেছি ও ভাবিতেছি, তবে কি প্রত্যাদেশ মিথ্যা? তখনই দেখিলাম, শুভ্র শ্মশ্রু ও শুভ্র কেশধারী দীর্ঘকায় একজন মহাপুরুষ বলিতেছেন. 'বাছা, তুমি চিন্তা ক'রো না, এইখানেই তাঁকে পাবে।' আমার চমক লাগিয়া গেল, কিন্তু তাঁহাকে আর আমি দেখিতে পাইলাম না।

"সেইদিন সন্ধ্যার সময় বাসায় শুইয়া আছি, একটু তন্দ্রা আসিয়াছে, এমন সময়ে একটি নানালঙ্কারে ভূষিতা পরমা সুন্দরী কুমারী আমায় চেতন করাইয়া জ্বালাজীর মন্দিরের দিকে যাইতে ইঙ্গিত করিয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন। তাঁহার হাস্যময়ী মূর্ত্তিখানি হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া গেল। ভাবিলাম, এ কোন দেবীমূর্ত্তি? এরূপ মূর্ত্তি কোন তীর্থে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হইল না।

"আমি ধীরে ধীরে মায়ের মন্দিরে গেলাম। গিয়া দেখি, চারিদিকে জ্বালামালা জ্বলিতেছে, তাহার মধ্যে একজন শ্রীমান সাধু চক্ষু বুজিয়া ধ্যান করিতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়া আমার বড় ভক্তি হইল।

"তাঁহার ধ্যান ভাঙ্গিতে একটু বিলম্ব দেখিলাম। এই অবকাশে আমারও কি জানি কেন বসিয়া বসিয়া একটু তন্দ্রা আসিল। অমনি কে যেন আমাকে ধাক্কা মারিয়া বলিল—ওরে, এই তো!

"যেইমাত্র সাধুর ধ্যান ভঙ্গ হইল অমনি আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—আপনার নামই কি শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী? তিনি কহিলেন —হ্যাঁ।

"তিনি দয়া করিয়া একটি শিবালয়ের পার্শ্বে একান্ত স্থানে আমাকে সাধনমার্গের উপদেশ করিলেন। আমি কৃতার্থ হইলাম। তখন আমার মনে হইল যে, আমি বৈদ্যনাথে ভবিষ্যৎ গুরুর চারিপার্শ্বে যে অগ্নি জ্বলিতে দেখিয়াছিলাম, তাহা এই জ্বালামুখীরই প্রজ্জ্বলিত জ্বালামালা।"

কিছুদিন পরে শ্রীকৃষ্ণানন্দ কাশীর যোগাশ্রমে দেবী অন্নপূর্ণার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। বিগ্রহের নাম দেওয়া হয় যোগেশ্বরী। আশ্রমের গুহায় তাঁহার যোগসাধনা ও ধ্যান জপ অনুষ্ঠিত হইতে থাকে।

মা-যোগেশ্বরী যেমন জাগ্রতা হইয়া উঠিতে থাকেন তেমনি এ সময়ে স্বামীজীর মধ্যেও নানা অলৌকিক যোগবিভূতির প্রকাশ ঘটিতে দেখা যায়। বহুতর কৃপাপ্রার্থী তাঁহার কৃপায় সাধন লাভ করেন, ব্যাধির কবল হইতেও অনেকে মুক্ত হন।

স্বামীজীর যোগবিভূতির খ্যাতি তখন চারিদিকে রটিয়া গিয়াছে। সে-বার হাতোয়ার মহারাজার এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয় মারাত্মক পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হইয়াছেন। তাঁহার আত্মীয়েরা স্বামীজীর কাছে আসিয়া ধর্না দিলেন। রোগীর ডাক্তারটিও সঙ্গে রহিয়াছে।

স্বামীজী কহিলেন, "আমি ক্ষুদ্র ব্যক্তি, আমার নিজের তো কোন ক্ষমতা নেই, যা করবার করেন মা-যোগেশ্বরী। তাঁকে জিজ্ঞেস না করে তো আমি কিছু বলতে পারিনে।"

ডাক্তার ভীত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "কিন্তু স্বামীজী, এ রোগীর পক্ষাঘাতের মূর্চ্ছা যদি আর ত্ব'একবার হয়, তা হ'লে আর কিছুতেই একে বাঁচানো যাবে না। তাড়াতাড়ি একটা কিছু করুন।"

"কি ক'রবো বাবা, সবই মায়ের হাতে। তাঁকে ব'লে দেখি তোমরা কাল একবার এসো।"

সন্ধ্যারতির পর মায়েপোয়ে কথাবার্তা হইল। চিন্ময়ী দেবীবিগ্রহ কহিলেন, "এ তুই আবার কি সব কচ্ছিস্ ? এ রোগী তো বাঁচবে না। প্রাক্তন শেষ হয়ে এসেছে!"

"মা, তুমি দয়া করলে কেন বাঁচবে না? তাছাড়া, ওরা যে বড় বিপন্ন হয়ে, বড় ভরসা করে আমার কাছে আশ্রয় নিয়েছে। একটা কিছু ব্যবস্থা তোমায় করতেই হবে।"

"বেশ কথা ওরা তো পক্ষাঘাতের জন্যই তোর শরণ নিয়েছে এ দুঃসাধ্য। তবু এ রোগ থেকে রোগী এবার বেঁচে যাবে। কিন্তু জীবনান্ত হবে আর এক রোগে।"

ঘটিলও তাহাই। ডাক্তারদের বিস্মিত করিয়া মরণোন্মুখ পক্ষাঘাত-রোগী শয্যায় উঠিয়া বসে, আরোগ্য লাভ করে। কিন্তু কিছুদিন পরেই সামান্য জ্বরে ভুগিয়া তাহার প্রাণবিয়োগ হয়।

নিজের কোন পীড়ার বেলায় কিন্তু দেখা যাইত স্বামীজীর আর এক মনোভাব। সেখানে তিনি পরম উদাসীন। মায়ের দেওয়া আনন্দের

সঙ্গে তাঁহার দেওয়া দুঃখের প্রচণ্ড আঘাতও নির্ব্বিকার চিত্তে সদাই তিনি বরণ করিয়া নেন।

সে-বার শরীর তাঁহার খুব অসুস্থ। একটি ভক্ত বড় ব্যাকুল হইয়া দেখিতে আসিয়াছেন।

কথাপ্রসঙ্গে ভক্তটি কহিলেন, "স্বামীজী, আপনার মত মহাপুরুষেরও আবার অসুখ! মায়ের কত কৃপা আপনার ওপর; তবে এত দেহকষ্ট আপনার হবে কেন?"

রোগশয্যায় উঠিয়া বসিয়া স্বামীজী কহিলেন, "সে কি গো, এ তোমাদের কেমন আব্দারের কথা। শরীর অসুস্থ হলেই কি বুঝতে হবে মায়ের অ-কৃপা হয়েছে? দেহ ধারণ করলেই, তার জন্য রোগ, শোক, দুঃখ ভোগ করতে হবে। তাছাড়া, সব দুঃখ মোচনের জন্যই কি মায়ের কাছে প্রার্থনা করতে আছে? যা আর কোথাও পাওয়া যায় না, তাই যে তাঁর কাছে চাইতে হয়। তত্ত্বজ্ঞান ও ভক্তিই হচ্ছে মার গুপ্ত ভাণ্ডারের নিধি, সেই মহাবস্তুই তাঁর কাছে চেয়ে নিতে হয়। মনে রেখো—টাকাকড়ি, ধানচা'ল যোগাড় করে দেওয়া মা-যোগেশ্বরীর কাজ নয়, তাঁর কাজ হচ্ছে ত্যাগ, সেবাবুদ্ধি, ভক্তি এসব এনে দেওয়া।"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণানন্দ আবার হাসিয়া কহিলেন, "আচ্ছা, এ দেহের রোগ যতবারই সারাও না কেন, দেহের পতন তো একদিন হবেই। তখন কি বলবে,—এ মায়ের অ-কৃপা?"

ভক্তটির মন এতক্ষণে ভরিয়া উঠিয়াছে। স্বামীজীকে প্রণাম করিয়া প্রসন্ন মনে তিনি উঠিয়া গেলেন।

দয়ালদাস-বাবা এই সময়ে একবার সদলে কাশীধামে আসেন। তিনি যোগাশ্রমে প্রবেশ করামাত্র মা-যোগেশ্বরীর জাগ্রত স্বরূপটি উপলব্ধি করেন। শিষ্যদের লক্ষ্য করিয়া মহাপুরুষ হর্ষভরে বলিয়া উঠেন, "মাঈ তো ইঁহা প্রকট হুঈ হ্যায়।"

গুরুদেবের আশীষধারা এসময়ে কৃষ্ণানন্দের উপর অজস্রধারে বর্ষিত হয়। দয়ালদাসজীর সহিত সর্ব্বদাই কয়েক শত শিষ্য ও অনুরাগী

সন্ন্যাসী ভ্রমণরত থাকেন। ইঁহারা সবাই স্বামী শ্রীকৃষ্ণানন্দকে দয়ালদাস বাবার এক বিশিষ্ট ও অনুগৃহীত শিষ্য হিসাবে যথেষ্ট সম্মান করিতেন। তাঁহার দর্শন পাইলেই সসম্ভ্রমে বলিয়া উঠিতেন, "মেরে বড়া ভাই আগয়ে।"

দয়ালদাসজী সম্বন্ধে এই সময়কার একটি সুন্দর কাহিনী রহিয়াছে। ইহা হইতে তাঁহার নিজের ও শিষ্য শ্রীকৃষ্ণানন্দের সাধনতত্ত্ব ও উদার আদর্শবাদ কিছুটা বুঝা যাইবে।

সে-বার দয়ালদাসবাবা কাশীধামে আসিয়াছেন। বহু শিষ্য, ভক্ত ও বিশিষ্ট সাধকদের দ্বারা তিনি পরিবৃত। এমন সময়ে কাশীর পণ্ডিত সমাজের এক নেতা সেখানে আসিয়া উপস্থিত। দয়ালদাসজীকে তিনি প্রশ্ন করিলেন, "মহারাজ, আপনি কোন্ শ্রেণীর স্বামী ?"

বাবা স্মিতহাস্যে উত্তর দিলেন, "আমি দাস-স্বামী।"

কথাটি শুনিয়া পণ্ডিতের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। কহিলেন, "সে কি কথা মহারাজ! দাস-স্বামী বলে সন্ন্যাস আশ্রমে কোন কিছু আছে ব'লে তো আমাদের জানা নেই!"

"তা'হলে শুনে রাখুন, প্রত্যেক সন্ন্যাসীই চিরদিন থাকেন দাস তাঁর নিজের গুরুদেবের কাছে, আর তিনি স্বামীরূপে বিরাজমান হন তাঁর শিষ্যদের সম্মুখে!"

পণ্ডিত আবার দয়ালদাসজীকে চাপিয়া ধরিলেন। প্রশ্ন করিলেন, "বাবা, আপনি কোন্ মঠের অন্তর্ভুক্ত ?"

"গগন মঠের।"

চমকিয়া উঠিয়া পণ্ডিত কহিলেন, "এ আপনার বড় অদ্ভুত কথা! শৃঙ্গেরী, যোশী প্রভৃতি মঠের নাম আমরা শুনেছি—গগনমঠের নাম তো কখনো শুনিনি!"

দয়ালদাসজীর অধরে দেখা দিল স্মিতহাস্য। বলিলেন, "ঐ সব মঠ কি সনাতন কাল থেকে প্রচলিত ? না, কেউ তাদের প্রবর্ত্তন করেছেন ?"

"কেন, এ সবই আচার্য্য শঙ্করের সৃষ্টি!"

"উত্তম। কিন্তু বলুন তো, আচার্য্য শঙ্কর ও তাঁর গুরু গোবিন্দপাদ-স্বামী কোন্ মঠের? তাঁরা তো ছিলেন আমার মতই গগন মঠের সন্ন্যাসী! অখণ্ড, উদার আকাশের তলে আকাশবৃত্তি নিয়ে পড়ে থাকা —তাই যে আমার গগন মঠ!"

এবার পণ্ডিতজী নিজের ভুল বুঝিতে পারেন, স্বামীজীর চরণতলে লুটাইয়া পড়েন।

দয়ালদাসজীর সাধনপন্থায় ছিল যোগ, তন্ত্র ও জ্ঞানের এক অপরূপ সমন্বয়। এই পাঞ্জাবী মহাপুরুষের উত্তরসাধক শ্রীকৃষ্ণানন্দের জীবনেও এ সাধনবৈশিষ্ট্য আত্মপ্রকাশ করে।

দয়ালদাসজী আর বেশী দিন মরদেহে বাস করেন নাই! কিন্তু অপ্রকটের আগে শিষ্য শ্রীকৃষ্ণানন্দকে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া যান।

সন্ন্যাসের পর হইতেই দীর্ঘকাল শ্রীকৃষ্ণানন্দ অধ্যাত্মসাধনায় রত আছেন। শক্তিমান আচার্য্যরূপে ভারতের প্রতি তীর্থে ও নগরে তিনি ধর্ম্মপ্রচার করিয়া বেড়াইয়াছেন। বহু মুমুক্ষু তাঁহার কাছে সাধন-ভজনের নির্দ্দেশ পাইয়া ধন্য হইয়াছে। গুরু দয়ালদাসজী এবার তাই প্রিয় শিষ্যকে পরমহংসাশ্রম গ্রহণ করান।

বড় অদ্ভুত, বড় বিচিত্র মহামায়ার লীলাখেলা। এ খেলায় তনয় শ্রীকৃষ্ণানন্দকে তিনি এক অদ্ভুত পরিণতির দিকে টানিয়া নেন।

স্বামীজীর কর্ম্মবহুল জীবনের কোণে এবার কোথা হইতে ঘনাইয়া আসে এক কালো মেঘ। একদল দুরাত্মার ষড়যন্ত্রে সর্ব্বজনশ্রদ্ধেয় আচার্য্য হঠাৎ মহাবিপন্ন হইয়া পড়েন। সমগ্র উত্তর ভারতে তখন তাঁহার বিরাট প্রতিষ্ঠা। কিন্তু এ প্রতিষ্ঠা একদল পরশ্রীকাতর মানুষের সহ্য হয় নাই। তাছাড়া, নিজে অব্রাহ্মণ হইয়া বহু ব্রাহ্মণকে তিনি দীক্ষা ও সাধন দিতেছেন, এজন্যও কিছু সংখ্যক গোঁড়া সনাতনী তাঁহার উপর মারমুখী হইয়া উঠে। বিরোধীদের হীন ষড়যন্ত্র ও মিথ্যা মামলার ফলে স্বামীজীর জীবনে নামিয়া আসে চরম লাঞ্ছনা।

আচার্য্য, ধর্ম্মবক্তা ও সংগঠকরূপে পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ এতদিন

ছিলেন বহুজনের জন্য, বহুজনের হিতের জন্য। এবার মা-যোগেশ্বরী তাঁহার প্রিয় তনয়কে ফিরাইয়া নিতে চান আপন অঙ্কে। বহিরঙ্গ জীবনের উপর ছেদ টানিয়া দিয়া স্বামীজী তাই বুঝি পুরাপুরি ভাবে অন্তর্ম্মুখীন হইয়া গেলেন! সম্মান আর লাঞ্ছনা, হাসি আর অশ্রু এবার তাঁহার কাছে সব একাকার! বহিরঙ্গ জীবনের, কর্ম্মময় জীবনের আকর্ষণ আর কিছু নাই। বাহিরের খেলা ফেলিয়া মায়ের বালক এবার মায়ের কোলে ফিরিতে ব্যাকুল। স্বামীজীর এসময়কার রচিত সঙ্গীতে এ মানসিকতাই ফুটিয়া উঠিয়াছে।

কেন আর বারংবার ডাকিস তোরা ভাই,
মায়ের কোল ছেড়ে কেমনে যাই।
যায় যে বেলা, আর করবো না খেলা,
বুঝি সাঙ্গ হ'লো, বঙ্গভূমির শ্রীবাস-লীলা।
এখন মার ছেলে মার কোলে বসে,
নাচি আর মা'র গুণ গাই।
আমি খেলিতে গেলে, তোরা দিস্ ঠেলে ফেলে
তাই মা ব'লেছে, কাজ কী বাছা ও-খেলা খেলে?
আমি মা পেয়েছি মা'র হয়েছি,
আমাতে আর আমি নাই।

কর্ম্ম-জ্ঞান-ও-ভক্তিময় জীবন এবার সার্থকতায় ভরপুর হইয়া গিয়াছে। মরদেহটি জীর্ণ নির্ম্মোকের মত খসিরা পড়িতে চায়।

১৩০৯ সনের তেসরা আশ্বিন অমরলোকের পরম আহ্বান আসিয়া গেল। জীবনযজ্ঞের পবিত্র আগুনে শেষ হবিটুকু নিঃশেষে অর্পণ করিয়া সাধক শ্রীকৃষ্ণানন্দ মরলোক ত্যাগ করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব

গঙ্গার বুকে সায়াহ্নের রক্তরাগ তখনো মিলাইয়া যায় নাই। দেবী ভবতারিণীর মন্দিরে বাজিতেছে সন্ধ্যারতির কাঁসর ঘণ্টা। এমন সময়ে দক্ষিণেশ্বরের ঘাটে দেখা দিলেন এক উলঙ্গ সন্ন্যাসী। সুন্দর সুঠাম দীর্ঘায়ত দেহ। আননে অপার প্রশান্তি ও নির্লিপ্তি, দুই চোখে দিব্য আনন্দের দ্যুতি। আপন মনে তিনি পাদচারণা করিয়া চলিয়াছেন।

ঘাটের এক পাশে সাধক গদাধর ভাবতন্ময় হইয়া বসিয়া আছেন। সন্ন্যাসীর দৃষ্টি তাঁহার দিকে পড়িল। দিব্যকান্তি, আত্মভোলা কে এই তরুণ ? সমাধিবান সাধকের লক্ষণ তাঁহার সারা অঙ্গে। সন্ন্যাসী চমকিয়া উঠিলেন। তন্ত্র আর ভক্তিবাদের দেশ বাংলায় বেদান্তের এমন উত্তম অধিকারীও থাকিতে পারে ? ইহা তো তাঁহার ধারণায় আসে নাই।

সন্মুখে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মঁায় তুম্‌কো বেদান্ত সিদ্ধি অওর নির্ব্বিকল্প সমাধি দুঙ্গা ! তুম্ লেওগে ?"

জটাজূটধারী তেজঃপুঞ্জকলেবর সন্ন্যাসী একি কথা বলিতেছে ? মা ভবতারিণীর ধ্যানে, তাঁহার চিন্ময়রূপে গদাধরের অন্তর বাহির রহিয়াছে পূর্ণ। মাতৃসাধনা তাঁহার সারা অস্তিত্বে ওতপ্রোত। আনন্দময়ী মায়ের রূপ-ধ্যানই যে তাঁহার জীবন। আজ তাহা হইবে একাকার। নিরাকার দৌত্য নিয়া আসিয়াছে কে এই নাগা সন্ন্যাসী ?

মাতৃ-বিরহের আশঙ্কায় গদাধরের বুক কাঁপিয়া উঠে, আবার দুর্নিবার আকর্ষণেও টানিতে থাকে এই মায়াবাদী তপস্বী।

সেদিনকার মোহময় সন্ধ্যায়, আলো-আধারের সন্ধিক্ষণে, নিরাকারের দূত সাকারের বরপুত্রের কাছে আপন হস্তটি প্রসারিত করিয়া দেয়। এই সন্ন্যাসী-দূতই ভারতবিখ্যাত মহাবৈদান্তিক—তোতাপুরী স্বামী।

ঐশী ইঙ্গিতেই পুরী মহারাজ সেদিন দক্ষিণেশ্বরে আবির্ভূত হন! এ আবির্ভাবের আলোকচ্ছটা তরুণ সাধক গদাধরের অধ্যাত্মজীবনে আনিয়া দেয় নূতনতর পথের সন্ধান, তাঁহার উত্তরণ ঘটায় শক্তিধর লোকগুরু শ্রীরামকৃষ্ণরূপে!

সন্ন্যাসীর প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বড় সহজ নয়। তাঁহাকে এড়ানো আরো কঠিন। জন্ম-জন্মান্তরের কি এক অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ তাঁহার সঙ্গে রহিয়া গিয়াছে, কে জানে? উদার দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া গদাধর শুধু কহিলেন, "কি করবো না করবো বাবু, কিছুই জানিনে। সব জানেন আমার মা। তাঁর আদেশ যদি পাই, তবেই আমি তোমার কথামত কাজ করবো।"

মায়ের আদেশ মিলিল। গদাধর বুঝিলেন, তাঁহার অধ্যাত্ম-জীবনকে পূর্ণতর করিয়া তুলিতেই সন্ন্যাসীর এই শুভাগমন।

মন্দিরের শ্যামা বিগ্রহই যে গদাধরের মা, আর এই মায়েরই আদেশের প্রতীক্ষায় তিনি আছেন, প্রথমটায় পুরীজী বুঝিতে পারেন নাই। সব কথা শোনার পর অদ্বৈতবাদী সাধকের অধরে চকিত হাসি খেলিয়া গেল। মায়াময় বিশ্ব-প্রবঞ্চের পরপারে, ভাবাতীত রাজ্যে এ বেদান্তীর সদা বিচরণ। মানব হৃদয়ের পরম ধন, ভগবৎ প্রেমকেও যে তিনি মায়া জ্ঞানে বিশুষ্ক করিয়া ফেলিয়াছেন। নির্ব্বিকল্প সমাধির পথে করিয়াছেন ব্রহ্মসাক্ষাৎ। সাকার ধ্যান আর ইষ্টপূজা আজ তাই তাঁহার চোখে একেবারে অর্থহীন।

বালকস্বভাব মাতৃসাধক গদাধরের কথা শুনিয়া তোতাপুরী সেদিন হাস্য সম্বরণ করিতে পারেন নাই।

পঞ্চবটীতলে পুরীজী তাঁহার আনুষ্ঠানিক কাজকর্ম্ম শুরু করিলেন। আজ পিতৃপুরুষদের শ্রাদ্ধ ও নিজ পিণ্ড প্রদান করিয়া সাধক গদাধর গ্রহণ করিবেন সন্ন্যাস। পুরীজীর নির্দ্দেশমতই সব কাজ সম্পন্ন হইল। যাহা কিছু নিয়া এতকাল গদাধর বাঁচিয়া ছিলেন--ভবতারিণীর প্রতি

মমতা, ভক্তি, প্রেম, সাধনার সমস্ত কিছু পুণ্যসঞ্চয়—সবই তিনি চিরতরে দিলেন বিসর্জ্জন। বিরজা হোম সমাপ্তির পর তাঁহার সন্ন্যাস নাম হইল—শ্রীরামকৃষ্ণ।

সর্ব্বপাশমুক্ত সাধকের এবার সমাধির গভীরে নিমজ্জনের পালা।

উত্তরকালে রামকৃষ্ণ বলিতেন, "ত্যাখ্, সমুদ্রের তীরে যে সর্ব্বদা বাস করে, তার যেমন কখন কখন মনে হয় যে, রত্নাকর সমুদ্রের গর্ভে কত কি রত্ন আছে তা দেখি, তেমনি মাকে পেয়ে, মার কাছে সর্ব্বদা থেকেও আমার তখন মনে হত—অনন্ত ভাবময়ী অনন্তরূপিণী মাকে নানা ভাবে, নানা রূপে দেখবো।" এবার তাঁহার সেই আনন্দরূপিণী ইষ্টদেবীকে রূপাতীত পর্য্যায়ে নিয়া যাইতে হইবে—নামরূপের সেখানে ঘটিবে বিলয়। লাভ করিতে হইবে জ্ঞানমার্গের চরমতম উপলব্ধি। তাই গুরুর নির্দ্দেশে তিনি আসনে গিয়া বসিলেন।

ইষ্টদেবীর চিন্ময়ী ভাবময়ী মূর্ত্তি রামকৃষ্ণের ধ্যানের ধন, তাঁহার সারা সত্তায় তাহা ওতপ্রোত হইয়া রহিয়াছে। নির্ব্বিকল্প পরমাত্মধ্যানে এই মূর্ত্তি তো বিলীন হইতে চাহে না। চেষ্টা বারবার বিফল হইল।

তোতা গর্জ্জিয়া উঠিলেন, "কেঁও হোগা নেহি!"—একখণ্ড ভগ্ন কাঁচ নিয়া রামকৃষ্ণের ভ্রূর মধ্যস্থানে তিনি বিদ্ধ করিলেন। গম্ভীরকণ্ঠে কহিলেন, "ব্যাস, এবার এখানে তোমার সারা মন, সারা চেতনা কেন্দ্রীভূত করে নাও, পৌঁছে যাও চরম উপলব্ধির স্তরে।"

তখনকার অবস্থার কথায় ঠাকুর রামকৃষ্ণ নিজে বলিয়াছেন—"জগদম্বার মূর্ত্তি আগের মত মনে উদয় হওয়া মাত্র, জ্ঞানকে অসি কল্পনা করে, ওটা মনে মনে দ্বিখণ্ড করে ফেললাম। তখন আর মনে কোন বিকল্প নেই; একেবারে হু-হু করে সব নাম-রূপ রাজ্যের উপরে উঠে গেল! সমাধিতে আমি ডুবে গেলাম।"—(লীলাপ্রসঙ্গ)

শিষ্যের সমাধির পথে কোন বিঘ্ন হয়, তোতা তাহা চান না। তাই রামকৃষ্ণের কুটিরের দ্বার তিনি তালাবন্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। পর পর

তিন দিন কাটিয়া গেল। বিস্ময়বিমুগ্ধ গুরুদেব এবার দুয়ার খুলিলেন। দেখিলেন, শিষ্য তখনো সমাধিস্থ। নিজ আসনে জ্যোতির্ম্ময় হইয়া বসিয়া আছেন! দেহ নিশ্চল, নিস্পন্দ—একেবারে চৈতন্যবিহীন। সর্ব্ব সত্তা যেন নিবাত নিষ্কল দীপশিখার মত জ্বলিতেছে।

একি অদ্ভুত, অবিশ্বাস্য কাণ্ড! নর্ম্মদা তীরে চল্লিশ বৎসরের কঠোর-তম তপস্যার পর তোতা যাহা লাভ করিয়াছেন, কোন্ ঐশীকৃপাবলে এই তরুণ সাধক এত সহজে তাহা লাভ করিলেন? বিস্ময় তাঁহার চরমে উঠে। কেবলই কহিতে থাকেন, "ইয়ে ক্যা দৈবী মায়া! ইয়ে ক্যা দৈবী মায়া!" রামকৃষ্ণের সেদিনকার কৃতিত্বে গুরুর আনন্দের সীমা রহিল না!

জ্ঞানবাদী, সর্ব্বপাশমুক্ত তোতাপুরীস্বামী এবার এই মহা অধিকারী শিষ্যের প্রেমে বাঁধা পড়িলেন। তীর্থ পরিক্রমার পথে কয়েকটি দিনের জন্য এখানে তিনি আসিয়াছিলেন। অতি সহজে চলিয়া যাওয়া আর ঘটিয়া উঠিল না। আপন সান্নিধ্য দিয়া শিষ্যকে অদ্বৈতবোধের ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠ করিতে তিনি তৎপর হইলেন।

দক্ষিণেশ্বরের বাগানে একাদিক্রমে প্রায় ছয়মাস কাল পুরীমহারাজ অবস্থান করেন, আর দিনের পর দিন রামকৃষ্ণের উচ্চতম উপলব্ধিগুলি তাঁহাকে বিস্মিত করিতে থাকে।

রামকৃষ্ণের উপাস্য, তাঁহার ধ্যানের ধন—জগন্মাতা। মায়ের এই চিন্ময়ী মূর্ত্তি তোতার জ্ঞানাগ্নির স্পর্শে নামরূপের বাহিরে চলিয়া যায়। আবার তোতাও কিন্তু নিজে রামকৃষ্ণের যাদুস্পর্শকে এড়াইতে পারেন নাই। নিরাকারের আকারকে—ব্রহ্মশক্তিকে তিনি স্বীকার করিয়া নিতে বাধ্য হন। মায়াতীতের মায়া-মোহাঞ্জন অদ্বৈত ব্রহ্মাত্মবাদীর নয়নেও সেদিন লাগিয়া যায়।

নর্ম্মদার ধারা এবার গঙ্গার স্রোতে আসিয়া মিশে—জ্ঞান আসিয়া ধারণ করে ভক্তি ও শক্তির লীলা-চঞ্চলতাকে।

জগন্মাতার নামগান করা সাধক রামকৃষ্ণের নিত্যকার অভ্যাস।

করতালি দিয়া নাম গাহিতে গাহিতে তিনি ভাবাবিষ্ট হইয়া উঠেন। মায়াবাদী তোতাপুরীজীর চোখে এ দৃশ্য বড় অদ্ভুত লাগে, প্রায়ই হাসি চাপা দায় হয়। সেদিন পরিহাস করিয়া শিষ্যকে বলেন, "ক্যা! রোটি ঠুক্‌তে হো?"

বালক-স্বভাব রামকৃষ্ণ খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠেন। বলেন, "শালা বলে কি! আমি প্রাণের টানে মা-ব্রহ্মময়ীর নাম করি, আর ও তা বুঝতেই চায় না!"

সুদূর নর্ম্মদার তীর হইতে মা-ভবতারিণী তোতাপুরীকে টানিয়া আনিয়াছেন। প্রিয়পুত্র গদাধরের সাধনসত্তায় বহিতেছে ভক্তি ও শক্তির ধারাস্রোত, এবার তাহাতে তোতার জ্ঞানসাধনার প্রবাহ তিনি মিলাইয়া দিলেন। আবার মহামায়ার সর্ব্বব্যাপিনী মায়াও বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর জীবনকে করিল প্রভাবিত। রামকৃষ্ণ আর তাঁহার মায়ের কাছে আসিয়া তোতা সত্যই বদ্‌লাইয়া গেলেন! শোনা যায়, শেষের দিকে রামকৃষ্ণের সুমধুর মাতৃসঙ্গীত তিনি কান পাতিয়া শুনিতেন— আর দুই চোখ তাঁহার জলে ভরিয়া আসিত।

ব্রহ্ম আর ব্রহ্মশক্তির কথা নিয়া গুরু শিষ্যে প্রণয়-কলহ কম হইত না। সেদিন তোতাপুরী তাঁহার ধুনীর সম্মুখে বসিয়া আছেন। মন্দিরের এক পরিচারক হঠাৎ আসিয়া ধুনী হইতে কিছুটা কাঠ সরাইয়া নিল। পবিত্র হোমাগ্নির অমর্য্যাদায় তোতা ক্রোধে ফাটিয়া পড়িলেন।

এমন মহাজ্ঞানীর রোষ! চিত্তচাঞ্চল্য! কৌতুকোচ্ছল রামকৃষ্ণ উচ্চহাস্যে করতালি দিয়া কহিলেন, "তবেই ত্যাখো, মহামায়ার দুর্ব্বার মায়া-শক্তির কাছে কি তুমি হার মানোনি?"

নাগা সন্ন্যাসী তোতার বজ্রসম দেহ কিন্তু বাংলার জলবায়ুতে ক্রমে ভাঙ্গিয়া পড়ে, দুরন্ত ব্যাধিতে তিনি আক্রান্ত হন। ব্যাধি যেমন দুরারোগ্য, যন্ত্রণাও তেমনি দুঃসহ। অবশেষে একদিন ভাবিলেন—কি কাজ এই ভঙ্গুর দেহের পরিচর্য্যায়! কি-ই বা লাভ ইহার রক্ষণে? আজই নদীজলে এ দেহ বিসর্জ্জন দিবেন।

গঙ্গার মধ্যস্থল লক্ষ্য করিয়া তোতা আগাইয়া চলিলেন। কিন্তু একি অদ্ভুত ব্যাপার? ডুবিয়া মরিবার মত জল তো নদীতে পাইতেছেন না। এপারে ওপারে হাঁটাহাঁটিই শুধু সার হইল। মহামায়ার মায়ায় সঙ্কল্প তাঁহার সোদন টুটিয়া গেল। তোতা হার মানিলেন। রামকৃষ্ণের নিকট স্বীকার করিলেন, ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি অভেদ। রামকৃষ্ণের মা, মহামায়াকে মানিয়া নিতে হইল।

রামকৃষ্ণের সাধনাকে তোতাপুরী পূর্ণাঙ্গ করিয়া গেলেন। তারপর ধীরে ধীরে দক্ষিণেশ্বরের এই অজ্ঞাত অখ্যাত পুরোহিত প্রবিষ্ট হইলেন যুগাচার্য্যের ভূমিকায়। জড়বাদী সভ্যতার প্রবল তরঙ্গ আসিয়াছে তখন আধুনিক ভারতে। এই তরঙ্গের মুখোমুখী আসিয়া তিনি দাঁড়াইলেন। চৈতন্যময় জীবনের কথা, ব্রহ্মসাক্ষাতের কথা শুনিয়া এ যুগের বিভ্রান্ত মানুষ উৎকর্ণ হইয়া উঠিল।

কামারপুকুরের নগণ্য, নিরক্ষর এই ব্রাহ্মণতনয়ের বিবর্ত্তনের কাহিনী বড় বিস্ময়কর—

রামকৃষ্ণের পিতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের নিবাস হুগলী জেলায় দেরে গ্রামে। নিষ্ঠাবান ও সদাচারী ব্রাহ্মণ তিনি। কুলদেবতা রঘুবীরের পূজা সমাপন না করিয়া জলগ্রহণ করেন না। সত্যসন্ধ বলিয়াও তাঁহার খ্যাতি যথেষ্ট ছিল। একবার কোন এক মিথ্যা মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দিতে তিনি অস্বীকার করেন, ফলে স্থানীয় জমিদারের সহিত তাঁহার সংঘাত বাদে! কিন্তু কোন অত্যাচার ও লাঞ্ছনা ধর্ম্মপ্রাণ ক্ষুদিরামকে সেদিন তাঁহার সত্যধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত করিতে পারে নাই। অবশেষে বিরক্ত হইয়া তিনি স্বগ্রাম ত্যাগ করেন, কামারপুকুরের শান্ত পরিবেশে নূতন কুটির বাঁধেন।

অনেকদিন পরের কথা। ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় সেদিন গ্রামান্তর হইতে ফিরিতেছেন। দেহ বড় ক্লান্ত, তাই মাঠের কোণে এক গাছের নীচে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। ক্রমে নিদ্রাকর্ষণ হইল।

ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখিলেন।—ইষ্টদেব রঘুনাথজী কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, একটি স্থান দেখাইয়া বলিতেছেন, "ওরে, ওখান থেকে আমায় নিয়ে চল্। বাড়ীতে নিয়ে সেবা পূজা কর।"

ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। ক্ষুদিরাম চমকিয়া উঠিয়া বসিলেন। নির্দ্দিষ্ট স্থানটির কাছে গিয়া বাক্‌স্ফূর্ত্তি হইল না। একটি শালগ্রাম শিলা অর্দ্ধপ্রোথিত রহিয়াছে, আর তাঁহার উপর ফণা বিস্তার করিয়া আছে এক বিষধর সর্প।

এই শিলা ভক্তিভরে গৃহে আনিয়া স্থাপন করিলেন। দেখা গেল, এটি রঘুবীর চক্র! ভক্তিমতী স্ত্রী চন্দ্রাদেবীও স্বামীর সহিত এই বিগ্রহের সেবায় প্রাণমন ঢালিয়া দিলেন।

ইষ্ট সেবার ফল ফলিতে দেরী হয় নাই। ক্ষুদিরাম সেবার গয়ায় তীর্থ করিতে গিয়াছেন। সেখানে রাত্রে দেখিলেন এক অদ্ভুত স্বপ্ন। —জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তিতে গদাধর রত্ন সিংহাসনে উপবিষ্ট, সহাস্যে ক্ষুদিরামের দিকে চাহিয়া প্রভু বলিলেন—তিনি পুত্ররূপে তাঁহার গৃহে অবতীর্ণ হইবেন। পরে জানা গেল, ঠিক এই সময়ে কামারপুকুরে চন্দ্রাদেবীরও ঘটে এক অদ্ভুত দৈব আবেশ।

১৮৪৬ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী। শুভ মুহূর্ত্তে, দরিদ্র ব্রাহ্মণ ক্ষুদিরামের গৃহ আলোকিত করিয়া ভূমিষ্ঠ হইল এক সুদর্শন শিশু। প্রভু গদাধরের বরে পুত্রের জন্ম। তাই আদর করিয়া তাহার নাম রাখা হইল—গদাধর।

কামারপুকুরে স্বেচ্ছাবিহারী গদাধরের বাল্যজীবন কাটে পরম আনন্দে। ধর্ম্মযাত্রা বা শিবের গান শুনিলেই বালক সোৎসাহে ভিড়িয়া পড়ে। মনসার ভাসান, হরিবাসরের গীত, কীর্ত্তন কোন কিছুই ফাঁক যাইবার যো নাই। যে কোন গান, যে কোন অভিনয় এই মেধাবী বালকের কণ্ঠস্থ হইয়া যায়। স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিশেষে গ্রামের সকলেরই সে পরম প্রিয়, সকলেরই আনন্দ-ধন।

বড় অদ্ভুত এই বালক। মাঝে মাঝে তাহার ভাবাবেশ হয়। সেদিন মাঠের ধারে বেড়াইতেছে, হঠাৎ আকাশপথে চোখে পড়ে এক উড়ন্ত বলাকার ঝাঁক। সঙ্গে সঙ্গেই আত্মসম্বিৎ হারাইয়া ফেলে। অসীমের ছোঁয়া কখন যেন তাহার মগ্ন চৈতন্যে দোলা দিয়াছে, কোন্ গভীরে তাহাকে তলাইয়া ফেলিয়াছে!

মাঠ হইতে পুত্রের অচেতন দেহটি তুলিয়া আনা হয়। মা চন্দ্রমণি আতঙ্কে কাঁদিতে থাকেন। শান্তি স্বস্ত্যয়ন করাইয়া তবে স্থির হন।

আর একদিনের কথা। গ্রামের মেয়েরা সবাই বিশালাক্ষীর মন্দিরে চলিয়াছে। গদাধরও তাহাদের সঙ্গ নেয়। পথিমধ্যে হঠাৎ তাহার দেহে দেখা দেয় দিব্য ভাবাবেশ। সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলে মেয়েরা ভয়ে অস্থির হইয়া পড়ে। কানাকানি শুরু হয়—বিশালাক্ষীর ভর হয় নাই তো? সকলে অচেতন গদাধরের স্তবস্তুতি শুরু করে।

সে-বার গ্রামে যাত্রাগান হইতেছে। গদাধর উহাতে শিব সাজিলেন। জটা বাঘছাল আর হাড়ের মালা পরার সঙ্গে সঙ্গে বালক অভিনয়ের কথা ভুলিয়া গেল। শিবের সাজসজ্জা জাগাইয়া তুলিল শিবের দৈবী আবেশ। সম্বিৎ হারাইয়া সে ভূতলে পড়িল।

পিতার মৃত্যুর পরে গদাধরের জীবনে ঘটে এক অদ্ভুত ভাবান্তর। একলা অনেক সময় ভূতির খালের শ্মশান বা নির্জ্জন আমবাগানে সে কাটাইয়া আসে। কামারপুকুরের পাশ দিয়াই পুরীযাত্রীদের আনাগোনা। লাহাবাবুদের পান্থনিবাসে পরিব্রাজক সাধু বৈরাগীর আড্ডা জমে। গদাধর তাঁহাদের কাছে আসিয়া জুটে, কৌতূহলভরে তাঁহাদের আচার-আচরণ লক্ষ্য করে। সাধু-সন্ন্যাসীদের সঙ্গে প্রায়ই ভাব জমিয়া যায়। আদর করিয়া প্রিয়দর্শন বালককে অনেকে ভজন শিখায়।

গদাধর স্বেচ্ছামত যত্রতত্র ঘুরিয়া বেড়ায়। লেখাপড়ায়ও দেখা যায় তেমনি খেয়ালিপনা। পাঠশালার পড়ায় একটুও মন নাই। তাচ্ছিল্য করিয়া বলে, "ও চালকলা-বাঁধার পড়ায় কি লাভ? ও আমি পড়তে চাইনে।" বালককে নিয়া বাড়ীতে সকলে চিন্তিত হন। তাছাড়া,

মাঝে মাঝে ঘটে তাহার ভাবাবেশ, তাই কেহ পড়ার জন্য তাহাকে তেমন চাপ দেয় না।

বড় মধুর গদাধরের কণ্ঠ। কীর্ত্তন ও যাত্রার গান যে শোনে, মুগ্ধ হইয়া যায়। অভিনয়ে দক্ষতাও তাহার কম নয়। সহজ সুন্দর গ্রাম্য জীবনের পরিবেশে এমনিভাবে দিন কাটে, প্রকৃতির আনন্দলোকে সে বাড়িয়া উঠে দিনের পর দিন।

বয়স ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে, এমনভাবে কতদিন আর গদাধরকে রাখা যায়? সংসারে অভাব অনটন যথেষ্ট। তার উপর ছেলের নিজের ভবিষ্যৎও একটা আছে তো! জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকুমার অবশেষে তাঁহাকে কলিকাতায় নিয়া আসিলেন। গদাধরের বয়স তখন সতের।

কলিকাতায় রামকুমার তখন টোল খুলিয়া বসিয়াছিলেন। কিন্তু ছাত্রাভাবে অল্প কিছুদিন পর ইহা উঠিয়া যায়।

রাণী রাসমণির নব প্রতিষ্ঠিত কালী মন্দিরে এসময়ে এক পুরোহিতের দরকার। রামকুমারকে এ কাজের জন্য ডাকা হইল। শূদ্রের প্রতিষ্ঠিত মন্দির! তা হোক্। রামকুমারের দৃষ্টিভঙ্গী স্বভাবতঃই উদার, তেমন গোঁড়ামি তাঁহার নাই। মন্দিরের পৌরোহিত্য তিনি গ্রহণ করিলেন।

গদাধর দাদার সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে আসিয়াছেন। কখনো মায়ের মন্দিরে ভাবতন্ময় হইয়া থাকেন, কখনো ঘুরিয়া বেড়ান গঙ্গাতীরে।

দাদা পীড়াপীড়ি করেন, "ওরে, কাজ তো একটা করতেই হবে, তবে ভবতারিণী মন্দিরে থেকেই কেন কিছু করিসনে?"

গদাধর এ কথায় কান পাতেন না। ভগবানের কাজ ছাড়া আর কাহারো চাকুরী তিনি করিবেন না।

মন তাঁহার বারবারই ছুটিয়া যায় দেবী ভবতারিণীর মন্দিরে। কি অমোঘ আকর্ষণ আছে এই বিগ্রহের, বুঝা কঠিন। এই মনোরম গঙ্গাতীরও তাঁহার বড় ভাল লাগিয়াছে। মন ক্রমে নরম হইয়া আসে, দেবীর বেশকারীর কাজ নিতে তিনি সম্মত হন। ইহার পর মন্দির-পূজারীর পদ গ্রহণ তাঁহার জীবনে সূচনা করে নূতন অধ্যায়ের



রামকৃষ্ণ পরমহংস

পুরোহিত গদাধরের সাথে ভবতারিণী বিগ্রহের সম্বন্ধ ক্রমে ঘনিষ্ঠতর হয়। ভক্ত সাধক আর জগন্মাতার আত্মিক যোগাযোগের মধ্য দিয়া এক অচ্ছেদ্য বন্ধন গড়িয়া উঠে।

শাক্তী দীক্ষা গ্রহণ না করিলে দেবীপূজা ঠিক ভাবে করা যায় না। গদাধর চিন্তায় পড়িলেন। তন্ত্রাচার্য্য কেনারাম ভট্টাচার্য্যকে তাঁহার পছন্দ, তাঁহার কাছেই দীক্ষা নিলেন। এ দীক্ষার পরই ঘটিল এক অদ্ভুত কাণ্ড, ভাবাবেশে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

মনের মত কাজ ভবতারিণীর এই পূজা। গদাধর একাজে তাঁহার দেহ-মন-প্রাণ ঢালিয়া দেন। ভক্তির জোয়ার নামে জীবনের দুই কূল ছাপাইয়া। প্রাণে জাগে মুমুক্ষার আর্ত্তি। সূক্ষ্মলোকের দ্বার ধীরে ধীরে উন্মোচিত হয়।

শুদ্ধসত্ত্ব অপাপবিদ্ধ সাধকের অন্তরে ফুটিয়া উঠে পূর্ব্বজন্মের সাত্ত্বিক সংস্কার। প্রকাশ দেখা যায় নানা লোকোত্তর বিভূতির।

দেবীর অর্চ্চনায় হয়তো বসিয়াছেন, অঙ্গন্যাস করন্যাসের সময় দেখেন অপূর্ব্ব দৃশ্য! তাঁহার নিজ অঙ্গের নানাস্থানে ঝলকিয়া উঠে জ্যোতির ছটা। পূজার আগে ভূতশুদ্ধি করিতে বসেন, ক্রিয়ার পর নিজেই চমকিয়া উঠেন! চাহিয়া দেখেন, পূজাক্ষেত্রের চারিদিকে, কোন্ অলৌকিক শক্তি-বলে জ্বলিয়া উঠিয়াছে অলৌকিক অগ্নিশিখা, পূজার অনুষ্ঠানকে উহা রক্ষা করিতেছে।

মায়ের আহ্বান মন্ত্রেরই বা একি প্রতিক্রিয়া! এ মন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে সারা দেহ দিব্য সত্তায় পূর্ণ হইয়া যায়। মন্দির গৃহের বায়ু মন্থর হইয়া উঠে। এক অপার্থিব ভাব-মহিমায় সমগ্র পরিবেশ থম্ থম্ করিতে থাকে। তেজঃপুঞ্জময় ভাবাবিষ্ট তরুণ পূজারীর মূর্ত্তি যে দেখে অবাক্ হইয়া যায়। সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্যদেব যেন আবির্ভূত হইয়াছেন, বসিয়াছেন ব্রহ্মময়ীর পূজায়!

পূজা শেষ হয়। এবার ঠাকুর মন্দিরগর্ভের কোণে বসিয়া, প্রাণ

ভরিয়া মাকে গাহিয়া শুনান রামপ্রসাদ আর কমলাকান্তের গান। প্রেম-বিহ্বল সাধকের বুক অশ্রুজলে সিক্ত হইতে থাকে।

রাত্রে মন্দির বন্ধ হইলে পঞ্চবটীর সংলগ্ন বনে ঠাকুর ধ্যানস্থ হন। বহিরঙ্গ জীবন হইতে নিজেকে তিনি একেবারে গুটাইয়া নিয়াছেন। ইষ্টদেবী জগন্মাতার পাদপদ্মে নিজেকে ঢালিয়া দিয়াছেন নিঃশেষে! সংসারের আহ্বান তাঁহার নিকট আজ অবান্তর—নিরর্থক। মাতৃ-ধ্যানে থাকেন সদা বিভোর।

ঈশ্বরলাভের জন্য কোন কষ্ট, কোন ত্যাগই আজ আর তাঁহার পক্ষে অসম্ভব নহে। কোন সাধন-কৃচ্ছ্রেই তিনি পরাঙ্মুখ নন।

'সমলোষ্ঠাশ্ম কাঞ্চনঃ' হইতে হইবে? ঠাকুর শুরু করেন এক অদ্ভুত খেলা। হাতে কতকগুলি টাকা ও মাটির ঢেলা নিয়া, 'মাটি-টাকা টাকা-মাটি' বলিয়া বারবার গঙ্গায় ছুঁড়িতে থাকেন।

সাধন জীবনের মূল কথা, অহংভাব নাশ করিতে হইবে। সর্ব্বজীবে আনিতে হইবে শিবজ্ঞান। ঠাকুর কালীবাড়ীর কাঙালীদের উচ্ছিষ্ট ভোজনে বসিয়া যান। এই কাঙালীরাই যে তাঁহার ইষ্ট দেবীর রূপ! তাহাদের পাতের প্রসাদ যে দেবীরই প্রসাদ! তাই এ বস্তু শিরে ধারণ করিয়া নিজেকে পবিত্র জ্ঞান করেন। ভিখারীদের পাতা ও উচ্ছিষ্ট নিজ হাতে পরিষ্কার করিয়া গঙ্গায় ফেলিয়া দিয়া আসেন।

সাধনার সিদ্ধির পথে কোন ক্রিয়া, কোন কর্ত্তব্যই যে তাঁহার অকরণীয় নাই! জগন্মাতার দর্শন তাঁহাকে পাইতেই হইবে, আর এ লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিতে হইলে কোন ফাঁক রাখিলে তো চলিবে না। চরম প্রস্তুতির পথে দিন দিন ঠাকুর আগাইয়া চলেন।

পিতামাতার শুদ্ধতা ও পবিত্রতা নিয়া তিনি জন্মিয়াছেন। নিজের ভিতরেও উপজিত হইয়াছে প্রেমভক্তির অপরিমেয় ঐশ্বর্য্য। অধ্যাত্ম-জীবনের পরম প্রাপ্তির জন্য সর্ব্বস্বপণ তিনি করিয়াছেন, দুর্ব্বার গতিতে তাই চলিয়াছেন ছুটিয়া।

ঈশ্বরপ্রেমের তীব্র ব্যাকুলতা ঠাকুরকে যেন উন্মাদ করিয়া তুলিল।

জগন্মাতার দর্শন না মিলিলে এ জীবনই যে বৃথা! আর্ত্তি শুনিলে পাষাণও বুঝি বিগলিত হয়। দুঃসহ জ্বালায় প্রায়ই অস্থির হইয়া বলেন, "মা, এত যে ডাক্‌ছি, তুই কি শুনছিস না? ভক্ত রামপ্রসাদকে এসে দেখা দিয়েছিস্ তেমনি আমাকে কি দেখা দিবি না!"

হৃদয়ের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া ঠাকুর সেদিন ছুটিয়া গিয়া মন্দিরে ঢুকিলেন। খড়্গাঘাতে এ জীবন নাশ করিবেন!

চৈতন্যঘন মহসত্তার মূলে আকর্ষণ পড়িল। জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীরূপে আদ্যাশক্তি উদ্ভাসিত হইলেন তাঁহার নয়ন সমক্ষে! এই তো তাঁহার চিন্ময়ী ইষ্টদেবী—এই তো তাঁহার মা! রামকৃষ্ণ সংজ্ঞাহীন হইয়া ভূতলে পড়িলেন।

এই দিব্যদর্শনের পরে, দুই দিন তাঁহাকে নিরন্তর ভাবাবিষ্ট অবস্থায় থাকিতে দেখা যায়।

পরবর্ত্তীকালে এই দিনকার দিব্য অনুভূতির কথা প্রসঙ্গে ঠাকুর বলিয়াছেন, "ঘর-দ্বার মন্দির সব কিছু যেন মিলিয়ে গেছে। কোথাও কিছু নেই, কেবল এক অনন্ত চেতনার জ্যোতিঃসমুদ্র! যেদিকে যতদূর দেখি তার ঢেউ আমায় গ্রাস করতে আসছে। অবশেষে আমায় একেবারে তলিয়ে দিল। আমি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লাম।"—(লীলাপ্রসঙ্গ)

তারপর ঘটিল এক অনন্ত জ্যোতিঃসমুদ্রের মধ্যে চিন্ময়ী মাতৃমূর্ত্তিতে ব্রহ্মময়ীর আবির্ভাব!

দর্শন শেষে ঠাকুর উচ্চৈঃস্বরে 'মা, মা' বলিয়া সেদিন ক্রন্দন করিয়া উঠেন। সারা অন্তরসত্তা ব্যাপিয়া এক অপার্থিব আনন্দের ঢেউ বহিয়া যায়। জগজ্জননীর দিব্য প্রকাশ ও অলৌকিক অনুভূতিতে তিনি অভিভূত হইয়া পড়েন!

ইষ্টদেবীর অদর্শনের পরই আবার জাগে বিরহ যন্ত্রণা। রামকৃষ্ণের জীবন দুঃসহ হইয়া উঠে।

মায়ের দর্শনের আকাঙ্ক্ষা আর চাপিয়া রাখিতে পারেন না। শুরু

হয় হৃদয়ভেদী কান্না। অধীর হইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়েন, মিনতি করিতে থাকেন, "মা-গো! আমায় কৃপা কর্, দেখা দে।"

মন্দিরগাত্রে প্রতিহত হইয়া ফিরে এই আর্ত্তধ্বনি। কখনো কখনো ভগবৎ-বিরহে ঠাকুর উন্মাদের মত হন। পাষাণে মুখ ঘষিয়া বলিতে থাকেন, "পাষাণী, তুই দেখা দিবিনে!" রক্ত ঝরে মুখ দিয়া, বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়, চারিদিকে লোকের ভীড় জমিয়া যায়!

উত্তরকালে ঠাকুর বলিয়াছেন, সে সময়ে অসহ্য যন্ত্রণায় সংজ্ঞা লোপ পাইলেই মায়ের বরাভয়হস্ত ও জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি তিনি দেখিতে পাইতেন। এই মূর্ত্তি ব্যাকুল সাধককে সান্ত্বনা দিত, আর দিত অধ্যাত্মপথের নির্দ্দেশ। আবার কখনো বা মা আর ছেলের মধ্যে চলিত কত অন্তরঙ্গ হাস্যালাপ।

নানা অনুভূতি ও দর্শনের স্রোত তখন ঠাকুরের জীবনে বহিতেছে। প্রবল গতিবেগে কোথায় ছুটিয়া চলিয়াছেন, কে জানে?

মাঝে মাঝে মাকে ডাকিয়া বলেন, "মা গো, আমার কি হচ্ছে কিছুই বুঝিনে। তোকে ডাক্‌বার মন্ত্রতন্ত্রও কিছুই আমি জানিনে। যা করলে তোকে চিরতরে পাওয়া যায়, তাই তুই আমায় শিখিয়ে দে। তুই ছাড়া আমার সহায় বা গতি যে আর কেউ নেই!"

ভক্তি ও শরণাগতির মূর্ত্ত বিগ্রহ ঠাকুর। মায়ের চরণে আজ তিনি নিজেকে একেবারে অবলুপ্ত করিয়া দিয়াছেন। নিজে তিনি যন্ত্র—আর জগজ্জননী হইয়াছেন তাঁহার যন্ত্রী। মা যেমনি চালান, তেমনি বহিয়া চলে সাধকপুত্রের জীবনধারা।

আগে ঠাকুর পূজা বা ধ্যানের সময় মায়ের দিব্য মূর্ত্তিটি শুধু দেখিতে পাইতেন। এবার সদাই ঘটিতেছে তাঁহার সান্নিধ্য লাভ। ভোরে ফুল তুলিতে যান, মালা গাঁথেন। মা-ও দিব্য মূর্ত্তিতে আসিয়া সঙ্গে জুটেন। অবিরাম চলে বাক্যালাপ। দু'জনের হাসি আনন্দ, রঙ্গরসের বিরাম নাই। পূজাঘরে, মন্দির চত্বরে, বাগানে বা চাঁদনীতে যখন যেখানে যান, আনন্দময়ী ভবতারিণী থাকেন তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে।

'ওরে, তুই এটা কর্, ওটা করিসনে'—বলিয়া মা তাঁহার প্রিয় সন্তানকে নির্দ্দেশের পর নির্দ্দেশ দিয়া চলেন।

ভবতারিণীকে ঠাকুর ভোগ নিবেদন করিতে বসেন। দেখেন এক আশ্চর্য্য দৃশ্য! দেবীর নয়ন হইতে জ্যোতির রশ্মি নির্গত হইয়া আসিয়া পড়ে ভোগান্নের উপর। দেবী আবার তাহা সংহরণ করিয়া নেন। পাষাণী প্রতিমা যেন জীবন্ত, সচলা। এক-একদিন এমনও হয়, ঠাকুর হয়তো ভোগ নিবেদন শেষ করেন নাই। কিন্তু মা ভবতারিণীর আর তর সহিতেছে না। মন্দির-গর্ভ আলোয় আলোময় করিয়া তাড়াতাড়ি আহারে বসিয়া গিয়াছেন।

ঠাকুর পড়েন মহা বিপদে। ব্যাকুলভাবে মাকে বলেন, "রোস্ রোস্ আগে মন্ত্রটা বলি তারপর খাস।"

মৃন্ময়ী শুধু চিন্ময়ীই হন নাই, লীলাময়ীও হইয়া উঠিয়াছেন। হাস্যলাস্যময়ীরূপে মন্দিরকক্ষে সদা তিনি বিরাজমানা থাকেন।

এ সময়কার কথা প্রসঙ্গে ঠাকুর বলিতেন, "নাকে হাত দিয়ে দেখেছি, মা সত্যি সত্যিই নিঃশ্বাস ফেলছেন। মন্দিরের দেয়ালে চিন্ময়ীর কোন ছায়া পড়তো না! নিজের ঘরে বসে বসে শুনেছি, মা পাঁয়জোর প'রে আনন্দময়ী ছোট এক মেয়ের মত ঝম্ ঝম্ করে মন্দিরের ওপর তলায় উঠে যাচ্ছেন।" এক একদিন দেখিতেন জগন্মাতা জীবন্ত মুর্ত্তিতে মন্দিরের দোতলায় দাঁড়াইয়া গঙ্গার শোভা দেখিতেছেন।

ইষ্টদেবীর সহিত একাত্মকতা ক্রমেই বাড়িতেছে। ঠাকুরের বৈধী ভক্তির বাঁধনও তাই হইতেছে শিথিল। পূজা ও ভোগরাগের নিয়ম-কানুন আজকাল আর মানিয়া চলা তাই সম্ভব হয় না। পাগ্‌লা বামুনের এই অদ্ভুত ও বিপরীত চালচলন দেখিয়া মন্দিরের লোকজন ঘাবড়াইয়া যায়।

জবা-বিল্বদলের অর্ঘ্য তুলিয়া নিয়া ঠাকুর কখনো নিজের মাথায় রাখেন। আবার ভাবাবেশে কখনো বা বুকে—এমন কি পায়ের উপর

হয়তো ঢালিয়া দেন! শুধু তাহাই নয়, এই পুষ্পদলেই আবার ভবতারিণীর পাদপদ্মে দিতেছেন অঞ্জলি।

মাঝে মাঝে ভাবাবেশে নয়নদ্বয় ও বক্ষ রক্তবর্ণ হয়। প্রেমোন্মত্ত অবস্থায় টলিতে টলিতে পূজার আসনটি ছাড়িয়া উঠেন! তারপর দেবীর সিংহাসনের উপর অবলীলায় নিজের পা তুলিয়া দেন। সস্নেহে চিবুক স্পর্শ করেন, আদর করেন। কখনো বা দেখা যায়, বিগ্রহের হাত ধরিয়া সোল্লাসে নৃত্য করিতেছেন।

নিবেদিত অন্নব্যঞ্জনের থালা ঠাকুর তুলিয়া ধরেন, মা ভবতারিণীকে নিজহাতে খাওয়াইতে থাকেন। সে এক প্রেমমধুর দৃশ্য! গদগদ স্বরে ঠাকুরকে এক এক সময়ে বলিতে শোনা যায়, "মা, আমায় কি বল্‌ছিস্! আমি খাব? আচ্ছা আচ্ছা, এই আমি খাচ্ছি।"

নিজের ভোগান্ন খাইয়া কখন যে উচ্ছিষ্ট অন্নের অংশ মায়ের মুখে পুরিয়া দিতেছেন, কোন হুঁশ নাই।

কর্ত্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ গেল, দেবীর ভোগরাগ কিছুই ভালভাবে দেওয়া হইতেছে না। উন্মাদ পুরোহিত সব কিছু ওলোট-পালোট করিয়া ফেলিতেছেন।

রাণীর জামাতা, এষ্টেটের কর্ত্তা, মথুর স্বয়ং তদন্তে আসিলেন। লুকাইয়া নিজ চক্ষে সমস্ত কিছু দেখিলেন। ভাবাবেগে চোখে তাঁহার জল আসিয়া পড়িল। ভাবিলেন, এ কি অদ্ভুত প্রেম-ভক্তি এই তরুণ পুরোহিতের? এমন ভক্তি এমন ব্যাকুলতায়ও যদি মন্দিরের দেবী বিগ্রহ জাগ্রত না হন, তবে আর কিসে হইবেন?

রাণী রাসমণি ও মথুর উপলব্ধি করিলেন, বহু পুণ্যের ফলে তাঁহারা এমন পূজারী পাইয়াছেন।

আদেশ প্রচারিত হইল, গদাধর ভট্টাচার্য্য স্বেচ্ছামত মা ভবতারিণীর পূজা করিবেন। তাঁহার কাজে ও চলাফেরায় কেহ যেন কখনো বাধা না দেয়।

কর্ত্তৃপক্ষ ইহাও বুঝিয়া নিলেন, ঠাকুরের পক্ষে এখন আর বৈধী আরাধনা সম্ভব নয়। আনুষ্ঠানিক কাজকর্ম্মের ভার আর তাঁহার উপর রাখা যায় না। এ দায়িত্ব এখন হইতে অপরকে দেওয়া হইল।

মথুরানাথ রাণীর জামাতা, তাঁহার সমস্ত কিছু কার্য্যের পরিচালক। প্রথম হইতেই ঠাকুরের প্রতি মথুরের এক অদ্ভুত আকর্ষণ জন্মে। অনেকদিন আগের কথা। সে-বার মন্দিরে পুরোহিতের অনবধানতায় গোবিন্দজী বিগ্রহের পা ভাঙ্গিয়া যায়। সকলেই ভীত হইয়া পড়িলেন, কি করা কর্ত্তব্য তাহা বুঝিতেছেন না। রাণী ও মথুর পণ্ডিতদের সহিত বহু পরামর্শ করিলেন। সকলেরই মত—এই বিগ্রহ বিসর্জ্জন দিয়া নূতন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করা হোক্। কারণ, ভগ্ন মূর্ত্তিতে পূজা শুদ্ধ হইবে না।

শুদ্ধসত্ত্ব সাধক, ছোট ভট্‌চাজের কথা মথুরানাথের মনে পড়িল। পরামর্শের জন্য তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

ঠাকুরের সহজাত প্রজ্ঞা সেদিন সর্ব্ব সমস্যার সমাধান করিয়া দেয়। তিনি বলিয়া উঠেন, "এ বিগ্রহ ফেলে দেবে, সে কি কথা গো। রাণীর জামাইদের কারো পা ভাঙলে কি হবে বল তো? তাকে গঙ্গায় ফেলে দিয়ে আর এক জামাই আনা হবে? না, তার চিকিৎসা চালাবে? গোবিন্দজীর ভাঙ্গা পা জোড়া লাগিয়ে দাও, সব ঠিক হয়ে যাবে।"

যেমন সহজ সরল কথা, তেমনি অকাট্য যুক্তি। প্রসিদ্ধ পণ্ডিতদের বিধান অগ্রাহ্য করিয়া রাণী ও মথুর এ পরামর্শই মানিয়া নিলেন।

ঠাকুর প্রায়ই থাকেন মায়ের ধ্যানে বিভোর, ভাবতন্ময়। একবার এজন্য তাঁহাকে বড় বিপদে পড়িতে হয়। সেদিন রাণী রাসমণি দেবী দর্শনে আসিয়াছেন। ঠাকুরের প্রাণ-গলানো গান শুনিতে তিনি খুব ভালবাসেন, তাই তাঁহাকে গাহিতে কহিলেন।

ঠাকুর তখনি পরমানন্দে শুরু করিলেন মাতৃসঙ্গীত। রাণী কিন্তু বেশীক্ষণ উহা মন দিয়া শুনিতে পারিলেন না। একটা জটিল মামলা তখন

চলিতেছে, এ সম্পর্কিত কি একটা কথা তিনি ভাবিয়া নিতেছিলেন। অন্তর্যামী ঠাকুর বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। সরোষে কহিলেন, "এখানেও ওসব চিন্তা!" সঙ্গে সঙ্গেই পড়িয়া গেল রাণী রাসমণির গালে এক চপেটাঘাত!

কি সর্ব্বনাশ! গদাধর ভট্টাচার্য্য কি পাগল হইয়া গিয়াছে! মন্দিরের কর্ম্মচারীরা মারমুখী হইয়া ছুটিয়া আসে।

রাণীর অঙ্গুলি সঙ্কেতে সকলে নিঃশব্দে স্থান ত্যাগ করিয়া যায়। রাণী বুঝিয়াছেন, শুদ্ধাচারী সাধকের কাছে তাঁহার বিষয়ী মনের চিন্তা-তরঙ্গ ধরা পড়িয়াছে। সত্যই তো! কালীঘরে বসিয়া কালীর গান শুনিতেছেন, এখানে বৈষয়িক কথা ভাবা তাঁহার উচিত হয় নাই। এ যে তাঁহারই লজ্জার কথা।

মথুরানাথ আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত, সংশয়ী মানুষ। কিন্তু ঠাকুরের সান্নিধ্যে আসিবার পর হইতেই তাঁহার জীবনে শুরু হয় এক অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন। শুধু ঠাকুরের রসদদারী করাই নয়, দীর্ঘকাল তিনি একান্ত নিষ্ঠায় তাঁহার সেবা করিয়াছেন। ভক্তবৎসল ঠাকুরের প্রথম ভক্ত এই মথুরানাথ। তিনি ও তাঁহার পত্নী ঠাকুরকে 'বাবা' বলিয়া সম্বোধন করিতেন, আর এই খেয়ালী বাবার সমস্ত আবদার ও অত্যাচার মথুর সহ্য করিতেন হাসিমুখে। বাবার ইচ্ছা পূরণের সুযোগ পাইলে তাঁহার আনন্দের সীমা থাকিত না। বিষয়ানুরাগী মথুর এক অহৈতুক মমত্বের বন্ধনে এই বিষয়বৈরাগীর সাথে আবদ্ধ হন।

মথুরের সেবা ও ভক্তির কথা উল্লেখ করিয়া উত্তরকালে রামকৃষ্ণ বলিতেন, "মথুর যে চৌদ্দ বৎসর ধরে সেবা করেছিল, তা কি অমনি করেছিল? মা তাকে এই শরীরের ভেতর দিয়ে অদ্ভুত অনেক কিছু দেখিয়েছিলেন। সেই জন্যই সে এত সেবা করতে পেরেছিল।"

অনেক দিন আগের কথা। ঠাকুর ভাবাবিষ্ট অবস্থায় বারান্দায় পায়চারী করিতেছেন। হঠাৎ তাঁহার দিকে দৃষ্টি পড়িতেই মথুরানাথ চমকিয়া উঠিলেন। বাবার মধ্যে আজ তিনি এ কি দেখিতেছেন?

ভবতারিণী ও মহাদেবের মূর্ত্তি যে তাঁহার মধ্যে আবির্ভূত! এ কি বিস্ময়! মথুর বারবার চক্ষু-মার্জ্জন করেন, কিন্তু দেখেন সেই একই অলৌকিক দৃশ্য! অশ্রুজলে বুক ভাসিয়া যাইতে থাকে। ছুটিয়া গিয়া ঠাকুরের পদতলে তখনি লুটাইয়া পড়েন।

শুধু ঠাকুর ও তাঁহার ভক্তমণ্ডলীর সেবা নয়, ঠাকুরের চারদিককার সমস্ত পরিবেশকে মথুর তাঁহার সাধনার পক্ষে সহায়ক করিয়া তোলেন। তাই পরমহংসদেব বলিতেন, "মাকে বলেছিলাম, এ দেহ কেমন করে রক্ষা হবে, আর সাধু ভক্তদের নিয়ে কেমন করেই-বা থাকবো? তাই তো সেজবাবু চৌদ্দ বৎসর সেবা করলে।"

মথুরের সহিত ঠাকুর সে-বার তীর্থভ্রমণে যান এবং বৈদ্যনাথে আসিয়া উপস্থিত হন। এখানকার কাঙালীদের দুঃখ দেখিয়া ঠাকুরের হৃদয় বিগলিত হয়। মথুরকে ধরিয়া বসেন, "এইসব দীন-দুঃখীদের খাওয়াতে হবে, সবাইকে কাপড় দিতে হবে।"

মথুর দেখিলেন মহা বিপদ। দূর তীর্থে চলিয়াছেন। যেখানে সেখানে এমনভাবে অর্থ ব্যয় করিলে চলিবে কেন? কিন্তু যত তিনি বুঝাইতে থাকেন, ঠাকুর তত বাঁকিয়া বসেন। উত্তেজিত কণ্ঠে বলিতে থাকেন, "তুমি হচ্ছো মায়ের দেওয়ান। তবে কেন এদের দেবে না!"

শেষটায় ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, "যাঃ! তোর সঙ্গে আমি কাশী যাব না, আমি এদের কাছেই থাকবো! এদের যে দেখ্‌বার কেউ নেই!"

অগত্যা মথুরকে রাজী হইতে হইল।

মথুরের সহিত ঠাকুরের একবার তর্ক হয়। মথুর বলিতেছিলেন, "ঈশ্বর আইন করেছেন ঠিকই, কিন্তু তাঁকেও তাঁর নিজের বিধান মেনে চলতে হয়।"

ঠাকুর উত্তর দিলেন, "সে কি গো! এ আবার কি কথা! তাঁর আইন তিনি সব সময়ে যে রদ করতে পারেন।"

যুক্তিবাদী মথুর একথা মানিতে রাজী নন। কহিলেন, "তা কি ক'রে হয়, বাবা? লাল ফুলের গাছে যে লাল ফুল হতেই হবে। সাদা ফুল সেখানে হবে কি ক'রে?"

পরের দিনই কিন্তু এ বিতর্কের সমাধান ঘটিল। প্রত্যূষে বাগানে গিয়া ঠাকুর দেখেন, কি আশ্চর্য্য! একটি লাল জবাগাছে, শ্বেত জবাও ফুটিয়া রহিয়াছে—একই ডালে দুই বর্ণের ফুল। তখনি ছুটিয়া গিয়া মথুরের চোখের সাম্‌নে এই বিস্ময়কর ব্যতিক্রমটি তুলিয়া ধরিলেন। মথুরকে হার মানিতে হইল।

এক মথুরানাথই তখন ঠাকুরের ঘনিষ্ঠতম সঙ্গী। বালকস্বভাব ঠাকুর মাঝে মাঝে তাঁহাকে ডাকিয়া বলেন, "ছাখো, মা আমায় দেখিয়ে দিয়েছেন, এখনকার সব ঢের অন্তরঙ্গ ভক্ত আছে। তারা সব আসবে, আর এখান থেকে ঈশ্বরকে লাভ করবে! মা এই খোল্‌টা দিয়ে অনেক খেলা খেলবে। অনেকের কল্যাণ করবে। তাই এটাকে রেখেছে, এখনো ভাঙ্গেনি। হ্যাঁগা তুমি কি বল? এসব কি ভুল?"

মথুর আশ্বাস দেন, "না বাবা, তোমাকে মা এ অবধি কোনটাই ভুল দেখাননি, তবে এ কেন ভুল হতে যাবে? নিশ্চয়ই তারা আসবে। কিন্তু বাবা, তারা দেরী করছে কেন? শিগ্‌গীর আসুক না, তাদের নিয়ে আমি আনন্দ করি!"

আবার যখন ভক্তদের আগমন সম্পর্কে ঠাকুর মাঝে মাঝে নিরাশ হইয়া উঠেন, মথুর তাঁহাকে উৎসাহ দিয়া বলেন, "তাতে আর কি হয়েছে বাবা? আমি একাই তো তোমার একশো ভক্ত!"

বালকস্বভাব ঠাকুর ক্ষুণ্ণমনে উত্তর দেন, "কি জানি বাবু, তারা আসবে, এটা যে মা আমায় দেখিয়ে দিলেন!"

ঠাকুরের সাধনার পথে এ সময়ে সূক্ষ্মলোক হইতেও সাহায্য কম আসিত না। নিজেই তিনি তাহা বর্ণনা করিয়াছেন,—"আমারই মত দেখতে এক যুবক সন্ন্যাসী-মূর্ত্তি আমার দেহের ভেতর থেকে যখন তখন

বেরিয়ে আসতো, আর সব বিষয়ে আমায় উপদেশ দিত। সে ঐরূপে বাইরে এলে, কখনো আমার সামান্য বাহ্যজ্ঞান থাকতো কখনো বা আমি জড়বৎ পড়ে থেকে তারই চেষ্টা সকল দেখতে পেতুম, তারই কথা শুনতে পেতুম।"

এই সময়কার উন্মত্ত অবস্থার তথ্যও ঠাকুরের কথায় কিছু পাওয়া যায়—"এর এক চতুর্থাংশ বিকার উপস্থিত হলে যে কোন সাধকের শরীর ত্যাগ হয়। এ সময়ে দিনরাতের অধিকাংশ সময় মা'র কোন না কোন রূপ দর্শনাদি পেয়ে ভুলে থাকতাম, তাই রক্ষে! নতুবা শরীরের এ খোলটা থাকা অসম্ভব হ'ত। এখন থেকে আরম্ভ করে দীর্ঘ ছয় বছর কাল ঘুম হয়নি, চোখ পলকশূন্য হয়ে গিয়েছিল। চেষ্টা করেও পলক ফেলা যেত না।"

এক সময়ে ঠাকুরের এ দিব্যোন্মাদের ভাব খুব বাড়িয়া যায়। বায়ু ঊর্দ্ধগতি, বক্ষ রক্তবর্ণ, মাথার চুল সব রুক্ষ, জট পাকাইয়া গিয়াছে। পরিধানের কাপড় বিস্রস্ত! দিনরাত মাতৃভাবনায় তিনি উন্মাদ। সমস্ত দেহে মনে যেন এক ঝড়ের মত্ততা!

এঁড়েদার বৈষ্ণব-পণ্ডিত কৃষ্ণকিশোর একদিন ঠাকুরকে প্রশ্ন করেন, 'তিনি তাঁহার উপবীত ত্যাগ করিয়াছেন কেন?'

ঠাকুর জবাব দিলেন, "আমার যখন এই অবস্থা হ'লো, তখন আশ্বিনের ঝড়ের মত একটা কি এসে কোথায় উড়িয়ে নিয়ে গেল! আগের চিহ্ন কিছুই রইলো না। হুঁস নেই, কাপড় পড়ে যাচ্ছে, তা পৈতা থাকবে কি করে? তোমার দিব্যোন্মাদ হ'লে তবে বুঝতে পারতে।"

হলধারী ঠাকুরের আত্মীয়, মন্দিরের তিনি অন্যতম পুরোহিত। জ্ঞানমার্গীয় এক গ্রন্থ পড়িয়া সেদিন ঠাকুরকে বুঝাইলেন—ঈশ্বর প্রকৃত-পক্ষে ভাবাতীত, নামরূপাদি উপাধি বর্জ্জিত। ভাব ভক্তি ইত্যাদি সহায়ে তাঁহার সম্বন্ধে যে সব অনুভূতি হয়, তাহা মিথ্যা!

এ কথা শুনিয়া ঠাকুর বালকের মত বড় ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন।

ভাবিলেন, 'তবে কি ভাবাবেশে যত কিছু ঈশ্বরীয় রূপ দেখেছি, যা কিছু শুনেছি, তা সবই ভুল।'

মা ভবতারিণীর কাছে কাঁদিয়া কহিলেন, মাগো, "নিরক্ষর মুখ্যু বলে আমায় কি এমনি ক'রে ফাঁকি দিতে হয়।"

কান্নার বেগ আর যেন থামিতে চাহে না। অকস্মাৎ সম্মুখের মেঝে হইতে কুয়াশার ধোঁয়ার মত কি যেন উঠিতে থাকে। উহার মধ্য হইতে আবির্ভূত হয় এক দিব্য পুরুষ। ঠাকুরকে সান্ত্বনা দিয়া তিনি কহেন, 'ওরে, তুই ভাব মুখে থাক্, ভাব মুখে থাক্।'

যেমন আকস্মিকভাবে এই অলৌকিক মূর্ত্তি আবির্ভূত হয়, তেমনই আবার হয় অন্তর্হিত।

ঠাকুর দিব্যোন্মাদগ্রস্ত। কিন্তু তাঁহার সম্পর্কে নানা কথাই পল্লবিত হইয়া জননী চন্দ্রমণির কানে পৌঁছিতে থাকে। তবে কি গদাধর সত্যই পাগল হইয়া গেল? উৎকণ্ঠার তাঁহার সীমা নাই।

জননীকে শান্ত করা দরকার, ঠাকুর তাই কামারপুকুরে চলিয়া আসিলেন। ইতিমধ্যে তিনি নিজেও খানিকটা স্থির হইয়াছেন। আগের সে উদ্দাম ভাবাবেশ, সে চঞ্চলতা আর নাই। গাঁয়ে আসিয়া মনের আনন্দে ঘুরিয়া বেড়ান, মাঝে মাঝে ভূতির খাল, বুধই মোড়লের নিভৃত শ্মশানে গিয়া ধ্যানস্থ হন।

জননী আশ্বস্ত হইলেন, পুত্রের বায়ুরোগ তবে কিছুটা কমিয়াছে। এবার ব্যস্ত হইয়া পড়েন তাঁহার বিবাহের জন্যে। মনে আশা, ইহার ফলে যদি বা সংসারের প্রতি কিছুটা টান হয়।

চেষ্টা খুবই চলিতেছে। কিন্তু পাত্রী কই? অচিরে দেখা গেল, ভবিষ্যৎ জীবন-সঙ্গিনীর খবর ঠাকুরের অজানা নয়।

মাতাকে ডাকিয়া পাত্রীর সন্ধান নিজেই সেদিন দিলেন। কহিলেন, "হেথায় হোথায় গেলে কি হবে? জয়রাম-বাটির রাম মুখুজ্যের বাড়ীতে খুঁজে দেখোগে। বিয়ের কনে কুটাবাঁধা হয়ে আছে।"

সত্যিই ক'নের সন্ধান সেখানে মিলিল। বালিকা বধূ সারদামণিকে মা সানন্দে বরণ করিয়া ঘরে তুলিলেন। বধূর বয়স পাঁচ, আর ঠাকুরের বয়স তখন তেইশ বৎসর।

কলিকাতায় ফিরিবার পর আবার দেখা দিল তাঁহার দিব্যোন্মাদের অবস্থা। দিবারাত্র জগন্মাতার ভাবে থাকেন বিভোর, বহিরঙ্গ জীবনের কোন ধারই ধারেন না। ভাবাবিষ্ট দেহে মহাবায়ুর গতি কেবল থাকে ঊর্দ্ধ দিকে। বক্ষ সদা আরক্তিম, চক্ষু পলকহীন, নিদ্রার লেশমাত্র নাই। তীব্র গাত্রদাহের জন্য প্রায়ই অস্থির থাকেন। সাংসারিক প্রসঙ্গ তাঁহার কাছে হইয়া গিয়াছে বিষবৎ। প্রবীণ কবিরাজের দল এ ব্যাধির স্বরূপ বুঝিতে পারেন না, হার মানিয়া যান। কেহ বা বলেন—এ যোগজ ব্যাধি, সারানো বড় কঠিন।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দের শেষভাগ। গঙ্গাতীরের ছোট বাগানটিতে ঠাকুর সেদিন পুষ্প চয়ন করিতেছেন। হঠাৎ দেখিলেন, বকুলতলার ঘাটে একটি নৌকা আসিয়া ভিড়িল। ভিতর হইতে বাহির হইলেন এক ভৈরবী। বয়স তাঁহার চল্লিশের বেশী হইবে না। পরিধানে গৈরিক বেশ। দীর্ঘ কেশরাশি আলুলায়িত। সুন্দর সুঠাম দেহে অঙ্গকান্তি, উছলিয়া পড়িতেছে।

ঠাকুর তাড়াতাড়ি নিজ কক্ষে ফিরিয়া আসিলেন। ভাগিনেয় হৃদয়কে ডাকিয়া বলিলেন, "হ্যাঁরে হৃদে, চট্ করে যা তো, ঐ ভৈরবীকে এখানে ডেকে আন্।"

হৃদয় তো অবাক! সাধিকা স্ত্রীলোকটি একেবারে অপরিচিতা,—তাঁহার আহ্বানে সে আসিতে চাহিবে কেন?

ঠাকুর স্মিতহাস্যে বলিয়া দিলেন, "ওরে যা না। আমার নাম করে তুই বল্‌গে। ঠিক আসবে।"

ঠাকুরকে দেখিয়াই ভৈরবীর বিস্ময় ও আনন্দের সীমা রহিল না। নয়ন দুটি পুলকাশ্রুতে ভরিয়া উঠিল। কহিয়া উঠিলেন, "বাবা, তুমি

এখানে রয়েছ? তুমি গঙ্গাতীরে আছ জেনে, তোমায় যে আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি। এতদিনে আজ তোমার দেখা পেলাম।"

ভৈরবী ও ঠাকুর সাক্ষাৎভাবে কেহ কাহাকেও জানেন না। নামও শোনা নাই। কিন্তু কোন্ সূক্ষ্ম যোগসূত্র উভয়ে সেদিন খুঁজিয়া পাইলেন তাহা কে বলিবে?

ভৈরবী যেন ঠাকুরের এক নূতন অভিভাবিকা। ঠাকুরও হইয়া গিয়াছেন এক বালক। নিজের নানা অভিজ্ঞতার কথা তাঁহাকে কহিতে থাকেন। দিব্যোন্মাদের দশা তখন চলিতেছে। কবে এই দশা হইতে মুক্তি পাইবেন কে জানে? ব্যাকুল স্বরে প্রশ্ন করেন, "হ্যাগা, আমি কি পাগল হলুম! আমার এ সকল কি হয়?"

ভৈরবী উত্তর দেন, "তোমায় কে পাগল বলে বাবা? তোমার যে মহাভাব হয়েছে! রাধারাণী, চৈতন্যদেব এঁদের যা হয়েছিল। আমি শাস্ত্র থেকে এসব সকলের কাছে প্রমাণ করবো!"

ভক্তিশাস্ত্র ও তন্ত্র-গ্রন্থ হইতে ভৈরবী ঠাকুরকে নানা তথ্য ও প্রমাণ পড়িয়া শুনান, তাঁহাকে আশ্বস্ত করেন।

আলাপ-আলোচনায় বেলা সেদিন গড়াইয়া গেল। ভৈরবীর কণ্ঠলগ্ন ইষ্ট, রঘুবীর-চক্র তখনো রহিয়াছেন অভুক্ত। মন্দির হইতে ভিক্ষা নিয়া তিনি পঞ্চবটীতে রাঁধিতে বসিলেন।

ভোগ নিবেদন করিতে গিয়া ধ্যানে বসিয়াছেন। দুই নয়নে বহিতেছে প্রেমাশ্রুর ধারা, বাহ্যজ্ঞান নাই।

এ সময়ে ঠাকুর হঠাৎ এক অদ্ভুত কাণ্ড করিয়া বসিলেন। কি যেন এক অলৌকিক আকর্ষণে তিনি পঞ্চবটীতে আসিয়া উপস্থিত। ভাবাবেশে উদ্বেল। ভৈরবীর ইষ্টকে নিবেদন-করা অন্ন কখন যে নিজেই গ্রহণ করিয়া বসিয়াছেন, হুঁশ নাই।

স্বাভাবিক জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে ঠাকুরের লজ্জার আর অবধি রহিল না। কহিতে লাগিলেন, "তাই তো! কে জানে বাবু, কেন এত বেসামাল হয়ে এ কাজ করে ফেললুম।"

ভৈরবী তাঁহাকে সাহস দিয়া কহিলেন, "একাজ তো তুমি করনি বাবা! যিনি তোমার ভেতরে আছেন, তিনিই যে করেছেন। ধ্যানে যাঁকে দেখছি, এ যে তাঁরই কাজ! কেন এরূপ হ'লো, তাও বুঝেছি। আর আমার পূজোয় কাজ নেই, পূজো এবার সার্থক হয়েছে।"

সেদিনকার ভোগপ্রসাদ ভক্তিভরে গ্রহণ করিয়া ভৈরবা তাঁহার দীর্ঘ দিনের পূজিত রঘুবীর-চক্র গঙ্গায় বিসর্জ্জন দিলেন।

ঠাকুরের দিব্য ভাব দেখিয়া, তাঁহার অলৌকিক অনুভূতির কথা শুনিয়া ভৈরবীর বিস্ময়ের সীমা থাকে না। দেহলক্ষণ মিলাইয়া তিনি চমৎকৃত হইয়া যান। শাস্ত্রে ভৈরবীর অসামান্য অধিকার, সাধ্যসাধন তত্ত্বও কম জানা নাই। সব দিক বিচার করিয়া এই তরুণ সাধকের চরম সাধনাবস্থারই সমর্থন তিনি পাইতেছেন।

তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে, ঠাকুরের এই আবির্ভাব জীবোদ্ধারের জন্য। তাছাড়া, তাঁহার এ উন্মত্ততা দিব্যোন্মত্ততা ছাড়া আর কিছু নয়, মহাভাবের প্রকাশ ঘটিয়াছে তাঁহার মধ্যে। এ তত্ত্ব শুধু নিজে বিশ্বাস করা নয়, আশেপাশে সকলের কাছে ভৈরবী উহা প্রচার করিতেও ছাড়িতেছেন না।

একদিন সোৎসাহে ঘোষণা করিয়া বসিলেন, "রামকৃষ্ণ অবতার—এবারে নিতায়ের খোলে, চৈতন্যের অবতরণ!"

ভৈরবী এসব কি বলিতেছে? কালীবাড়ীতে এক মহাচাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল। এই উক্তির ফলে সকলেরই সশ্রদ্ধ দৃষ্টি পতিত হইল দক্ষিণেশ্বরের উন্মাদ ব্রাহ্মণের দিকে।

ভৈরবী নিজের সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে চান, তাই শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের আহ্বান করিতে বলিলেন। ঠাকুরের কৌতূহল বালকের মত—মথুরকে অনুরোধ করিতেছেন, "বাম্‌নী এত সব কথা জোর দিয়ে বলছে, তা একটা মীমাংসার জন্য তাদের ডাকো না বাবু!"

বীরভূম ইন্দেশের বিখ্যাত তান্ত্রিক সাধক গৌরীপণ্ডিত। মথুরানাথ তাঁহাকে আহ্বান করিলেন। এ পণ্ডিতের সিদ্ধাইর তখন খুব প্রসিদ্ধি। দক্ষিণেশ্বরে থাকা কালে ঠাকুরও ইহা স্বচক্ষে দেখেন।

গৌরীপণ্ডিত এক অলৌকিক ধরণের হোম করিতেন। বামহস্তটি শূন্যে প্রসারিত করিয়া করতলের উপর প্রায় একমণ যজ্ঞকাষ্ঠ তিনি সাজাইয়া দিতেন। তারপর উহাতে করা হইত অগ্নিসংযোগ। এই অদ্ভুত ভঙ্গিতে দীর্ঘ সময় ব্যাপিয়া চলিত ক্রিয়ানুষ্ঠান। বিস্ময়ের কথা, হাতের তালু তাঁহার অক্ষতই থাকিত।

গৌরীপণ্ডিতের আরো একটি সিদ্ধাই ছিল। এটি প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করার একটি বিশেষ প্রক্রিয়া। এ সিদ্ধাই নিয়া ঠাকুরের সঙ্গে গৌরীপণ্ডিতের সংঘাত হয় এবং পণ্ডিত পরাস্ত হন।

দক্ষিণেশ্বরের প্রাঙ্গণে পৌঁছামাত্র গৌরীপণ্ডিত উচ্চকণ্ঠে ধ্বনিত করেন এক তান্ত্রিক আরাব। হা-রে-রে-রে নিরালম্বো লম্বোদর জননী তাম্ যামি শরণং—প্রভৃতি মন্ত্র ঘোর রবে বলিয়া চলেন।

তাঁহার মুখ হইতে এগুলি উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে কোন শক্তিমান সাধকের শক্তি বিনষ্ট হইয়া যায়, আর পণ্ডিত অবলীলায় প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে জয়ী হন।

সেদিন গৌরীপণ্ডিতের চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরও এক অদ্ভুত কাণ্ড করিয়া বসেন। কি জানি কেন, অজ্ঞাতসারে তাঁহার মুখ হইতে নির্গত হয় আরও উচ্চরব—'হা-রে-রে'।

চারদিকে এক প্রচণ্ড কোলাহল পড়িয়া যায়। তারস্বরে হঠাৎ এমন রে-রে শব্দ কেন? তবে কি মন্দিরে ডাকাত পড়িয়াছে? ভবতারিণীর গহনার লোভে সদলবলে আজ হানা দিয়াছে? লাঠিসোটা হাতে নিয়া হন্তদন্ত হইয়া দারোয়ানেরা ছুটিয়া আসিল। বলা বাহুল্য, ক্ষণপরেই আসল ব্যাপারটা বুঝা গেল, সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরচত্বরে বহিয়া গেল এক হাসির তরঙ্গ।

গৌরীপণ্ডিতের সমস্ত শক্তি, আর সমস্ত সিদ্ধাই কে যেন ইতিমধ্যেই

নিষ্কাশিত করিয়া নিয়াছে! হতবীর্য্য হইয়া, বিষণ্ণ মনে, ধীরে ধীরে তিনি কালীমন্দিরের দিকে চলিয়া গেলেন।

উত্তরকালে ঠাকুর এ সম্পর্কে বলেন, "মা এর পর আমায় জানিয়ে দিলেন, গৌরী যে শক্তি বা সিদ্ধাই দিয়ে লোকের বল হরণ ক'রে অজেয় থাকতো, সেই শক্তির এখানে ঐরূপে পরাজয় হয়ে যায়। তাই তার সিদ্ধাই আর থাকলো না। মা তার কল্যাণের জন্যই তার শক্তিটা আমার এই খোলটার ভেতর টেনে নিলেন।"

গৌরীপণ্ডিত অতঃপর কয়েকদিন দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান করেন। ঠাকুরের দিব্যভাব প্রত্যক্ষ করিয়া তিনি মোহিত হন, ভক্তিভরে তাঁহার কাছে করেন আত্মসমর্পণ। অল্পকাল পরে পণ্ডিত সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, অভীষ্টসিদ্ধির পথে যাত্রা তাঁহার শুরু হয়।

এমনিতেই ঠাকুরের প্রতি মথুরের শ্রদ্ধা অসীম। তদুপরি ভৈরবী তাঁহার ভগবত্তা প্রমাণ করিতে চাওয়ায় মথুরের উৎসাহ বাড়িয়া গেল। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের এক সভা তিনি আহ্বান করিলেন।

বৈষ্ণবচরণ কলিকাতার চৈতন্যসভার সভাপতি, সে সময়কার বৈষ্ণব আচার্য্যদের মধ্যে তাঁর খ্যাতি যথেষ্ট। সদলবলে তিনিও দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইলেন।

সভা শুরু হইতে দেরী নাই। ঠাকুর ভবতারিণীকে প্রণাম করিতে গিয়াছেন। প্রণামের সাথে সাথেই দেহে নামিল দিব্য-আনন্দ-রসের ঢল। মহাভাবে তিনি প্রমত্ত।

মন্দির-দ্বারে আসিয়াই ঠাকুর হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়ান। অপূর্ব্ব ভাবাবিষ্ট মূর্ত্তি! চোখেমুখে স্বর্গীয় জ্যোতির ছটা। এ মূর্ত্তি বৈষ্ণব-চরণের নয়নপথে পড়ামাত্র তিনি অভিভূত হইয়া যান। ঠাকুরের চরণে পড়িয়া বারবার আর্ত্তি প্রকাশ করিতে থাকেন।

প্রেমোন্মত্ত হইয়া ঠাকুর এসময়ে বৈষ্ণবচরণের কাঁধের উপর বসিয়া পড়েন। পণ্ডিত তো আনন্দে একেবারে মাতোয়ারা, কৃতকৃতার্থ।

অপার উৎসাহে গাহিতে থাকেন ঠাকুরের স্তব-গাথা। গৌরীপণ্ডিত, মথুরনাথ প্রভৃতি নীরবে দাঁড়াইয়া এই নাটকীয় দৃশ্য দেখিতেছেন।

সভার বিতর্কের মীমাংসা এভাবে আগে হইতেই প্রায় হইয়া গেল। সমবেত পণ্ডিত ও দর্শকদের সম্মুখে ভৈরবীও সেদিন তাঁহার অসামান্য শাস্ত্রজ্ঞান প্রদর্শন করিলেন।

ঠাকুরের নানা লক্ষণ ও শাস্ত্রের প্রমাণ নিয়া আলোচনা চলিতেছে। গৌরীপণ্ডিত, বৈষ্ণবচরণ ও অন্যান্য আচার্য্যেরা প্রবল উৎসাহে বিতর্কে মাতিয়াছেন। অথচ যাঁহাকে নিয়া এত কথা, তিনি কিন্তু একেবারে নির্লিপ্ত। সকলের মাঝখানে অর্দ্ধনগ্ন হইয়া ঠাকুর উপবিষ্ট। মাঝে মাঝে বালসুলভ ভঙ্গীতে এদিক ওদিক তাকান, কখনো কৌতুকভরে আপন মনে হাস্য করেন। কখনো বা সম্মুখের বটুয়া হইতে কিছু মৌরী নিয়া মুখে পুরিয়া দেন।

পণ্ডিতদের বাকবিতণ্ডা বা উত্তেজনা তাঁহাকে স্পর্শই করিতেছে না, যেন অপর কাহারো প্রসঙ্গ শুনিয়া যাইতেছেন।

উৎসাহভরে এক একবার ঠাকুর বিতর্কে যোগও দেন। উত্তেজিত পণ্ডিতদের হাত টানিয়া ধরিয়া ছোট বালকের মত হাসিতে থাকেন। কখনো বা বলিয়া বসেন, 'না গো না, তা নয়—আমার এরকমটা হয়!'

ভৈরবীর কথা বৈষ্ণবচরণ মানিয়া নিলেন। সিদ্ধান্ত করিলেন ঠাকুরের মধ্যে বৈষ্ণবশাস্ত্রোক্ত মহাভাবই সঞ্চারিত হইয়াছে। উনিশ প্রকারের এই মহাভাব। ইহার দুই-চারিটা উপস্থিত হইলেই জীবের দেহ চলিয়া যায়! সভার শেষে সেদিন ঘোষিত হইল,—ঠাকুর ঈশ্বরাবতার।

গৌরীপণ্ডিত ঠাকুরকে আগেই মানিয়া নিয়াছেন, তিনি আর কোন বিতর্কে অগ্রসর হইলেন না।

বৈষ্ণবচরণের ঘোষণা শুনিয়া মথুর ও অন্যান্য সকলে তো বিস্ময়ে হতবাক্। বালকস্বভাব ঠাকুর বিস্মিত ও উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছেন। মথুরকে ডাকিয়া চুপি চুপি বলেন, "ওগো, এসব বলে কি? যা হোক বাবু, রোগ-টোগ নয়—শুনে কিন্তু মনটায় আনন্দ হচ্ছে।"

মথুর এতক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া ভাবিতেছিলেন, পরম সৌভাগ্য তাঁহার তাই এই দেবকল্প মহাপুরুষের সেবার ভার পাইয়াছেন, আর পাইয়াছেন তাঁহার কৃপা।

ভৈরবী স্থির করিলেন, এবার হইতে শাস্ত্রোক্ত পন্থায় ঠাকুরের সাধনা অগ্রসর হোক্। প্রতিভাময়ী সাধিকা নিজেই সেই ভার গ্রহণ করিলেন—হইলেন ঠাকুরের প্রথম লৌকিক শিক্ষাগুরু।

নানা বিচিত্র সাধনধারা আসিয়া মিলিয়াছে ভৈরবীর জীবনে। কণ্ঠে সদাই তাঁহার ঝুলানো থাকে ইষ্টদেব রঘুবীরের চক্র। তন্ত্র-শাস্ত্রে তাঁহার অদ্ভুত অধিকার। আবার বৈষ্ণবীয় শাস্ত্র ও সাধনাও তাঁহার কম আয়ত্তে নয়।

শুদ্ধাভক্তির বলে ঠাকুর সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। এইবার ভৈরবী তাঁহার মধ্যে সঞ্চালিত করিয়া দেন শক্তিসাধনার নূতনতর প্রাণধারা। চৌষট্টিখানা তন্ত্রের নানাধরণের দুরূহ অনুষ্ঠান তিনি ঠাকুরকে দিয়া একে একে সম্পন্ন করান। তারপর তন্ত্রমতে ঠাকুরের পূর্ণাভিষেক ক্রিয়া উদ্‌যাপিত হয়। বেলতলা ও পঞ্চবটীতে দুইটি পঞ্চমুণ্ডীর আসন প্রস্তুত করাইয়া ভৈরবী নিখুঁতভাবে দিনের পর দিন তন্ত্র সাধনার সমস্ত কিছু অনুষ্ঠান সম্পন্ন করান।

পূর্ণাভিষেক বা তান্ত্রিক সন্ন্যাস গ্রহণের পর ঠাকুরকে বহুতর তান্ত্রিক সাধন-ক্রিয়া করানো হয়। এ কাজে মা ভবতারিণীর আদেশ মিলিয়াছে, ঠাকুরের তাই ইহাতে নিজেরও উৎসাহের অভাব নাই। এই সাধনকালে বহু অলৌকিক দর্শন ও অভিজ্ঞতা তাঁহার হইতে থাকে।

তান্ত্রিক ক্রিয়ায় বহু দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যে দরকার হয়। ভৈরবী রোজই দূর-দূরান্ত হইতে এগুলি সংগ্রহ করিয়া আনেন।

একদিন শবের খর্পরে মৎস্য রাঁধিয়া ঠাকুর মা-জগদম্বাকে ভোগ দিলেন। নিজেও প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। কিন্তু ভৈরবী যেদিন

তাঁহাকে নিবেদিত নরমাংস গ্রহণ করিতে বলিলেন, সেদিন তিনি ঘৃণায় সঙ্কুচিত না হইয়া পারেন নাই! ভৈরবী অবলীলায় ঐ মাংস নিজে ভোজন গ্রহণ করিলেন। তারপর দৃঢ়স্বরে ঠাকুরকে কহিলেন, "বাবা এবার তুমি এই মহামাংসের প্রসাদ মুখে দাও।"

ঠাকুর 'মা-মা' বলিয়া মাঝে মাঝে হুঙ্কার ছাড়িতেছেন, আর ভিতরে তাঁহার উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিতেছে চণ্ডিকার ভাব। এই ভাবাবেশের পর আর ঐ মাংস গ্রহণে কুণ্ঠাবোধ রহিল না।

আর একদিনকার কথা। গভীর অমানিশায় বিশেষ একটি তান্ত্রিক অনুষ্ঠান হইবে। ভৈরবী কোথা হইতে এক পূর্ণযৌবনা রূপসী রমণীকে দক্ষিণেশ্বরে ডাকিয়া আনিয়াছেন। ঠাকুরকে কহিলেন, "বাবা, একে দেবীবুদ্ধিতে আজ তুমি পূজো কর।"

পূজা শেষ হইয়া গেল। ভৈরবী এবার এই নারীকে বিবস্ত্রা করিয়া ফেলিলেন। ঠাকুরকে নির্দ্দেশ দিলেন, "বাবা, এখন মেয়েটির কোলে বসে তোমার জপসাধন করতে হবে।"

নারীমাত্রেই আজীবন যাঁহার মাতৃজ্ঞান, সেই মহাসাধকের অন্তরও প্রথমটায় আতঙ্কে কাঁপিয়া উঠিল! কিন্তু কৃপাময়ীর কৃপাসিদ্ধ যিনি তাঁহার আবার ভয় কি? জগজ্জননীকে স্মরণ করার সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুর মাতৃশক্তিতে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। বীর সাধক দিব্যাবেশে ঐ উলঙ্গ নারীর অঙ্কে গিয়া বসিলেন। বসিবামাত্রই ধ্যানস্রোতে কোথায় ডুবিয়া গেলেন, কোন বাহ্যজ্ঞান রহিল না।

সম্বিৎ ফিরিয়া পাইয়া ঠাকুর নয়ন উন্মীলন করিলেন। ভৈরবী তখন তাঁহাকে বলিতেছেন, "বাবা, তোমার ক্রিয়া সমাপ্ত হয়েছে। খুব কম সাধকই এ সাধনকালে আত্মসম্বরণ করতে পারে। সামান্য কিছুকাল জপ করেই তারা ক্ষান্ত হয়। আর তুমি এসময়ে একেবারে সমস্ত বোধের পরপারে চলে গিয়েছিলে।"

তন্ত্রসাধনকালে রামকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি এক অপূর্ব্ব দিব্যশ্রী ধারণ করে। ফুটিয়া উঠে সিদ্ধ সাধকের নয়নাভিরাম রূপ। যেখানেই যান

 Ram Krishna

লোকে নির্নিমেষে তাকাইয়া থাকে। মার কাছে তাই মিনতি জানান বারবার, "মা, আমার এ বাহ্য রূপে কোন দরকার নেই, এটা নিয়ে গিয়ে, তুই আমায় ভেতরের রূপ দে।"

এই সময়কার তন্ত্রোক্ত ক্রিয়াকলাপের ফল ফলিয়া উঠে। ঠাকুরের সাধনজীবনে আসে বিভূতির ঐশ্বর্য্য বহুতর অলৌকিক দর্শন ও অনুভূতিও তিনি লাভ করেন।

কিন্তু বরাবরই তিনি ছিলেন শুদ্ধাভক্তির একনিষ্ঠ সাধক, তাই এই বিভূতি সম্বন্ধে কোনদিনই ঔৎসুক্য দেখান নাই, এ সম্বন্ধে সচেতনও তেমন হন নাই।

ঠাকুরের সেবক, ভাগিনেয় হৃদয়নাথের বড় দুঃখ—লোকের সাধনায় কত ফল ফলে, কিন্তু কই, তাহার মামার জীবনে তো চমকপ্রদ সিদ্ধাই কিছু দেখা যাইতেছে না? বৈষয়িক উন্নতিতেও তো এই সিদ্ধাই লাগানো যাইত!

একদিন সোজাসুজি বলিয়া ফেলিলেন. "মামা, পঞ্চবটীতে কত সব শক্তিমান সাধু আসে, কত তাদের সিদ্ধাই! তারা ধূলোকে সোনা করে, আরও কত কিছু করে। তুমি তো এতকাল কত কঠোর সাধন ক'রলে, কিন্তু মামা তোমার কিছুই হ'লো না!"

বালকবৎ স্বভাব ঠাকুরের। ভবতারিণীর কাছে ছুটিয়া গেলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাগো, হৃদু বল্‌ছে, আমার নাকি কিছুই হয় নি!"

জগজ্জননী অঙুলি সঙ্কেতে দেখাইয়া দিলেন—বিষ্ঠার স্তূপ। অর্থাৎ সিদ্ধাই সাধকের কাছে বিষ্ঠার মতই ঘৃণ্য।

মন্দির হইতে ফিরিয়া ঠাকুর হৃদয়কে ক্রুদ্ধস্বরে কহিলেন, "শালা, তুই আমাকে ভুল বুঝিয়েছিলি!"

ইহার পর হইতে অষ্টসিদ্ধি ও বিভূতির উপর ঠাকুরের এক ঘৃণার ভাব চিরতরে বদ্ধমূল হইয়া যায়।

তন্ত্রসিদ্ধ হওয়ার কালেই ঠাকুর দিব্য শক্তিবলে ভবিষ্যৎ জীবনের ইঙ্গিত প্রাপ্ত হন। বুঝিতে পারেন, দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে বসিয়া

যুগাচার্য্যের ভূমিকা তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হইবে, শুদ্ধসত্ত্ব সাধকের সব আসিবে আশ্রয়ের জন্য। এই উপলব্ধির সাথে ঠাকুরের জীবনে আসে গুরুভারের নূতনতর চেতনা।

নেপথ্যের মহানাট্যকার রামকৃষ্ণজীবনের নূতন নূতন দৃশ্য উন্মোচন করিয়া চলিয়াছেন। তান্ত্রিক ক্রিয়াগুলি সম্পূর্ণ হওয়ার পর আবার এক পটপরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেল।

সাধক জটাধারী সে-বার দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত। বাৎসল্য-রসের এক সিদ্ধ সাধক তিনি। নবদূর্ব্বাদলশ্যাম বাল-শ্রীরাম তাঁহার উপাস্য। ধাতুময়-বিগ্রহ 'রামলালা' জটাধারীর কাছে শুধু চিন্ময় রূপ পরিগ্রহ করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন না, এক নিত্য সহচররূপে প্রিয় ভক্তের সঙ্গে করেন লীলা বিহার। জটাধারীর পিছে পিছে ঘুরিয়া বেড়ান, আব্দার উপদ্রব করেন, আর বাৎসল্য-রসে বিভোর সাধক সমস্ত ঝঞ্ঝাট সানন্দে পোহাইতে থাকেন।

জটাধারী আর তাঁহার ইষ্টবিগ্রহ, কি জানি কেন, ঠাকুরকে কেবলি আকর্ষণ করে। প্রায় সময়ই তিনি তাঁহাদের কাছে গিয়া বসিয়া থাকেন। রামলালার নব নব লীলা আর নাটুকেপনা দেখিয়া তাঁহার আনন্দের অবধি থাকে না।

রামলালা বিগ্রহ কিন্তু অচিরেই ডিগ্‌বাজী খাইয়া বসে—হঠাৎ সে একদিন ঠাকুরের প্রেমে পড়িয়া যায়। গভীর ভক্তি নিষ্ঠা নিয়া সাধক জটাধারী দিবারাত্র এত সেবাযত্ন করিতেছেন, সেদিকে তাঁহার ভ্রূক্ষেপই নাই। চতুর চূড়ামণি এবার নূতন লীলারঙ্গে মাতিয়াছেন। ঠাকুরের দিকেই এখন তাঁহার ঝোঁক পড়িয়াছে। ঠাকুর জটাধারীর কাছ হইতে সরিয়া আসিলেই, রামলালা চিন্ময়রূপে অমনি তাঁহার ঘরে আসিয়া হাজির হয়। বারণ করিলেও মানে না। ঠাকুরের কোলে উঠিয়া নাচে, দৌড়ায় আর সর্ব্ব রকম উৎপাত করিয়া বেড়ায়।

রামলালার এ সময়কার লীলারঙ্গ বড় মধুর। এই লীলা যেভাবে

ঠাকুর ব্যক্ত করিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য ও মাধুর্য্য উপলব্ধি করা সাধারণের পক্ষে সম্ভব নয়। ঠাকুর বলিয়াছেন, "সেদিন রামলালা বায়না করছে দেখে, ভোলাবার জন্য চারটি ধানশুদ্ধ খই খেতে দিলুম। তারপর দেখি, ঐ খই খেতে গিয়ে, ধানের তুষ লেগে তার নরম জিভ চিরে গেছে। তখন মনে যা কষ্ট হ'লো! তাকে কোলে করে ডাক ছেড়ে কাঁদতে লাগলুম—যে মুখে মা-কৌশল্যা লাগবে বলে ক্ষীর, সর, ননীও সন্তর্পণে তুলে দিতেন, আমি এত অভাগা যে, সেই মুখে এই কদর্য্য খাবার দিতে মনে একটুও সঙ্কোচ হ'লো না!"

এই অদ্ভুত ঘটনার কথা বর্ণনা করিতে গিয়া ঠাকুরের শোকের পাথার উথলিয়া উঠিত। তখন ভক্ত ও দর্শনার্থীরাও স্থির থাকিতে পারিতেন না।

অনেক দিন আগে কুলদেবতা রঘুবীরের সেবা ও পূজার সুবিধার জন্য ঠাকুর রামমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। এবার সেই রঘুবীরের প্রতি জাগিয়া উঠে গভীর বাৎসল্যভাব। নূতন মন্ত্র তিনি জটাধারীর নিকট হইতে গ্রহণ করেন, আর বালক-শ্রীরামের ধ্যানে থাকেন সদা বিভোর। সদাই প্রত্যক্ষ করেন—

যো রাম দশরথকা বেটা,
ওহি রাম ঘট্ ঘটমে লেটা।
ওহি রাম জগৎ পসেরা,
ওহি রাম সবসে নেয়ারা।

ভক্ত জটাধারীর মনে কিন্তু ক্ষোভ হইয়াছে। একি আচরণ তাঁহার রামলালার? এতদিনের সেবা পূজা সব ভুলিয়া গেল?

রামলালা সেদিন তাঁহার খেদ মিটাইয়া দেয়, আনিয়া দেয় সাধক জীবনের চরম উপলব্ধি। জটাধারী দেখিলেন—তাঁহার ইষ্টদেব পরম চৈতন্যময়, সমস্ত বিশ্বসংসারে তিনি রহিয়াছেন ওতপ্রোত।

এবার অন্তরে আর তাঁহার কোন ক্ষোভ নাই। রামকৃষ্ণের কাছে থাকিয়াই যখন রামলালার সত্যকার আনন্দ তখন জটাধারী তাহাতে

বাদ সাধিবেন কেন? এই জাগ্রত বিগ্রহকে ঠাকুরের নিকটে রাখিয়া জটাধারী বিদায় গ্রহণ করিলেন।

বাৎসল্যভাবের সিদ্ধির পর ঠাকুর ব্রতী হন মধুর ভাবের সাধনায়। সখীভাবে করেন দেহসজ্জা, প্রেমভাবে হন ভাবিত। শুরু হয় তাঁহার মধুর রসের রাগানুগা-সাধন।

ভাবনা ও সাধনা অনুযায়ী সিদ্ধিলাভে ঠাকুরের দেরী হয় নাই। নারীবেশে জানবাজারের রাজবাড়ীতে ঠাকুর এসময়ে কিছুকাল বাস করেন। পুরমহিলারা অনেকে ভুলিয়াই যান যে তিনি পুরুষ। ঠাকুরের মধ্যে ফুটিয়া উঠে কান্তাভাব—প্রেম-ভক্তির এই সাধন পরিণত হয় মহাভাবে। শ্রীভগবানের চিন্ময় রূপ ও মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া ঠাকুর মধুর-সাধনের চরম পর্য্যায়ে উপনীত হন।

বিভিন্ন সাধনার অন্তর্নিহিত সূত্র যে এক ও অভিন্ন—এ সত্যটি উপলব্ধি করিতে ঠাকুরের দেরী হয় নাই। দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদের তত্ত্ব তাঁহার মধ্যে সমন্বিত হয় এক অখণ্ড অধ্যাত্মচেতনায়।

প্রেমের ঠাকুর শ্রীচৈতন্যের সাধন তত্ত্বের যে অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা ঠাকুর রামকৃষ্ণ দিতেন তাহাতে এই অখণ্ডবোধের পরিচয় মিলে। তিনি বলিতেন, "হাতীর বাইরের দাঁত থাকে শত্রুকে আক্রমণের জন্য, আর ভেতরের দাঁতে খাবার চিবিয়ে খায় শরীর পোষণের জন্য। গৌরাঙ্গের অন্তরে ও বাইরে তেমনি ছিল দুই ভাবের প্রকাশ। বাইরের মধুর ভাব সহায়ে লোকের কল্যাণ করতেন, আর ভেতরে থাকতো অদ্বৈত ভাব—প্রেমের চরম পরিপুষ্টিতে তিনি ভূমানন্দে গলে যেতেন, তখন তিনি ব্রহ্মভাবে থাকতেন অধিষ্ঠিত।"

মধুর সাধনার পট-পরিবর্ত্তনের পরই ঠাকুরের জীবনে ঘটে তোতাপুরীর আবির্ভাব—আসে বেদান্তের পরম উপলব্ধি।

অদ্বৈতবোধের প্রবাহ ঠাকুর রামকৃষ্ণের অধ্যাত্ম-জীবনে মাসের পর মাস ব্যাপিয়া বহিয়া চলে। এসময়কার অবস্থার বর্ণনা করিয়া তিনি বলিয়াছেন—

"যে অবস্থায় সাধারণ জীবেরা পৌঁছুলে আর ফিরতে পারে না, একুশ দিন মাত্র শরীর টেকে, শুক্‌নো পাতা যেমন গাছ থেকে ঝরে পড়ে, তেমনি পড়ে যায়—সেইখানে ছয় মাস ছিলুম! কখন কোন্ দিক দিয়ে যে দিন আসতো, রাত যেত, তার ঠিকানাই হ'ত না। মরা মানুষের নাকে মুখে যেমন মাছি ঢুকে, তেমনি ঢুকতো কিন্তু সাড়া হ'ত না। চুলগুলো ধুলোয় জটা পাকিয়ে গিয়েছিল। হয় তো অসাড়ে শৌচাদি হয়ে গেছে, তারও হুঁশ হয়নি।

"শরীরটে কি আর থাকতো ?—এই সময়েই যেত। তবে এ সময়ে একজন সাধু এসেছিল। তার হাতে রুলের মত একগাছা লাঠি ছিল। অবস্থা দেখেই চিনেছিল। আর বুঝেছিল—এ শরীরটে দিয়ে মা'র অনেক কাজ এখনো বাকী আছে—এটাকে রাখতে পারলে অনেক লোকের কল্যাণ হবে। তাই খাবার সময় খাবার এনে, মেরে হুঁশ আনবার চেষ্টা করতো। একটু হুঁশ হচ্ছে দেখেই মুখে খাবার গুঁজে দিত! এই রকমে কোন দিন একটু আধটু পেটে যেত, কোন দিন যেত না। এই ভাবে ছ'মাস গেছে।

"তারপর এই অবস্থার কতদিন পরে শুনতে পেলুম, মা'র কথা—ভাব মুখে থাক্, লোকশিক্ষার জন্য ভাব মুখে থাক্।

"তারপর অসুখ হ'লো—রক্ত আমাশয়; পেটে খুব মোচোড়, আর খুব যন্ত্রণা। সেই যন্ত্রণায় প্রায় ছ'মাস ভুগে ভুগে তবে শরীরে একটু একটু করে মন নাম্‌লো—সাধারণ মানুষের মত তখন হুঁশ এলো! নতুবা থাকতে থাকতে মন আপনা-আপনি ছুটে গিয়ে একেবারে সেই নির্ব্বিকল্প অবস্থায় চলে যেত!"

ঠাকুরের স্ত্রী সারদামণি ক্রমে যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন। স্বামীর

সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলে। মস্ত বড় সাধক তিনি, দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে নাকি তাঁহার প্রতিপত্তির সীমা নাই।

অন্তরের ব্যথা গুমরিয়া উঠে, এমন স্বামীর সেবার অধিকার কি তাঁহার হইবে না? সে-বার পিতাকে সঙ্গে নিয়া দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সাধন ভজনে সদাই ডুবিয়া থাকিলে কি হয়, সেদিন পত্নীর প্রতি ঠাকুরের ব্যবহার কিন্তু দেখা গেল বড় স্বাভাবিক, বড় আন্তরিক। পরম সমাদরে তাঁহাকে তিনি গ্রহণ করিলেন। স্থান দিলেন নিজেরই কক্ষে, নিজেরই শয্যায়। বিবাহিতা তরুণী স্ত্রীকে, নিজের আয়ত্তাধীন স্ত্রীকে নিকটে রাখিয়া ইন্দ্রিয়-সংযমের পরাকাষ্ঠা তিনি প্রদর্শন করিলেন।

উভয়ের দাম্পত্য জীবনের এক শুদ্ধসত্ত্ব, স্বর্গীয় রূপ সেদিন ফুটিয়া উঠিল। এ রূপ বড় দুর্লভ। দাম্পত্য জীবনের এ দিব্য রূপায়ণে ঠাকুরের তুলনায় সারদামণির কৃতিত্ব কম নয়। আপন সংযম ও ত্যাগ-বৈরাগ্য দিয়া স্বামীর ব্রতকে তিনি অক্ষুণ্ণ রাখেন।

উত্তরকালে পত্নী সম্পর্কে ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "ও যদি এত ভাল না হ'ত, আত্মহারা হয়ে তখন আমায় আক্রমণ করতো তাহ'লে আমার সংযমের বাঁধ ভাঙতো কিনা, দেহবুদ্ধি আসতো কিনা, কে বলতে পারে? বিয়ের পর মা জগদম্বাকে ব্যাকুল হয়ে ধরে পড়েছিলাম। বলেছিলাম—মা, আমার স্ত্রীর ভেতর থেকে কামভাব একেবারে দূর করে দে। ওর সঙ্গে একত্রে বাস করে এ সময়ে বুঝেছিলাম, মা আমার সে কথা সত্যিই শুনেছিলেন।"

স্বামী সারদানন্দ তাঁহার রচিত লীলা-গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "পূর্ণযৌবন ঠাকুর ও নবযৌবনসম্পন্ন শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর এই কালের দিব্য লীলাবিলাস সম্বন্ধে যে সকল কথা আমরা ঠাকুরের নিকট শ্রবণ করিয়াছি, তাহা জগতের আধ্যাত্মিক ইতিহাসে অপর কোনও মহাপুরুষের সম্বন্ধে শ্রবণ করা যায় না। উহাতে মুগ্ধ হইয়া মানবহৃদয় স্বতঃই ইঁহাদিগের দেবত্বে বিশ্বাসবান হইয়া উঠে এবং অন্তরের ভক্তি

শ্রদ্ধা ইঁহাদিগের শ্রীপাদপদ্মে অর্পণ করিতে বাধ্য হয়। দেহবোধ বিরহিত ঠাকুরের প্রায় সমস্ত রাত্রি এইকালে সমাধিতে অতিবাহিত হইত এবং সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হইয়া বাহ্যভূমিতে অবরোহণ করিলেও তাঁহার মন এত উচ্চে অবস্থান করিত যে, সাধারণ মানুষের ন্যায় দেহবুদ্ধি উহাতে এক ক্ষণের জন্যও উদিত হইত না।

পৌঁছানোর দুই একদিন পর পত্নী সারদাকে একান্তে পাইয়া ঠাকুর বলেন, "কি গো, আমায় কি তুমি মায়ায় বদ্ধ করতে এসেছো?"

কিশোরী বধূ তখনি দৃঢ়, সপ্রতিভ কণ্ঠে উত্তর দেন, "না, তা কেন? আমি তোমার সহধর্ম্মিণী। তোমার ধর্ম্মপথে সহায়তা করতেই আমি এসেছি।"

রাতের পর রাত শয্যায় বসিয়া ঠাকুরের ভাবসমাধি হয়। সারদামণি বড় ঘাবড়াইয়া যান। এক একদিন ত্রস্তে ব্যস্তে ঠাকুরের ভাগিনেয় হৃদয়কে ডাকিয়া আনেন। কাণে বার বার নাম শুনানোর পরে তবে ঠাকুর প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠেন।

ইহার পর হইতে ঠাকুর নিজেই সারদামণিকে বলিয়া রাখিতেন, কোন্ রকমের ভাবসমাধি হইলে কোন্ মন্ত্র শুনাইতে হইবে, কি করিয়া তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিতে হইবে। কিন্তু রাত্রি ঘনাইয়া আসিলেই সারদার আর দুশ্চিন্তার অবধি থাকে না। কখন কি ভাবাবেশ ঠাকুরের হয়, কখন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন তাহা জানা নাই। প্রায় সারারাত তিনি জাগিয়া কাটান। ঠাকুর একদিন সেকথা জানিতে পারিয়া বড় দুঃখিত হইলেন। কাছেই নহবৎখানার ঘর, এখন হইতে সেখানেই সারদামণির শয়নের ব্যবস্থা করা হইল।

একদিন সারদা ঠাকুরের পদসেবা করিতেছেন! হঠাৎ ঠাকুরকে তিনি প্রশ্ন করিয়া বসিলেন, "ওগো, ঠিক করে বল তো, আমায় তোমার কি মনে হয়?"

ঠাকুর তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, "মন্দিরে যে মায়ের পূজা হয়, সেই মা-ই এই শরীরের জন্ম দিয়েছেন এবং আজকাল নহবতে বাস করছেন। আবার তিনিই এখন কচ্ছেন আমার পদসেবা। আনন্দময়ী মায়ের প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি বলেই যে তোমায় সর্ব্বদা আমি দেখি।"

নিজের পত্নীতে ও সমস্ত নারীতেই ঠাকরের এ মাতৃভাব। ব্রহ্মময়ীর স্বরূপ তিনি তাঁহাদের সকলের মধ্যেই উপলব্ধি করেন। এবার তাঁহার এ উপলব্ধিকে তিনি পূর্ণতর করিয়া তুলিতে চাহেন।

সেদিন অমাবস্যা। ফলহারিণী কালীপূজা। ঠাকুর নিজের শয়ন-ঘরে ষোড়শী পূজার আয়োজন করিয়া বসিলেন। পত্নী সারদামণিকে তিনি মহামায়া জ্ঞানে পূজা করিবেন, জপতপ ও ধ্যান ধারণার সব কিছু ফল তাঁহার চরণে করিবেন সমর্পণ।

গঙ্গাজলে অভিষেকের পর সারদামণিকে নব বস্ত্র পরানো হইল। পুষ্প-চন্দনে সজ্জিত হইয়া তিনি পূজাবেদীতে বসিলেন। এই ভাবগম্ভীর পরিবেশে তিনিও ভাবাবিষ্টা হইয়া গিয়াছেন। পূজা শেষে মা-মা রবে চারিদিক কাঁপাইয়া তুলিয়া রামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হইলেন। বেদীতে উপবিষ্টা সারদামণিরও তখন বাহ্যজ্ঞান নাই।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ। এ সময় হইতে ঠাকুরের জীবন-লীলানাট্যে এক নূতনতর দৃশ্যপট উন্মোচিত হয়। আত্মসমাহিত সাধক এবার আত্মপ্রকাশ করেন লোকগুরুরূপে।

মনীষী, বাগ্মী ও ধর্ম্মনেতারূপে কলিকাতায় তখন কেশব সেনের বিরাট প্রতিষ্ঠা। তাঁহার সঙ্গে ঠাকুরের প্রীতির সম্পর্ক গড়িয়া উঠে, ক্রমে এ সম্পর্ক হয় ঘনিষ্ঠতর। কেশব সেনের দেখাদেখি বিজয়কৃষ্ণ, প্রতাপ মজুমদার, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতিও আসিতে থাকেন।

এবার হইতে দক্ষিণেশ্বরের পাগলা বামুনের ভগবৎ-কথা শুনিতে সকলে ভীড় করেন, ভাগবত জীবনের প্রকাশ তাঁহার মধ্যে প্রত্যক্ষ করিতে অনেকেই হন মহা কৌতুহলী। এ ঈশ্বরপ্রাপ্ত মহাপুরুষের দিকে

কলিকাতার শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। তারপর তাঁহার চরণতলে আসিয়া জড়ো হইতে থাকে একের পর এক ভক্তবৃন্দ ও আত্মার পরমাত্মীয় শিষ্যদল।

দেশের সমাজজীবনে তখন চলিতেছে এক মানস-সঙ্কট। একদিকে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের আদর্শ সংঘাত, আর একদিকে জাগিয়া উঠিয়াছে জাতির আত্মপরিচয় সাধন ও আত্মপ্রতিষ্ঠার তীব্র আকাঙ্ক্ষা। কোথায় আলো, কোথায় পথ? বিভ্রান্ত মানুষকে কে দিবে সত্যের সন্ধান? এই সময়ে ঘটিল শ্রীরামকৃষ্ণের অভ্যুদয়!

সংশয়াচ্ছন্ন, জড়বাদী মানুষকে তিনি ডাকিয়া কহিলেন, ঈশ্বর দূরের বস্তু নয়, তিনি পর নন। একান্ত আপনজন। তাঁহার জন্য ব্যাকুল হইলে, সর্ব্বত্যাগী হইলে তাঁহাকে পাওয়া যায়। ঠাকুর তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহার সন্ধানও তিনি অবগত আছেন।

শত শত ঈশ্বরবিমুখ এ সময়ে তাঁহাকে দর্শন করিতে আসে। ভাগবত শক্তির প্রকাশ তাঁহার দেহে দেখিয়া বিশ্বাসবান হয়, নূতনতর চৈতন্য লাভ করে। ঈশ্বরমুখীন, ত্যাগবৈরাগ্যবান সাধকেরাও আসেন। তাঁহাদের বিশ্বাস হইয়া উঠে দৃঢ়তর, পরমাশ্রয়রূপে এ মহাপুরুষকে আরো আঁকড়িয়া ধরেন।

কেশব সেন একদিন সখেদে রামকৃষ্ণকে কহিলেন, "মশাই, বলে দিন, কেন আমার ঈশ্বর দর্শন হচ্ছে না।"

ঠাকুরের জীবন ঈশ্বরধৃত। ঈশ্বরময় তিনি হইয়া গিয়াছেন। তাই এ ব্যাপারে তাঁহার মুখে মনরাখা কথা শোনা যায় না। সোজা বলিয়া দিলেন, "লোকমান্য, বিদ্যা এ সব নিয়ে তুমি আছ কিনা, তাই হয় না। ছেলে চুষি নিয়ে যতক্ষণ চোষে ততক্ষণ মা আসে না। লাল চুষি। খানিকক্ষণ পরে চুষি ফেলে দিয়ে যখন চীৎকার করে, তখন মা ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে আসে। তুমি মোড়লী করছো, মা ভাবছে—ছেলে আমার মোড়ল হয়ে বেশ আছে। আছে তো থাক্।"

শিবনাথ শাস্ত্রী এক সময়ে প্রায়ই রামকৃষ্ণের কাছে যাইতেন।

কিন্তু তাঁহার ভাবসমাধি যে কি বস্তু তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেন না। কেহ এ সম্পর্কে প্রশ্ন করিলে শিবনাথ মত প্রকাশ করিতেন—এই ভাবসমাধি স্নায়ুবিকার প্রসূত।

সেদিন শিবনাথ দক্ষিণেশ্বরে আসিয়াছেন, ঠাকুর তাঁহাকে কোণঠাসা করিয়া ফেলিলেন। কহিলেন, "হ্যাগা শিবনাথ, তুমি নাকি এ-গুলোকে রোগ বল ? আর বল যে, ঐ সময়ে অচৈতন্য হয়ে যাই ? তোমরা ইট, কাঠ, মাটি, টাকাকড়ি এই সব জড় জিনিষগুলোতে দিনরাত মন রেখে ঠিক থাক্‌বে, আর যাঁর চৈতন্যে জগৎ সংসারটা চৈতন্যময় হয়ে রয়েছে, তাঁকে দিনরাত ভেবে আমি অজ্ঞান, অচৈতন্য হলুম ! এ কোন্ দিশি বুদ্ধি তোমার ?"

শিবনাথ নির্ব্বাক, নতশির হইয়া বসিয়া রহিলেন।

বিষয়ী ও অর্দ্ধ-বিষয়ী লোকের ভীড়ে রামকৃষ্ণ কেবলি হাঁপাইয়া উঠিতেছেন। কিন্তু কই ? যে শুদ্ধসত্ত্ব, বৈরাগ্যবান সাধকদের প্রতীক্ষায় তিনি আছেন, তাহাদের তো এখনো দেখা নাই ! জগজ্জননী যে নিজে বলিয়াছেন তাহাদের আগমনের কথা। সে কথা তো মিথ্যা হইবার নয়। কিন্তু ঠাকুর যে আর ধৈর্য্য ধরিতে পারেন না।

এক একটা দিন চলিয়া যায়, আর তাঁহার বিরহযন্ত্রণা হয় তীব্রতর। হতাশ হইয়া ভাবিতে বসেন—আরও একটা দিন অতিক্রান্ত হইয়া গেল, কই ? যাহাদের আসিবার কথা, তাহারা তো আজো আসিল না !

আকাশে অন্ধকার নামিয়া আসে। মন্দিরের আরতির শব্দ দূরে—বহুদূরে মিলাইয়া যায়। রামকৃষ্ণ কুঠিবাড়ীর ছাদে চুপি চুপি উঠিয়া যান। তারপর সেখানে গিয়া ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে থাকেন, "ওরে, তোরা সব কে কোথায় আছিস্, আয় ! তোদের না দেখে যে আর আমি একদিনও থাকতে পারছিনে।"

মিলনের লগ্ন আসিয়া যায়। একের পর এক এবার আসিতে থাকে শুদ্ধাত্মা, মুমুক্ষু, ভক্তের দল—রামকৃষ্ণের আদর্শের ইহারা ধারক বাহক, নব ধর্ম্মান্দোলনের এক একটি স্তম্ভ।

চিহ্নিত শিষ্যদের কাহার কি পরিচয়, কে কোন্ দিক হইতে আসিতেছে কোন কিছু ঠাকুরের অজানা নয়। এক একদিন মনের আনন্দে দু'এক কথা প্রকাশও করেন। দেখা হইলেই পরম আত্মীয়ের মত তাহাদিগকে গ্রহণ করেন। তারপর শুরু হয় এই ভক্ত সাধকদের গড়িয়ে তোলার পর্ব্ব।

অদ্ভুত অধ্যাত্মশিল্পী এই ঠাকুর রামকৃষ্ণ! বিস্ময়কর তাঁহার সৃজনী প্রতিভা। অমোঘ তাঁহার অলৌকিক শক্তির স্পর্শ। দূরসন্ধানী দৃষ্টি দিয়া প্রতিটি শিষ্যের অন্তর দিনের পর দিন দেখিতেছেন, নিপুণ হস্তে করিতেছেন রূপান্তরিত। সর্ব্বজ্ঞ ও শক্তিধর সদ্‌গুরুরূপে সদা নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন তাঁদের সূক্ষ্মতম চিন্তাতরঙ্গ।

সাধক ভক্তদের উপর ঠাকুরের কৃপা বর্ষণের কথা জানাইতে গিয়া লীলা-প্রসঙ্গকার লিখিয়াছেন—

"প্রত্যেককে একান্তে আহ্বানপূর্ব্বক ধ্যান করাইতে বসাইয়া তাহাদিগের বক্ষ, জিহ্বা প্রভৃতি শরীরের কোন কোন স্থান দিব্যাবেশে স্পর্শ করিতেন। ঐ শক্তিপূর্ণ স্পর্শে তাহাদিগের মন বাহিরের বিষয়-সমূহ হইতে আংশিক ও সম্পূর্ণভাবে সংহৃত ও অন্তর্ম্মুখী হইয়া পড়িত এবং সঞ্চিত ধর্ম্মসংস্কার সকল অন্তরে সহসা সজীব হইয়া উঠিয়া সত্য-স্বরূপ ঈশ্বরের দর্শন লাভের জন্য তাহাদিগকে বিশেষভাবে নিযুক্ত করিত। ফলে, উহার প্রভাবে কাহারও দিব্যজ্যোতি মাত্রের অথবা দেব-দেবীর জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তিসমূহের দর্শন, কাহারও গভীর ধ্যান ও অভূতপূর্ব্ব আনন্দ, কাহারও হৃদ্‌গ্রন্থি সকল সহসা উন্মোচিত হইয়া ঈশ্বর লাভের জন্য প্রবল ব্যাকুলতা, কাহারও ভাবাবেশ ও সবিকল্প সমাধি এবং বিরল কাহারও নির্বিকল্প সমাধির পূর্ব্বাভাষ আসিয়া উপস্থিত হইত।

"তাঁহার নিকট আগমন করিয়া ঐরূপে জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি প্রভৃতির দর্শন কত লোকের যে উপস্থিত হইয়াছিল তাহার ইয়ত্তা হয় না।

"তারকের মনে ঐরূপে বিষম ব্যাকুলতা ও ক্রন্দনের উদয় হইয়া

অন্তরের গ্রন্থি সকল একদিন সহসা উন্মোচিত হইয়াছিল এবং ছোট নরেন উহার প্রভাবে স্বল্পকালে নিরাকারের ধ্যানে সমাধিস্থ হইয়াছিল, এ কথা আমরা ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছি। কিন্তু ঐরূপ স্পর্শে এককালে নির্বিকল্প অবস্থার আভাস প্রাপ্ত হওয়া একমাত্র নরেন্দ্রনাথের জীবনেই দেখা গিয়াছিল।

"ভক্তদিগের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তিকে ঠাকুর ঐরূপ স্পর্শ করা ভিন্ন কখনও কখনও আনবী বা মন্ত্রদীক্ষাও প্রদান করিতেন। ঐ দীক্ষা প্রদানকালে তিনি সাধারণ গুরুগণের ন্যায় শিষ্যের কোষ্ঠি-বিচারাদি নানাবিধ গণনা ও পূজাদিতে প্রবৃত্ত হইতেন না, কিন্তু যোগদৃষ্টি সহায়ে তাহার জন্মজন্মাগত মানসিক সংস্কারসমূহ অবলোকন পূর্ব্বক 'তোর এই মন্ত্র' বলিয়া মন্ত্র নির্দ্দেশ করিয়া দিতেন।"

নবাগত তরুণ সাধকেরা ঠাকুরের কাছে আসেন। নিজস্ব সমস্যার কথা, অভিজ্ঞতার কথা জনাইয়া নির্দ্দেশ চান। এ সময়ে ঠাকুর যেন তাঁহাদের অন্তরঙ্গ সখা, সুহৃদ। সাধ্য ও সাধন সম্পর্কে ফাঁকা আওয়াজ তাঁহার নাই। উঁচুতে বসিয়া, নাগালের বাহিরে থাকিয়া, উপদেশ বর্ষণ করিয়া তিনি কর্ত্তব্য সমাধা করেন না। ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসিয়া একান্ত অন্তরঙ্গতায় আশ্রিতের হাত ধরেন। তারপর ধীরে ধীরে টানিয়া নেন তাহাকে পরম প্রাপ্তির দিকে।

সে-বার এক তরুণ ভক্ত সখেদে কহিলেন, "ঠাকুর, আমার যে কাম যাচ্ছে না, এত সাধনভজন করে চলেছি কিন্তু মাঝে মাঝেই ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য এসে পড়ছে। কি করবো, আমায় বলে দিন।"

ঠাকুর যেন প্রশ্নকর্তার এক প্রবীণ বন্ধু। তাহাকে কাছে বসাইয়া আশ্বাস ও উৎসাহ দিয়া কহিতে লাগিলেন—

"ওরে, ভগবৎদর্শন না হলে কাম একেবারে যায় না। তা, ভগবানের দর্শন হলেও শরীর যতদিন থাকে ততদিন একটু আধটু থাকে, তবে মাথা তুলতে পারে না। তুই কি মনে করিস, আমারই একেবারে গেছে? এক সময়ে মনে হয়েছিল যে, কামটাকে জয় করেছি। তারপর

পঞ্চবটীতে বসে আছি, আর এমনি কামের তোড় এলো যে, আর যেন সামলাতে পারিনে। তারপর ধূলোয় মুখ ঘষ্‌ড়ে কাঁদি আর মাকে বলি, 'মা, বড় অন্যায় করেছি, আর কখনও ভাববো না যে, কাম জয় করেছি',—তবে যায়।

"কি জানিস্—তোদের এখন যৌবনের বন্যা এসেছে। তাই বাঁধ দিতে পাচ্ছিস্ না। বান যখন আসে, তখন কি আর বাঁধ-টাঁধ মানে? বাঁধ উছ্‌লে ভেঙে জল ছুটতে থাকে। লোকের ধান-ক্ষেতের ওপর এক বাঁশ সমান জল দাঁড়িয়ে যায়।

"তবে বলে—কলিতে মনের পাপ পাপ নয়। আর, মনে একবার আধবার কখনো কুভাব এসে পড়ে তো—'কেন এল' বলে বসে বসে তাই ভাবতে থাকবি কেন? ওগুলো কখনো কখনো শরীরের ধর্ম্মে আসে যায়—শৌচ-পেচ্ছাপের চেষ্টার মত মনে করবি। শৌচ-পেচ্ছাপের চেষ্টা হয়েছিল ব'লে লোকে কি মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে বসে? সেইরকম ওই ভাবগুলোকে অতি সামান্য, তুচ্ছ, হেয় জ্ঞান করে মনে আর আনবি না।

"আর তাঁর নিকটে খুব প্রার্থনা করবি, হরিনাম করবি ও তাঁর কথাই ভাববি। ও-ভাবগুলো এল কি গেল—সেদিকে নজর দিবি না। এরপর ওগুলো ক্রমে ক্রমে বশ মানবে।"

গম্ভীরাত্মা, বৈরাগ্যবান মহাপুরুষ রামকৃষ্ণ। কিন্তু মুমুক্ষু বালক ভক্তদের নিয়া এক একদিন কি হাস্য পরিহাসের তরঙ্গই না তুলিয়া দেন। যে কক্ষটিতে প্রতিদিন জ্ঞান, বৈরাগ্য আর ঈশ্বরতত্ত্বের সুগভীর আলোচনা হয়, সেখানে অনাবিল হাস্যরসের ঝড় বহিয়া যায়। ঠাকুর হাসিতে হাসিতে অনেক সময় বলেন, "দ্যাখো, আমি এ ছোকরাদের কেবল নিরামিষ দিই না। মাঝে মাঝে আঁশ-ধোয়া জল একটু একটু দিই। তা না হলে আসবে কেন?"

ঠাকুরের বিশিষ্ট ভক্ত ও চরিতকার শ্রীম একদিনকার এরূপ একটি দৃশ্যের বর্ণনা দিতেছেন, "ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শুদ্ধাত্মা ভক্তদিগকে পাইয়া

আনন্দে ভাসিতেছেন। ছোট খাটটিতে বসিয়া বসিয়া তাহাদিগকে কীর্ত্তনীর ঢং দেখাইয়া হাসাইতেছেন। কীর্ত্তনী সেজেগুজে সম্প্রদায়ের সঙ্গে গান গাহিতেছে। কীর্ত্তনী দাঁড়াইয়া। হাতে রঙীন রুমাল। মাঝে মাঝে ঢং করিয়া কাসিতেছে ও নথ তুলিয়া থুথু ফেলিতেছে। আবার যদি কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি আসিয়া পড়ে, গান গাইতে গাইতেই তাহাকে অভ্যর্থনা করিতেছে ও বলিতেছে—'আসুন'। আবার মাঝে মাঝে হাতের তাবিজ, অনন্ত ও বাউটি ইত্যাদি অলঙ্কার দেখাইতেছে।"

ব্রহ্মজ্ঞপুরুষের এ এক লীলারঙ্গ, অপূর্ব্ব রসোচ্ছল ভাব। হাত নাড়িয়া মুখ বাঁকাইয়া একাই ঢপওয়ালীর অভিনয় জমাইয়া তুলিয়াছেন, আর অন্তরঙ্গ বালক ভক্তদের মধ্যে পড়িয়া গিয়াছে তুমুল হাস্যরোল। একটি ভক্তের বয়স বড় কম, ঠাকুরের কাণ্ড দেখিয়া সে তো হাসিয়া লুটোপুটি।

ঠাকুর তৃপ্তির হাসি হাসিয়া কহিতেছেন, "ছেলে মানুষ কিনা, তাই হেসে গড়াগড়ি যাচ্ছে।"

পরক্ষণেই আবার এ বালক ভক্তটিকে তিনি সতর্ক করিয়া দিতেছেন, "ওরে পল্টু, দেখিস্, তোর বাবাকে যেন এসব কথা বলিসনি। যা-ও আমার ওপর এক-আধটুকু টান ছিল, তা-ও তাহলে যাবে। ওরা একে ইংলিশম্যান লোক।"

ভক্ত নরেন্দ্রনাথ তখন জীবনযুদ্ধে বড় ক্ষতবিক্ষত, চরম দারিদ্র্যের আঘাতে মুহ্যমান। পিতার মৃত্যুর পর পরিবারের ভরণপোষণের দায়িত্ব তাঁহার উপর পড়িয়াছে। অথচ বহু চেষ্টায় একটা চাকুরী জুটাইতে পারিতেছেন না। তাঁহার ইচ্ছা বাড়ীর একটা সুব্যবস্থা করিয়া, নিশ্চিন্ত হইয়া, তারপর একেবারে অধ্যাত্মজীবনের স্রোতে ঝাঁপাইয়া পড়িবেন। কিন্তু ঠাকুরের হিসাব অন্য প্রকার। তাঁহার মতে, ঈশ্বরপ্রেম যখন উত্তাল হইয়া উঠে, বিরহে তীব্রতায় যখন প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়, সংসারিক বিলিব্যবস্থার কথা, সতর্কতার কথা, তখন প্রকৃত মুক্তিকামী ভক্তের মনে উঠিবে কেন?

সেদিন নরেন দক্ষিণেশ্বরে আসিয়াছেন। সারা দেহে মনে ক্লান্তি আর বিষাদের ছাপ। ঠাকুর এমন সময় তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বক্রোক্তির বাণ ছাড়িতে লাগিলেন। ভক্ত মাষ্টার মহাশয় কাছেই উপবিষ্ট। ঠাকুর তাহাকে কহিলেন, "ছাখো, যে বড় ঘরের ছেলে তার খাবার ভাবনা হয় না—সে মাসে মাসে মাসোহারা পায়। আচ্ছা, নরেনের অত উঁচু ঘর, তবু হয় না কেন, বল তো? ভগবানে মন সবটা সমর্পণ করলে তবে তো তিনি সব যোগাড় করে দেবেন।"

একটু পরেই এ প্রসঙ্গের জের টানিয়া ঠাকুর শুরু করিলেন তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গোক্তি। কহিলেন, "একটা মাগীর ভারি শোক হয়েছিল! আগে নথ্‌টা কাপড়ের আঁচলে সে বাঁধলে, তারপর—'ওগো, দিদিগো আমার কি হ'লো গো' ব'লে সকলের সামনে আছড়ে পড়লো; কিন্তু খুব সাবধান রয়েছে সে, নথটা যেন ভেঙ্গে না যায়।"

সকলে হাসিতেছে। কিন্তু ঠাকুরের এই শাণিত বিদ্রূপের খোঁচা সেদিন নরেনের মর্ম্মে গিয়া বিঁধিল। মন মেজাজ এমনিতেই তেমন ভাল নয়। কক্ষের মেঝেতে শ্রান্ত দেহটি ধীরে ধীরে এলাইয়া দিয়া তিনি শুইয়া পড়িলেন।

ভক্তপ্রবর মাষ্টার মহাশয় ঠাকুরের কথার ভঙ্গীতে কৌতুকোচ্ছল হইয়া উঠিয়াছেন। স্মিতহাস্যে নরেনের দিকে চাহিয়া ফোড়ন কাটিলেন, "একেবারে শুয়ে পড়লে যে!"

মাষ্টার মহাশয় নরেনের চাইতে বেশী সংসারী। মুহূর্ত্তমধ্যে ঠাকুর তাঁহার লক্ষ্য ঘুরাইয়া নিয়া মাষ্টারের দিকে তাক্ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে হানিলেন তীক্ষ্ণতর শ্লেষ ও ব্যঙ্গভরা উক্তি, "এ যেন সেই রকম কথাই হ'লো,—আমি তো আছি নিজের ভাসুরকে নিয়ে, তাইতেই লজ্জায় মরি, অন্য মাগীরা পরপুরুষ নিয়ে থাকে কি করে লো?"

তরুণ ভক্তদের তুমুল হাস্যরোলে সারা ঘর মুখর হইয়া উঠে। কিন্তু হাসি ও ব্যঙ্গোক্তির অন্তরালে যে তীক্ষ্ণ শায়ক ঠাকুর সেদিন নিক্ষেপ করেন তাহা প্রবিষ্ট হয় সাধনপ্রয়াসী সকল ভক্তদেরই মর্ম্মমূলে।

পূর্ব্বপশ্চাৎ ভাবিতে গেলে যে ঈশ্বরপ্রেমের স্রোতে ঝাঁপ দেওয়া যায় না, এ সার কথাটি তাঁহারা আর কখনো বিস্মৃত হন নাই।

আবার এই রঙ্গ-উচ্ছল আপনভোলা মহাপুরুষের দেখা যায় আর এক কঠোর রূপ। কঠিন শাসন ও নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়া শিষ্যদের তিনি দিনের পর দিন গড়িয়া তোলেন। ত্যাগ তিতিক্ষা ও ধ্যান জপের মধ্য দিয়া তাঁহাদের অধ্যাত্মসাধনাকে করিয়া তোলেন কেন্দ্রীভূত। তীক্ষ্ণ সজাগ নয়ন দুইটি নিরন্তর ভক্ত শিষ্যদের পাহারা দিয়া চলে। কোন ক্ষুদ্রতম ত্রুটিবিচ্যুতি, কোন ফাঁকি তাঁহার এ শ্যেন দৃষ্টিকে এড়াইয়া যাইতে পারে না।

রাখাল মহারাজ ঠাকুরের মানসপুত্র। স্নেহ ও আদর দিয়া সদাই ঠাকুর তাঁহাকে ঘিরিয়া রাখেন। হঠাৎ একদিন রহস্যচ্ছলে কোন সঙ্গীর কাছে রাখাল মিথ্যা কথা বলিয়াছেন। বলা বাহুল্য অন্তর্য্যামী ঠাকুরের কাছে এ তথ্যটি অজানা রহে নাই। দোষ যত নগণ্যই হোক্ ভক্তের কল্যাণের জন্য উহা সংশোধন করিতেই হইবে! রাখালকে তিনি চাপিয়া ধরিলেন। কঠোর স্বরে কহিলেন, "ওরে, তোর মুখ ওরকম দেখছি কেন? নিশ্চয় তুই আজ মিছে কথা বলেছিস্।"

দোষ স্বীকার করিয়া তবে রাখাল নিষ্কৃতি পান।

ভাতের সহিত একটু বেশী পরিমাণ ঘি খাওয়া ভক্ত নিরঞ্জনের চিরকালের অভ্যাস। নতুবা ভোজনে তাঁহার তৃপ্তি হয় না। ব্যাপারটি নিতান্ত তুচ্ছ। কিন্তু রামকৃষ্ণ ইহা নিয়াই এক তুমুলকাণ্ড বাধাইয়া বসিলেন। নিরঞ্জন সেদিন কেবলমাত্র ভাতের থালাটি নিয়া খাইতে বসিয়াছেন, চটি ঠক্ ঠক্ করিয়া দ্রুতপদে ঠাকুর আসিয়া উপস্থিত। উত্তেজিত স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "অ্যা! অত ঘি খাওয়া! শেষকালে কি তুই লোকের ঝি বউ বার করবি?"

নিরঞ্জন সৎ ও শুদ্ধাচারী সাধক। তাই বিশেষ করিয়া এ মন্তব্যে বড় মর্ম্মাহত হইলেন। কিন্তু ঠাকুরের তিরস্কারে মিতাচার ও কৃচ্ছ্র-সাধনের আদর্শটি চিরতরে তাঁহার মনে গাঁথা হইয়া গেল।

শিষ্যদের অধ্যাত্ম-রূপান্তরের ক্ষেত্রে ঠাকুরের মধ্যে ফুটিয়া উঠিত লোকোত্তর রূপ! সেখানে তিনি মহাশক্তিধর আচার্য্য সদ্‌গুরুসত্তার মহিমময় প্রকাশ তাঁহার মধ্যে। শিষ্যদের জীবনতরীর তিনি কাণ্ডারী। অবলীলায় এই তরীকে পৌঁছাইয়া দিতেছেন ওপারে।

অতীন্দ্রিয় রাজ্যের চাবিকাঠিটি রহিয়াছে তাঁহার হস্তে। শুধু কথায় ও স্পর্শে শক্তি সঞ্চারিত হইতেছে; শিষ্যদের জীবনে আসিতেছে নব নব অধ্যাত্ম-অনুভূতি। শুধু দৃষ্টিসম্পাতে ও পদাঙ্গুষ্ঠের ছোঁয়ায় ঘটিতেছে মানুষের নবজন্ম।

রাখাল তখন খুব কঠোর সাধনা করিতেছেন। কিন্তু তাঁহার মনে বড় দুঃখ, অলৌকিক দর্শন কিছু হইতেছে না। ঠাকুরকে মাঝে মাঝেই এজন্য অনুযোগ দিতে থাকেন। অবশেষে তাঁহার কৃপা হইল, কহিলেন, "আচ্ছা, যা—মা তোকে কিছু দেখাবেন।"

সেই দিনই এক কাণ্ড ঘটিল। রাখাল মহারাজ মন্দিরে বসিয়া ধ্যান করিতেছেন। সম্মুখে দেখিলেন এক দিব্য জ্যোতির স্রোতধারা। শুধু তাহাই নয়, এই স্রোত তাঁহারই দিকে ধাইয়া আসিতেছে। নবীন সাধক বড় ঘাবড়াইয়া যান, ছুটিয়া মন্দির হইতে বাহির হন ও ঠাকুরের কাছে আসিয়া বসিয়া পড়েন।

অন্তর্য্যামী গুরু সবই জানেন। হাসিয়া হাসিয়া কহিতে লাগিলেন, "ওরে, ঝট্‌পট্ দর্শন-টর্শন চাইবি, আবার পালিয়েও আসবি। তা হলে কি করে হবে, বল্ তো?"

আরো কিছুদিন পরের কথা। একনিষ্ঠ কঠোর সাধন ভজনের ফলে রাখাল মহারাজের মধ্যে কিছু কিছু অলৌকিক বিভূতি স্ফুরিত হইয়া উঠিতেছে। মানুষের মনের অভ্যন্তর তিনি অনায়াসে দেখিতে পান। নূতন সাধক—তাই মাঝে মাঝে এসব দেখার জন্য কিছুটা ইচ্ছা মনে জাগে। অচিরেই ঠাকুর এ ইচ্ছার মূলোৎপাটন করিলেন।

রাখালকে ডাকাইয়া আনিলেন। তারপর তীব্র ভাষায় তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া কহিলেন, "ওরে, তোর এমন হীন বুদ্ধি কেন রে?

কোথায় শুদ্ধাভক্তি নিয়ে সাধন-ভজনে থাকবি, তা না অষ্টসিদ্ধির দিকে মন দিচ্ছিস্।"

প্রথম সাক্ষাতের মাসখানেক পরে নরেন দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন। অস্ফুটস্বরে কি বলিতে বলিতে ঠাকুর দক্ষিণ পদদ্বারা তাঁহাকে স্পর্শ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে নরেনের সম্মুখে খুলিয়া গেল এক অপূর্ব্ব অলৌকিক অভিজ্ঞতার দ্বার।

দেখিলেন, কক্ষের সব কিছু বেগে ঘূর্ণমান হইয়া নিঃসীম আকাশে মিশিয়া গেল। তাঁহার আমিত্ব বোধও তখন লোপ পাইবার পথে। মহাশূন্যের সহিত সমস্ত কিছু অস্তিত্ব যেন একাকার হইতে চলিয়াছে। আমিত্বের বিলয়ের সঙ্গে সঙ্গে ঘটিতেছে সর্ব্ববিলুপ্তি! সর্ব্বগ্রাসী মৃত্যু তাঁহার কাছে আগাইয়া আসিতেছে।

নরেন চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "ওগো, তুমি আমার এ কি করলে? আমার যে মা ভাই সব রয়েছে, দায়িত্ব রয়েছে।"

স্মিতহাস্যে ঠাকুর কহিলেন, "আচ্ছা তবে এখন থাক্। একবারে কাজ নেই, কালে হবে।"

অতঃপর নরেনের রূপান্তর সাধনে দেরী লাগে নাই। ঠাকুর তাঁহার ঐশী লীলার প্রধান পরিকরকে, তাঁহার এই বাণীবাহককে পূর্ণাঙ্গ করিয়া গড়িয়া তুলেন। ভক্ত ও শিষ্যদের মধ্যে নরেন ফুটিয়া উঠেন তাঁহার 'সহস্রদল কমল'-রূপে, স্বামী বিবেকানন্দরূপে আধুনিক ভারতের প্রাণশক্তিকে তিনি উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলেন। প্রতীচীর দ্বারে এই মহাসাধক ভারতের শাশ্বতবাণী পৌঁছাইয়া দেন, গড়িয়া তোলেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যেকার মহামিলনের সেতু।

একজোড়া চটি পায়ে, কাপড়ের খুঁটটি গায়ে জড়াইয়া সাধারণ পূজারী বামুনের মতই চলাফেরা করেন রামকৃষ্ণ। বাহিরের লোকের চোখে নিরীহ ভক্ত মানুষটি। শুধু অন্তরঙ্গ শিষ্যেরা জানেন তাঁহার স্বরূপ। জানেন, তাঁহার কৃপা মুহূর্তে আনিয়া দেয় উচ্চতর অধ্যাত্ম-উপলব্ধি, সাধক জীবনের বৃন্তে অবলীলায় ফোটায় বর্ণাঢ্য পুষ্পদল।

সাধনরত তারকের বুকে রামকৃষ্ণ সেদিন পদ স্পর্শ করেন। সঙ্গে সঙ্গে ঘটে এক বিস্ময়কর কাণ্ড! তরুণ ভক্ত ভাবসমাধিতে মগ্ন হইয়া যান। বাহ্যজ্ঞান পাইয়া দেখেন, ঠাকুর তাঁহার মাথায় হাত বুলাইতেছেন আর অস্ফুটস্বরে কহিতেছেন, "মা নেমে এসো, নেমে এসো।"

ঠাকুর আর তাঁহার মায়ের এ কৃপালীলা দেখিয়া ভক্ত শিষ্যেরা বিস্ময়-মুগ্ধ নেত্রে চাহিয়া থাকে।

ভক্ত কালী তখন একাগ্রমনে সাধনা করিয়া চলিয়াছেন। ধ্যানে বসিয়া ইষ্ট ও দেবদেবীর কত চিন্ময়মূর্ত্তি দর্শন করেন, ঠাকুরকে প্রায়ই এসব অভিজ্ঞতার কথা জানাইতেও থাকেন। পরম আনন্দে দিন কাটিতেছে। হঠাৎ ঠাকুর একদিন বলিয়া দিলেন, "ওরে তোর এসব দর্শন-টর্শন আর হবে না।"

সেদিন হইতে ঘটিলও সেইরূপ। নবীন সাধক ইহার পর হইতে আর কোন চিন্ময়মূর্ত্তি দেখেন না। শক্তিধর ঠাকুরের নির্দ্দেশে বশংবদের মত সেগুলি কোথায় সরিয়া পড়িয়াছে।

জ্ঞানপন্থী তরুণ শিষ্যের সাধনা ও সিদ্ধির পথে এই ব্যবস্থাই ঠাকুর সেদিন কল্যাণকর মনে করিয়াছিলেন।

বিশাল ও বিচিত্র এই রামকৃষ্ণরূপী সদ্‌গুরুসত্তার মহাসমুদ্র! ভক্ত ও শিষ্যদের পক্ষে ইহার কূল-কিনারা পাওয়া সম্ভব ছিল না।

সেদিন এক গৃহী ভক্ত দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া লাটু মহারাজকে একজোড়া নূতন চটি দিয়া যান। দুর্ভাগ্যক্রমে ঐ দিনই উহার একপাটি কোথায় হারাইয়া গেল। বাৎসল্য রসে ভরপুর ঠাকুর একথা শুনিয়া বড় দুঃখিত হইলেন। পরদিন প্রত্যুষে দেখা গেল, তিনি ঐ হারানো চটির পাটির জন্য বাগানে খোঁজাখুঁজি শুরু করিয়াছেন।

লাটু পড়িয়াছেন মহা বিপদে। কাতর কণ্ঠে তিনি অনুনয় করিতে লাগিলেন, "দোহাই আপুনার হামার চটির লিয়ে আপুনাকে এমন ঢুঁড়তে হবে না। হামার এতে পাপ হোবে।"

ঠাকুর কিন্তু নিরস্ত হইবার পাত্র নন। ঝোপঝাড়গুলি দেখিতেছেন, আর সখেদ বলিতেছেন, "তাই তো রে, নতুন জুতো জোড়া। মোটেই তোর ভোগে এলো না।"

লাটু মহারাজ অসহিষ্ণু হইয়া বলিলেন, "রাম রাম, হামার জুতোর জন্যে আপুনি এতো কষ্টো কেনো করছেন। হামার দিনটাই আজ একেবারে খারাপ যাবে।"

ঠাকুর উত্তরে শুধু কহিলেন, "ওরে, দিন কি এতে খারাপ যায়? সেই দিনই খারাপ যাবে, যেদিন ভগবানের নাম নিবিনে।"

ভোরে তো এই জুতো-উদ্ধার পর্ব্ব! পুত্রপ্রতিম লাটুর জন্য কোমল-হৃদয় ঠাকুরের খেদের অন্ত নাই। আবার সন্ধ্যায় দেখি মুমুক্ষু সাধক শিষ্যের উদ্ধার পর্ব্ব। সেখানে ফুটিয়া উঠিয়াছে ব্রহ্মবিদ্ সদ্গুরুর এক শক্তিধর, মহিমোজ্জ্বল রূপ!

সে-দিন সায়াহ্নে লাটু মহারাজ ধ্যানে বসার পর চৈতন্য হারাইয়া ফেলেন। চোখ দুইটি শিবনেত্র, মুখ দিয়া কেবলি বাহির হইতে থাকে গোঁ-গোঁ শব্দ। সংবাদ শুনিয়াই ঠাকুর ছুটিয়া আসিলেন, নিজের হাঁটু দিয়া লাটুর বুকে ঘষিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল। লাটু ইতিউতি চাহিতেছেন। ঠাকুর বলিতে লাগিলেন, "তুই আজ মা-কালীকে দেখেছিস্, তাই না? চুপ কর্ শালা, চুপ কর্। নইলে এখনি চারিদিকে সোরগোল পড়ে যাবে।"

ঠাকুরের অপার করুণা আশ্রিত ভক্তদের উপর। কত আশা ও আশ্বাসের বাণীই না এই দেবমানবের কণ্ঠে সদাই উদ্গত হয়!

ভক্ত যোগীন সে-বার বিবাহ করিয়াছেন। মনে মনে তাঁহার মহা ভয়, ঠাকুর হয়তো এ দোষে তাঁহাকে ত্যাগই করিবেন। কামিনী কাঞ্চন ত্যাগের আদর্শ যিনি সর্ব্বত্র প্রচার করিয়া বেড়ান, শিষ্যের এ ত্রুটি কি তিনি সহজে ক্ষমা কবিবেন?

যোগীন ভয়ে ভয়ে দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীতে ঢুকিতে যাইতেছেন। দূর হইতে সবিস্ময়ে দেখিলেন, ঠাকুর পরনের কাপড়টি বগলে চাপিয়া

দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহারই জন্য তিনি অপেক্ষমান। ব্যস্ত সমস্ত হইয়া কহিলেন, "ওরে, আয় আয় ভয় কি? এখানকার আশীর্ব্বাদ থাকলে ওরকম একলাখ্ বিয়ে করলেও ক্ষতি হয় না।"

যোগীনের অন্তর হইতে দুশ্চিন্তার পাষাণভার নামিয়া গেল।

গিরিশ ঘোষ রামকৃষ্ণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভক্ত। নাট্যকার ও নটের অসামান্য প্রতিভা নিয়া তিনি জন্মিয়াছেন। মনীষা, ব্যক্তিত্ব ও ক্ষুরধার বুদ্ধির দিক দিয়া তিনি অতুলনীয়, কখনো কাহারো কাছে মাথা নোয়ান না। কিন্তু ঘোর মাতাল ও দুরন্ত তিনি।

এই গিরিশ দক্ষিণেশ্বরে গিয়া ঠাকুরের সম্মুখে মাতলামি করিয়াছেন, এক এক সময়ে বেসামাল হইয়া তাঁহার পিতৃপুরুষকে গালিগালাজ করিতেও ছাড়েন নাই। ঠাকুর কিন্তু করুণার মূর্ত্ত বিগ্রহ। অসামান্য ধৈর্য্য নিয়া এই দুর্দ্দান্ত ভক্তের পরিবর্ত্তনের জন্য প্রতীক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার নটবৃত্তি, মদ্যপান কোন কিছুতেই বাধা দেন নাই। অপার করুণারাশি তাঁহার নয়ন হইতে সতত ঝরিয়া পড়িয়াছে। কেহ কখনো গিরিশের মদ খাওয়া বন্ধ করার জন্য ঠাকুরকে অনুরোধ জানাইলে তিনি শুধু কহিয়াছেন, "খাক্ না শালা, ক'দিন খাবে!"

এ করুণা, এ হৃদয়বত্তার তুলনা কই? গিরিশের কাছে ইহাই হইল ঠাকুরের ভগবত্তার প্রমাণ। ঠাকুরকে তিনি বিশ্বাস করিলেন ভগবান বলিয়া। তারপর একদিন ঠাকুরেরই প্রেরণায় তাঁহাকে বকল্মা দিলেন, চরণে করিলেন আত্মসমর্পণ।

কিন্তু গিরিশের এ ভক্তি বিশ্বাস সব সময়ে তো স্থির থাকে না! যুক্তিবাদী মনে মাঝে মাঝে সন্দেহ জাগিয়া উঠে, ঠাকুরকে বাজাইয়া নিতে উৎসুক হন।

সেদিন এক অভিনেত্রীর বাড়ীতে গিরিশের নিমন্ত্রণ। পান-ভোজনে অনেক রাত হইয়া গিয়াছে। অভিনেত্রীটি সে রাত্রির জন্য তাঁহাকে সেখানেই থাকিয়া যাইতে বলিল। গিরিশ সাধারণতঃ অন্যত্র রাত্রিবাস

করেন না। এই দিন এক দুষ্টবুদ্ধি তাঁহার মাথায় জাগিল। ভাবিলেন, দেখাই যাক্ না, এ প্রলোভনের স্থানে ঠাকুর তাঁহাকে রক্ষা করেন কিনা। গৃহকর্ত্রীর অনুরোধে রাজী হইয়া পড়িলেন।

এদিকে রাত্রি যত গভীর হইতেছে, গিরিশ ততই তাঁহার শরীরে বোধ করিতেছেন এক তীব্র জ্বালা। এ জ্বালা ক্রমে অসহ্য হইয়া উঠিল। এ গৃহে তিনি আর এক মুহূর্ত্ত টিঁকিতে পারিতেছেন না। অভিনেত্রীটিকে কহিলেন, "ওগো, বাড়ীতে যে চাবির গোছাটা ফেলে এসেছি। হারিয়ে গেলে মহাবিপদ! আর তো আমি এখানে থাকতে পাচ্ছিনে।"

বাড়ীতে ফিরিয়া ঘুম আর হয় নাই। প্রত্যূষে উঠিয়াই দক্ষিণেশ্বরে গিয়া উপস্থিত হন। কাতরকণ্ঠে রামকৃষ্ণকে প্রশ্ন করেন, "ঠাকুর, কেন কাল আমি এমন সঙ্কটে পড়লাম? বলুন, তবে কি আপনি আমার বকল্মা নেননি—আমায় গ্রহণ করেননি? আবার কি আমায় সেই অধঃপতনের পথেই নেমে যেতে হবে?"

ঠাকুর এতক্ষণ গিরিশের কথা শুনিতেছেন আর মুচকি মুচকি হাসিতেছেন। এবার দৃঢ়স্বরে কহিলেন, "সেটি আর কখনো হবে না। শালা, তুই কি ভেবেছিস্, তোকে ঢ্যাম্না সাপে ধরেছে যে পালিয়ে যাবি? তা নয়রে, তা নয়। এ যে জাত সাপের ধরা। তিন ডাকেই চুপ করতে হবে। কোন রকমে পালিয়ে গেলেও বাসায় গিয়ে মরে থাকতে হবে।"

সত্যই তাই। ঠাকুরের সর্ব্ববিস্তারী কৃপার কবল হইতে গিরিশ সারা জীবনে আর ছাড়া পান নাই। জীবন তাঁহার রামকৃষ্ণময় হইয়া উঠে। মদের নেশা ও অহঙ্কারের স্থান সঙ্কুলান আর সেখানে হয় নাই।

বাহিরের লোকের কাছে ঠাকুর বড় প্রচ্ছন্ন থাকেন, যেন নিতান্ত এক সাধারণ ভক্ত সাধক তিনি। কিন্তু স্থান-কাল-পাত্র ভেদে দেখা যায় তাঁহার শক্তির প্রকাশ!

সে-বার পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি রামকৃষ্ণকে দর্শন করিতে

আসিতেছেন। এদিকে তাঁহার পাণ্ডিত্য ও বক্তৃতাশক্তির কথা শুনিয়া বালকস্বভাব ঠাকুর তো ভয়েই অস্থির। এদিনকার দৃশ্যটি বড় কৌতুকাবহ! ঠাকুর নিজেই ইহার বর্ণনা দিতে গিয়া বলিয়াছেন, "দেখ্‌ছোই তো, এখানে ওসব লেখাপড়া-টড়া কিছু নেই। মুখ্যু-শুখ্যু মানুষ। পণ্ডিত দেখা করতে আসবে শুনে বড় ভয় হ'লো। এই তো দেখ্‌ছো, পরনের কাপড়েরই হুঁশ থাকে না। কি বলতে কি বলবো, ভেবে একেবারে জড়োসড়ো হলুম।

"মাকে বললুম, দেখিস্ মা, আমি তো তোকে ছাড়া শাস্তর-মাস্তর কিছুই জানিনে। দেখিস্।

"তারপর একে বলি—'তুই তখন থাকিস্'। ওকে বলি—'তুই আসিস্, তোদের সব দেখলে তবু ভরসা হবে'।

"পণ্ডিত যখন এসে বসলো, তখনো ভয় রয়েছে। চুপ করে বসে তার দিকেই দেখছি, তার কথাই শুনছি। এমন সময় দেখছি কি, যেন তার ভেতরটা মা দেখিয়ে দিচ্ছে—শাস্তর-মাস্তর পড়লে কি হবে, বিবেক বৈরাগ্য না হ'লে ওসব কিছুই নয়! তার পরেই সড়-সড় করে একটা কি এই শরীরের ওপরের দিকে, মাথায় উঠে গেল। ভয়-ডর সব কোথায় চলে গেল। একেবারে বিব্‌ভুল হয়ে গেলুম! মনে হতে লাগল, মুখ উঁচু হয়ে গিয়ে তার ভেতর থেকে যেন কথার ফোয়ারা বেরুচ্ছে। আর যত বেরুচ্ছে, তত ভেতর থেকে কে যেন ঠেলে ঠেলে যোগান দিচ্ছে। কামারপুকুরে ধান মাপবার সময় যেমন রামে রাম, দুইয়ে দুই ব'লে মাপে, আর একজন তার পেছনে বসে ধানের রাশ ঠেলে দেয়, সেই রকম। কিন্তু কি যে সব বলেছি, তা কিছুই জানিনে। যখন একটু হুঁশ হ'লো, তখন দেখছি কি, পণ্ডিত কাঁদছে, একেবারে ভিজে গেছে। ঐ রকম একটা অবস্থা মাঝে মাঝে হয়।"

আর এক দিনের অনুরূপ ঘটনার কথাও তাঁহার নিজের মুখে মাঝে মাঝে শুনা যাইত—

"কেশব সেদিন খবর পাঠালে, জাহাজে করে গঙ্গায় বেড়াতে নিয়ে

যাবে, একজন সাহেবকে (ভারত ভ্রমণে আগত পাদ্‌রী কুক্ সাহেব) সঙ্গে নিয়ে আসছে। সেদিনও ভয়ে কেবলই ঝাউতলার দিকে শৌচে যাচ্ছি! তারপর যখন তারা এলো আর জাহাজে উঠলুম, তখন এই রকমটা হয়ে গিয়েছিল! আর কত কি বলেছিলুম। পরে সবাই বললে খুব উপদেশ নাকি দিয়েছিলুম। আমি কিন্তু বাবু কিছুই জানিনি।”

নরেন হইতেছেন ঠাকুরের শুদ্ধসত্ত্ব, বৈরাগ্যবান শিষ্যদের মধ্যমণি। প্রথম হইতেই ঠাকুর তাঁহাকে চিহ্নিত করিয়া নিয়াছেন তাঁহার প্রধান পরিকররূপে। নরেনের ত্যাগ বৈরাগ্য আর সহজাত জ্ঞানের প্রশংসায় ঠাকুর পঞ্চমুখ। একদিন সোৎসাহে বলিয়া ফেলিলেন, “দেখলাম, কেশবের ভেতর একটা শক্তি, যার ফলে সে জগৎবিখ্যাত হয়েছে, আর নরেনের ভেতর রয়েছে সে রকম আঠারোটা শক্তি।”

আবার কখনো বা সকলের বিস্ময়ের উদ্রেক করিয়া ঠাকুর নরেন সম্বন্ধে কহেন, “ও জ্ঞান খড়্গ সহায়ে মায়াময় সব বন্ধনকে খণ্ডবিখণ্ড করে ফেলছে। মহামায়া তাই-তো ওকে নিজের আয়ত্তে সহজে আনতে পারছে না।”

এক একদিন ঠাকুর বলিয়া বসেন, “নরেন খাপ্‌খোলা তলোয়ার। ও অখণ্ডের ঘর, ধ্যানসিদ্ধ ঋষি।”

শক্তিমান সাধক নরেনকে ঠাকুর তাঁহার ভালবাসার বাঁধনে বাঁধিয়া ফেলেন। আবার ঠাকুরের মধ্যে যে ঐশ্বরীয় ভাব, ভাগবত শক্তির প্রকাশ ঘটিয়াছে, তাহা বুঝিয়া নিতে নরেনেরও বেশী দেরী হয় নাই।

দিনের পর দিন তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন দক্ষিণেশ্বরের এই পাগলা বামুনের অলৌকিকত্ব। উপলব্ধি করিয়াছেন তাঁহার মাহাত্ম্য। তাঁহার হাতেই যে রহিয়াছে অধ্যাত্মশক্তির স্পর্শমণি! সামান্যতম কৃপাসম্পাতে এই মহামানব মানুষের পরমপ্রাপ্তি ঘটাইয়া দিতে পারেন।

ঠাকুরের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে থাকিয়া নরেন তাঁহার সাধননির্দ্দেশ গ্রহণ

করিতেছেন, উচ্চতর অনুভূতি ও উপলব্ধির দ্বার উন্মোচিত হইতেছে দিনের পর দিন। অধ্যাত্মজীবন হইয়া উঠিতেছে পূর্ণতর।

কঠোরতপা নরেনকে ঠাকুর একদিন ডাকিয়া কহিলেন, "আচ্ছা ঠিক করে বল্ দেখি, তুই কি চাস্।"

উত্তর হইল, "আমার ইচ্ছে হয়, শুকদেবের মত একেবারে পাঁচ ছয় দিন সমাধিতে ডুবে থাকি। তারপর শুধু শরীর রক্ষার জন্য খানিকটা নীচে নেমে এসে, আবার সমাধিতে চলে যাই।"

"ছি! ছি! তুই এত বড় আধার। তোর মুখে এই কথা? আমি ভেবেছিলাম, তুই বটগাছের মত হবি, তোর ছায়ায় হাজার হাজার লোক আশ্রয় পাবে, তা না হয়ে তুই কিনা নিজে মুক্তি চাস্? এতো তুচ্ছ কথা অতি হীন কথা রে! না না, অত ছোট নজর করিস্‌নি।"

আর একদিন নরেনের সমাধি ও উচ্চতম অধ্যাত্ম-উপলব্ধির শেষে ঠাকুর তাঁহাকে ডাকাইয়া আনেন। বলেন, "কেমন রে। মা তো আজ তোকে সব দেখিয়ে দিলেন। চাবী কিন্তু আমার হাতে রইল। এখন তোকে কাজ করতে হবে। যখন আমার এই কাজ শেষ হয়ে যাবে, তখন আবার চাবী খুলে দেব।"

রামকৃষ্ণমণ্ডলীর নেতৃত্ব আর ঐশ্বরীয় কর্ম্মের দায়িত্বভার নিবার যোগ্য করিয়া ঠাকুর তাঁহাকে গড়িয়া তোলেন, কর্ম্মময় মহাজীবনের শেষ অঙ্কে সেদিনকার কথিত চাবীটিও তিনিই খুলিয়া দেন।

১৮৮৫ সাল। রামকৃষ্ণের লীলাময় জীবনদীপ এবার নির্ব্বাণোন্মুখ হইয়া উঠে। মারাত্মক ক্যান্সার রোগে তিনি আক্রান্ত হন। ভক্তদের জীবনে নামিয়া আসে বিষাদের অন্ধকার।

প্রথমে কলিকাতায় কিছুদিন ঠাকুরের চিকিৎসা করানো হয়। তারপর তাঁহাকে আনা হয় কাশীপুরে। আসন্ন গুরুবিচ্ছেদের শোক-চ্ছায়ায় ভক্তদের মধ্যে গড়িয়া উঠে এক অচ্ছেদ্য প্রাণের বন্ধন। উত্তর-কালের রামকৃষ্ণমণ্ডলীর সূচনা হয় সেদিনকার এ যোগসূত্রের মধ্য দিয়া।

ঠাকুর এখন যেন হইয়া উঠিয়াছেন এক স্পর্শমণি। কৃপাভরে যাহাকেই কাছে টানিতেছেন সে-ই হইতেছে নূতন মানুষ।

এ সময়ে রোগশয্যায় থাকার কালে তাঁহার দেহে এক অপূর্ব্ব, অলৌকিক শক্তির স্ফুরণ হইতে থাকে। এ সম্পর্কে নিজেই ভক্তদের তিনি বলিতেন, "মা দেখিয়ে দিচ্ছে—এ শরীরের ভেতর এখন এমন একটা শক্তি এসেছে যে, এখন আর কাউকে ছুঁয়ে দিতেও হবে না। তোদের বলবো ছুঁয়ে দিতে, তোরা দিবি, তাতেই অপরের চৈতন্য হবে।"

দক্ষিণেশ্বরে ও কাশীপুরে দেখা যায়, ঠাকুর দিনের পর দিন কত গল্প করিতেছেন, ভক্তোপদেশ দিতেছেন। ব্রহ্মবিদ্ পুরুষের অমৃতময় বাণী শুনিয়া ভক্ত ও দর্শনার্থীদের মন তৃপ্তি ও আনন্দে ভরিয়া উঠিতেছে। জটিল দুরূহ দার্শনিক প্রশ্নের মীমাংসা তিনি অবলীলায় করিয়া দেন, সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন হইতে তুলিয়া ধরেন কত উদাহরণ। সত্যের সহজ সরল ব্যাখ্যানে লোকে অনুপ্রাণিত হয়। কল্যাণ ও আনন্দের সঞ্চয় নিয়া ভক্ত ও দর্শনার্থীরা ঘরে ফিরে।

ঠাকুরের এক ভক্ত সেদিন জিজ্ঞাসা করেন, "আচ্ছা ঠাকুর, ভগবান সাকার না নিরাকার?"

উত্তর হয়, "ওরে, তিনি সাকারও বটে, আবার নিরাকারও বটে; আবার তাছাড়া আরো কি, তা কে জানে? সাকার কেমন জানিস্? —যেমন জল আর বরফ। জল জমেই বরফ হয়, আবার এই বরফের ভেতর বাইরে জল। বরফ জল ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু ভ্যাখ্, জলের রূপ নেই—অর্থাৎ তার একটা বিশেষ কোন আকার নেই। কিন্তু বরফের আকার আছে। তেমনি ভক্তি হিমে অখণ্ড সচ্চিদানন্দ সাগরের জল জমে বরফের মত নানা আকার ধারণ করে।"

সাকার আর নিরাকার-এর বহু বিতর্কিত প্রশ্নের এ এক সহজ মীমাংসা, অপরূপ ব্যাখ্যান।

ভক্তদের কাছে পরম তত্ত্বের আভাস দিতে গিয়া এক এক দিন

ঠাকুর বলিতেন, "ওরে, সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম কি সহজ কথা? রাম, কৃষ্ণ এ সব অবতার তাতে কত থরে থরে ফুটে রয়েছে।"

সেদিন ভক্তপরিবৃত হইয়া ঠাকুর বসিয়া আছেন। প্রসঙ্গক্রমে 'সর্ব্বজীবে দয়া' এই কথাটি তাঁহার কাণে গেল। অমনি সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। ক্রমে অর্দ্ধবাহ্যাবস্থা ফিরিয়া আসিল। তখন আপন মনে কহিতে লাগিলেন, "জীবে দয়া—জীবে দয়া? দূর শালা। কীটানুকীট তুই! জীবকে আবার দয়া কি করবি? দয়া করবার তুই কে? না-না জীবে দয়া নয়—শিব জ্ঞানে জীবের সেবা।"

নরেন্দ্রনাথ সেদিন রামকৃষ্ণের এ কথা কয়টি শুনিতে শুনিতে অভিভূত হইয়া গেলেন। এ যে বেদান্তের প্রজ্ঞানময় ভাষ্য!

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কহিলেন, "কি অদ্ভুত আলোকই আজ ঠাকুরের এই কথায় পেলাম। বেদান্তজ্ঞান শুষ্ক, কঠোর বলেই আমরা জানি। ভক্তির মিশ্রণ ঘটিয়ে ঠাকুর এ বেদান্তকে কি সরস্, কি মধুর করে তুললেন। ঠাকুর যা বল্‌লেন, তাতে বোঝা গেল, বনের বেদান্তকে ঘরে আনা যায়। সংসারে সব কাজে তা অবলম্বন করা যায়।"

সত্যোপলব্ধির পথে মহাসাধক রামকৃষ্ণ ভক্তি, শক্তি ও জ্ঞানের ঘটান এক অপরূপ মিশ্রণ, আশ্রিত ভক্তদের হৃদয়ে গাঁথিয়া দেন তাঁহার পরম তত্ত্ব। হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টানের ভিন্নপন্থী সাধনা যে একই পরম প্রাপ্তির সাগরে গিয়া বিলীন হয় এ সত্য তাঁহার নিজ জীবনে প্রতিফলিত হয়। যুগাচার্য্যের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া ঠাকুর ধ্বনিত করেন আধুনিক যুগের মহাসমন্বয়-বাণী—'যত মত তত পথ'।

শিষ্যদের সাধনা ও সিদ্ধির স্তরগুলিতে অহংবোধ যাহাতে মাথা উঁচাইয়া না দাঁড়ায় সেদিকে সদাই ঠাকুরের সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। এসম্পর্কে একদিন তাহাদিগকে সাবধান করিয়া কহিলেন—

"অনেকের ইচ্ছে হয়—গুরুগিরি করি, পাঁচজনে গণে মানে, শিষ্য সেবক হয়, লোকে বলবে, গুরুচরণের ভাইয়ের আজকাল বেশ সময়, কত লোক আসছে যাচ্ছে, শিষ্য সেবক অনেক হয়েছে, ঘরে জিনিষপত্র

থৈ থৈ কচ্ছে। এ গুরুগিরিও বেশ্যাগিরির মত! ছার টাকাকড়ি, লোকমান্য হওয়া, শরীরের সেবা, এই সবের জন্যে আপনাকে বিক্রি করা! যে শরীর মন আত্মার দ্বারা ঈশ্বরকে লাভ করা যায়, সেই শরীর মন আত্মাকে সামান্য জিনিষের জন্য এরূপ করে রাখা ভাল নয়। একজন বলেছিল, সাবির এখন খুব সময়, এখন তার বেশ হয়েছে, একখানা ঘরভাড়া নিয়েছে, ঘুঁটেতে গোবরে, তক্তপোষ, দুখানা বাসন হয়েছে, বিছানা মাদুর তাকিয়া, কতলোক বশীভূত, যাচ্ছে আসছে, অর্থাৎ, সাবি এখন বেশ্যা হয়েছে, তাই তার সুখ ধরে না। আগে সে ভদ্রলোকের বাড়ী দাসী ছিল, এখন বেশ্যা হয়েছে। সামান্য জিনিষের জন্য নিজের সর্ব্বনাশ!"

এই ধরণের তীক্ষ্ণ শ্লেষাত্মক কথা শোনার পর ভক্ত শ্রোতাদের অন্তর হইতে গুরুগিরির ক্ষীণতম ইচ্ছাটুকুও নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইত।

শুধু নানা উপদেশ ও তত্ত্বের ব্যাখ্যাই ভক্তেরা ঠাকুরের মুখে শুনে নাই, সেই তত্ত্বকে তাঁহার মধ্যে স্ফুরিত হইতে দেখিয়াছে। তত্ত্বের বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে তৎ-এর মহনীয় রূপের আভা তাঁহার ভাগবতী তনুতে বিলসিত হইতে দেখিয়া দিনের দিন সকলে ধন্য হইয়াছে।

এ সময়ে প্রায়ই নিজের আধ্যাত্মিক অবস্থার কথা বলিতে গিয়া ঠাকুর শিষ্যদের কহিতেন, "দ্যাখ্ এখানকার মনের স্বাভাবিক গতিই ঊর্দ্ধদিকে। সমাধি হলে আর তা নামতে চায় না। তোদের জন্য জোর করে নামিয়ে আনি। নামতে নামতে হয়তো আবার সেই ওপরের দিকে চোঁচা দৌড়লো।"

গলরোগের চিকিৎসা করার জন্য ঠাকুরকে তখন শ্যামপুকুরে আনিয়া রাখা হইয়াছে। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এসময়ে একদিন তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আসেন। কিছুদিন পূর্ব্বে ঢাকায় থাকিতে ঠাকুর সম্পর্কে গোঁসাইজীর এক অলৌকিক অভিজ্ঞতা হয়। ঠাকুর ও ভক্তদের কাছে বসিয়া সেই কাহিনীটিই তিনি বলিলেন।—

কক্ষদ্বার বন্ধ করিয়া গোঁসাইজী ভগবৎ-চিন্তা করিতেছিলেন। হঠাৎ

দেখিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ সশরীরে তাঁহার সম্মুখে বসিয়া আছেন। একি অবিশ্বাস্য কাণ্ড! কলিকাতা হইতে ঢাকার গেণ্ডারিয়া আশ্রমে তিনি কি করিয়া এভাবে এখানে উপস্থিত হইলেন? দৃষ্টিভ্রম নয় তো?

ঠাকুর কি সূক্ষ্মদেহে আসিয়াছেন, না—একেবারে স্থূল দেহেই আবির্ভূত? পরখ করা দরকার। সম্মুখস্থ মূর্ত্তির হাত পা গোঁসাইজী বহুক্ষণ টিপিয়া দেখিলেন। সত্যই যে ইহা শ্রীরামকৃষ্ণের সজীব দেহ। ঠাকুর তাঁহার সম্মুখে বসিয়া কেবলি মিটি মিটি হাসিতেছেন।

ক্ষণপরেই এ মূর্ত্তি অন্তর্হিত হইয়া গেল।

ঠাকুরকে দেখাইয়া বিজয়কৃষ্ণ ভক্তদের কহিতে লাগিলেন, "দেশ বিদেশ, পাহাড় পর্ব্বত ঘুরে ফিরে অনেক সাধু মহাত্মা দেখেছি কিন্তু এমনটি আর কোথাও দেখলাম না। এখানে যে ভাবের পূর্ণ প্রকাশ দেখছি, কোথাও তার দু আনা, কোথাও এক আনা, কোথাও এক পাই আধ পাই মাত্র। চার আনাও কোন জায়গায় দেখলাম না।"

ভক্তদের দিকে তাহাইয়া ঠাকুর স্মিতহাসি হাসিতেছেন। হঠাৎ বালকের মত বলিয়া উঠিলেন, "বিজয় এসব বলে কি গো!"

গোঁসাইজী ছাড়িবার পাত্র নন। যে বস্তু তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, স্পর্শদ্বারা অনুভব করিয়াছেন রামকৃষ্ণ তাহা উড়াইয়া দিতে চাহিলে তিনি মানিবেন কেন?

আবার কহিলেন, "দেখুন, সে দিন ঢাকাতে আমি যেমনটি দেখেছি, তাতে আপনি 'না' বল্‌লে আমি আর শুন্‌ছিনে। অতি সহজ হয়েই তো আপনি যত গোল বাধিয়েছেন। ক'লকাতার পাশেই দক্ষিণেশ্বর। যখনই ইচ্ছে, এসে আপনাকে দর্শন করতে পারি। আসতে কোন কষ্টও নেই—নৌকা, গাড়ী সবই পাওয়া যায়। ঘরের পাশে এভাবে আপনাকে এত সহজে পাওয়া যায় বলেই আমরা আপনাকে বুঝলাম না। যদি কোন পাহাড়ের চূড়োয় বসে থাকতেন, আর পথ হেঁটে, অনাহারে গাছের শিকড় ধরে উঠে আপনার দর্শন পাওয়া যেত, তা হলে আমরা আপনার কদর করতাম। এখন মনে করি, ঘরের পাশেই যখন এই

রকম, তখন না জানি বাইরে দূর দূরান্তে আরো কত ভাল ভাল সব রয়েছে। এ জন্যেই আপনাকে ফেলে আমরা ছুটোছুটি করে মরি।"

অলৌকিক ভাব ও অলৌকিক শক্তির প্রকাশ ঠাকুর রামকৃষ্ণের জীবনে বারবার দেখা গিয়াছে। কিন্তু সাধনজীবনের এ বৈশিষ্ট্য, এ পরিচয় এই মহামানবের জীবনে কখনো মুখ্য হইয়া উঠে নাই। তাঁহার সবচেয়ে বড় পরিচয়—তিনি লোকগুরু, সার্থক সাধকজীবন গঠনের এক অসামান্য অধ্যাত্মশিল্পী।

স্বামী বিবেকানন্দ তাই বলিতেন, "মনের বাইরের জড় শক্তি-গুলোকে কোন উপায়ে আয়ত্ত করে কোন একটা অলৌকিক ব্যাপার সকলকে দেখানো বড় বেশী কথা নয়—কিন্তু এই যে পাগ্‌লা বামুন লোকের মনগুলোকে কাদার তালের মত হাতে নিয়ে ভাঙতো, পিটতো, গড়তো, স্পর্শমাত্রেই নূতন ছাঁচে ফেলে নূতন ভাবে পূর্ণ করতো, এর চাইতে আশ্চর্য্য ব্যাপার আমি আর কিছুই দেখিনে।"

ভক্ত বুড়োগোপাল সে-বার তীর্থ দর্শন করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার খুব ইচ্ছা, এ উপলক্ষে সাধু-সন্ন্যাসীদের ভোজন করান, বস্ত্রাদি দান করেন।

ঠাকুর তাঁহাকে কহিলেন, "ওরে কোথায় আবার সাধু খুঁজে বেড়াবি। এখানকার ছেলেরা সব বৈরাগ্যবান। এদেরই খাইয়ে দে, তাতেই তোর কাজ হবে।"

ভোজন ও দানের ব্যবস্থাদি সব কিছু ঠাকুরের নির্দ্দেশমত সম্পন্ন হইল। নিজেই তিনি তরুণ ভক্তদের হাতে তুলিয়া দিলেন গৈরিক বস্ত্র, একগাছা করিয়া মালা, আর কমণ্ডলু।

শিষ্যদের জীবনে আন্তর সন্ন্যাসেরই এক ধারাস্রোত ঠাকুর সেদিন উন্মুক্ত করিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন কিনা কে জানে?

১৮৮৬ সালের পহেলা জানুয়ারী। অপরাহ্ণ কাল। কয়েকদিন

ঘরে আবদ্ধ থাকার পর ঠাকুর সেদিন বাগানে বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন। ক্ষণপরেই গিরিশ ঘোষের সঙ্গে দেখা। প্রশ্ন করিলেন, "আচ্ছা গিরিশ, তুমি কি এখানে দেখেছ যে, অত কথা যাকে তাকে এমন করে বলে বেড়াও ?"

শ্রীরামকৃষ্ণের কথা বলিতে গেলেই গিরিশ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠেন, বলেন—তিনি অবতার। তাই ঠাকুরের এই প্রশ্ন।

গিরিশ তখনই ঠাকুরের পদতলে জানু পাতিয়া বসিলেন, করজোড়ে শুরু করিলেন তাঁহার স্তবস্তুতি।

ঠাকুরও তখন ভগবৎ-ভাবে বিভাবিত হইয়া উঠিয়াছেন। মুখমণ্ডল হইয়াছে দিব্যভাবে প্রদীপ্ত ! আর আবেগোচ্ছল গিরিশ 'জয়-রামকৃষ্ণ' বলিয়া ঘন ঘন হুঙ্কার ছাড়িতেছেন।

সেদিন অনেক গৃহীভক্ত কাশীপুরে আসিয়াছেন। ঠাকুরকে ঘিরিয়া তাঁহারা বারবার জয়ধ্বনি দিতে লাগিলেন।

ঠাকুর তখনও ভাবে মাতোয়ারা। সকলকে কহিলেন, "তোমাদের আর কি বলবো, তোমাদের সকলের চৈতন্য হোক।" সেদিন তিনি হইয়াছেন কল্পতরু ! এক একটি ভক্তের বক্ষ স্পর্শ করিতেছেন আর দিব্য ভাবাবেশে সে উদ্বেল হইয়া উঠিতেছে। লীলাময় ঠাকুরের স্পর্শে সেদিন এই গৃহী ভক্তদের সকলেরই প্রাণে আসে উদ্দীপনা, অতীন্দ্রিয় দর্শন ও অলৌকিক অনুভূতি লাভে সবাই বিহ্বল হয়।

ঠাকুরের ব্যাধি ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। ভক্ত ও শিষ্যদের মনে তাই দুশ্চিন্তার অবধি নাই। আপ্রাণ চেষ্টায় সকলে তাঁহার সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন।

সেদিন পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি ঠাকুরকে দেখিতে আসিয়াছেন। রোগযন্ত্রণায় ভুগিতে দেখিয়া পণ্ডিত কহিলেন, "আচ্ছা, আপনার মত লোক তো ইচ্ছেমাত্রই এ ব্যাধি দূর করে দিতে পারে। তা'হলে, একবার তা করলে হয় না ?"

ঠাকুর উত্তরে কহিলেন, "সে কি গো! তুমি পণ্ডিত হয়ে এ কথা কি করে বলছো? যে মন সচ্চিদানন্দকে দিয়েছি, তা সেখান থেকে তুলে এনে এ ভাঙা হাড়-মাংসের খাঁচাটায় রাখতে কি প্রবৃত্তি হয়?"

শশধর পণ্ডিত বিস্ফারিত নয়নে এ দেবমানবের দিকে চাহিয়া রহিলেন, মুখে কোন কথা সরিল না!

কিন্তু ভক্তদের এড়ানো দায়। নরেন ও অন্যান্য গুরুভাইরা দিনের পর দিন চাপ দিতে লাগিলেন, অন্ততঃ ভক্তদের জন্য ঠাকুরকে তাঁহার এ রোগ সারাইতেই হইবে। তিনি নিজে কিছু না করিতে চান, মাকে তো বলিতে পারেন!

অগত্যা ঠাকুরকে রাজী হইতে হইল। শিষ্যেরা সবাই ফলাফল জানিতে ব্যগ্র। নরেন্দ্র আসিয়া চাপিয়া ধরিলেন, "মাকে বলেছেন তো? কি জবাব পেলেন, বলুন।"

"ওরে, মাকে বললাম,—'মা, গলার এ ক্ষতের জন্য খেতে পারিনে, যাতে দুটি খেতে পারি, তাই করে দে।' তা মা তোদের সবাইকে দেখিয়ে দিয়ে বললেন—'কেন, এই যে এত মুখে খাচ্ছিস'!"

দেহাত্মবোধের উর্দ্ধে, অদ্বৈতজ্ঞানে যে মহাসাধক সদা অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন একথা ছাড়া জগন্মাতা আর তাঁহাকে কি-ই বা বলিবেন? ঠাকুরকে ভক্তগণ আর ব্যতিব্যস্ত করেন নাই।

অধ্যাত্মশিল্পী ঠাকুরের এক একটি অপরূপ সৃষ্টি এই তরুণ ভক্তেরা। ইহাদের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা তিনি করিয়াছেন, এবার প্রয়োজন প্রাণশক্তিকে কেন্দ্রীভূত করিয়া তোলা। এজন্য ঠাকুরের তৎপরতার অবধি নাই। সুযোগ পাইলেই নিবিড় করিয়া তাহাদিগকে কাছে টানেন, একাত্মক করিয়া তুলিতে যত্নবান হন। মাঝে মাঝে নিজ স্বরূপের আভাস ইঙ্গিতও প্রদান করেন।

সেদিন রোগশয্যায় শায়িত নিজের দেহটি আঙুলি সঙ্কেতে দেখাইয়া বলেন, "ওরে, যে রাম, যে কৃষ্ণ হয়েছিল, সে-ই ইদানীং এই খোল্‌টার ভেতর—তবে এবার গুপ্তভাবে আসা! যেমন রাজার ছদ্মবেশে নিজ

রাজ্য পরিদর্শন। যেমনি জানাজানি কানাকানি হয়, অমনি সে সেখান থেকে সরে পড়ে—সেই রকম !"

মহাপ্রস্থানের দিনটির আর দেরী নাই। ঠাকুর সেদিন নরেন্দ্রনাথকে নিজ কক্ষে ডাকিয়া আনিলেন। আর কেহ সেখানে উপস্থিত নাই। স্থির দৃষ্টিতে প্রিয়তম শিষ্যের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে তিনি সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। নরেন্দ্রনাথও ধীরে ধীরে হইলেন বাহ্যজ্ঞান বিরহিত। নিস্পন্দ হইয়া তিনি উপবিষ্ট।

জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে নরেন দেখিলেন, ঠাকুর তাঁহার দিকে চাহিয়া প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতেছেন। কিছুক্ষণ পরে সংক্ষেপে শুধু কহিলেন, "আজ তোকে সর্ব্বস্ব দিয়ে আমি ফকির হলাম। এই শক্তিতে তুই অনেক কাজ করবি। তারপর ফিরে যাবি।"

চিহ্নিত প্রতিনিধির মধ্যে ঘটিল শক্তি সঞ্চালন !

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই আগষ্ট। ঠাকুরের মরলীলা সেদিন শেষ দৃশ্যে আসিয়া পড়ে। মধ্যাহ্নের কিছু আগে যোগারূঢ় অবস্থায় মহাসাধক চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হন। যুগাচার্য্যের ভূমিকার শেষে মহাজীবনের উত্তরণ ঘটে জগন্মাতার অমৃতময় অঙ্কে।

প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

বাংলার ধর্ম্ম ও সমাজজীবনের এক সন্ধিক্ষণে গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণ আবির্ভূত হন। আপন সাধনা, সিদ্ধি ও আত্মিক আদর্শ প্রচারের মধ্য দিয়া সমকালীন সমাজ-বিবর্ত্তনকে তিনি প্রভাবিত করেন, বাংলায় ক্ষয়িষ্ণু ভক্তি-আন্দোলনে জাগাইয়া তোলেন নূতন প্রাণস্পন্দন। এই শক্তিধর মহাপুরুষের জীবন ও বাণীতে উদ্বুদ্ধ হয় সহস্র সহস্র মুমুক্ষু মানুষ।

অদ্বৈতবংশের নৈষ্ঠিক বৈষ্ণবের গৃহে বিজয়কৃষ্ণের জন্ম। তরুণ বয়স হইতেই জীবনে জাগে উদ্রগ্র আকাঙ্ক্ষা—ঈশ্বর লাভ তাঁহাকে করিতেই হইবে, প্রত্যক্ষ করিতে হইবে পরম সত্যকে ; এজন্য কোন ত্যাগ, কোন দুঃখেই তিনি পরাঙ্মুখ হইবেন না ; সত্যকে তিনি প্রত্যক্ষ ভাবে জানিবেন, অর্জ্জন করিবেন ব্রহ্মজ্ঞান।

সত্য সাক্ষাতের এই মহান্ ব্রত বিজয়কৃষ্ণকে ঠেলিয়া দেয় চরম ত্যাগ-তিতিক্ষাময় জীবনের পথে।

গোড়ার দিকে তিনি ঝাঁপাইয়া পড়েন ব্রাহ্ম সমাজের আবর্ত্তে—পদে পদে চলিতে থাকে সত্যধৃত জীবনের নির্ভীক সংগ্রাম। তারপর আকাশ-গঙ্গা পাহাড়ে সদ্‌গুরুর সহিত মিলন ঘটে! কঠোর তপস্যার বলে অপরিমেয় যোগৈশ্বর্য্য তিনি আহরণ করেন, গুরুর আদেশে অবতীর্ণ হন আচার্য্যের ভূমিকায়! অকৃপণ করে বিতরণ করিয়া যান অধ্যাত্মসম্পদ।

জীবনের এই বিচিত্র গতিপথে বিধাতা তাঁহাকে নিয়া কত খেলাই না খেলিয়াছেন! কত স্রোতাবর্ত্ত রচিত হইয়াছে জীবনধারায়, সৃষ্ট হইয়াছে কত আলো-আঁধারের মায়া। তারপর দিব্য চেতনায় উদ্‌ভাসিত হইয়া এই জীবনধারা মিশিয়াছে মুক্তির পারাবারে।

সংস্কারপন্থী ব্রাহ্ম আন্দোলনের পর গোঁসাইজী গ্রহণ করেন যোগীবর পরমহংসজীর প্রদত্ত সাধনা ; সিদ্ধিলাভের পর উত্তরজীবনে তিনি আত্মপ্রকাশ করেন মহাপ্রেমিক বৈষ্ণবাচার্য্যরূপে। মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্মের এক প্রধান ধারক ও বাহক-রূপে চিহ্নিত হইয়া উঠেন।

এই মহাজীবনের তাৎপর্য্যের কথা বলিতে গিয়া শ্রীঅরবিন্দ এক সময়ে লিখিয়াছিলেন, "এদেশের সমাজ-চেতনায় বিজয়কৃষ্ণের অধ্যাত্ম-জীবনের প্রভাব সুদূরপ্রসারী—এ প্রভাবের গুরুত্ব উপলব্ধি করিবার মত সময় আজিও আসে নাই।"

ঝুলন পূর্ণিমার সন্ধ্যায়, ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে ২রা আগষ্ট তারিখে প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ ভূমিষ্ঠ হন।

পিতা আনন্দচন্দ্র গোস্বামী বৈষ্ণবীয় দৈন্যের প্রতিমূর্ত্তি এক পরম-ভাগবত। গৃহদেবতা শ্যামসুন্দরের পূজা না করিয়া কখনো জলগ্রহণ করেন না। একবার শান্তিপুর হইতে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিতে করিতে রক্তাক্ত বক্ষে তিনি পুরীধামে পৌঁছেন। এভাবে পরম দৈন্যভরে জগন্নাথ দর্শন করিয়া তবে তাঁহার মনে শান্তি হয়। আনন্দচন্দ্রের শেষের দিনটিও বড় চমৎকার। ভক্তিভরে ভাগবত পাঠ করিতে করিতে ভাবাবিষ্ট অবস্থায় তিনি দেহ রক্ষা করেন।

বিজয়ের মাতা স্বর্ণময়ী ছিলেন এক অসামান্য নারী। বিপন্ন ও আর্ত্ত মানুষের কাছে তিনি যেন মূর্ত্তিমতী করুণা। দিনদুঃখীরা কোন কিছু চাহিলে উজাড় করিয়া সব ঢালিয়া দিতেন।

গ্রামের হাটে দরিদ্র নারীরা শাকপাতা বিক্রয় করিতে আসে। বেচা-কেনার কাজ সারিতে বেলা গড়াইয়া যায়। স্বর্ণময়ী সস্নেহে তাহাদিগকে বাড়ীতে ডাকিয়া আনেন, স্বহস্তে মাথায় তৈল মাখাইয়া দেন। স্নান করিয়া আসিলে আকণ্ঠ পূরিয়া ভোজন করান।

সে-বার এক শীতের সন্ধ্যায় কলিকাতার পথ দিয়া তিনি চলিয়াছেন। দেখিলেন, একটি তরুণী গণিকা রাস্তার ধারে নীরবে

দাঁড়াইয়া আছে। বহুক্ষণ পরে সেই পথেই ফিরিলেন। তখনো মেয়েটি দুরন্ত মাঘের শীতে তেমনি দাঁড়াইয়া আছে। স্বর্ণময়ীর অন্তর করুণায় ভরিয়া উঠিল। ব্যস্তসমস্ত হইয়া হাতের সমস্ত টাকাকড়ি পতিতাটিকে বিলাইয়া দিলেন। সস্নেহে বারবার বলিতে লাগিলেন, "বাছা, আর এমন ক'রে শীত ভোগ ক'রো না—এবার তুমি ঘরে ফিরে যাও।"

অল্প বয়সে বিজয়কৃষ্ণের পিতৃবিয়োগ হয়। তাই জননীর প্রভাবই তাঁহার জীবনে বেশী পড়িতে দেখা যায়। বংশের ঐতিহ্যের সাথে নিজের সহজাত ভক্তি ও বৈরাগ্য তাঁহার রহিয়াছে, পুণ্যময়ী জননীর সান্নিধ্য এ সম্পদ আরো বাড়াইয়া তোলে।

শান্তিপুরের সহজ সুন্দর গ্রাম্য পরিবেশ। পরমানন্দে সেখানে বিজয়ের দিন কাটে। বালককাল হইতেই চরিত্রে ফুটিয়া উঠে ঋজুতা ও অপূর্ব্ব সত্যনিষ্ঠা। পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে জুটিয়া মাঠে ঘাটে বালক ঘুরিয়া বেড়ায়। প্রতিবেশীদের উপর উপদ্রবও কম করে না। যে কেহ অভিযোগ করিলে সত্য কথা নিঃসঙ্কোচে বলিয়া দেয়। চোখের সামনে অন্যায় অবিচার কিছু দেখিলে বিজয় কাহাকেও ছাড়িয়া কথা কহে না। দৃপ্ত ভঙ্গীতে তাহার প্রতিবাদ করিয়া বসে।

সে-বার শান্তিপুরের জমিদার এক প্রজাকে কাছারী বাড়ীতে ধরিয়া আনিয়াছেন। অপরাধ যাহাই হোক, শাস্তির ব্যবস্থা উঠিয়াছে চরমে। বাঁশ-ডলা দিবার ফলে লোকটির শ্বাসরোধ হওয়ার উপক্রম।

এ নৃশংস দৃশ্য দেখিয়া বিজয়ের আর ধৈর্য্য রহিল না, ক্ষিপ্তবৎ সেখানে ছুটিয়া গেলেন। জমিদারকে 'রাক্ষস' 'ডাকাত' বলিয়া গালি দিতে দিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। গোঁসাইদের বালকের এ দুরন্ত সাহস দেখিয়া জমিদার ও তাহার লোকজন বিস্মিত হইয়া যায়।

বিজয়ের এ সৎসাহসের ফলে নির্য্যাতিত লোকটি কিন্তু মুক্তি পায়, ঘরে ফিরিয়া আসে।

একবার জ্ঞাতি গোঁসাইরা এক শিষ্যকে সমাজচ্যুত করেন। তাহার

অর্থদণ্ড হয় তিন শত টাকা। কিশোর বিজয় কিছুদিন পরে ঐ শিষ্যের বাড়ীতে বেড়াইতে গিয়াছেন, লোকটি সাশ্রুনয়নে তাহার দুঃখের কথা নিবেদন করিল। বিজয়ের হৃদয় গলিতে দেরী হইল না। সমস্ত দণ্ড নিজ দায়িত্বে তিনি মার্জ্জনা করিয়া দিলেন। এজন্য জ্ঞাতিদের কাছে তাঁহাকে লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছিল।

শান্তিপুরে পাঠশালা ও টোলের পড়া শেষ হইলে বিজয়কৃষ্ণ কলিকাতায় গিয়া সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি হইলেন। উৎসাহী শিক্ষার্থী বেশ কিছুদিন বিদ্যাচর্চ্চায় ডুবিয়া রহিলেন।

বিজয়ের বয়স তখন মাত্র আঠারো বৎসর। জননী ইহারই মধ্যে তাঁহার বিবাহের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। অচিরে সুলক্ষণা পাত্রী যোগমায়াকে বধূরূপে বরণ করিয়া তুলিলেন।

সে-বার রংপুর জেলার কোন এক শিষ্যবাড়ীতে বিজয়কৃষ্ণ অবস্থান করিতেছেন। হঠাৎ সেদিন চলিতে চলিতে কাণে আসিল গম্ভীর কণ্ঠের দৈববাণী। কে যেন তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া বারবার বলিতেছে, 'পরলোক চিন্তা কর'।

এ কি বিস্ময়কর অলৌকিক কণ্ঠ! নেপথ্য হইতে কে তাঁহাকে ডাকে? এমন করিয়া কল্যাণ চায় তাঁহার? কে তাঁহাকে উদ্বুদ্ধ করিতে চায় নব জীবনের পথে? বিজয়কৃষ্ণের অন্তরে এই অলৌকিক বাণী আলোড়ন তুলিয়া দেয়। কি করিবেন বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। অন্তরের ব্যাকুলতা দিন দিন বাড়িতে থাকে।

আবার একদিন আসে চেতনার দুয়ারে নূতন করাঘাত। এক বৃদ্ধা শিষ্যের জীবনে আসিয়াছে প্রবল বিষয়-বিরক্তি। বিজয়কৃষ্ণের পায়ে সে লুটাইয়া পড়ে, কাঁদিয়া বলে, "প্রভু আমি ত্রিতাপে জ্বলে পুড়ে মরছি, আপনি কৃপা ক'রে আমায় উদ্ধার করুন।

এই অশ্রুজল, এই আর্ত্তি সত্যাশ্রয়ী যুবকের মর্ম্মমূলে গিয়া সেদিন বিদ্ধ হয়।

বিজয় চমকিয়া উঠেন। ভাবেন, 'আমি উদ্ধার ক'রবো একে? সে কি কথা! আমি নিজেই যে মায়ায় আবদ্ধ হয়ে পড়ে রয়েছি। আশ্রয় নেই, সহায় নেই, আমি কার জন্য কি করতে পারি? যদি না-ই পারি, তবে কেনই বা এই গুরুগিরির কপটাচার?'

সিদ্ধান্ত স্থির হইতে দেরী হইল না। সেই দিন হইতেই গুরুগিরি তিনি ত্যাগ করিলেন।

বাংলার সমাজ-জীবনে এ সময়ে এক প্রচণ্ড ঝড় বহিতেছে। ইংরেজি শিক্ষা ও সভ্যতার আক্রমণে সমাজ-বন্ধন শিথিল, ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি বিপন্ন। ডিরোজিও, ডাফ্, মেকলের প্রভাবে শিক্ষিত বাঙালীর একদল হইয়াছে নিরীশ্বরবাদী, কতক হইতেছে খৃষ্টান। সেদিনকার এই ভাঙন রোধের জন্য, ধর্ম্ম ও সমাজের সংস্কারের জন্য শক্তিধর পুরুষ রাজা রামমোহন আসিয়া দাঁড়ান জাতির পুরোভাগে।

ভারতীয় সভ্যতাকে বাঁচাইতে গিয়া রামমোহন সেদিন রচনা করেন এক আত্মরক্ষামূলক ব্যূহ। নূতন ধর্ম্মান্দোলন সৃষ্টি করিয়া তাহার নাম দেন, 'বেদান্ত প্রতিপাদ্য সত্য ধর্ম্ম।' তারপর ইহাতে আসিয়া মিলে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের অপূর্ব্ব সংগঠন প্রতিভা। আন্দোলন হইয়া উঠে ব্যাপকতর, নাম দেওয়া হয়, ব্রাহ্মধর্ম্ম। সে সময়ে দেবেন্দ্রনাথ ও কেশব সেনের প্রেরণায় শিক্ষিত বাঙ্গালী ঘরের দিকে তাহার দৃষ্টি ফিরাইতে আরম্ভ করিয়াছে।

হিন্দুসমাজ এক বিপর্য্যয়ের মুখ হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়াছে। এবার চলিয়াছে তাহার আত্মশুদ্ধি ও আত্মপ্রতিষ্ঠার আন্দোলন। তরুণ বিজয়কৃষ্ণ এই আন্দোলনে নামিয়া পড়িলেন।

শিষ্য-ব্যবসায় আগে হইতেই ত্যাগ করিয়াছেন। সংস্কৃত কলেজও এবার ছাড়িয়া দিলেন। কিন্তু সংসার নির্ব্বাহের কি উপায়? অর্থকরী কাজ তো কিছু করা প্রয়োজন। স্থির করিলেন, তিনি মেডিকেল কলেজের বাংলা বিভাগে পড়িবেন। পাশ করার পর সংসার পালনের সঙ্গে সঙ্গে জনকল্যাণ করাও চলিবে।

এ সময়ে এক বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতায় তিনি চরম অর্থকষ্টে পড়েন। এক একদিন রাস্তার কলের জল খাইয়াও দিন কাটাইতে হয়।

অন্তরে আগে হইতেই চলিতেছে এক ভাব-বিপ্লব। তার উপর দারিদ্র্যের এই কষাঘাত! একেবারে উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থা।

এ সময়ে ঘুরিতে ঘুরিতে বিজয়কৃষ্ণ এক দিন ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া উপস্থিত হন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বেদীতে উপবিষ্ট, ওজস্বিনী ধর্ম্মোপদেশ তিনি দিতেছেন। এ উপদেশ বিজয়কে স্পর্শ করিল, শান্তির প্রলেপ অন্তরে মাখাইয়া দিল। ব্রাহ্মধর্ম্মে তিনি দীক্ষা নিলেন।

অল্পকাল মধ্যেই ব্রাহ্মসমাজের এক শ্রেষ্ঠ কর্ম্মীরূপে তিনি খ্যাতি অর্জ্জন করেন। ত্যাগ, আদর্শনিষ্ঠা ও কর্ম্মতৎপরতায় তাঁহার সমকক্ষ লোক তখন সে সমাজে খুব বেশী দেখা যায় নাই।

দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের এক ঘনিষ্ঠ সহকর্ম্মী হিসাবে বিজয় ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মব্রত গ্রহণ করেন। কিন্তু উত্তরকালে দেখা যায়, নিজ আদর্শ ও সত্যনিষ্ঠা রক্ষার জন্য এই দুই ধর্ম্মনেতাকেই বর্জ্জন করিতে তিনি দ্বিধাবোধ করেন নাই।

বিজয় সবেমাত্র ব্রাহ্মসমাজে ঢুকিয়াছেন। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই আত্মপ্রকাশ করে তাঁহার সত্যসন্ধ, বিপ্লবী রূপ। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকেই সেদিন প্রশ্ন করিয়া বসেন, "আচ্ছা, বলুন তো, জাতিভেদই যদি আমরা না মানি, তবে আর এ উপবীত রাখা কেন? এ কিন্তু আমার কাছে মনে হয় এক কপটাচার!"

দেবেন্দ্রনাথ উদার হইলেও এতটা অগ্রসর হইতে চাহেন নাই। বিজয় কিন্তু তাঁহার উপবীত সেদিন হইতেই ত্যাগ করেন।

উপবীত ত্যাগের জন্য শান্তিপুর ও কলিকাতায় তাঁহার ও তাঁহার পরিবারের লোকদের লাঞ্ছনার অবধি রহিল না। কিন্তু কোনমতেই অকুতোভয় তরুণকে সেদিন টলানো যায় নাই।

আরেক বারের কথা। বিজয়কৃষ্ণ অল্প কিছুদিন হয় ব্রাহ্মসমাজের

প্রচারক-পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। কথাপ্রসঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাকে বলিলেন, "একটা কথা স্মরণ রেখো, প্রচারের জন্য আমি তোমায় যখন যেখানে যেতে বলবো, সেইখানেই তোমায় যেতে হবে।"

তেজস্বী বিজয় গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন, "মার্জ্জনা করবেন, আমি আমার জীবনে ভগবানের আদেশ ও ধর্ম্মবুদ্ধিকেই শুধু অনুসরণ করে যাবো—মানুষের আদেশে চলা তো আমার পক্ষে সম্ভব হবে না।"

দেবেন্দ্রনাথ গুণগ্রাহী ধর্ম্মনেতা। এ কথা শুনিয়া সেদিন একটুও তিনি বিরক্ত হন নাই, বরং বিজয়ের নির্ভীকতা ও ভগবৎ-প্রেমের এই পরিচয় তাঁহাকে মুগ্ধ করে। অতঃপর স্বাধীনভাবে ধর্ম্মপ্রচার করিতেই তাঁহাকে অনুমতি দেন।

যশোহরের এক গ্রামে সে সময়ে অবিলম্বে একজন ব্রাহ্ম প্রচারকের দরকার। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি উপযুক্ত লোক কিরূপে যোগাড় হইবে? কর্ত্তৃপক্ষ বড় দুশ্চিন্তায় পড়িলেন।

মেডিকেল কলেজের শেষ পরীক্ষা হইতে আর কয়েক মাস বাকী। বিজয়কৃষ্ণ এজন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের প্রয়োজন ও সে প্রয়োজনের গুরুত্বের কথা শুনিয়া বিনা দ্বিধায় তিনি আগাইয়া আসিলেন। চিকিৎসক জীবনের সমস্ত সম্ভাবনা ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎকে তুচ্ছ করিয়া গ্রহণ করিলেন ঐ প্রচারকের পদ।

শুভানুধ্যায়ীর চোখে একাজ ভাল ঠেকে নাই। জনৈক বন্ধু প্রশ্ন করেন, "বলি, পড়া ছেড়ে তো প্রচারক হ'লে, কিন্তু পরিবারের ভরণপোষণ কি করে চলবে, তা কি ভেবেছ?"

ত্যাগব্রতী বিজয় দৃপ্তকণ্ঠে উত্তর দেন, "সেজন্য মোটেই ভাবিনে। যিনি মরুভূমিতে বনগুল্ম বাঁচিয়ে রাখতে পারেন, তিনিই নেবেন আমার আর আমার পরিবারের ভার।"

প্রচারকের কাজ নিবার পর যে অসাধারণ ত্যাগ, তিতিক্ষা ও নিষ্ঠা তিনি প্রদর্শন করেন, যে কোন সংগঠনে তাহা দুর্লভ।

প্রাচীন ও নব্য পন্থীদের সংঘর্ষে ব্রাহ্মসমাজ অতঃপর দুই ভাগ হইয়া

গেল। রক্ষণশীল মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ আদি-ব্রাহ্ম সমাজকে আঁকড়াইয়া রহিলেন, আর নব্যদল কেশবচন্দ্র ও বিজয়কৃষ্ণ প্রভৃতির নেতৃত্বে স্থাপন করিলেন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ।

কলিকাতার ভেদ-বিসম্বাদে ক্লান্ত হইয়া গোস্বামীজী এই সময়ে কিছুদিনের জন্য শান্তিপুরে গিয়া বাস করিতে থাকেন।

শান্তিপুরের গৃহদেবতা শ্যামসুন্দর বিগ্রহকে নিয়া নানা অলৌকিক কাণ্ড এসময়ে ঘটিত। স্বপ্নযোগে বা জাগ্রতাবস্থায় শ্যামসুন্দর বিজয়ের কাছে আব্দার করিতেন। অদ্ভুত ধরণের নির্দ্দেশও মাঝে মাঝে আসিত। যুক্তিবাদী ব্রাহ্মনেতা গোস্বামীপাদের হইত মহা বিপদ। এসব অলৌকিক দর্শন ও প্রত্যাদেশ নিজের বিচারবুদ্ধির কষ্ঠীপাথরে যাচাই করিতে গিয়া তাঁহার খেই হারাইয়া যাইত।

শ্যামসুন্দর বিগ্রহের সহিত বিজয়ের অন্তরঙ্গতা কিন্তু ক্রমে বাড়িয়া চলে। ঠাকুরের আচরণ বড় বিচিত্র। আব্দার আর মান-অভিমানের যেন তাঁহার অন্ত নাই। সুযোগ পাইলেই চিন্ময় রূপ ধরিয়া বিজয়ের নিকট আসিয়া আবির্ভূত হন। বিজয় যেন তাঁহার মনের মানুষটি। নিজের যত কিছু ছোটখাটো অভিযোগ ও আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা তাঁহাকে জানাইয়া রাখিয়া ঠাকুর অন্তর্হিত হন। শ্যামসুন্দরের এই অপরূপ প্রণয়লীলার কথা বিজয়কৃষ্ণ উত্তরকালে মনোজ্ঞ ভঙ্গীতে শিষ্যদের কাছে বিবৃত করিতেন—

'একবার শ্যামসুন্দর এসে আমাকে বললেন,—ওরে, আমি সোনার চূড়ো পরবো ; আমাকে একটা চূড়ো গড়িয়ে দে না।

'আমি বললাম,—আমি তোমাকে বিশ্বাস-টিশ্বাস করি না। যারা করে তাদের গিয়ে বল ! আমি টাকা কোথায় পাব?

'শ্যামসুন্দর বললেন,—ছাখ্, তোর খুড়ীমাকে বল্‌গে, তার ঝাঁপির ভেতর টাকা আছে। তাই নিয়ে নে না।

'পরে খুড়ীমাকে এ বিষয় বলাতে খুড়ীমাও বললেন,—ওরে কাল যে

শ্যামসুন্দর এসে আমায় স্বপ্নে বললেন—হ্যাঁরে, আমাকে চূড়ো গড়িয়ে দে না। আমি বললাম—আমি কোথায় টাকা পাবো? আমার তো কিছু নেই। শ্যামসুন্দর বললেন—ওগো, চল্লিশ-পঞ্চাশটা টাকা কি তুই দিতে পারিস্ না? ছাখ্ না, না পারিস্ তো বিজয়কে বলগে, সে দেবে।

'খুড়ীমা এই বলে খুব কাঁদতে লাগলেন, আর বললেন—সাতষট্টিটা টাকা আমি অতি গোপনে রেখেছিলেম, তা কেউ জানে না।

'ঐ টাকা খুড়ীমা দিয়েছিলেন, আমি সেই টাকা দিয়ে ঢাকা হ'তে সোনার চূড়ো গড়িয়ে দিই। আজ শ্যামসুন্দর সেই চূড়ো পরেছেন।

'সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে, আমি যখন এই ছাদের উপর গিয়েছিলাম শ্যামসুন্দর উঁকি মেরে দেখে আমাকে বললেন,—ওরে একবার দেখে যা না, চূড়ো পরে আমি কেমন সেজেছি।

'আমি বললাম,—আমি আর এ সব কি দেখবো, আমি তো আর তোমাকে মানি নে।

'শ্যামসুন্দর বললেন,—তাতে আর কি, না-ই বা মানলি, একবার দেখতেও কি দোষ?

'আর আমি শ্যামসুন্দরের কাছে যেয়ে, তাঁর স্নেহমাখা স্নিগ্ধ দৃষ্টি, উজ্জ্বল রূপের ছটা দেখে, একেবারে মুগ্ধ হ'য়ে পড়লাম।

'শ্যামসুন্দর একটু হেসে বললেন,—একি, তুই না আমাকে বিশ্বাস করিস্ না?

'আমি বললাম,—ঠাকুর, আমার উপর তোমার এতই যদি দয়া তবে আর এতকাল এত ঘুরালে কেন? সমস্ত ভাঙ্গিয়ে চুরিয়ে বিষম কালাপাহাড় করেছিলে কেন?

'শ্যামসুন্দর বললেন,—তাতে আর তোর কি? ভেঙ্গেছিলেম আমি, আবার গ'ড়েও নিচ্ছি আমি; তোর তাতে কী আর হয়েছে? ভেঙ্গে গড়্লে আরও কত সুন্দর হয়, জানিস্?

'প্রচারক অবস্থায়, সময়ে সময়ে মা'ঠাকুরাণীকে দেখতে আমি বাড়ী

আসতাম। একবার এই ঘরে মধ্যাহ্নে ব'সে আছি, শ্যামসুন্দর এসে বললেন,— ছাখ্ আজ আমাকে খাবার দিয়েছে, কিন্তু জল দেয় নি।

'আমি অমনিই খুড়ীমাকে ডেকে বললাম,—খুড়ীমা। তোমাদের শ্যামসুন্দর বলছেন, আজ তোমরা তাঁকে জল দাওনি।

'খুড়ীমা আমাকে বললেন,—হ্যাঁ,শ্যামসুন্দর আর লোক খুঁজে পেলেন না; তুই ব্রহ্মজ্ঞানী কিনা, তাই তোকে গিয়ে বলেছেন,—জল দেয়নি।

'আমি বললাম,—আচ্ছা অনুসন্ধান করে দেখ না।

'খুড়ীমা অমনই অনুসন্ধানে জানলেন, যথার্থই জল দেওয়া হয় নাই।

'এইরূপে শ্যামসুন্দর অনেক সময়ে অনেক কথা বলতেন। পূজারী কোনপ্রকার অনাচার বা ত্রুটি করলে, শ্যামসুন্দর এসে বলে যেতেন। শিশুকাল থেকে শ্যামসুন্দরের আশ্চর্য্য কৃপা দেখে আসছি। আমি না মানলেও তিনি কখনও আমাকে ছাড়েননি।'

ঈশ্বর নির্দ্দিষ্ট যে প্রেম-মধুর লীলা অভিনয় সাধক বিজয়কৃষ্ণের জীবনমঞ্চে অনুষ্ঠিত হইবে, তাহার প্রস্তুতি সেদিন ভিতরে ভিতরে শুরু হইয়াছে। তাহা দেখার জন্যই কি আড়াল হইতে চতুর শ্যামসুন্দর এইরূপে উঁকিঝুঁকি মারিতেছিলেন?

শ্যামসুন্দরের মুরলী ধ্বনি বিজয়কৃষ্ণকে মাঝে মাঝে শুধু উচ্চকিত করিতেছে, তখনো মন কাড়িতে পারে নাই।

কোথায় আলো, কোথায় অমৃত? কে দিবে পথসন্ধান? অতৃপ্তি ও মানসিক অশান্তি নিয়া বিজয়কৃষ্ণ দিন কাটাইতেছেন। তাঁহার এ অবস্থা দেখিয়া এক বৈষ্ণব বন্ধু কহিলেন, "তুমি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ কর।" এ মহাগ্রন্থটি পাঠে পাইলেন তিনি অমৃত-পথের সন্ধান।

গোঁসাইজী নিজে লিখিয়াছেন, "ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং জগদীশ কাময়ে, জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তি রহৈতুকী ত্বয়ী—এই শ্লোকটি পাঠ করিয়া অহৈতুকী ভক্তি লাভের জন্য আমার মনে এসময়ে এক প্রবল আকাঙ্ক্ষার উদয় হইল।

শ্রীচৈতন্যের প্রেমভক্তির রসধারা ধীরে ধীরে তাঁহার অধ্যাত্মজীবনে নামিয়া আসে। এবার শুরু হয় অদ্বৈত-সন্তানের সাধনায় আপন প্রভুকে চিনিয়া নিবার পালা।

সে-বার বিজয়কৃষ্ণ নবদ্বীপের সিদ্ধ মহাপুরুষ চৈতন্যদাস বাবাজীকে দর্শন করিতে গিয়াছেন। কথাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবাজী, ভক্তি কিসে হয়?"

'ভক্তি' শব্দটি কাণে পশিবামাত্র বাবাজীর সারা শরীর কদম্বের মত রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে। আবেগকম্পিত দেহে, হুঙ্কার দিয়া তিনি কহিলেন "তোমার মুখে তো এ প্রশ্ন সাজে না গোঁসাই! ভক্তি যে তোমাদেরই ঘরের বস্তু! এ যে আমার অদ্বৈতেরই ভাণ্ডারের ধন! তবে গোঁসাই, একথা সত্যি, দীনহীনকাঙাল না সাজলে, অভিমান উৎপাটিত না হলে ভক্তিদেবীর কৃপা লাভ হয় না।"

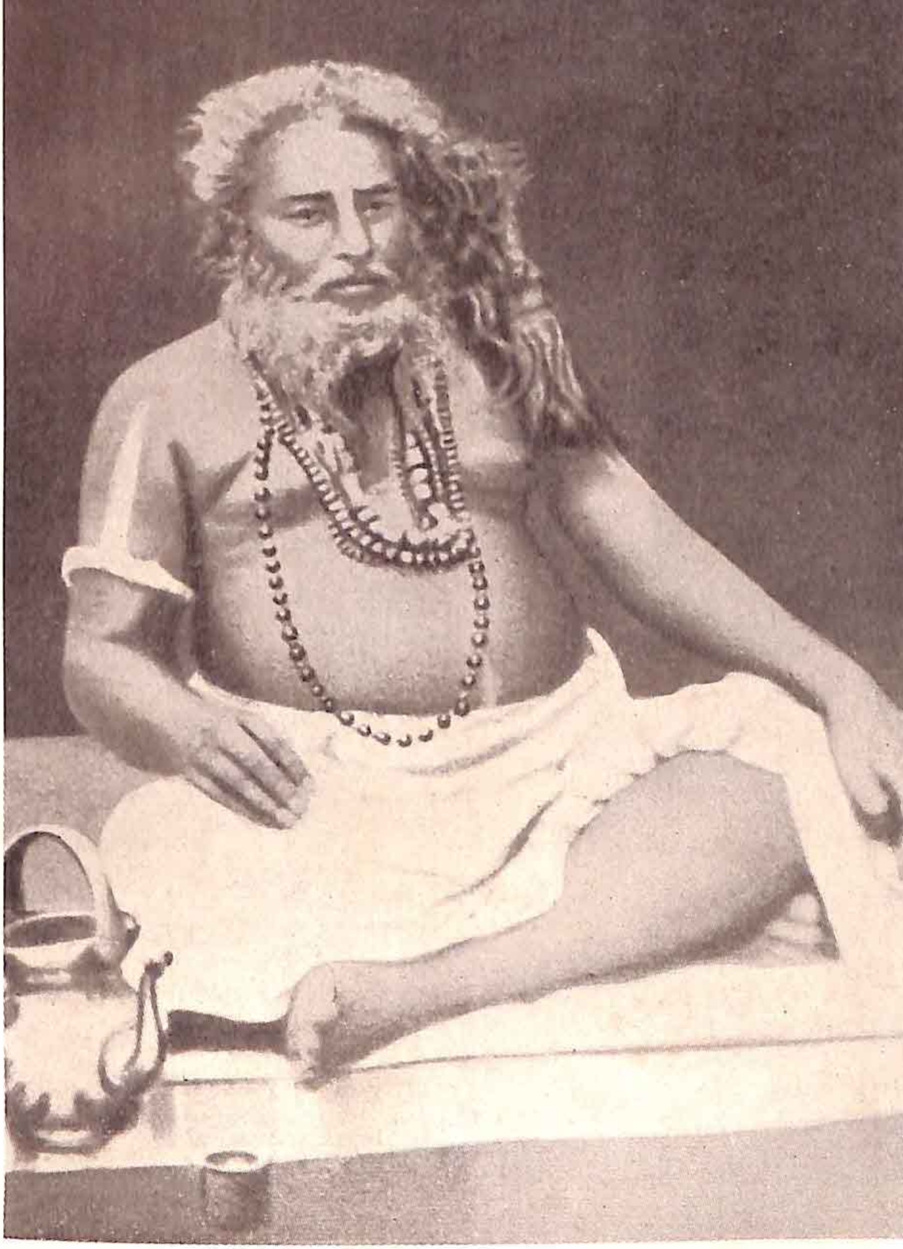
শক্তিধর মহাপুরুষ চৈতন্যদাস কিছুক্ষণ গোঁসাইজীর দিকে স্থির-দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিলেন। তারপর ধীরকণ্ঠে বলিলেন, "প্রভু, আমি যে তোমার ললাটে তিলক ও গলায় কণ্ঠি দেখলাম। কালে এ দু'টি বস্তু যে তোমায় ধারণ করতেই হবে।"

বাবাজী তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিতেই গোস্বামীপাদের চমক ভাঙ্গিল, দ্রুতপদে সেখান হইতে তিনি চলিয়া আসিলেন।

ইহার পর কাল্‌নার ভগবানদাস বাবাজীর সহিত বিজয়কৃষ্ণ একবার সাক্ষাৎ করিতে যান। অনেকটা পথ হাঁটিয়া আসিতে হওয়ায় বড় পিপাসা পাইয়াছে। জল পান করিতে চাহিবা মাত্র বাবাজী কিছু মিষ্টি ও জলভরা কমণ্ডলুটি আগাইয়া দিলেন।

গোঁসাই সসঙ্কোচে বলিলেন, "বাবাজী, আমি যার-তার হাতে খাই —জাত মানিনে। আপনি একি কচ্ছেন? আপনার নিজের ব্যবহারের কমণ্ডলুটি আমায় যেন দেবেন না।"

বাবাজী করজোড়ে কহিলেন, "প্রভু, আমার জাতবিচার না গেলে,



গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণ

খণ্ডবুদ্ধি নাশ না হলে, ভক্তিদেবীর কৃপা হবে কেন? আমায় আর পরীক্ষা করবেন না। আপনি কৃপা করে জল পান করুন।"

গোস্বামী-প্রভু জল পান করার পর ভগবানদাস বাবাজী ভক্তিভরে ঐ কমণ্ডলু তাঁহার নিজের মাথায় ঠেকাইলেন, প্রসাদ হিসাবে অবশিষ্ট জলটুকু পান করিয়া ফেলিলেন।

এক ভক্ত এসময়ে বাবাজীকে স্মরণ করাইয়া দেয়, বাবাজী, গোঁসাইপ্রভু কিন্তু গলার পৈতেটাও বর্জ্জন করেছেন।

ভগবানদাস উত্তরে কহিলেন, "জান তো, আমার শ্রীঅদ্বৈতেরও যে পৈতে গলায় থাকতো না। আর মজা দেখ, অদ্বৈত-সন্তানের নেতৃত্বটি কিন্তু ঠিকই বজায় আছে। আমার গোঁসাইপ্রভু ব্রাহ্মসমাজে ঢুকেছেন বটে, কিন্তু সেখানকার আচার্য্য হয়েই বসে আছেন।"

এক ব্যক্তি অমনি বিদ্রূপ করিয়া বলে, "তা বটে, তবে ইনি হচ্ছেন জামা-জুতো পরা আধুনিক আচার্য্য।"

কথাটি শুনিয়াই বাবাজীর চোখ অশ্রুসজল হইয়া উঠিল। বলিলেন, "ভাই, প্রভুকে মনোহর বেশে সাজিয়ে রাখা, সে যে আমাদেরই এক পবিত্র দায়িত্ব। আমরা দুর্ভাগা বলে, এ দায়িত্ব পালন করতে পারিনি। তাই তো, প্রভুকে নিজের সজ্জা নিজেকেই করে নিতে হয়েছে।"

বাবাজীর এ করুণ খেদোক্তি সকলেরই মর্ম্ম স্পর্শ করে, মন্তব্যকারী মাথা নীচু করিয়া থাকে।

চৈতন্যদাস ও ভগবানদাস বাবাজীর আবেদন অদ্বৈতবংশের সন্তান গোঁসাইজীর হৃদয়ে তুলিয়া দেয় আলোড়ন।

ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার-ব্রত বিজয়কৃষ্ণ গ্রহণ করেন, আর এ ব্রত সাধনে প্রদর্শন করেন চরম ত্যাগ, বৈরাগ্য ও কৃচ্ছ্রের আদর্শ। দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম প্রচারকদের জন্য মাসিক বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিতে চান, কিন্তু বিজয় ইহার বিরোধিতা করিয়া বসিলেন। চরম দারিদ্র্যের সঙ্গে যুঝিতেছেন, সর্ব্বদিক দিয়া সহায়-সম্বলহীন, কিন্তু তবুও ভাগবৎ জীবনের আদর্শ

প্রচার করিতে গিয়া অর্থ নিতে চান নাই, মন সায় দেয় নাই। ফলে তখনকার মত মহর্ষিকে এ প্রস্তাব ত্যাগ করিতে হয়।

ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া ঈশ্বরের ধর্ম্মপ্রচারে বিজয় নামিয়াছেন। এ যে তাঁহার পবিত্র দায়িত্ব। একাজে পারিশ্রমিক নেওয়া কেন? নিজে চিকিৎসা জানেন, সামান্য কিছু উপার্জ্জনও হয়। ইহা দিয়াই সংসার চালাইতে থাকেন। কিন্তু সত্যনিষ্ঠ সাধকের মনে একদিন প্রশ্ন উঠে, এভাবে টাকাকড়ি উপার্জ্জন করা কি ঠিক। এই অর্থকরী কাজে লিপ্ত থাকিলে ধর্ম্মপ্রচারের ক্ষতি তো কিছুটা হইবেই। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি এ চিকিৎসা-ব্যবসায়ও পরিত্যাগ করিলেন। আকাশবৃত্তির উপরই রহিল একমাত্র ভরসা।

এসময়ে সপরিবারে দিনের পর দিন তাঁহার অর্দ্ধাশন ও অনশনে কাটিয়াছে। যেদিন অন্ন জুটিত, উপকরণ জুটিত না। উপকরণ যদি বা মিলিল অন্নের সাথে দেখা নাই। প্রায়ই উঠানের কাঁটানটে শাক, অথবা হলুদ ও তেঁতুল জল গ্রহণ করিত ব্যঞ্জনের স্থান। পত্নী যোগমায়া দেবীকেও দারিদ্র্যের লাঞ্ছনা কম সহ্য করিতে হয় নাই। স্বামীর আদর্শনিষ্ঠ জীবনের সমস্ত দুঃখ কষ্ট সানন্দে তিনি বরণ করিয়া নেন। ত্যাগ বৈরাগ্য ও কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্য দিয়া হাসিমুখে আসিয়া তাঁহার পাশে দাঁড়ান। যোগমায়া ছিলেন সত্যকার সহধর্ম্মিনী, তাই তাঁহার সাহায্যে গোঁসাইজীর ব্রত উদ্‌যাপন সহজ হইয়া উঠে।

প্রচারকার্য্যে বিজয়কৃষ্ণকে সাধ্যের অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হয়, বাংলা ও বাংলার বাহিরে বহু স্থানে তিনি পর্য্যটন করিতে থাকেন। ফলে শরীর তাঁহার ভাঙ্গিয়া পড়ে। হৃৎপিণ্ডে জন্মে দুরারোগ্য ব্যাধি। তাছাড়া, প্রচারে রত থাকার সময় তখনকার রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের কত বিদ্রূপ, কত অত্যাচার ও লাঞ্ছনাই যে তাঁহাকে সহ্য করিতে হয় তাহার ইয়ত্তা নাই।

ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্মালোচনা, ধ্যানধারণা প্রভৃতি গোঁসাইজী একান্ত

নিষ্ঠায় করিয়া চলিয়াছেন। রাত্রির পর রাত্রি কাটিতেছে তীব্র সাধন-ভজন ও উপাসনায়। কিন্তু তৃষ্ণা তাঁহার মিটে কই ?

কেশব সেনের মত তিনিও দক্ষিণেশ্বরে গিয়া পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে উপবেশন করেন। অধীর মন সাময়িকভাবে কিছুটা শান্ত হইয়া আসে। আবার বাড়ে চিত্তের অস্থিরতা। অধ্যাত্ম-জীবনের যে পরম প্রাপ্তির জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিয়াছেন, তপস্যা করিতেছেন, তাহা তো মিলিতেছে না ?

বিজয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বড় চমৎকার কীর্ত্তন গান করেন। সে অপূর্ব্ব গান শুনিয়া নয়নে তাঁহার প্রেমাশ্রুর ধারা বহিয়া যায়, হৃদয় দ্রব হইয়া আসে। এক একদিন খেদ জাগে, এমন প্রাণগলানো কীর্ত্তন কি ব্রাহ্মসমাজে প্রবর্ত্তন করা যায় না ? নেতা কেশবচন্দ্রকে সে-বার ভ্রাতার সুমধুর কীর্ত্তন শোনাইয়া তিনি মুগ্ধ করেন, অনুমতি নেন সমাজে মৃদঙ্গ-করতাল সহ কীর্ত্তন প্রবর্ত্তনের জন্য।

এই কীর্ত্তন গানে, মহাভক্ত বিজয়কৃষ্ণের আকুতি ও ক্রন্দনে ব্রাহ্ম-সমাজের সভায় তখন ভক্তিরসের তরঙ্গ উঠিত।

তাঁহার এসময়কার ঈশ্বর-পাগল রূপের আকর্ষণ ছিল বিস্ময়কর। ইহার উল্লেখ করিয়া শিবনাথ শাস্ত্রী বলিয়াছেন, "গোঁসাইকে সকলের সামনে দেখিয়ে বেড়ালে, তাঁর এই ভক্তিসমৃদ্ধ মূর্ত্তি দেখালেই ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের ব্যাপক প্রচার হবে, আর কোন কিছুর দরকার হবে না।"

কেশবচন্দ্রকে এ সময়ে প্রায়ই বলিতে শোনা যাইত, "গোঁসাই ভক্তিসিদ্ধ হয়ে গিয়েছে।"

সত্যনিষ্ঠ সাধক বিজয়কৃষ্ণের মন কিন্তু এ কথায় শান্তি পায় না। যে আনন্দ ও অনুভূতির দোলা হৃদয়ে আসিয়া লাগে তাহা তো স্থায়ী হয় না! ভাবিয়া আকুল হন, ভগবৎ দর্শনের জন্য মনেপ্রাণে ভিখারী সাজিয়াছেন, কিন্তু কই, পরমপ্রভুর সন্ধান তো মিলিল না ? কবে আসিবে মিলনের লগ্ন ? কে বলিবে, এই দুঃসহ বিচ্ছেদের পরিসমাপ্তি হইবে কোন পথে ?

মনে শান্তি নাই। গোঁসাইজী দিনের পর দিন সাধুসন্ন্যাসী খুঁজিয়া বেড়ান! ব্যাকুলভাবে তাঁহাদের অনুসরণ করেন, সান্নিধ্যলাভে কৃতার্থ হইয়া উঠেন। একদিনকার বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথায় তিনি বলিতেছেন,—

"মেছোবাজার ষ্ট্রীট্ দিয়ে যাচ্ছি, আমার জুতো ছিঁড়ে গেল। রাস্তার উপরে, একটি চামারকে দেখে, তাকে এই জুতো সেলাই করতে দিলাম, কিন্তু সে পয়সা চুক্তি করলে না। জুতো সেলাই হয়ে গেলে, আমি তাকে পয়সা দিলাম। সেই পয়সা হতে, সে আমাকে ছ'টি পয়সা ফিরিয়ে দিল এবং তখনই তার যন্ত্রাদি গুটিয়ে নিয়ে চলল।

"আমার একটু আশ্চর্য্য বোধ হ'লো। আমি তার পিছনে পিছনে চললাম। সে গঙ্গাতীরে, বাবু-ঘাটে যেয়ে, তল্‌পি-তল্‌পা রাস্তার নীচে একটা ভাঙা খিলানের ভিতর গুঁজে রেখে গঙ্গা স্নান করল; পরে তিলক ক'রে, সন্ধ্যা-তর্পণাদি ক'রে খিদিরপুরের দিকে চলল। আমিও তার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যেতে লাগলাম।

"সে একটি বাড়ীতে প্রবেশ করল। আমিও ঐ বাড়ীর দ্বারে উপস্থিত হওয়া মাত্রেই একটি লোক এসে, আমাকে অতিথি মনে ক'রে বাড়ীতে নিয়ে গেলেন।

"যেয়ে দেখি, ঐ চামারটি একজন মহান্ত। তাঁর বিস্তর শিষ্যসেবক আছেন। আখ্‌ড়ায় ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত আছেন। খুব ধূমধাম ব্যাপার। আমি দেখে শুনে একেবারে অবাক হ'য়ে গেলাম।

"মহান্তকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার এত শিষ্য সেবক, নিজে মহান্ত, জাতিতে ব্রাহ্মণ, কিছুরই তো অভাব নাই, তবে আপনি জুতা সেলাই করেন কেন?

"মহান্ত বাবাজী আমার প্রশ্ন শুনে কেঁদে ফেললেন, এবং হাত জোড় ক'রে তাঁর গুরুদেবকে স্মরণ ক'রে পুনঃপুনঃ নমস্কার করতে করতে বললেন—গুরু আমার বড় দয়াল ছিলেন। একদিন অতিথিকে ভোজন করাবার পূর্ব্বেই আমি আহার করেছিলাম, তাতে তিনি

আমাকে শাসন করে বললেন,—আরে তু কাহে সাধু হুয়া, তু চামার হো। আমার গুরুদেবের সেই বাক্য আমা হ'তে অন্যথা হবে ? এই জন্য আমি, সেই দিন থেকেই চামারী করে জীবিকা নির্ব্বাহ করছি। সারাদিন চামারী ক'রে নিজের আহারোপযোগী চার আনা পয়সা মাত্র পেলেই আমি চ'লে আসি। গুরুদেব শেষকালে তাঁর গদিতে আমাকেই দয়া ক'রে রেখে গিয়েছেন। কিন্তু তা হ'লেও, সাধ্যমত চামারীবৃত্তি দ্বারা তাঁরই সেবা ক'রে দিন কাটিয়ে দিচ্ছি। আমাকে আশীর্ব্বাদ করবেন, যেন শেষ দিন পর্য্যন্ত আমি আমার গুরুদেবের সেই বাক্য রক্ষা করে যেতে পারি।

"ইঁহাকে দেখার পর, আমার মনে হ'লো, এ প্রকার ছদ্মবেশে তো মহাত্মারা যেখানে সেখানে থাকতে পারেন ! বাইরের আকার, বেশভূষা, আচার-ব্যবহার দেখে যখন তাঁদের চেনবার যো নেই, তখন কার কি অবস্থা কি প্রকারে বুঝবো ? সেই হতে আমি রাস্তায় বার হলেই, ছু'দিকে স্ত্রীলোক, পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ, মেথর, হাড়ী, ডোম, মুটে, মজুর যাকেই রাস্তার সম্মুখে ছু'পাশে দেখতে পাই, মনে মনে নমস্কার করে চলি।"

অধ্যাত্মজীবনের নূতনতর অধ্যায় এবার উন্মোচিত হইতেছে, তাই গোঁসাইজীর ব্যাকুলতাও তেমনি বাড়িয়া চলিয়াছে। সাধু সন্ন্যাসীর মধ্যে গুরু খুঁজিয়া বেড়ানোই এখন তাঁহার প্রধান কাজ। এ সম্বন্ধে নিজের এক অভিজ্ঞতার বিবরণ দিতেছেন—

"একদিন আমি মির্জাপুর ষ্ট্রীট দিয়ে যাচ্ছি। দেখতে পেলাম, একটি দীর্ঘাকৃতি কাঙ্গালবেশ সাধু দণ্ড-কমণ্ডলু হাতে ছুটে আসছেন। দূর হ'তে দেখতে পেয়ে, আমি তাঁকে নমস্কার করব মনে ক'রে ফুটপাথের অপর দিকে গিয়ে দাঁড়ালাম। তিনি নিকটে আসতেই, আমি তাঁকে নমস্কার করলাম।

"চলতি মুখে তিনি আমার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করলেন। তখন মনে হ'লো যেন আধমণ বরফ আমার মাথায় কেউ চাপিয়ে দিলে। সমস্ত শরীরটি আমার ঠাণ্ডা হ'য়ে গেল।

"আমি সাধুর সঙ্গে যেতে মনস্থ করা মাত্র, সাধু আমার পিঠে একটি চাপড় মেরে বললেন—'চলো বাচ্চা, চলো'। এই ব'লে, খুব দ্রুত পদে যেতে লাগলেন। আমিও তাঁর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চললাম। কি ভাবে, কোন্ দিক্ দিয়ে, কোথায় যে গেলাম, কিছুই জানি না। একেবারে যেন মেস্‌মেরাইজড হয়ে পড়লাম।

"কতক্ষণ পরে দেখি, ইডেন গার্ডেনে উপস্থিত হয়েছি। সাধু আমাকে একটা গাছের নীচে বসিয়ে অনেক উপদেশ দিলেন। গুরু ব্যতীত কিছুই হয় না, তিনি পুনঃপুনঃ বলতে লাগলেন।

"আমি তাঁর নিকটে দীক্ষা প্রার্থনা করাতে, তিনি আমাকে বললেন, —'না, তা হবে না ; তোমার গুরু নির্দ্দিষ্ট রয়েছেন। সময়ে তিনিই তোমাকে খুঁজে নেবেন, ব্যস্ত হ'তে হবে না'।

"তার পর আমি, তাঁর অনুসরণ করতে ইচ্ছুক হ'য়ে পশ্চাৎ পশ্চাৎ চললাম। হাবড়ার পোলের উপরে চলতে চলতে দেখলাম, হঠাৎ সাধু অদৃশ্য হ'য়ে পড়লেন। এ ঘটনার পরে সাধুদের প্রতি আমার আরও শ্রদ্ধা বেড়ে গেল।"

গোঁসাইজীর সাধনজীবনে আত্মতুষ্টির স্থান নাই। প্রতি পদক্ষেপে নিজেকে করেন পরীক্ষা, করেন কঠোর নিয়ন্ত্রণ। সে-বার তিনি লাহোরে গিয়াছেন। নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা ভাবিয়া একদিন বড় হতাশ হন, নদীতে জীবন বিসর্জ্জন দিতে যান। হঠাৎ আবির্ভূত হন এক শক্তিমান মুসলমান ফকীর, তাঁহাকে পিছন হইতে ডাকিয়া ফিরান। বলেন, "বেটা, দুনিয়ার মালিকই সব খেলা খেলছে—তোমায় নিয়েও চলেছে তাঁরই খেলা। অন্তরে খেদ রেখো না তোমার প্রার্থিত ধন মিলবে। নির্দ্দিষ্ট গুরুর কাছেই তা তুমি পাবে।"

প্রাণের পিপাসা বিজয়কৃষ্ণকে চঞ্চল করিয়া তোলে। এই সময় অঘোরপন্থী, কর্ত্তাভজা, রামাইৎ, শাক্ত, বৈষ্ণব, বাউল, দরবেশ, বৌদ্ধযোগী প্রভৃতি কত সাধকের কাছেই না তিনি ছুটাছুটি করিয়াছেন! কিন্তু আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর সন্ধান কোথাও পান নাই।

কলিকাতার ঠনঠনিয়ার মোড়ে সেদিন এক শান্ত, সৌম্যদর্শন উচ্চকোটি সন্ন্যাসীকে দেখিয়া গোঁসাইজী আকৃষ্ট হইলেন। এ সময়ে তিনি ভগবদ্ দর্শনের জন্য একেবারে অস্থির। সন্ন্যাসী তাঁহার মনের অবস্থা বুঝিলেন। বলিলেন, "দেখো, আকাশমে কোই ইমারৎ বনানে সক্‌তা নহি। তুমকো তো গুরু কর্‌নে হোগা। মগর্ ঘাবড়াও মৎ বাচ্চা তুম্‌হারা গুরু বখত্ মে মিল্ জায়েগা।" এই আশ্বাসবাণী শুনিয়া তিনি কিছুদিনের জন্য শান্ত হন। পরে আবার জাগে তীব্র চঞ্চলতা।

সেবার গোঁসাইজী শুনিলেন, দার্জ্জিলিং-এর কাছে, অরণ্যে এক শক্তিমান বৌদ্ধযোগী রহিয়াছেন। তখনি সেখানে ছুটিয়া গেলেন। অপরিমেয় যোগবিভূতির অধিকারী এই মহাত্মা। দেখা গেল, ধ্যানাসনে বসিয়া আছেন, আর তাঁহার শিরোদেশ হইতে জ্যোতি নির্গত হইতেছে। বিস্মিত বিজয়কৃষ্ণ নির্নিমেষে সেদিকে চাহিয়া রহিলেন। ধ্যানভঙ্গের পর মহাপুরুষের কাছে চাহিলেন দীক্ষা।

যোগী উত্তর দিলেন, "বাবা, আমি তো আদিষ্ট না হয়ে কাউকে দীক্ষা দিই না! তা ছাড়া, তোমার গুরু নির্দ্দিষ্ট রয়েছেন। তাঁর সন্ধান পাবে নর্ম্মদাতীরে। সেখানে যাও, নির্দ্দেশ ঠিক মিলবে।"

এই যোগী নর্ম্মদাতীরের এক মহাত্মার ঠিকানা দিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই বিজয়কৃষ্ণ সেখানে গিয়া হাজির। মহাত্মার চরণে পতিত হইয়া জানাইলেন আকুতি। তিনি আশ্বাস দিয়া কহিলেন, "বৎস, তোমার সৎ-গুরু উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষায় বসে আছেন! নিজেই এসে কৃপা করবেন, তুমি অধীর হয়ো না।"

ব্যাকুল প্রাণে একবার কাশীতে গিয়া গোঁসাইজী তৈলঙ্গস্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এই মহাযোগীর আন্তরিক স্নেহ ও সান্নিধ্যলাভ করিয়া হন কৃতার্থ।

অদ্ভুত আকর্ষণ এই যোগীরাজের। প্রায় সারাদিনই বিজয়কৃষ্ণ তাঁহার সঙ্গ করিয়া বেড়ান। বেলা গড়াইয়া যায়, ক্ষুৎপিপাসার দিকে

লক্ষ্যই নাই। তাঁহার শান্ত দেহ শুক্‌নো মুখ দেখিয়া স্বামীজী এক একদিন ব্যস্ত হইয়া পড়েন, ভক্তদের দিয়া আহার্য্য আনাইয়া দেন।

স্বামীজী ইচ্ছাময়, খেয়াল-খুসীমত গঙ্গাস্রোতে ভাসিয়া বেড়ান, প্রায়ই অসিঘাটে ডুব দিয়া ভাসিয়া উঠেন মণিকর্ণিকার শ্মশানে। এই খেয়ালী ব্রহ্মজ্ঞপুরুষের সঙ্গনেশা বিজয়কৃষ্ণকে পাইয়া বসিয়াছে। গঙ্গার তীরে তীরে হাঁটিয়া তিনিও চলেন তাঁহার পিছু পিছু। কখনো দেখা যায়, স্বামীজী নিশ্চল প্রস্তরমূর্ত্তির মত বসিয়া থাকেন, আর ভক্তগণ দলে দলে আসিয়া এই উলঙ্গ যোগীরাজের শিরে বিল্বপত্র ও গঙ্গাবারি ঢালিয়া দেয়। বলিতে থাকে, "নমঃ শিবায়, নমঃ শিবায়।"

বড় অপরূপ, বড় প্রাণস্পর্শী এই দৃশ্য। এই দৃশ্যের দিকে চাহিয়া গোঁসাইজী মন্ত্রমুগ্ধের মত বসিয়া থাকেন।

সেদিন গঙ্গাতীরে অনেকক্ষণ ঘুরিয়া বিজয়কৃষ্ণ খুব শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। বিশ্রামের জন্য মণিকর্ণিকার ঘাটে আসিয়া বসিলেন। হঠাৎ দেখিলেন, গঙ্গাগর্ভ হইতে স্বামীজী উঠিয়া আসিতেছেন। সম্মুখে আসিয়া কহিলেন, "ওহে স্নান করে এসো, তোমায় আজ একটা মন্ত্র দেবো।"

বিজয়কৃষ্ণ থতমত খাইয়া গেলেন। কহিলেন, "স্বামীজী, আমার মায়ের নিকট যে আমার প্রাথমিক দীক্ষা হয়ে গিয়েছে।"

স্বামীজী ছাড়িবার পাত্র নহেন, বিজয়কৃষ্ণকে তখনি এক ধমক দিয়া উঠিলেন।

বিজয় যোড়হস্তে যোগীবরকে নিবেদন করিলেন, "বাবা, আমার কিন্তু মন্ত্র-তন্ত্রে তেমন বিশ্বাস এখনো হয়নি। তাছাড়া, আমি এখনো ব্রাহ্মসমাজের লোক।"

কিন্তু এসব কথায় কান দেয় কে? ত্রৈলঙ্গ মহারাজের মাথায় আর এক ঝোঁক চাপিয়া গিয়াছে। বিজয়কে সবলে আকর্ষণ করিয়া যোগীরাজ তাঁহাকে স্নান করাইলেন। তারপর স্মিতহাস্যে কহিলেন, "শোন বাচ্চা, তোমায় এ মন্ত্র দেবার বিশেষ কারণ রয়েছে। তোমার

শরীর শুদ্ধির জন্যই এখন এর প্রয়োজন। আমি তোমার দীক্ষাগুরু নই। তিনি রয়েছেন অন্যত্র। তাঁর সঙ্গে এক শুভ লগ্নে শিগ্গীর তোমার দেখা হবে।"

ত্রৈলঙ্গ মহারাজের প্রদত্ত এই মন্ত্রটি গোস্বামীজী শ্রদ্ধাভরে বহুদিন জপ করিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকার্য্যে বিজয়কৃষ্ণ সে-বার গয়ায় আসিয়াছেন। নিকটেই আকাশগঙ্গা পাহাড়। সিদ্ধ রামাইৎ সাধু, রঘুবরদাসজীর আশ্রম সেখানে। গোঁসাইজী তাঁহাকে দেখিতে ছুটিলেন।

বাবাজীর পদতলে পড়িয়া নিবেদন করিলেন, "প্রভু, আমি বড় অজ্ঞান, আমায় দয়া করুন। পরাভক্তির উদয় যাতে হয়, সেই আশীর্ব্বাদই আমি আপনার কাছে চাই।"

রঘুবরদাস স্নেহভরে বলিলেন, "বাবা, তোমার মত আর্ত্তি যার, ভক্তিদেবী কি তাঁকে কৃপা না করে পারেন? স্থির হও। অচিরেই মনস্কামনা তোমার পূর্ণ হবে।"

বিজয়কৃষ্ণের প্রতি বাবাজীর স্নেহের অন্ত নাই। নিজ হস্তে তাঁহার আহার্য্য প্রস্তুত করেন, সযত্নে তাঁহাকে ভোজন করান। এই ভক্তিসিদ্ধ মহাত্মার বিভূতি দর্শনে গোঁসাইজী অবাক হইয়া যান।

আকাশচারী পাখীর দল বাবাজীর আহ্বানে ছুটিয়া আসে। অনুগত পোষ্যের মত তাঁহার দেহে আসিয়া বসে, ঠোঁট দিয়া খুঁটিয়া খুঁটিয়া জটা পরিষ্কার করিয়া দেয়। বন্যপশুরাও বাবাজীর কম বশে নয়। আশ্রমের আশেপাশে ঘন বন। সেখান হইতে মাঝে মাঝে দুই-একটি বাঘও আসিয়া উপস্থিত হয়। হিংস্র বাঘ বাবাজীর সস্নেহ তিরস্কারে মাথা নোওয়াইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। আবার তাঁহার আদেশে প্রস্থান করে!

এই মহাপুরুষের আশ্রয়ে, আকাশগঙ্গা পাহাড়ের শান্ত মনোরম পরিবেশে গোস্বামীপাদ কিছুদিন সাধন-ভজন করেন।

ব্রহ্মযোনী পাহাড়ে এক মহাপুরুষ অবস্থান করেন, গোস্বামীজী

সেদিন তাঁহাকে দর্শন করিতে যান। অবতরণের সময় পর্ব্বতের সানুদেশে গোড়ধোয়া নামক স্থানে তিনি উপস্থিত হন। শুনিলেন, এই সেই পবিত্র ক্ষেত্র যেখানে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য তাঁহার শ্যামসুন্দরকে দর্শন করেন, অন্তরে জাগে তাঁহার দিব্য উন্মাদনা।

ভক্ত বিজয়কৃষ্ণের মানসপটে ভাসিয়া উঠে মহাপ্রভুর সেই প্রেমবিহ্বল ছবি 'কৃষ্ণরে বাপরে' বলিয়া যে কান্না তিনি কাঁদিয়াছিলেন আজিও যেন গোড়ধোয়ার আকাশ বাতাসকে তাহা মন্থর করিয়া রাখিয়াছে। অলৌকিক ভাবময়তায় এস্থান পূর্ণ। গোঁসাইজা একবারে আত্মহারা হইয়া যান।

হৃদয়ে জাগে অলৌকিক প্রেম-বন্যার উচ্ছ্বাস। ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি আর মনের প্রাকার যেন ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া একাকার হইতে চায়।

ইষ্ট দর্শনের আকাঙ্ক্ষা মনে আরো তীব্র হয়, দিন গুনিতে থাকেন সৎগুরুর আশায়।

১২৯০ সালের আষাঢ় মাস। সেদিন ভোরবেলায় বিজয়কৃষ্ণ আকাশগঙ্গা পাহাড়ে রঘুবরদাসের আশ্রমে বসিয়া আছেন। শুনিলেন, পর্ব্বতশীর্ষে এক শক্তিধর মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে।

সেবার জন্য কিছু ফলমূল হাতে নিয়া তখনি উপরে উঠিলেন। দর্শন পাইলেন এক দিব্যকান্তি মহাপুরুষের!

নির্নিমেষে গোঁসাইজী তাঁহার দিকে তাকাইয়া রহিলেন, ধীরে ধীরে ঘটিল আত্মবিস্মৃতি। কি এক অমোঘ আকর্ষণ রহিয়াছে এই লোকোত্তর পুরুষের মধ্যে। দর্শন মাত্র সারা অস্তিত্ব যেন দ্রবীভূত হইয়া তাঁহার চরণতলে লুটাইতে চায়। তাঁহাকে গুরুরূপে বরণ করিবার জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।

মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণকে আশীর্ব্বাদ করার সঙ্গে সঙ্গে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দে তাঁহার মন-প্রাণ ভরপুর হইয়া উঠিল। মহাপুরুষের চরণ ধরিয়া কাতরভাবে তিনি দীক্ষা চাহিলেন।

প্রার্থনা পূর্ণ হইল। দীক্ষা নিবার অব্যবহিত পরেই গুরুর চরণে গোঁসাইজী নিপতিত হইলেন। বাহ্যজ্ঞান লোপ পাইয়া গেল।

চেতনা পাইয়া দেখেন, গুরু অন্তর্হিত হইয়াছেন!

এতদিনে যদিই বা দেখা দিলেন জীবনতরীর কাণ্ডারী আবার কোথায় অদৃশ্য হইলেন? গোঁসাইজী দিশাহারা, উন্মত্তপ্রায়। সদ্‌গুরুকে আবার পাইতেই হইবে, নতুবা জীবনে তাঁহার শান্তি নাই। গয়া অঞ্চলের পাহাড়ে-পাহাড়ে তিনি ঘুরিতে লাগিলেন।

অবশেষে রামশিলা পাহাড়ের এক নির্জ্জন অরণ্যে গুরুজী আবার তাঁহার সম্মুখে হঠাৎ হন আবির্ভূত। সান্ত্বনা দিয়া বলেন, "বাচ্চা, ঘাবড়াও মৎ। জোরছে সাধন অওর ভজন করতে রহো। বখৎমে তুম্‌হারি পুরি সিদ্ধি মিল যায়গা।"

অতর্কিতে মহাপুরুষ আবার অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

গোস্বামীপাদের গুরুদেবের নাম ব্রহ্মানন্দস্বামী। পরমহংসজী নামেই তিনি সাধুমহলে পরিচিত ছিলেন।

তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের দেশ পাঞ্জাব। গোড়ার দিকে তিনি বাস করেন নানকপন্থী এক উদাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে। তারপর ভক্তিসাধক নানকপন্থী মতে সাধনা করেন। উত্তরকালে এক মহাযোগীর আশ্রয় লাভ করিয়া পরিণত হন এক ব্রহ্মবিদ্ মহাসাধকে।

পরমহংসজীর আসন ছিল হিমালয়ে, মানস-সরোবর তীরে। ঘনিষ্ঠ শিষ্যদের কাছে নিজ সাধনস্থলীর বর্ণনা তিনি মাঝে মাঝে দিতেন। কহিতেন, সাধারণের পরিচিত মানস-সরোবর হইতেছে ভৌগোলিক মানতালাও—যোগীদের সাধনক্ষেত্র, আসল মানস-সরোবর এই মানতালাও হইতে পৃথক্। তাঁহার মতে, সদ্‌গুরুর কৃপা ও যোগশক্তি ছাড়া এই আসল মানসসরোবরে যাওয়া কাহারো পক্ষে সম্ভব নয়।

এই পরমহংসজীর কৃপায় বিজয়কৃষ্ণ সিদ্ধিলাভ করেন, হন আপ্তকাম। অলৌকিক বিভূতির খেলা তাঁহার জীবনে বহু দেখা গিয়াছে, কিন্তু বরাবরই অন্তর্য্যামী শক্তিধর গুরু অন্তরাল হইতে তাঁহার সমস্ত কর্ম্ম

নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন। যখনি প্রয়োজন হইয়াছে তখনি তাঁহাকে নিগূঢ় সাধন নির্দ্দেশাদি দিয়াছেন। বিজয়কৃষ্ণের জীবনে স্তরে স্তরে এই গুরুকৃপা ছড়ানো রহিয়াছে।

দীক্ষার পরে হঠাৎ একদিন গোঁসাইজীর গত জন্মের স্মৃতি জাগিয়া উঠে। সেদিন তিনি ফল্গুর অপর তীরে রামগয়ায় গিয়াছেন। সেখানে নৃসিংহ মন্দিরে বসিতে গিয়াই তাঁহার চেতনার পর্দ্দাটি সরিয়া গেল। মনশ্চক্ষে ভাসিয়া উঠিল পূর্ব্বজন্মের সন্ন্যাস-জীবনের দৃশ্য।

—এই মন্দিরে আরো তিনজন সাধুর সঙ্গে তিনি সাধন ভজন করিতেন। সে জন্মে এখানকার এক বটবৃক্ষে তিনি 'ওঁ রাম' এই মন্ত্রটি লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। খোঁজ করিয়া দেখা গেল, বৃক্ষের গায়ে খোদাই করা লেখাটি তখনো রহিয়াছে, একেবারে মুছিয়া যায় নাই।

এই অঞ্চলের বরাবর্ পাহাড় বহু শক্তিমান সাধু-সন্ন্যাসীর তপোক্ষেত্র। এইখানেই যোগী গম্ভীরনাথবাবার সহিত বিজয়কৃষ্ণের সাক্ষাৎ হয়। যোগীবরের কৃপা ও নানা সাধন নির্দ্দেশ পাইয়া তিনি এ সময়ে উপকৃত হন।

আকাশগঙ্গা পাহাড়ের এক নির্জ্জন গুহায় গোস্বামীজী তাঁহার আসন পাতিয়া বসিলেন। বরাবরই তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য—যে কাজে ব্রতী হন, তাহার শেষ না দেখিয়া ছাড়েন না। আহার-নিদ্রার কথা ভুলিয়া সাধনার গভীরে তিনি ডুবিয়া যান, গুরুর নির্দ্দেশিত পন্থায় ধীরে ধীরে হন অগ্রসর।

রঘুবরদাস বাবাজী বলিয়াছেন, শেষের দিকে বিজয়কৃষ্ণ এক আসনে এগারো দিন একাদিক্রমে ধ্যানমগ্ন থাকেন। বাবাজীর যত্নেই এ সময়ে কঠোরতপা সাধকের প্রাণ রক্ষা হয়!

পরমহংসজী অতঃপর গোঁসাইজীকে কাশী যাওয়ার নির্দ্দেশ দেন। সেখানে গিয়া হরিহরানন্দ সরস্বতীর নিকট তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। নব নামকরণ হয় অচ্যুতানন্দ সরস্বতী।

এই আনুষ্ঠানিক সন্ন্যাস গ্রহণের পর বিজয়কৃষ্ণ ঠিক করিলেন, তিনি অবিলম্বে সংসার ত্যাগ করিবেন। কিন্তু এ সঙ্কল্প বাদ সাধিলেন তাঁহার গুরুদেব, পরমহংসজী।

কাশীধামে হঠাৎ সেদিন আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, "বাবা, তুমি সংসার ত্যাগ ক'রো না। আগের মতই গৃহস্থাশ্রমে থাক, যে সাধন পেয়েছ, তা নিয়ে এগিয়ে চলো। জীবের কল্যাণের জন্যই তোমায় সংসারে থাকতে হবে। ব্রাহ্মসমাজ ছাড়বার কথা ভেবে ব্যস্ত হয়ো না, সময় মত তা সাপের খোলসের মত খসে পড়বে।"

কাশী হইতে গোঁসাইজী আকাশগঙ্গা পাহাড়ে ফিরিয়া আসিলেন। আবার শুরু হইল তাঁহার কঠোর তপস্যা। গুরু পরমহংসজীকে এসময়ে প্রায়ই আবির্ভূত হইতে দেখা যাইত, উত্তম অধিকারী শিষ্যকে যোগের দুরূহ সাধনাদি তিনি শিক্ষা দিয়া যাইতেন।

গোঁসাইজী একদিন কথাপ্রসঙ্গে যোগীদের অলৌকিক শক্তি ও যোগবিভূতি সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন।

পরমহংসজী বুঝিলেন, যুক্তিবাদী শিষ্যের প্রত্যয় সহজে আসিবে না, কিছুটা যোগৈশ্বর্য্য তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করানো দরকার।

গুরুজী সেদিন তাঁহাকে অণিমা-লঘিমা ইত্যাদি অষ্ট সিদ্ধির ক্রিয়া প্রদর্শন করেন। যোগশক্তির এক একটি প্রকাশ সাধক বিজয়কৃষ্ণ প্রত্যক্ষ করেন, আর বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া যান। সর্ব্ব বিদ্যা-বুদ্ধি ও অভিমানের ভিত্তি একেবারে শিথিল হইয়া উঠে।

গুরুমহারাজের একদিনকার যোগবিভূতির লীলা কিন্তু তাঁহাকে হতবাক্ করিয়া দেয়।

আকাশগঙ্গা পাহাড়ে, গহনবনের এক প্রান্তে সেদিন একটি লোক মরিয়া পড়িয়া আছে। পরমহংসজী যোগবলে সূক্ষ্মদেহে সেই মৃতদেহে প্রবেশ করিলেন। শবটি ধীরে ধীরে নড়িয়া চড়িয়া উঠিল, তারপর একেবারে জীবন্ত হইয়া উপবেশন করিল গোঁসাইজীর সম্মুখে। তিনি

তো বিস্ময়ে একেবারে হতবাক ! নির্নিমেষে এই জীবন্ত শবের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

পুনরায় ঐ দেহ হইতে বাহিরে আসিয়া পরমহংসজী নিজ দেহে ঢুকিয়া পড়িলেন। এবার সহাস্যে শিষ্যকে বলিলেন, "ক্যা ? অব্ তুমহারা বিশ্বাস হুঁয়া ?"

এসময়ে অল্পদিনের ভিতর গুরুর কৃপায় কঠোরতপা গোস্বামীজী অষ্টসিদ্ধি লাভ করিলেন।

এই সময়ে গয়ার এক তন্ত্রসিদ্ধ মহাপুরুষের আগমন ঘটে। গুরুর নির্দ্দেশে এই শক্তিমান তান্ত্রিকের ভৈরবীচক্রে গোঁসাইজী একদিন যোগদান করেন। তন্ত্রসাধনার স্বরূপ সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা সেদিন তাঁহার অর্জ্জিত হয়। শিষ্যের নিজস্ব সাধনপথ রহিয়াছে, তবুও গুরু তাঁহাকে নানা আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞার মধ্য দিয়াই গড়িয়া তুলিতেছিলেন।

আকাশগঙ্গা পাহাড়ে গোঁসাইজী দুশ্চর তপস্যায় ব্রতী হইয়াছেন। তদুপরি রহিয়াছে গৈরিক ধারণ, আর তীব্র বৈরাগ্য। আত্মীয় এবং বন্ধু-বান্ধবেরা শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। অবশেষে তাঁহারা জোর করিয়া তাঁহাকে কলিকাতায় নিয়া আসিলেন।

বিজয়কৃষ্ণ সেদিন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছেন। ভক্তিভরে তিনি দেবেন্দ্রনাথকে প্রণাম করিলেন। তাঁহার মুখের দিকে চাহিবামাত্র দেবেন্দ্রনাথের বিস্ময় জাগিয়া উঠিল। দেখিলেন এক দিব্য নবীন সাধকের আননখানি ঝল্‌মল্ করিতেছে। ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "গোঁসাই, তোমায় যে নতুন মানুষ দেখছি। নিশ্চয় কোন অমূল্য বস্তু তুমি পেয়েছ। কোথায় পেলে ?"

গোস্বামীজী উত্তর দিলেন, "গয়ার পাহাড়ে। এক ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ কৃপা ক'রে কিছু দিয়েছেন।"

দেবেন্দ্রনাথ বলিয়া চলিলেন, "বুঝতে পারছি, যে বস্তু পেয়েছ, তাতে তুমি ধন্য হবে, উদ্ধার হবে। এদেবদুর্ল্লভ ধন কখনো ত্যাগ

ক'রো না। ব্রাহ্মসমাজে তুমি থাকো বা না থাকো, সে ভিন্ন কথা। কিন্তু এ যেন কখনো ত্যাগ ক'রো না।"

কেশবচন্দ্রের কন্যার কুচবিহারে বিবাহের পর ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে দলগত বিরোধ উপস্থিত হয়। এসময়ে বিজয়কৃষ্ণ ও অন্যান্য নেতারা মিলিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত করেন।

অতঃপর পূর্ব্ববঙ্গে গিয়া গোঁসাইজী সমাজের প্রচারকরূপে কাজ করিতে থাকেন। অন্তর সাধনাও চলিত এই সঙ্গে। দিনের নির্দ্দিষ্ট কাজের পর তিনি সাধনার গভীরে ডুবিয়া যাইতেন।

সাধনপথে অতঃপর আসিতে থাকে বাধার পর বাধা। কিন্তু সমর্থ গুরু প্রতিবারই উপস্থিত হন তাঁহার সাহায্যের জন্য। উচ্চতর সাধনার স্তরে শিষ্যকে আগাইয়া দিয়া যান।

সেবার বিজয়কৃষ্ণের সর্ব্বদেহে এক দুঃসহ দহন-জ্বালা শুরু হয়, অন্তরেও দেখা দেয় শুষ্কতা। এ সময়ে পরমহংসজী হঠাৎ একদিন তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হন। কহেন, "বাবা, তুমি এবার জ্বালামুখীতে চলে যাও। সেখানে গিয়ে তপস্যা কর, তোমার দেহের এ দাহ-বোধ অচিরে সেরে যাবে।" গুরু নির্দ্দেশিত সাধনা অনুসরণ করিয়া গোস্বামীজী শান্তিলাভ করেন।

সৎগুরুর কৃপা ও কঠোর তপস্যার ফল অচিরে ফলিয়া উঠে। সাধক বিজয়কৃষ্ণের জীবনে স্ফুরিত হয় দিব্য জীবনের জ্যোতি। ঢাকায় গেণ্ডারিয়া আশ্রমে বসিয়া তিনি সিদ্ধকাম হন, ভগবৎ-দর্শন লাভ করেন। তাঁহার সিদ্ধ দেহে এসময়ে অপূর্ব্ব দিব্য কান্তি ফুটিয়া উঠে, যে কেহ তাঁহার দর্শনে আসিলেই বিস্ময়-বিমুগ্ধ হইয়া যাইত।

সাধনজীবনের শেষে এইবার শুরু হয় আচার্য্য জীবনের পালা। পরমহংসজী এখন হইতে বিজয়কৃষ্ণকে দীক্ষাদানের অনুমতি দেন।

বরাবরই গোস্বামীজীর দীক্ষাদানের এক বৈশিষ্ট্য দেখা যাইত। কেহ কখনো তাঁহার কাছে দীক্ষাপ্রার্থী হইলে তিনি নেপথ্যস্থিত

গুরুদেবকে নিবেদন করিতেন। অনুমতি মিলিলে তবেই প্রার্থীকে দিতেন নাম বা দীক্ষাবীজ।

ব্রাহ্ম প্রচারক নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁহার এক অলৌকিক দর্শনের কথা বর্ণনা করিয়াছেন। গোস্বামীজী নিভৃতে বসিয়া সেদিন নগেন্দ্রনাথকে দীক্ষা দিতেছেন। হঠাৎ নগেন্দ্রবাবুর চোখে পড়িল এক অদ্ভুত দৃশ্য। দেখিলেন, গোস্বামীপ্রভুর পিছনে এক দীর্ঘকায় শুভ্রশ্মশ্রু, জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন।

নগেন্দ্রবাবু এ সম্পর্কে প্রশ্ন করিলে গোঁসাইজী হাসিয়া বলিলেন, "গুরুদেব পরমহংসজীকেই আপনি দেখেছেন। তাঁর অপার কৃপাতেই আপনার এ দর্শন ঘটেছে। প্রত্যেকটি দীক্ষাদানের সময়ে তিনিই আমার দেহকে আশ্রয় করে কাজ করেন। তিনি যন্ত্রী, আমি যন্ত্রমাত্র।"

গোস্বামীজীর সাধনদানের প্রণালী ছিল সরল ও সহজসাধ্য। প্রতি শ্বাসে গুরুর দেওয়া নাম সাধন করিতে হইত। এ সঙ্গে প্রাণায়ামের প্রক্রিয়াও থাকিত। আহার-বিহারে সদাচার ও ধর্ম্মনিষ্ঠা বজায় রাখার কঠোর নির্দ্দেশ তিনি সবাইকে দিতেন।

তাঁহার এই সাধন দ্বারা কিন্তু কাহারো নিজস্ব ধর্ম্মীয় স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইত না। প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের বহু মুমুক্ষু লোক তাঁহার কাছে আশ্রয় ও সাধন পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছে।

দীক্ষাকালে গোস্বামীজীর শক্তি সঞ্চারণ ভক্তদের প্রায়ই বিস্মিত করিত। স্পর্শ ও মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে দীক্ষিতের অতীন্দ্রিয় দর্শনাদি ঘটিত, অলৌকিক ভাবাবেশে তিনি বিভোর হইয়া পড়িতেন।

এই দীক্ষাদান সম্পর্কে কখনো কাহারো অনুরোধ-উপরোধের ধার গোঁসাইজী ধারিতেন না। সেবার একটি গৃহ পরিচারিকাকে তিনি সাধন দিলেন। ঠিক সে সময়েই কোন অভিজাত পরিবারের এক সচ্চরিত্র যুবক তাঁহার কাছে আশ্রয় চায়। তিনি কিন্তু তাহাকে প্রত্যাখ্যান করেন। এ ঘটনাটি ভক্তমহলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছিল।

এ সম্পর্কে তাঁহাকে প্রশ্ন করা হইলে কহিলেন, "ছ্যাখো, এ সাধন

সম্পূর্ণ অহৈতুকী, এ বস্তু নিতান্তই ভগবানের দান। যাঁর উপর কৃপা রয়েছে—তিনিই পাবেন। এর তালিকাও রচিত হয়ে রয়েছে। সদ্‌গুরুর মাধ্যমেই এটা বিজ্ঞাপিত হয়। অনুযোগ ক'রে কোন লাভ নেই।''

ভোলাগিরি মহারাজ বিজয়কৃষ্ণকে সাধক ও আচার্য্য হিসাবে যথেষ্ট মর্য্যাদা দিতেন; একবার কোন বিশিষ্ট বাঙালী ভদ্রলোক গিরিজীর নিকট সাধনপ্রার্থী হন।

"আরে হামারা পাস কেঁও আয়া? উঁহা তো আশুতোষ হ্যায়, উন্‌সে লে লেও"---গিরি মহারাজ উত্তর দিলেন। বিজয়কৃষ্ণকে তিনি স্নেহ করিয়া বলিতেন, আশুতোষ। বিজয়কৃষ্ণের দেহত্যাগের পর তিনি বাঙ্গালীদের দীক্ষা দিতে শুরু করেন।

লোকনাথ ব্রহ্মচারী ও গোস্বামীপ্রভুর মধ্যে বরাবরই এক ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বর্ত্তমান ছিল। লোকনাথ সে সময়ে বাস করতেন বারদী গ্রামে। তখন তাঁহার বয়স প্রায় পৌনে দুই শত বৎসর। কঠোর-স্বভাব শক্তিধর এই মহাপুরুষ বিজয়কৃষ্ণকে বড় স্নেহ করিতেন। বিজয়কৃষ্ণও প্রায়ই তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ না করিয়া স্থির থাকিতে পারিতেন না। দুই মহাপুরুষের মিলনে দেখা দিত গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম, উৎসারিত হইত দিব্য আনন্দের ধারা!

ব্রহ্মচারীজী স্বভাবতঃ দুর্মুখ ও রুক্ষ প্রকৃতির হইলে কি হয়, বিজয়কৃষ্ণকে দেখিলেই তাঁহার আনন্দ উথলিয়া উঠিত। একবার গোস্বামীজী তাঁহার দর্শনে গিয়াছেন, তিনি রসিকতা করিয়া এক বৈষ্ণবকে বলিলেন, "ওগো, তোমাদের গৌরাঙ্গ হচ্ছে মাটির, পাথরের। আর এই ছাখো আমার গৌরাঙ্গ, এ জীবন্ত।"

গোস্বামীপাদের সহিত পরিচিত হইবার পর হইতেই লোকনাথ ব্রহ্মচারীর নাম এ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে, বিশেষতঃ শিক্ষিত সমাজে ছড়াইয়া পড়িতে থাকে।

সাধনজীবনে গোঁসাইজী এ সময়ে এমন স্তরে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন যেখানে ধর্ম্ম, সমাজ ও সম্প্রদায়ের যত কিছু গণ্ডী ও ভেদরেখা স্বতঃই

বিলুপ্ত হইয়া যায়। এইবার গুরু পরমহংসজীর কথা ফলিয়া উঠিল। সাপের খোলসের মত ব্রাহ্মসমাজের আবরণটি হঠাৎ একদিন স্খলিত হইয়া পড়িল। ১৯০৮ সালে চিরতরে তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করিলেন।

শিষ্যদের উৎসাহে ও সমবেত চেষ্টায় গেণ্ডারিয়ার আশ্রমটি এবার ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠে। সিদ্ধপুরুষ গোঁসাইজীকে কেন্দ্র করিয়া উচ্ছ্বসিত হয় দিব্য আনন্দের তরঙ্গ। যোগ, তপ ও ভজনের সাথে বহিয়া চলে শাস্ত্রপাঠ, ধর্ম্মালোচনা ও নামকীর্ত্তনের ধারা।

সে-বার দ্বারভাঙ্গায় গিয়া গোঁসাইজী শূলবেদনায় শয্যাশায়ী হইয়া পড়েন। ডাক্তারদের চিকিৎসায় কোনই ফল হইতেছে না। স্পষ্টই বুঝা গেল, রোগীর বাঁচার কোন আশা নাই।

বন্ধুবান্ধব ও ভক্তেরা হাল ছাড়িয়া দিলেন। সেদিন এমন সময়ে দেখা গেল, বাড়ীর বারান্দায় এক গৌরতনু দীর্ঘকায় সন্ন্যাসী চুপচাপ বসিয়া রহিয়াছেন! সকলেরই মন চঞ্চল ও বিষাদগ্রস্ত, কেহই এ সাধুটিকে লক্ষ্য করে নাই। অপরাহ্ণ হইতে কিন্তু দেখা গেল, গোস্বামীজী দ্রুত আরোগ্যের পথে যাইতেছেন।

সঙ্কট কাটিয়া গেল, রোগী অল্প সময়ের মধ্যে সুস্থ হইয়া বসিলেন। শুধু তাহাই নয়, সকলকে বিস্মিত করিয়া গোঁসাইজী সেদিনই সন্ধ্যাকালে তুমুল বিক্রমে উদ্দণ্ড কীর্ত্তন শুরু করিয়া দিলেন। ডাক্তার ও ভক্তেরা তো এ দৃশ্য দেখিয়া হতবাক্!

গোস্বামীজী পরে ভক্তদের কাছে প্রকাশ করিয়াছিলেন, "তোমরা সেদিন লক্ষ্য ক'রনি। বারান্দায় যে সাধুটি নিভৃতে বসে ছিলেন, তিনিই গুরুদেব পরমহংসজী। স্বয়ং উপস্থিত থেকে সেদিন আমার মৃত্যুযোগ কাটিয়ে দিয়ে গেলেন। আর একথাও আমায় বলে গেলেন, বহুজনের হিতের জন্য তোমার আরো কিছুদিন বেঁচে থাকা দরকার।"

আপৎকালে শিষ্যদের আশ্রয় দান ও তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণের

দিকে গোস্বামীজীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। একবার মহেন্দ্রনাথ মিত্র নামক তাঁহার জনৈক শিষ্যকে তিনি ঢাকা হইতে কোন কাজে কলিকাতায় পাঠান। মহেন্দ্রবাবু কার্য্যোপলক্ষে বড়বাজার দিয়া যাইতেছেন। ক্ষুধার উদ্রেক খুব হইয়াছে, কিন্তু সঙ্গে আছে মাত্র চারিটি পয়সা। স্থির করিলেন, উহা দিয়া দুধ কিনিয়া খাইবেন।

ঠিক এমনি সময়ে এক সাধু আসিয়া ভিক্ষা চাহিয়া বসিলেন। কি আর করা যায়? তখনি পয়সা কয়টি তাঁহাকে দান করিতে হইল!

ঢাকায় ফিরিবামাত্র গোস্বামীজী স্মিতহাস্যে বলিয়া উঠিলেন, "সেদিন বড়বাজারের সাধুকে পয়সা ক'টা দিয়ে ভালই করেছেন।"

মহেন্দ্রবাবু তো অবাক! সুদূর ঢাকায় বসিয়া গোঁসাইজী কি করিয়া এ কথা জানিলেন? তিনি কি সর্ব্বজ্ঞ?

বিজয়কৃষ্ণ পরে সব কথা তাঁহাকে ভাঙ্গিয়া বলেন। ঐ দুধ পান করিলে মহেন্দ্রবাবুর তৎক্ষণাৎ কলেরা হইত, তাই ঠাকুর বিজয়কৃষ্ণেরই নির্দ্দেশে তাঁহারই পরিচিত এক সাধু ঐ পয়সা ক'টি হস্তগত করেন, তাঁহাকে সে দিন বাঁচান।

এ সময়কার সিদ্ধাবস্থায়, গোস্বামীপাদের জীবনে ও তাঁহার আশেপাশে নানা অলৌকিক ঘটনা ঘটিতে দেখা যাইত। শিষ্য কুলদানন্দজী প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে ইহার কিছু কিছু বর্ণনা তাঁহার দিন-লিপিতে রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

"মধ্যাহ্নে আহারান্তে ঠাকুর আমতলায় যাইয়া বসিলেন মহাভারত শ্রবণান্তে বেলা প্রায় ২টার সময়ে ঠাকুর বলিলেন—আমগাছ হতে আজ মধুক্ষরণ হচ্ছে, দেখতে পাচ্ছো? আমি হেঁট মস্তকে থাকি বলিয়া ওদিকে দৃষ্টি পড়ে নাই। ঠাকুর বলামাত্র একটু মাথা তুলিয়া দেখি, গাছ হইতে অবিশ্রান্ত শিশির-বিন্দুর মত কি যেন পড়িতেছে। আমতলায় শুষ্ক তৃণপত্র ও তুলসী গাছগুলি তেলপনা হইয়া গিয়াছে। মন্দিরের পূর্ব্ব ও উত্তরদিকের রোয়াকে ফোঁটা ফোঁটা

শিশিরবিন্দুর মত মধু পড়িয়া ভিজিয়া রহিয়াছে। তাতে বিস্তর ডেঁয়ে পিঁপড়া প্রভৃতি আসিয়া জড়াইয়া পড়িতেছে। সমস্ত গাছের পাতায় পাতায় অসংখ্য মধুমক্ষিকা গুন্ গুন্ করিয়া ঘুরিতেছে। একপ্রকার সদ্‌গন্ধে চিত্ত প্রফুল্ল হইয়া উঠিতেছে।

"ঠাকুর আবার বলিলেন,—কি, মধু ব'লে বুঝতে পারছো? এসময়ে শ্রীধর ও অশ্বিনী আসিয়া পড়িলেন; তাঁহারা দু-তিনটি শুষ্কপত্র চাটিতে চাটিতে বলিলেন,—বাঃ, এ তো বেশ মিষ্টি; মধুই বটে।

"আমার তেমন বিশ্বাস হইল না। আমি বৃক্ষের নিম্ন শাখার দুটি পাতা ছিঁড়িয়া ফেলিলাম, ঠাকুর শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন,—উঃ, কি কোরছো? ওভাবে পাতা ছিঁড়তে আছে?

"পাতা দুইটি হাতে লইয়া দেখিলাম—ঠিক যেন তরল আঠা মাখানো রহিয়াছে। চাটিয়া দেখিলাম খুব মিষ্টি। তখন আশ্রমস্থ দশ-বারজনকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া দিলাম, সকলেই আমপাতায় মধুর স্বাদ পাইয়া আশ্চর্য্য হইলেন।

ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—আমগাছে আবার এরূপ মধু পড়ে নাকি? ঠাকুর বলিলেন—শুধু আমগাছ কেন? যে সব বৃক্ষের তলায় বহুদিন নিষ্ঠার সহিত হোম, যাগ-যজ্ঞ, সাধন-ভজন তপস্যা হয়, অথবা যে সকল বৃক্ষের নীচে মহাত্মা মহাপুরুষদের আসন থাকে, সে সব বৃক্ষ মধুময় হয়ে যায়। সময়ে সময়ে সে সব বৃক্ষে মধুক্ষরণ হয়। খুব ভক্তির সঙ্গে পূজা করলে জলও মধুময় হয়। শান্তিপুরে গঙ্গাজলে একবার মধু পোকা পড়ছে উঠছে দেখে সন্দেহ হ'ল। জল একটু খেয়ে দেখলাম মিষ্টি-মধুর গন্ধ। বহু প্রাচীন নিমগাছ, তেঁতুলগাছ দেখেছি, তা থেকে, ঝরণার মত মধু পড়ে। কমণ্ডলু ভরে খেয়েছি, পরে অনুসন্ধানে জেনেছি —ওসব বৃক্ষের তলায় কোন সিদ্ধপুরুষের বা মহাপুরুষের আসন ছিল।"

গোঁসাইজী সম্বন্ধে ব্রহ্মচারীর আরও এক চমকপ্রদ অভিজ্ঞতার বিবরণ পাওয়া যায়—

"কয়েকদিন যাবৎ ঠাকুরের শরীরে সর্ব্বদাই বিন্দু বিন্দু ঘামের মত

দেখিয়া আসিতেছি। বেগে বাতাস করাতেও তাহা শুকায় না দেখিয়া সময়ে সময়ে সন্দেহ জন্মিয়াছে—কিন্তু জিজ্ঞাসা করিতে সাহস পাই নাই! ঠাকুর সময়ে সময়ে ভিজা গামছা লইয়া নিজেই গা পুঁছিয়া থাকেন, পিঠে হাত চলে না বলিয়া আমি পিঠ পুঁছিয়া দেই। প্রচুর পরিমাণে তৈল মাখিয়া স্নান করিয়া উঠিলে যেরূপ দেখায়, ঠাকুরকে কয়দিন যাবৎ সেইরূপ দেখিতেছি। মানুষের শরীরে ঘর্ম্মাকারে মধু বাহির হয়—কোথাও শুনি নাই, কোন পুস্তকেও পড়ি নাই। ঠাকুরের এ যে সমস্তই অদ্ভুত দেখিতেছি।

"স্নিগ্ধ সুমিষ্ট পদ্মগন্ধে সর্ব্বদাই ঘরটি আমোদিত হইয়া রহিয়াছে। বোল্‌তা, প্রজাপতি ও মধুমাছি ঘরে প্রবেশ করিয়া ঠাকুরের মাথার উপরে দুই চারি পাক ঘুরিয়া বাহির হইয়া যাইতেছে। হাতপাখার ঝাপ্‌টা হাওয়াতে ঠাকুরের শরীরে বা মস্তকে বসিবার অবসর পাইতেছে না। অসংখ্য পিঁপড়াও সময়ে সময়ে ঠাকুরের আসনের ধারে ও উপরে আসিয়া পড়িতেছে। দেখিলেই উহা ঝাড়িয়া সরাইয়া দিতেছি।

"ঠাকুর নত মস্তকে মুদ্রিত নয়নে স্থিরভাবে বসিয়া আছেন। তৈল-ধারার মত অবিরল অশ্রু বর্ষণে ঠাকুরের বক্ষঃস্থল ভাসিয়া কৌপীন বহির্ব্বাস ভিজিয়া যাইতেছে। ধ্যানমগ্নাবস্থায় ঠাকুরের মস্তক প্রতি শ্বাসপ্রশ্বাসে ধীরে ধীরে ঝুঁকিয়া বামদিকের হাঁটুর উপরে আসিয়া পড়ে। ঠাকুর এই অবস্থায় ৮।১০ মিনিট কাল থাকেন, পরে উঠিয়া বসেন। পুনঃপুনঃ এইভাবে পড়িয়া উঠিয়া অপরাহ্ণ ৪টা পর্য্যন্ত অতিবাহিত করেন। এই সময়ে ঠাকুরের দেহে যে সব অদ্ভুত অবস্থা প্রকাশ হয় তাহা আমার ব্যক্ত করিবার উপায় নাই; ঠাকুরের অসীম কৃপাতে দর্শন করিয়া ধন্য হইয়া যাইতেছি।" (শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু প্রসঙ্গ)

কুলদানন্দ সে সময়ে প্রায়ই বিজয়কৃষ্ণের কক্ষে শয়ন করেন। সেদিন শেষ রাত্রিতে এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখিয়া তিনি চমকিয়া উঠিলেন। তাঁহার দিনলিপিতে রহিয়াছে—

"দেখিলাম, একটি কৃষ্ণবর্ণ সাপ ঠাকুরের বাম অঙ্গ বাহিয়া মস্তকে

একটু ফণা বিস্তার করিয়া রহিল, পরে ধীরে ধীরে দক্ষিণ অঙ্গ বাহিয়া আবার নামিয়া গেল। ঠাকুর আমাকে বলিলেন—ইনি আসনের জাত-সাপ। সুবিধা পেলেই আসেন, জটা বেয়ে মাথায় উঠে কপালের উপরে কিছুক্ষণ ফণা ধরে থেকে চলে যান।

"সরুনালে এই প্রাণায়াম স্বাভাবিক ভাবে চলতে থাকলে তাতে বড় সুন্দর একটি শব্দ হয়। সাপ সেই সুর শুনতে বড় ভালবাসে। বাড়ীর যেখানেই সাপ থাক্ না কেন, দূর হ'তে উহা শুনতে পায়, আর তাতে আকৃষ্ট হয়। ক্রমে সাপ এসে ঐ সুর ধরতে গিয়ে, গায়ে, ঘাড়ে, মাথায় উঠে পড়ে। নাকের পাশে, কপালের উপর ফণা বিস্তার করে, স্থির হয়ে ঐ সুর শুনতে থাকে। সময়ে সময়ে নিজের শিস্ও ওতে মিশিয়ে দিয়ে বড়ই আনন্দ পায়। মহাদেবের ঘাড়ে মাথায় যে সাপ থাকে, তা কিছুই অস্বাভাবিক নয়, সাধন চললে তোমাদেরও গায়ে সাপ উঠতে পারে। এই সাপ কখনও অনিষ্ট করে না, এদের দ্বারা বিস্তর সাহায্যই পাওয়া যায়। এরা ছোঁ মারে না, শিস্ ফেলে আবার প্রাণায়াম হলেই চলে যায়।"

সেবার ঢাকার শিষ্যদের নিয়া গোঁসাইজী বৈষ্ণবদের পবিত্র ধূলট উৎসব মহা সমারোহে উদ্‌যাপন করেন।

ব্রাহ্মসমাজের গণ্ডী-বিনিষ্ক্রান্ত গোঁসাইজীর জীবনে ভক্তির প্রবাহ এবার উপচিয়া পড়িতেছে। সমগ্রনগরীর জীবনকে তাহা আনন্দে উদ্বেল করিয়া তুলিল। শত শত মৃদঙ্গ-করতাল বাজিতেছে, আর বিপুল জনতা প্রভুপাদকে ঘিরিয়া গাহিয়া চলিয়াছে—

"হরি ব'লব মুখে যাব সুখে ব্রজধাম,
কলিতে তারক ব্রহ্ম হরিনাম।
এ নাম শিব জপিছেন পঞ্চমুখে,
নারদ করেন বীণায় গান।
এবার গুরু নামে দিয়ে ডঙ্কা,
রাধা নামে দাও বাদাম।

এই নামসুধা পান করিয়া সহস্র সহস্র লোক সেদিন উন্মত্তপ্রায়—মহাভাবে মাতোয়ারা। এই ধূলট উৎসবে বিজয়কৃষ্ণের উদ্দণ্ড নৃত্য প্রেমভক্তির বন্যা বহাইয়া দেয়। অষ্টসাত্ত্বিক প্রেমবিকার তাঁহার ভক্তিসিদ্ধ দেহে প্রকটিত হয়। এ স্বর্গীয় দৃশ্য দেখিয়া জনতা অভিভূত হইয়া পড়ে। কীর্ত্তন-উৎসবে অনেকের উপর গোঁসাইজীর অলৌকিক শক্তি সঞ্চারণের কথা ঢাকাবাসী দীর্ঘকাল বিস্মৃত হয় নাই।

সে-বার গোস্বামীজী কাশীতে অবস্থান করিতেছেন। কাশীর ধর্ম্মসভার বাৎসরিক অধিবেশন এসময়ে অনুষ্ঠিত হয়। কৃষ্ণানন্দ স্বামী এই সভার প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা. স্বামীজী গোস্বামীপ্রভুকে নিমন্ত্রণপত্র পাঠাইতেছেন, এ সময়ে কয়েকটি লোক বক্রোক্তি করিয়া বলে, "ইনি তো গৃহী সন্ন্যাসী! গার্হস্থ্য ধর্ম্মটি ঠিকই বজায় রেখেছেন।"

অন্তর্যামী গোঁসাইজীর দিব্য দৃষ্টিতে এসব এড়ায় নাই। তিনি সদলবলে এই ধর্ম্মসভায় উপস্থিত হইলেন। সভার পর কীর্ত্তন শুরু হইল এবং বিজয়কৃষ্ণের নাচগান ও উদ্দণ্ড নৃত্যে সেদিন জাগিয়া উঠিল প্রচণ্ড উদ্দীপনা! পরম ভাগবতের দেহে অশ্রু, কম্প, পুলক প্রভৃতি একি ভাবের বিকাশ! দেখিয়া সকলে হতবাক হন, শ্লেষোক্তি যাঁহারা করিয়াছিলেন, তাঁহারা বারবার ক্ষমা প্রার্থনা করিতে থাকেন।

কাশীর মঠ ও মন্দিরে গোস্বামীজী এ সময়ে প্রায়ই বিগ্রহ দর্শনে যান। ঢুকিবামাত্রই 'বম্ ভোলা—বম্ ভোলা' হুঙ্কারে চারিদিকে কাঁপাইয়া তোলেন। নয়নকোণ হইতে ফোয়ারার মত অশ্রুজল উৎসারিত হইতে থাকে। সে এক মর্ম্মস্পর্শী দৃশ্য! আরতি শেষ হইলে তাঁহার পদধূলি গ্রহণের ভীড় লাগিয়া যায়, প্রায় সময়েই মন্দিরে শৃঙ্খলা রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়ে।

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতীর সহিত গোঁসাইজীর এ সময়ে একবার সাক্ষাৎ হয়। তাঁহাকে পরম সাদরে গ্রহণ করিয়া স্বামীজী মহারাজ নানা শাস্ত্রালাপ করেন। বিশুদ্ধানন্দজী অনেককে ইহার পর বলিতেন,

"বহুত সাধু মঁয় দর্শন কিয়া, লেকিন ইয়ে বঙ্গালী সাধুকা মাফিক অওর কোঈ সাধু নহি দেখা।"

কাশীধামে তখন ভাস্করানন্দজীর যোগবিভূতির খুব খ্যাতি। গোঁসাইজী একদিন শিষ্যগণসহ তাঁহার সহিত দেখা করিতে যান। আশ্রমে পোঁছিয়া শুনিলেন, স্বামীজী মহারাজ ধ্যানমগ্ন রহিয়াছেন, এখন ভেট হইবে না।

দর্শন না করিয়া গোস্বামীপাদও নড়িবেন না। শিষ্যদের নিয়া তিনি আশ্রমের বাহিরে এক বৃক্ষমূলে বসিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই ভাস্করানন্দ নয়ন উন্মীলন করিলেন।

বাহ্যজ্ঞান প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে শিষ্যদের কহিলেন, "বাগানের বৃক্ষতলে এক শক্তিমান মহাপুরুষ উপবিষ্ট রয়েছেন। চল, এখনি আমরা সেখানে গিয়ে তাঁর সাথে মিলিত হই।"

উভয়ের সাক্ষাৎকারে দিব্য আনন্দের স্রোত বহিয়া গেল।

প্রসিদ্ধ সাধক দ্বারকাদাস বাবাজীর সহিত গোস্বামীপ্রভুর দেখা করার অভিলাষ হয়। বাবাজী মহারাজ দিনের বেলায় কাশীর সন্নিহিত এক বনে প্রবেশ করিয়া সাধন ভজনে রত হন, তারপর রাত্রে স্বস্থানে ফিরিয়া আসেন। আশ্রমে সেদিন তাঁহার দেখা না পাইয়া গোস্বামীজী নিজের নাম-ঠিকানা রাখিয়া আসিলেন। পরদিন সকলে বিস্মিত হইয়া দেখেন, দ্বারকাদাস বাবাজী নিজেই বিজয়কৃষ্ণের আবাসে আসিয়া উপস্থিত। সসম্ভ্রমে বহুক্ষণ তাঁহার সহিত নানা কথাবার্ত্তা বলিয়া তিনি বিদায় গ্রহণ করিলেন।

এ সময়ে গুরু পরমহংসজীর নির্দ্দেশে বিজয়কৃষ্ণ কিছুদিনের জন্য বৃন্দাবনে বাস করেন। গুরু তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিয়াছিলেন, "যাও বাচ্চা, ব্রজভূমিতে গিয়ে কিছুদিন ভজন সাধন কর। বড় জাগ্রত সে স্থান। সেখানে এ সময়ে থাকলে রাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলা তুমি প্রত্যক্ষ করতে পারবে।"

প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ যেন পরমহংসজীর এক অনন্যসাধারণ সৃষ্টি !

শক্তিধর গুরুর কৃপায় তাঁহার উদ্গত জীবনে হইয়াছে অলৌকিক বিভূতি আর প্রেমভক্তির মধুরস। যোগসিদ্ধ দেহের আধারে ভক্তির রস টলমল করিয়া উঠিয়াছে। অসামান্য যোগবিভূতির সাথে আসিয়া মিলিয়াছে বিরল প্রেমভক্তি!

শান্তিপুরের কাছে বাবলায় অদ্বৈতপ্রভুর এক ভজনস্থান আছে। বাল্যকাল হইতে বিজয়কৃষ্ণের এখানে খুব যাওয়া আসা ছিল। ধর্ম্ম-জীবনের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে এ পবিত্র ভূমির আকর্ষণ তাঁহার নিকট আরও বাড়িয়া যায়। শান্তিপুরে আসিলেই এখানে কিছুকাল তিনি ধ্যান-ভজন-জপে কাটাইয়া যাইতেন।

সে-বার শিষ্যগণসহ বাবলায় উপস্থিত হইয়াছেন। সকলকে বলিলেন, "ছাখো, এখানকার আবহাওয়া অপূর্ব্ব, একটু স্থির হয়ে বসলে বা অন্তর্ম্মুখীন হ'লে তা টের পাওয়া যায়।" কুলদানন্দ ব্রহ্মচারীজী সেদিনকার এক মনোরম অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়াছেন—

"আমরা সকলেই স্থিরভাবে বসিয়া নাম করিতে লাগিলাম। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা ও মুহুর্মুহু শঙ্খধ্বনি সংযোগে একটি মহাসঙ্কীর্ত্তন ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইতেছে। ভাবিলাম, ঠাকুরকে এস্থানে আজ উপস্থিত জানিয়াই বুঝি আশপাশের লোক সঙ্কীর্ত্তন লইয়া এস্থানে আসিতেছেন। আমরা খুব উৎসাহের সহিত নাম করিতে লাগিলাম। সঙ্কীর্ত্তনের ধ্বনিতে আমাদের চিত্ত নাচিয়া উঠিল।

"দুই এক মিনিট অন্তরেই, সঙ্কীর্ত্তন আসিয়া পড়িয়াছে সুস্পষ্ট বোধ হওয়াতে, আমরা কেহ কেহ আসন ছাড়িয়া সঙ্কীর্ত্তনে যোগ দিতে মন্দিরের বাহির হইয়া পড়িলাম এবং অদূরেই সঙ্কীর্ত্তন হইতেছে বুঝিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। অদ্ভুত ভগবানের খেলা। ঠাকুরকে ছাড়িয়া যতই আমরা সঙ্কীর্ত্তনে যোগ দিবার আকাঙ্ক্ষায় চলিতে লাগিলাম, ততই সঙ্কীর্ত্তনের ধ্বনি ক্রমশঃ হ্রাস পাইয়া, দুই-এক মিনিটের মধ্যে একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া গেল।

"আমরা আসিয়া ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—সঙ্কীর্ত্তনের মহাকোলাহল শুনিয়া তাহাতে যোগ দিবার আকাঙ্ক্ষায় যেমন আমরা মন্দিরপ্রাঙ্গণ হইতে বাহির হইয়া ছুটাছুটি করিতে লাগিলাম, জানি না অকস্মাৎ কি প্রকারে সেই সঙ্কীর্ত্তন মুহূর্ত্তমধ্যে কোন দিকে চলিয়া গেল।

"ঠাকুর বলিলেন, 'ছেলেবেলায় প্রায়ই আমি বাব্‌লায় আসতাম—এই সঙ্কীর্ত্তন শুনতাম, তখন একবার এদিক্ একবার ওদিক্ ছুটাছুটি করতাম। স্থির হ'য়ে ব'সে নাম করলেই, ক্রমে ওতে আরও যোগ দিতে পারতে। এই সঙ্কীর্ত্তন সাধারণ কীর্ত্তন নয়। তোমরা খুব ভাগ্যবান—মহাপ্রভুর সঙ্কীর্ত্তনধ্বনি শুনেছ।"

আর একদিন গোঁসাইজীকে কেন্দ্র করিয়া সেখানে এক বিস্ময়কর কাণ্ড ঘটে। কুলদানন্দের দিনলিপিতে এ তথ্যটিরও উল্লেখ রহিয়াছে—"এক দিবস ঠাকুর চৌদ্দ মাদল লইয়া বহুলোক সমেত নিজ বাড়ী হইতে সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে বাব্‌লায় চলিলেন। গৃহপালিত কুকুরটিও সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

"এ কুকুর সাধারণ কুকুর নয়। শুনিলাম, জীবনে কখনও এই কুকুর মাংস বা উচ্ছিষ্ট খায় নাই। কুকুর 'কেলে' প্রত্যহ শ্যামসুন্দরের মন্দির পরিক্রমা করিত। খোল-করতালের শব্দ পাইলে সেইস্থানে গিয়া উপস্থিত হইত এবং নিবিষ্টচিত্তে একস্থানে বসিয়া সঙ্কীর্ত্তন শ্রবণ করিত। কখনো কখনো উহার অশ্রুধারা নির্গত হইত। ঠাকুর কেলেকে 'ভক্তরাজ' বলিয়া ডাকিতেন। কেলে নাকি মহাপুরুষ, বিশেষ কোনও কার্য্য সাধনের জন্য সংসারে আসিয়াছে।

"সঙ্কীর্ত্তনের সঙ্গে আনন্দ করিয়া কেলে ঠাকুরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। কিন্তু গঙ্গার খাত পার হইবার সময় সহযাত্রীদিগের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি কেলেকে তাড়াইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। কেলে তখন নিরুপায় হইয়া দৌড়িয়া গিয়া ঠাকুরের পায়ে লুটাইয়া পড়িল। ঠাকুর কেলের গমনে বাধা দিতে নিষেধ করিলেন।

"অচিরেই হরিসঙ্কীর্ত্তন মন্দির অঙ্গনে প্রবেশ করিল। তখন ভাবাবেশে মত্ত হইয়া সকলেই উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে লাগিলেন এবং চতুর্দ্দিকে অপ্রাকৃত মহাসঙ্কীর্ত্তনের মৃদঙ্গ করতালের ধ্বনি শুনিয়া সকলেই মাতোয়ারা হইলেন। কেহ কেহ অদূরে সঙ্কীর্ত্তন আসিতেছে ভাবিয়া তাহাতে যোগ দিবার মানসে এদিকে সেদিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। কিন্তু যতই তাঁহারা মন্দির হইতে তফাৎ হইতে লাগিলেন, ততই সেই সঙ্কীর্ত্তনের ধ্বনি আর শুনিতে পাইলেন না।

"এই সময় 'ভক্তরাজ' কেলে কিঞ্চিৎ ব্যবধানে পঞ্চবটীর নিকটে একটি স্থানে দৌড়াইয়া গিয়া সজোরে মৃত্তিকা আঁচড়াইতে লাগিল এবং পরক্ষণেই ঠাকুরের নিকট আসিয়া চীৎকার করিতে করিতে ঠাকুরের বহির্ব্বাস কামড়াইয়া ধরিয়া সজোরে আকর্ষণ করিতে লাগিল।

"ক্রমাগত তাহাকে এইরূপ করিতে দেখিয়া ঠাকুর কেলের সঙ্গে সঙ্গে গিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং উহা খুঁড়িবার জন্য আদেশ করিলেন। নিকটবর্ত্তী কৃষকদের গৃহ হইতে দু'খানি কোদাল আনিয়া ঐ স্থান খনন করা হইল। খানিক দূর খনন করিয়া কিছুই না পাওয়াতে খননকারীরা নিবৃত্ত হইল।

"এই সময় 'ভক্তরাজ' ঠাকুরের দিকে সতৃষ্ণনয়নে তাকাইয়া চীৎকার করিতে লাগিল এবং নখদ্বারা মৃত্তিকা আবার ব্যস্ততার সহিত আঁচড়াইতে আরম্ভ করিল।

"ইহা দেখিয়া ঠাকুর আরও মৃত্তিকা খনন করিতে বলিলেন। এইবার কিছুক্ষণ খুঁড়িতেই একটি পিতলের হাঁড়ি বাহির হইয়া পড়িল। উহার ভিতরে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর নামাঙ্কিত এক জোড়া কাষ্ঠপাদুকা, একটি মাটির করোয়া এবং হস্তলিখিত ছিন্নপুঁথি একটি বাক্সর ভিতর রহিয়াছে দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইলেন। ঠাকুর ঐ পাদুকা মস্তকে ধারণ করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন।

"সঙ্কীর্ত্তন আবার আরম্ভ হইল। ঠাকুর ভাবাবেশে অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। সংজ্ঞালাভ করিয়া দেখিলেন 'ভক্তরাজ' কেলেও অচৈতন্য।

ঠাকুর তাহার কাণে নাম শুনাইতে লাগিলেন। ক্রমে কেলে উঠিয়া দাঁড়াইল। ঠাকুর তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া—'যে কার্য্যের জন্য তুমি এসেছিলে, আজ তা সম্পন্ন হ'লো, এখন তুমি গঙ্গালাভ কর' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

"প্রহরাধিক রাত্রির পর সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে সকলে গৃহে আসিল। পরদিন প্রাতে গঙ্গাস্নানে গিয়া সকলে দেখিল একহাঁটু জলে কেলের মৃতদেহ ভাসিতেছে! ঠাকুর নিজহস্তে গঙ্গাতীরের বালুকা খনন করিয়া 'ভক্তরাজ' কেলের দেহ সমাধিস্থ করিলেন।"

বৃন্দাবনে পৌঁছিবার পর পরম ভাগবত গৌরকিশোর দাসের সহিত গোস্বামীপাদের ঘনিষ্ঠতা ও বন্ধুত্ব হয়। দুজনে মিলিয়া মহানন্দে এই সময়ে কৃষ্ণপ্রেমরস আস্বাদন করিতেন।

বৃন্দাবনে কয়েকটি প্রভাবশালী গোস্বামী গোড়ার দিকে বিজয়কৃষ্ণের প্রতি বিরূপ আচরণ প্রদর্শন করেন। তাঁহার উপর বেশ কিছুটা অত্যাচারও হয়। একবার একদল দুষ্ট গোঁসাই তো অলক্ষ্যে তাঁহার শিরে দুর্গন্ধময় গোবর জলই ঢালিয়া দেয়। এই দুষ্কৃতিকারীদের একজন স্বপ্নে আদেশ পায় যে, প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ এক মহাপুরুষ—পুষ্পমাল্য দিয়া তাঁহার উপযুক্ত অভ্যর্থনা না করিলে তাহারা সকলে বিনষ্ট হইবে। এ স্বপ্নাদেশের কথা শুনিয়া দুষ্কৃতেরা ভীত হয়, বিজয়কৃষ্ণের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া, মাল্য দিয়া তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা জানায়।

সেদিন বৃন্দাবনের রাধাবাগে বসিয়া গোস্বামীপ্রভু গভীর ধ্যানে নিমগ্ন আছেন। এ সময়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তিতে তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হন। এই অলৌকিক দর্শন জাগাইয়া তোলে এক মহাভাবের প্রবাহ। গোঁসাইজী বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া ফেলেন।

উত্তরকালে গোঁসাইজীকে প্রায়ই বলিতে শুনা যাইত, বৃন্দাবনের বনাঞ্চলে বৈষ্ণব মহাপুরুষেরা বৃক্ষরূপ ধারণ করিয়া অবস্থান করেন। এ পুণ্যক্ষেত্রের অপ্রাকৃত লীলা দর্শনের জন্যই তাঁহারা আসেন। তিনি

ভক্ত ও শিষ্যদের বলিতেন,—এই সকল বৈষ্ণব মহাপুরুষদের সহিত তাঁহার বহুবার সাক্ষাৎ ঘটিয়াছে!

পরিকরবৃন্দসহ গোস্বামীজী সেদিন যমুনাপুলিনে বেড়াইতেছেন, বালুর মধ্যে হঠাৎ মৃতদেহের একটি অস্থি পাওয়া গেল। এই অস্থি হাতে তুলিয়া নিয়া প্রভুপাদ সঙ্গীদিগকে কহিলেন, "চেয়ে ছাখো, এই পবিত্র হাড়গুলোতে 'হরেকৃষ্ণ' নাম চিহ্নিত রয়েছে। বৃন্দাবনের বৈষ্ণবদের নামসাধনার কি প্রভাব! নিরন্তর নাম করার ফলে তাঁদের অস্থি-মজ্জা এইরূপই নামাঙ্কিত হয়ে যায়।"

এক বাঙালী ভদ্রলোক এসময়ে বৃন্দাবনে বেড়াইতে আসিয়াছেন। গোঁসাইজী প্রভুকে তিনি খুব শ্রদ্ধা করেন। প্রভু এখানে আছেন জানিয়া ব্যগ্রভাবে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

কথাপ্রসঙ্গে কহিলেন, "প্রভু, বৃন্দাবনের মাহাত্ম্যের কথা কেবল কাণে শুনেই গেলাম, কিন্তু কিছুই অনুভূত হ'লো না। এ স্থানের বিশেষত্বও কিছু জানতে পারলাম না।"

গোস্বামীজী বলিলেন, "আপনি একি কথা বলছেন? এ যে অপ্রাকৃত ধাম! ব্রজরজের মহিমা নিশ্চয়ই আছে! একবার নাম করে এই পবিত্র ভূমিতে আপনি লুটিয়ে পড়ুন দেখি।"

আগন্তুক একথা শুনিয়া ধূলোয় গড়াগড়ি দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হইল তাঁহার অদ্ভুত ভাবোন্মত্ততা। অঝোর ধারে তিনি কাঁদিতে লাগিলেন! দুই চোখে অবিরল ধারায় কেবলি অশ্রু ঝরিতেছে, আর ব্রজের পবিত্র ধূলি তিনি বারংবার গায়ে লেপন করিতেছেন। বহু কষ্টে সেদিন তাঁহাকে শান্ত করা গেল।

যোগমায়া দেবী এই সময়ে কিছুকালের জন্য বৃন্দাবনে আসিয়া বাস করেন। গোঁসাইজী পত্নীসহ বাস করিতেছেন, এজন্য বৃন্দাবনের কোন কোন সাধুকে বিদ্রূপ ও কটাক্ষ করিতে দেখা যায়।

ব্রজবিদেহী মোহান্ত রামদাস কাঠিয়া-বাবার কাণে একথা পৌঁছে।

বাবাজী মহারাজ বিজয়কৃষ্ণের মর্ম্ম জানিতেন। তিনি বিদ্রূপকারীদের তীব্রস্বরে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "তোমরা চুপ কর। এই মহাত্মা এক মহাসমর্থী পুরুষ। তেজস্বী সাধক ব্যক্তি হচ্ছেন ঠিক আগুনের মত, সব কিছু তাঁর তেজে দগ্ধ হয়ে যায়। গৃহে বাস করলে এঁর মত সাধুর কোন ক্ষতি হয় না।"

বৃন্দাবনে থাকাকালে গোঁসাইজীর পত্নী যোগমায়া দেবী বলিয়াছিলেন—রাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলা স্থান এই ব্রজধাম, এখানেই তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করিবেন। হইলও তাহাই। শুদ্ধাত্মা সাধিকা অল্পদিন পরেই নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হইলেন।

যে কোন অবস্থায়, যে কোন সময়ে নামকীর্ত্তন শুনিলে গোস্বামীপ্রভুর বাহ্যজ্ঞান থাকিত না—সমগ্র সত্তায় মহাভাবের তরঙ্গ উদ্বেলিত হইয়া উঠিত। বৃন্দাবনে সেদিন এক কৌতুককর ঘটনা ঘটে।

গোস্বামীজীর আবাসের নিকট দিয়া এক সংকীর্ত্তন চলিয়াছে। তিনি তখন শৌচাগারে। শৌচক্রিয়া শেষ না করিয়াই দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হইলেন এবং কীর্ত্তনে গিয়া যোগ দিলেন। ভাবাবেশে একেবারে মাতোয়ারা! নাম কীর্ত্তন ও হরিলুট শেষে যখন বাড়ী ফিরিলেন তখন স্মরণ হইল—তাই তো! শৌচকার্য্য তো করা হয় নাই! এমনি ছিল তাঁহার ভক্তি ও প্রেমের আবেশ, এমনি প্রগাঢ় ছিল নামে রতি!

খণ্ডবুদ্ধির পরপারে ছিল এই মহাসাধকের নিরন্তর অবস্থিতি। পাপ-পুণ্য ও শৌচাশৌচবোধের প্রয়োজন তাই তাঁহার কাছে অর্থহীন হইয়া গিয়াছিল।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণের এ সময়কার সাক্ষাৎটি বড় মর্ম্মস্পর্শী। কুলদানন্দজী তাঁহার দিনলিপিতে ইহার এক অপূর্ব্ব বিবরণ দিয়াছেন—

"ঠাকুর দুই বেঞ্চের মধ্যস্থলে যাইয়া নমস্কার করিয়া, মহর্ষির চরণদ্বয় তাঁহার মস্তকে ধারণ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। ঐ সময়ে পবিত্রমূর্ত্তি

বৃদ্ধ মহর্ষির শুভ্র মুখমণ্ডল রক্তিম হইয়া উঠিল, তিনি করপুট বক্ষঃস্থলে স্থাপন পূর্ব্বক, মস্তক ঘন ঘন কম্পিত করিয়া গদগদ স্বরে 'নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়, গোব্রাহ্মণহিতায় চ। জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ, গোবিন্দায় নমোনমঃ, গোবিন্দায় নমোনমঃ।' পুনঃ পুনঃ বলিতে বলিতে শিহরিয়া উঠিতে লাগিলেন, গণ্ডস্থল ভাসাইয়া অশ্রুধারা বর্ষণ হইতে লাগিল। ঠাকুরও ভাবাবেশে যেন অবশাঙ্গ হইয়াই মহর্ষির বামভাগস্থিত চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। ঠাকুর ও মহর্ষি উভয়েই কিছুক্ষণের জন্য নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। আমরাও সকলে ঐ সময়ে মহর্ষিকে ভূমিতে পড়িয়া প্রণাম করিলাম এবং উভয় পার্শ্বস্থ লম্বা বেঞ্চে বসিয়া পড়িলাম। প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয় মহর্ষির দক্ষিণ দিকের চেয়ারে বসিয়াছিলেন। আমাদিগকে দেখিয়া, মহর্ষি তাঁহাকে বলিলেন, 'ইঁহাদের দেখিয়া আমার বড়ই আনন্দ হইতেছে, ইঁহারা কে?' শাস্ত্রী মহাশয় মহর্ষির কাণের কাছে মুখ রাখিয়া, উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন —ইঁহারা সকলে গোঁসাইর শিষ্য।

"মহর্ষি বলিলেন, 'মানুষ যখন একটা উৎকৃষ্ট খাবার বস্তু পায়, শুধু নিজে না খেয়ে অন্যান্যকেও উহা দিতে ইচ্ছা করে, ইনিও সেইরূপ নিজে যাহা ভোগ করেছেন, শিষ্যদিগকেও তাহা দিচ্ছেন; ইহাতে ওঁর বিন্দুমাত্রও স্বার্থ নাই, শিষ্যদের কল্যাণই আকাঙ্ক্ষা করেন। ইনিই ধন্য, ইনিই যথার্থ শিষ্যদের সন্তাপহারক। ইঁহার দর্শনে প্রাচীন ঋষিদের ভাবই প্রাণে জাগ্রত হয়।'

"তিনি আবার বলিতে লাগিলেন—'ভগবানকে যেমন ভাবে পেতে আকাঙ্ক্ষা, তেমনি ভাবে পাচ্ছি না। সময় সময় তিনি দয়া করে দর্শন দিয়ে বিদ্যুতের মত অদৃশ্য হয়ে যান, যতক্ষণ আবার সেই প্রেমময়ের উজ্জ্বল রূপ দর্শন না পাই, উন্মত্তের মত থাকি, প্রাণ আমার ধড়ফড় করে—সময় যে কি ভাবে কাটাই, তিনিই জানেন। তিনি দয়া করে দর্শন না দিলে, কি আর করব। জ্ঞানের দ্বারা কখনও তাঁকে লাভ করা যায় না, জ্ঞান তো একটা কথার কথা মাত্র। যথার্থ প্রেম ভক্তিই

তাঁকে লাভ করবার একমাত্র উপায়। তা তো আর চেষ্টাসাধ্য নয়। তাঁরই দয়ায় হয়; পুরুষকার—অর্থশূন্য কথা। তাঁর চরণে নির্ভরই সার। শ্বেত অশ্বমেধের ঘোড়া করে তিনি আমাকে গ্রহণ করবেন বলেছেন। তাঁর এই বাক্যই ভরসা করে, তাঁর দয়ার দিকে চেয়ে পড়ে আছি।'

"এই বলিয়া মহর্ষি বালকের মত ক্রন্দন করিতে করিতে একেবারে অধীর হইয়া পড়িলেন। ঠাকুর 'জয়গুরু জয়গুরু', বলিতে লাগিলেন। একটু পরে, চোখ মুখ মুছিয়া মহর্ষি ঠাকুরকে বলিতে লাগিলেন, 'যে ক্ষেত্রে ভগবানের কৃপা অবতীর্ণ হয়, পূর্ব্ব হ'তেই তার লক্ষণ দেখা যায়। জন্ম, সঙ্গ, শিক্ষা ও সাধন, এই চারিটি একসঙ্গে না থাকলে প্রকৃত সত্য বস্তু, ষোল আনা ধর্ম্ম লাভ হয় না। তোমাতে এই চারিটি উপযুক্তরূপে রয়েছে। অদ্বৈত প্রভুর বিশুদ্ধ বংশে তুমি জন্মগ্রহণ করেছ, সদ্‌গুরুর আশ্রয়লাভ করেছ, তাঁর কৃপায় প্রকৃত সৎশিক্ষা ও সদুপদেশ পেয়েছ। তারপর, মনুষ্যচেষ্টায় সাধন ভজনও যতটা সম্ভব, তাহাও পূর্ণমাত্রায় তুমি করেছ, সর্ব্বোপরি ভগবানের কৃপা, তাহাও তোমার প্রতি যথেষ্ট রয়েছে। তুমি ধন্য।' এই বলিয়া মহর্ষি সংস্কৃত একটি শ্লোক পড়িলেন—

কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা, বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন।
নৃত্যন্তি স্বর্গে পিতরস্তু তেষাং, যেষাং কুলে বৈষ্ণব নাম ধেয়ঃ॥

"তুমি যাহাই কর, যখন যেরূপ ভাবে চল, ভগবান তাহাই অতি সুন্দর দেখছেন।"

"ঠাকুর বলিলেন—আপনিই তো আমাকে হাতে ধরে মানুষ করেছেন! আমার সবই তো আপনা হ'তে। আপনিই আমার গুরু।

"ঠাকুরের কথা শেষ হইতে না হইতেই, মহর্ষি একটু হাসিয়া বলিলেন, 'হ্যাঁ, তা ঠিকই ব'লেছ, গুরু তো বটেই। তবে সে যে পাঠশালার ছেলেদের গুরুমশায়ের মত। ক, খ শিখতে হ'লে প্রথমে যেমন ছেলেদের গুরুমহাশয়ের নিকটে শিখতে হয়, পরে ঐ ছেলেরাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা পেয়ে ঐ গুরুমহাশয়েরও গুরুর উপযুক্ত হয়।

এখন পাঠশালার গুরুমহাশয়কে গুরু বললে যেমন হয় তোমার বেলাও ঠিক সেইরূপই হচ্ছে।' ঠাকুর চুপ করিয়া রহিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তখন এই প্রকার নানা কথা তুলিয়া ঠাকুরের প্রশংসা ও স্তুতিবাদ করিতে লাগিলেন। ঠাকুর তখন গাত্রোত্থান করিয়া মহর্ষির চরণদ্বয় মস্তকে ধারণ করিয়া বলিলেন,—আমি আপনার বালক, আমাকে আপনি আশীর্ব্বাদ করুন্!

"মহর্ষি প্রতিনমস্কার করিয়া বলিলেন,—আমি তোমায় আশীর্ব্বাদ করতে পারি না, আমি তোমায় শ্রদ্ধা করি। তোমার জয় হোক।

"আমরাও সকলে একে একে মহর্ষির চরণ স্পর্শ করিয়া প্রণাম করতঃ বাসায় ফিরিতে প্রস্তুত হইলাম। মহর্ষি খুব হৃষ্টান্তঃকরণে আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন,—তোমাদের মঙ্গল হবে, গোঁসাইকে তোমরা কখনো ছেড়ো না, ইনি তোমাদের সকলকে অনন্ত উন্নতির পথে নিয়ে যাবেন।"

সে-বার প্রয়াগে মহাসমারোহে কুম্ভমেলা অনুষ্ঠিত হইতেছে। বিজয়কষ্ণ এখানে শিষ্যগণসহ উপস্থিত। বৈষ্ণব সাধুমণ্ডলীর মধ্যে তাঁবু খাটাইয়া তিনি আসন স্থাপন করিয়াছেন। ইহার মধ্যস্থলে এক পূজাবেদী। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দপ্রভুর দুই বিগ্রহ স্থাপন করিয়া নিত্যপূজার ব্যবস্থা হইয়াছে।

শিষ্যদের মধ্যে কাজের ভার বাঁটিয়া দিয়া গোস্বামীজী বলিলেন, "আমার কি কাজ হবে জানো?—ভিক্ষা। তোমাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব থাকবে আমার ওপর।"

সঞ্চিত কোন টাকাকড়ি তাঁবুতে নাই, কিন্তু দৈনিক শত শত টাকা ব্যয় হইতেছে। আটা, চিনি, ঘি আসিতেছে, ভারে ভারে।

মেলায় আগত শত শত লোককে নিয়মিতভাবে ভোজন করাইয়াও গোস্বামীজীর চিরাচরিত দানকার্য্য অবাধে চলিত। তাঁহার অতিথি-বৎসলতার কথা সেখানে জনপ্রবাদে পরিণত হইয়াছিল।

বিজয়কৃষ্ণ গৃহস্থের মত জীবনযাপন করেন। বৈষ্ণব হইয়া রুদ্রাক্ষ ও

গৈরিক ধারণ করিতে তাঁহাকে দেখা যায়। শুধু তাহাই নয়, গৌর-নিতাই বিগ্রহের পূজাও তাঁহার তাঁবুতে চলিয়াছে। এসব নিয়া মেলার বৈষ্ণব-মণ্ডলীতে নানা বিরুদ্ধ সমালোচনা উঠিতে থাকে।

এসময়ে ভোলাগিরিজী, কাঠিয়াবাবা প্রভৃতি মহাত্মাগণ গোঁসাইজীর সমর্থনে আগাইয়া আসেন। তাঁহার অধ্যাত্মজীবনের উৎকর্ষ ও সাধনশক্তির মাহাত্ম্য সকলকে বুঝাইয়া দেন। বৈষ্ণব সাধুরা এবার শান্ত হন।

উচ্চকোটি সাধুসন্ন্যাসীরা ইতিমধ্যেই গোঁসাইজীর মর্ম্ম অবগত হইয়াছিলেন। মৌনীবাবা, অমরেশ্বরানন্দ পুরী, নরসিংহ দাস বাবাজী, গম্ভীরনাথজী, দয়ালদাস বাবা, অর্জ্জুনদাস বাবাজী প্রভৃতি মহাপুরুষগণ বিজয়কৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎমাত্রই তাঁহাকে আন্তরিক সমাদর ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেন।

একদিন মহাত্মা অর্জ্জুনদাস গোস্বামীজীর তাঁবুতে বসিয়া আছেন। রঙ্গিয়াবাবা নামক এক সিদ্ধযোগীও এসময়ে সেখানে উপস্থিত। কথা-প্রসঙ্গে যোগক্রিয়া সম্বন্ধে তাঁহার জানা কিছু কিছু নিগূঢ় তথ্য তিনি শুনাইতে থাকেন। কিছুক্ষণ তাঁহার কথা শুনার পর অর্জ্জুনদাসজীর ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। গোস্বামীজীকে দেখাইয়া তেজোদৃপ্ত কণ্ঠে রঙ্গিয়াবাবাকে বলিয়া উঠিলেন, "আরে, দেখ্‌তে নেই, ইঁয়ে সাক্ষাৎ যোগীরাজ হ্যায়! হরবখৎ সমাধিমে রহ্‌তে হ্যায়। ইন্‌কো সামনেমে আপ ক্যা বাৎলাতে হেঁ?" যোগীটি এ তিরস্কারের পর একেবারে চুপ হইয়া যান।

যোগশক্তির সাথে ভক্তি, ঐশ্বর্য্যের সাথে দৈন্য, গোস্বামীজীর মধ্যে বিস্ময়কররূপে মিলিত হয়, লাভ করে এক সুমঞ্জস পরিণতি।

অতি স্বাভাবিকভাবে গোঁসাইজী নিজের এই যোগৈশ্বর্য্যকে বহন করিতেন। তাঁহার এ যোগসিদ্ধি প্রকটিত হইয়া উঠিত শুধু কৃপার ক্ষেত্রে, দানের ক্ষেত্রে। হাজার হাজার ভক্ত লোকগুরুরূপে দেখিত তাঁহার প্রেমভক্তি-উজ্জ্বল ভাবময় রূপ। এ রূপ, এ ভাব নিয়া বাংলার

অধ্যাত্মজীবনে যে প্রেমতরঙ্গ তিনি তোলেন, চৈতন্য যুগের পরে কম বৈষ্ণব নেতাই তাহা করিতে সক্ষম হইয়াছেন!

বোলপুরের উকিল শ্রীহরিদাস বসু প্রথম জীবনে ব্রাহ্ম ছিলেন—পরে তিনি বিজয়কৃষ্ণের কৃপা পাইয়া কৃতার্থ হন। হরিদাসবাবু একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলিতেছিলেন, "আহা, হনুমানের কি অপূর্ব্ব ভক্তি! বুক চিরে ইষ্টদেবতা, রাম-সীতা দেখিয়েছিলেন।"

ভক্তের ভাবময় কথা কয়টি শুনিবামাত্র গোস্বামীপাদ স্মিতহাস্যে কহিলেন, "সে কিগো! বুক কি আবার চিরতে হয়!"

গুরুদেবের কথার অর্থ কি, হরিদাসবাবু তাহাই ভাবিতেছিলেন। ক্ষণপরেই চমৎকৃত হইয়া দেখিলেন, গোস্বামীজীর আসনে 'হরেকৃষ্ণ' এই মন্ত্রটি ধীরে ধীরে আপনা হইতে অঙ্কিত হইয়া গেল। শুধু তাহাই নয়, সেখানে আত্মপ্রকাশ করিল রাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তি। এ অলৌকিক দৃশ্য দেখিয়া হরিদাসবাবুর মুখে কথা সরিল না।

সে-বার বৃন্দাবনে থাকিতে এক অভূতপূর্ব্ব ধ্যানাবেশের মধ্য দিয়া গোস্বামীজীর দিন কাটিতে থাকে। একদিনকার প্রগাঢ় ধ্যানে অসন্ন যুগ-পরিবর্ত্তনের ইঙ্গিত তিনি প্রাপ্ত হন। সেদিন ধ্যানকুটিরের দ্বার কিছুতেই খুলিতেছেন না, সেবকগণ ভীত হইয়া ডাকাডাকি শুরু করিলেন।

গোস্বামীপাদ বাহিরে আসিয়া ধীরগম্ভীরস্বরে কহিলেন, "হিমাচলের কয়েকটি ঋষি আজ কৃপা করে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁরা বললেন—ভারতের অবস্থার শীঘ্রই পরিবর্ত্তন হবে। আজকের দিনে যে ধর্ম্মজীবন দেখছি, তা আরও অবনত হবে, তারপর ভগবান স্বয়ং অবতীর্ণ হবেন। মানবজাতির ঘটবে পুনরুজ্জীবন, আসবে যুগান্তর।"

দীর্ঘ সাধনার শেষে পরম ভাগবত বিজয়কৃষ্ণের জীবনে এবার আসিয়াছে দারুব্রহ্ম—নীলাচলনাথের আহ্বান। পুরীধামে তাঁহাকে এবার পৌঁছিতে হইবে। গুরু পরমহংসজীর আজ্ঞাও মিলিয়া গিয়াছে। দীর্ঘ কৃচ্ছ্রব্রতের ফলে স্বাস্থ্য প্রায় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, তাই কয়েকটি সেবক শিষ্য তাঁহার সঙ্গে চলিল।

যাত্রাকালে গুরুদেব বলিলেন, "তোমরা আমায় প্রসন্ন মনে বিদায় দাও, আমি যেন আমার প্রাণের নীলাচলনাথকে দর্শন করতে পারি। আমার যেন মহাধাম প্রাপ্তি ঘটে।"

কলিকাতার বাসায় একটি মেথর কাজ করে। প্রেমাবেশে বিভোর গোঁসাইজী কাঁদিতে কাঁদিতে তাহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। কহিলেন, "ভাই আশীর্ব্বাদ কর, আমি যেন দারুব্রহ্মের কৃপা পাই।"

নীলাচলে পৌঁছিয়া আনন্দ আর ধরে না। তখনি ছুটেন নীলমাধবের অঙ্গনে। প্রেমের পাথার তরঙ্গিয়া উঠে, ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়াই কীর্ত্তন শুরু করিয়া দেন। বহুদিন পরে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের প্রেমভক্তির ভাববন্যা আবার পুরীধামে বহিয়া যায়।

এক বৎসরের কিছু বেশী সময় গোস্বামীজী এখানে বাস করেন। এই সময়ের মধ্যেই ভক্তসমাজের মধ্যমণিরূপে তিনি চিহ্নিত হইয়া উঠেন। জটাজূটসমন্বিত, দিব্যকান্তি এই মহাপুরুষকে উৎকলবাসীরা নাম দেয়, জটিয়াবাবা।

কৌপীনধারী, কপর্দ্দকহীন জটিয়াবাবার যোগৈশ্বর্য্য ও নিত্যকার দান-অনুষ্ঠানের খ্যাতি চারিদিকে রটিয়া যায়।

মহাধামের মিলন-ক্ষেত্রে প্রভুপাদ তাঁহার জীবননাথের মুখোমুখী আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। প্রাণ ভরিয়া দারুব্রহ্মের নানা লীলা-উৎসব তিনি উদ্‌যাপন করিতেছেন। চন্দ্রযাত্রা, রথযাত্রা, পদ্মবেশ, দোলযাত্রা একের পর এক আবর্ত্তিত হইয়া আসে। প্রভুপাদের অন্তরে ডাকিয়া উঠে দিব্য আনন্দের বান। প্রাণ ভরিয়া জগন্নাথের সেবা করেন, আর দানধ্যানে হন কল্পতরু।

সেদিন ঝুলন দোলের আনন্দ-উৎসব। মঞ্চোপরি অধিষ্ঠিত নীল-মাধবের শোভা যেন অনির্ব্বচনীয়। প্রভুর নামকীর্ত্তনে আর উদণ্ড নৃত্যে গোস্বামীজী সেদিন প্রেমের বন্যা বহাইয়া দিলেন। এ নৃত্য কীর্ত্তনে পুরীবাসী উন্মত্ত হইয়া উঠিল। মহাভাবে মাতোয়ারা গোঁসাইজীর অঙ্গে দেখা যাইতেছে অশ্রু, পুলক, কম্প প্রভৃতি অষ্টসাত্ত্বিক ভাবের

প্রকাশ। চোখে মুখে দিব্য জ্যোতির আভা। এই দেবোপম মূর্ত্তি দর্শনে জগন্নাথের ছত্রধরও আত্মহারা হইয়া পড়ে, গোস্বামীপাদের শিরে ছত্র ধারণ করিয়া সে প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতে থাকে। চারিদিক স্বর্গীয় ভাবরসে টলমল করিতে থাকে।

শরীর ক্রমে খুব অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে। আজকাল গোঁসাইজী প্রায়ই সমুদ্রে যাইতে পারেন না। কিন্তু বিস্ময়ের কথা, তাঁহার সমুদ্র-স্নান একদিনের জন্যও বন্ধ হয় না। এক একদিন ধ্যানাসন হইতে উঠিয়া আসিলে সেবকগণ দেখেন জটাজাল হইতে টপ্‌টপ্‌ করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতেছে। প্রশ্ন করিলে গোঁসাইজী সংক্ষেপে উত্তর দেন, "আমি যে এইমাত্র সমুদ্রে স্নান করলাম।"

পরম বিস্ময়ে ভক্তগণ তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকে। কারণ, সবাই জানে, তিনি এত অসুস্থ যে, গৃহের বাহিরে যাইতে পারেন না।

সেদিন এক বিশেষ পুণ্যযোগে প্রভুপাদ শ্রীজগন্নাথের মন্দিরে আসিয়াছেন। শ্রীবিগ্রহ দর্শন করার পর তাঁহার অন্তরে অলৌকিক ভাবের স্ফুরণ হইল। ভাবাবিষ্ট হইয়া বলিতে লাগিলেন, "ছ্যাখো, সাধারণ মানুষ এই বিগ্রহকে বলে, জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রা। আসলে এরা দারুব্রহ্মের অখণ্ড রূপ। সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মই দারুরূপে ত্রিমূর্ত্তিতে প্রকটিত হয়েছেন। এঁদের দেখলে ব্রহ্মদর্শন হয়।"

পুরীধামের ভক্তসমাজে এসময়ে গোস্বামীপাদের বিপুল প্রতিষ্ঠা। তাঁহার এই প্রতিষ্ঠা কোন কোন বৈষ্ণব মঠের মোহান্ত এবং স্থানীয় কয়েকটি প্রভাবশালী ব্যক্তির ঈর্ষা জাগাইয়া তোলে। বিজয়কৃষ্ণের প্রাণনাশের জন্য তাহারা তৎপর হয়।

সেদিন ভোরবেলায় প্রভুপাদ সাঙ্গোপাঙ্গসহ ভক্ত নীলমণি বর্ম্মণের বাড়ীতে বসিয়া আছেন। সাধুবেশধারী একটি লোক তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। লোকটি গোঁসাইজী বা তাঁহার সেবকদের কাহারো পরিচিত নয়। দেখা গেল, তাহার হাতে রহিয়াছে জগন্নাথের প্রসাদী নাড়ুর একটি ঝাঁপি।

আগন্তুক তাড়াতাড়ি প্রসাদী নাড়ু গোঁসাইজীর দিকে আগাইয়া দেয়। বলে, "বাবা, প্রাপ্তিমাত্রেই প্রসাদ খেতে হয়, নিন্।"

সর্ব্বজ্ঞ মহাপুরুষ গোঁসাইজীর কাছে এ নাড়ুর গোপন তথ্য অজানা নাই। মুহূর্ত্তেই তিনি বুঝিয়া নিয়াছেন, ইহাতে মিশ্রিত রহিয়াছে প্রাণঘাতী বিষ!

আরো বুঝিয়াছেন, এই বিষ ভক্ষণের মাধ্যমে ঘটাইতে হইবে তাঁহার মর জীবনের অবসান—করিতে হইবে লীলা সংবরণ। ইহাই বিধিলিপি।

সর্ব্বোপরি কথা—এ যে প্রভুর মহাপ্রসাদ! কোনমতেই তিনি ইহা প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন না!

এ বিষাক্ত নাড়ু প্রসাদ গলাধঃকরণ করার পর ধীরে ধীরে তিনি অচেতন হইয়া পড়িলেন। চিকিৎসকের চেষ্টায় যদিই বা জ্ঞানসঞ্চার হইল, শরীর একেবারে বিধ্বস্ত হইয়া গেল। আর তাহা সারিয়া উঠে নাই। এক মাসকাল রোগভোগের পর নিত্যলীলায় প্রবেশের চিহ্নিত দিনটি আসিয়া পড়ে। ১৩০৬ সালের ২১শে জ্যৈষ্ঠের রাত্রি ভক্তদের কাছে হইয়া উঠে মর্ম্মান্তিক!

ভারতের অধ্যাত্ম-আকাশ হইতে এক মহা জ্যোতিষ্ক সেদিন চিরতরে অপসৃত হইয়া যায়।

শ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংস

আকস্মিক দুর্ঘটনা মানুষের জীবনে আনিয়া দেয় ক্ষয়-ক্ষতি, আগত হয় অভিশাপরূপে। কচিৎ দুই এক ক্ষেত্রে কিন্তু দেখা যায়, এ দুর্ঘটনা আশীর্ব্বাদ রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বর্দ্ধমানের বণ্ডুল গ্রামের ভোলানাথের জীবনে সেদিন এরকমই এক ব্যতিক্রম দেখা গেল।

চঞ্চল বালক ভোলানাথের বয়স বার বৎসরের বেশী নয়। গ্রামের পথ দিয়া হাঁটিয়া চলিয়াছে, এমন সময় হঠাৎ এক ক্ষিপ্ত কুকুর তাহাকে দংশন করিয়া বসে। এই দুর্ঘটনাকে উপলক্ষ করিয়াই জীবনে তাহার নামিয়া আসে ঐশী করুণা ও আশীর্ব্বাদ।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধের কথা। কুকুর দংশনের আধুনিক চিকিৎসা তখনো আবিষ্কৃত হয় নাই। ভোলানাথের ক্ষতস্থানে দেশীয় ঔষধপত্র প্রয়োগ করিয়া তেমন ফল হইল না। আরো ভালো চিকিৎসার জন্য তাহাকে চুঁচুড়ায় এক আত্মীয়ের গৃহে পাঠানো হইল।

ঘায়ের বড় দুঃসহ যন্ত্রণা। এক এক দিন এ যন্ত্রণা সহ্যের সীমা ছাড়াইয়া যায়। সেদিন গভীর রাতে সে চুপি চুপি ঘর ছাড়িয়া নদীতীরে আসিয়া দাঁড়ায়। জলে ডুবিয়াই সে আত্মহত্যা করিবে!

নদীতে নামিতে যাইবে, এমন সময় চোখে পড়ে এক অদ্ভুত দৃশ্য! অদূরে গঙ্গাগর্ভে দাঁড়ানো জটাজূটসমন্বিত এক সন্ন্যাসী। গম্ভীর স্বরে স্তোত্র পাঠ করিয়া তিনি ডুব দিতেছেন, আর মস্তক উঠানোর সঙ্গে সঙ্গে জলরাশি স্তম্ভাকারে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া উত্থিত হইতেছে ঊর্দ্ধে। একি অদ্ভুত অলৌকিক কাণ্ড! স্তব্ধ বিস্ময়ে, নির্নিমেষে বালক এই যোগ-বিভূতিসম্পন্ন মহাপুরুষের দিকে চাহিয়া আছে।

সন্ন্যাসীর দৃষ্টিও বালক ভোলানাথের উপর পড়িল। স্নানের পর

তিনি তীরে উঠিয়া আসিলেন। ভোলানাথকে কাছে ডাকিয়া সস্নেহে কহিলেন, "বাবা, এ তুমি কি করতে যাচ্ছিলে? আত্মহত্যা যে মহাপাপ।" সাশ্রুনয়নে বালক অসহ্য রোগযন্ত্রণার কথা নিবেদন করিল।

মহাপুরুষ সহজ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "এ আবার কি একটা রোগ! ও কিছুই নয়। এক্ষুনি তোমার সমস্ত কিছু জ্বালা-যন্ত্রণার অবসান ঘটবে। এজন্য ভেবো না।"

কৃপাময় সন্ন্যাসী ভোলানাথের ক্ষতস্থানে নিজের হস্ত বুলাইয়া দিলেন। তীব্র ব্যথা-বেদনা নিমেষে কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল।

সন্ন্যাসী অতঃপর গঙ্গাতীরে আর বেশীক্ষণ অবস্থান করেন নাই। ভোলানাথের আনন্দ আর ধরে না। মহাত্মার কৃপায় সম্পূর্ণরূপেই সে যে রোগমুক্ত হইয়া গিয়াছে! গভীর রাত্রে স্বস্থানে ফিরিয়া আসে। এই অলৌকিক ঘটনার কথা সবাইকে বলিতে থাকে।

ভোলানাথ বার বৎসরের বালক, কিন্তু এ বয়সেই সে যেন অনন্য-সাধারণ। গঙ্গাতীরের মহাপুরুষের স্মৃতি সেদিন হইতে সে আর ভুলিতে পারে নাই। বারবারই তাঁহার দিব্য মূর্তি, তাঁহার কণ্ঠস্বর অন্তরে দোলা দিয়া যাইতেছে!

কে এই শক্তিধর পুরুষ, অবলীলায় যিনি তাঁহার এ দুরারোগ্য ব্যাধি আরোগ্য করিয়া দিলেন? তাঁহার কাছে তবে তো আরো অনেক দুর্লভ বস্তুই রহিয়াছে! সে বস্তু কি তাহার ভাগ্যে মিলিবে না?

দুর্জ্জেয় আকর্ষণ এই সন্ন্যাসীর! ভোলানাথ পরের দিনই আবার তাঁহার সন্ধানে গঙ্গাতীরে গিয়া উপস্থিত।

এইদিন দেখা যায় আর এক বিস্ময়কর দৃশ্য। মহাপুরুষ নদীতীরে বসিয়া পূজা ও তর্পণ সারিতেছেন। মাঝে মাঝে হস্ত দ্বারা করিতেছেন জলস্পর্শ। প্রতিবারই অবিশ্বাস্য কাণ্ড ঘটিতেছে সেখানে। যখনি তিনি নীচের দিকে হস্ত প্রসারিত করেন, তখনি গঙ্গাবক্ষ স্ফীত হইয়া উঠে। হাতের ছোঁয়া লাগিতেই জলরাশি আবার স্বস্থানে ফিরিয়া যায়।

ভোলানাথ বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে অদূরে দণ্ডায়মান। এ দৃশ্য হইতে সে নয়ন ফিরাইতে পারিতেছে না।

মহাপুরুষের পূজা-বন্দনাদি শেষ হইয়া যায়। বালক ছুটিয়া গিয়া পতিত হয় তাঁহার চরণতলে। কাতরকণ্ঠে কাঁদিয়া কহিতে থাকে, "প্রভু, আপনি কাল আমার জীবন দান করেছেন। আমার একান্ত মিনতি, সেই জীবনের সব ভার আপনিই গ্রহণ করুন। আপনার চরণতলে বসে এই জীবন কাটিয়ে দিতে চাই। কৃপা ক'রে আজই আপনি আমায় মন্ত্রশিষ্য করে নিন্।"

সান্ত্বনা দিয়া মহাপুরুষ কহিলেন, "বাবা, সময়ে সবই হবে, সদ্‌গুরুও তোমার মিলে যাবে, তুমি অধীর হয়ো না। আচ্ছা, আজ তোমায় সামান্য কিছু আমি দিচ্ছি।"

ভোলানাথকে একটি বিশেষ যোগাসন তিনি শিক্ষা দিলেন, আর কাণে দিলেন জপের মন্ত্র। নির্দ্দেশ রহিল, প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যায় এ মন্ত্র জপ করিতে হইবে।

মহাপুরুষ আশীর্ব্বাদ জানাইয়া চলিয়া গেলেন। বালকের জীবনে উন্মোচিত হইল এক নূতন অধ্যায়।

কুকুর-দংশনের ক্ষত উপলক্ষ করিয়াই ভোলানাথের জীবনে ঘটিল মহাপুরুষের আবির্ভাব, আর সে আবির্ভাব অচিরে আনিয়া দিল ঈশ্বরীয় কৃপার সৌভাগ্যোদয়।

বালক ভোলানাথের জীবনে আত্মিক সাধনার যে বীজ রোপিত হয়, তাহার মর্ম্ম সেদিন কিছুই সে বুঝিতে পারে নাই। উত্তরকালে এই বীজই পরিণত হয় এক মহীরুহে। আচার্য্য বিশুদ্ধানন্দ পরমহংস-রূপে উত্তরভারতে তাঁহার অভ্যুদয় ঘটে।

বারাণসীর অধ্যাত্মকেন্দ্রে এই মহাপুরুষকে দীর্ঘকাল অধিষ্ঠিত থাকিতে দেখা যায়—এ অঞ্চলে তিনি পরিচিত হইয়া উঠেন 'গন্ধবাবা' নামে। যে অলৌকিক বিভূতিলীলা এই শক্তিধর মহাসাধক দিনের পর

দিন দেখাইয়া যান, প্রকাশ্যে জন-সমাজের সম্মুখে খুব কম সাধকই আজ অবধি তাহা দেখাইয়াছেন।

১৮৫৬ সালের ১১ই মার্চ্চ বিশুদ্ধানন্দ ভূমিষ্ঠ হন। ছয় মাস পরেই পিতা অখিলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁহার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মা রাজরাজেশ্বরী এবং কাকা চন্দ্রনাথের আদরযত্নে শিশু বাড়িয়া উঠিতে থাকে। সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের পরিবেশে বিকশিত হয় তাহার জীবন।

অল্প বয়সেই ভোলানাথের মধ্যে দেখা যায় নানা অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য। চঞ্চল বালক-গোষ্ঠীর মধ্যে নিজস্ব ভঙ্গী সে বজায় রাখিয়া চলে, সকলের মধ্যে থাকিয়াও সে থাকে অনন্য।

গ্রামের সিদ্ধেশ্বরীর মন্দিরে, শ্মশান ও বটতলায় বালক ভোলানাথ সুযোগ পাইলেই ঘুরিয়া বেড়ায়। বড় অদ্ভুত খেয়াল এই গম্ভীর প্রকৃতি বালকের। লোকে তাহার কথা নিয়া কত বলাবলি করে।

দুরারোগ্য ব্যাধি সন্ন্যাসীর কৃপায় সারিয়া গিয়াছে। বালক ভোলানাথ এবার ফিরিয়া আসিল স্বগ্রামে। জননী রাজরাজেশ্বরী স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিলেন। কিছুদিনের মধ্যে হৃতস্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইবার পর তাহাকে বর্দ্ধমানে পাঠানো হইল সংস্কৃত পড়িবার জন্য।

দুই বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। বালকের অন্তরে মহাপুরুষের রোপিত বীজটি দিন দিন হইয়া উঠিতেছে রূপায়িত। এই সময়ের মধ্যে এক দিনের জন্যও কিন্তু তাহাকে তাহার জপ এবং আসন প্রাণায়াম বাদ দিতে দেখা যায় নাই।

ইতিমধ্যে হঠাৎ এক নূতন পর্ব্বের সূচনা হইল। ভোলানাথ সেদিন বর্দ্ধমানের রাজপথ দিয়া কোথায় চলিয়াছেন। কাণে আসিল এক পথ-চারী মুসলমান ভদ্রলোকের কথাবার্ত্তা। এক যোগীপুরুষের অলৌকিক কাহিনী তিনি বলিতেছেন। এই মহাত্মাটি নাকি কিছুদিন হয় ঢাকায় উপস্থিত হইয়াছেন। বড় বিস্ময়কর তাঁহার যোগবিভূতি, শহরের সর্ব্বত্র শোনা যায় এই কথা। বুড়িগঙ্গার জলে প্রত্যুষে মহাত্মা স্নান

করিতে যান, আর রোজই সেখানে ঘটে এক বিস্ময়কর কাণ্ড। তাঁহার গাত্র বেষ্টন করিয়া নদীগর্ভ হইতে এক জলস্তম্ভ উত্থিত হয়। কেহ কেহ এই অলৌকিক দৃশ্য প্রত্যক্ষও করিয়াছে।

যোগবিভূতির ধরণটি শুনিয়াই ভোলানাথ চমকিয়া উঠিলেন। তবে তো ইনিই তাঁহার সেই প্রাণদাতা মহাতপস্বী! অন্তরের মধ্যে ইঁহাকেই যে তিনি জীবনকাণ্ডারীরূপে স্থাপিত করিয়াছেন।

যে ভদ্রলোক এই কাহিনী বর্ণনা করিতেছিলেন তাঁহার নিকট হইতে ভোলানাথ ঐ মহাপুরুষের ঢাকার ঠিকানা জানিয়া নিলেন। আরও শুনিলেন, সংবাদদাতা ভদ্রলোক ঢাকা শহরেরই লোক, কয়েক-দিনের মধ্যেই তিনি সেখানে ফিরিয়া যাইতেছেন।

মহাপুরুষকে দর্শনের জন্য ভোলানাথ ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন। স্থির করিলেন, ঐ ভদ্রলোকটির সহিতই কয়েকদিন পর তিনি ঢাকায় রওনা হইবেন। চিরতরে সংসার ত্যাগ করিয়া মহাত্মার চরণে আশ্রয় নিবেন, এ সঙ্কল্পও ঠিক হইয়া গেল।

কিন্তু জননীর অনুমতি তো নেওয়া চাই। তাড়াতাড়ি তিনি বগুলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার প্রস্তাব শুনিয়া সকলে তো অবাক! এ আবার কি কথা! এই অল্প বয়সে ঘর ছাড়িয়া, সমস্ত কিছু ভবিষ্যৎ ছাড়িয়া সে কোথায় যাইবে? আত্মীয়-স্বজনেরা বাধা দিলেন।

ভোলানাথের জননী রাজরাজেশ্বরী দেবীর আচরণ কিন্তু বড় অদ্ভুত, বড় অপ্রত্যাশিত। মুহূর্ত্তে মন স্থির করিয়া ফেলিলেন, বালক পুত্রের সঙ্কল্পে কোন বাধাই দিলেন না।

আত্মীয়-স্বজনদের ডাকাইয়া আনিয়া বলিলেন, "ভোলানাথের কোষ্ঠিতে তার পরমায়ু রয়েছে মাত্র বাইশ বৎসর। এটা আমি নিজে বিশ্বাস করেছি, নিশ্চিত বলেই ধরে নিয়েছি। যদি এরকম শক্তিধর যোগীর চেলা হয়ে ওর আয়ু বাড়ে, তবে সেইটেই তো হবে আমাদের পরম লাভ। তাছাড়া, ও যখন চলে যাবার জন্য এমন ব্যাকুল, তখন ওকে যেতে দেওয়াই তো সঙ্গত!"

মায়ের অনুমতি ও আশীর্ব্বাদ মিলিল। ভোলানাথ আনন্দে অধীর হইয়া জননী ও গুরুজনদের পদধূলি গ্রহণ করিলেন, চলিলেন তাঁহার নিরুদ্দেশের যাত্রায়।

রওনা হইবার সময় পথের সাথীও একটি জুটিয়া গেল। হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় তাহার সমবয়সী বন্ধু, মহাত্মার যোগৈশ্বর্য্যের কাহিনী শুনিয়া সে মুগ্ধ হইয়াছে। গৃহত্যাগ করিয়া সেও গেল।

ঢাকার উপকণ্ঠস্থিত রমণা। আজিকার দিনের রমণীয় উদ্যান ও সৌধমালা তখন এ পল্লীতে কিছুই ছিল না। চারিদিকে ছিল দুর্গম গহন অরণ্য—সাপ-বাঘের আবাসস্থান। তাহারই মধ্যে দেখা যাইত দুই-একটি প্রাচীন শক্তিসাধনার পীঠস্থান ও মন্দির। সাধু-সন্ন্যাসীরা এখানে আসিয়া কিছুদিন সাধন-ভজন করিয়া যাইতেন।

ভোলানাথ ও তাঁহার বন্ধুটি অনেক খোঁজাখুঁজির পর রমণার প্রান্তে মহাপুরুষের সাক্ষাৎ লাভ করিলেন।

প্রথমটায় মহাপুরুষ তাহাদিগকে এড়াইতেই চাহিলেন। কেন এই অল্প বয়সে, সুকুমার দেহে দুশ্চর তপস্যা ও কৃচ্ছ্র সাধন? সংসারাশ্রমে থাকিয়া কি ধর্ম্মলাভ হয় না?

ভোলানাথ ও তাহার সঙ্গীকে এড়ানো বড় কঠিন, উভয়ে তাঁহার চরণতলে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। যোগীবরের কৃপা হইল, বালক দুইটিকে গ্রহণ করিলেন। সেই দিনই ডেরা-ডাণ্ডা উঠানো হইল।

গভীর রজনী। রমণার বনাঞ্চলে ঘন অন্ধকার নামিয়া আসিয়াছে। মহাপুরুষ নবাগত বালক ভক্ত দুইটিকে নিকটে ডাকিলেন। তারপর দুই হস্তে ধারণ করিলেন তাঁহাদের দুইজনের বাহু। অন্ধকার বনপথ দিয়া তাঁহারা চলিয়াছেন। কিছুদূর গিয়াই মহাপুরুষ বালকদ্বয়ের দুই চোখ কাপড় দিয়া বাঁধিয়া দিলেন। তাঁহাদের তখন মোহাচ্ছন্নের মত অবস্থা। অন্ধকারময় পথের কোন স্মৃতি মনে জাগরূক থাকিতেছে না। দীর্ঘপথ

তাঁহারা অতিক্রম করিয়া চলিয়াছেন। মাঝে মাঝে কাণে আসিতেছে শৃগাল ও হিংস্র বাঘের রব।

পরদিন প্রাতে এই যাত্রার বিরাম ঘটে। এবার উভয়ের চক্ষুর আচ্ছাদন খুলিয়া দেওয়া হয়। এক মন্দির সন্নিহিত আশ্রমে তাঁহারা আশ্রয় গ্রহণ করেন।

স্থানীয় লোকজনদের জিজ্ঞাসা করিয়া ভোলানাথ জানিলেন, এই স্থানের নাম বিন্ধ্যাচল। ঢাকার রমণা হইতে বিন্ধ্যাচল প্রয় ছয়শত মাইল। শুধু যোগীবরের হাত দুইটি ধরিয়া থাকিয়া কিরূপে তাঁহারা এই দূরত্ব একরাত্রে অতিক্রম করিলেন? কোন্ যোগবিভূতির ফলে ইহা সম্ভব হইল? উভয়ে বিস্ময়ে হতবাক হইয়া গিয়াছেন।

গন্তব্যস্থল এখনও রহিয়াছে বহু দূরে। কিন্তু মহাত্মার যে অপূর্ব্ব যোগসামর্থ্যের পরিচয় সে রাত্রিতে পাওয়া গেল তাহাতে কোন দূরত্ব, কোন দুরধিগম্যতার প্রশ্নই আর উঠে না।

এই একই অলৌকিক পন্থায় যোগশক্তিবলে মহাত্মা তাঁহার বালক ভক্তদের হিমালয় অতিক্রম করান, তিব্বতের দুর্গম এক মালভূমিতে আনিয়া উপস্থিত করেন।

এবার ভোলানাথের বিস্ময়-বিমূঢ় দৃষ্টি সমক্ষে দেখা দিল এক অদ্ভুত সাধনরাজ্য। শক্তিধর দণ্ডী সন্ন্যাসী পরমহংস প্রভৃতির ইহা এক অপূর্ব্ব মিলনকেন্দ্র। উত্তরকালে বিশুদ্ধানন্দজী এই স্থানকে জ্ঞানগঞ্জ নামে অভিহিত করিতেন।

যে মহাপুরুষের কৃপা ও আশ্রয় অবলম্বন করিয়া ভোলানাথ এই গিরিমালা-বেষ্টিত পবিত্র অঞ্চলে প্রবেশ করিলেন, তাঁহার নাম নীমানন্দ পরমহংস। বাঙ্গালী দেহ। বয়স তৎকালে প্রায় পাঁচশত হইয়াছিল বলিয়া বিশুদ্ধানন্দজী বলিতেন।

স্বামী নীমানন্দ অতঃপর ভোলানাথ ও তাঁহার সঙ্গীকে মনোহরতীর্থ নামক রমণীয় গিরিশীর্ষে নিয়া যান। এখানে তাঁহার গুরুদেব স্বামী

মহাতপার পদপ্রান্তে নবীন সাধনার্থীদের উপস্থিত করেন। এই মহাত্মারই নিকট দীক্ষালাভ করিয়া ভোলানাথ ধন্য হন। নূতন নামকরণ হয়—বিশুদ্ধানন্দ স্বামী।

ইহার পর প্রায় বার বৎসর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে থাকিয়া বিশুদ্ধানন্দকে উচ্চতর যোগ শিক্ষা আয়ত্ত করিতে হয়। একনিষ্ঠ সাধনা ও কঠোর কৃচ্ছ্রব্রতের মধ্য দিয়া তাঁহার অধ্যাত্মজীবন অগ্রসর হইতে থাকে।

শক্তিধর আচার্য্য ভৃগুরামস্বামী এবং শ্যামানন্দস্বামী এসময়ে বৃত হন তাঁহার শিক্ষাগুরুরূপে। তাঁহার ব্রত উদ্‌যাপন, তন্ত্র ও যোগসাধনার পথে ইঁহারা হন প্রধান সহায়ক। দণ্ডী ও পরিব্রাজক অবস্থা অতিক্রম করিয়া তীর্থস্বামীর পর্য্যায়ে উন্নীত হইতে সাধক বিশুদ্ধানন্দজীর প্রায় আট বৎসর সময় লাগিয়াছিল।

ধীরে ধীরে এক অসামান্য সাধকরূপে তিনি চিহ্নিত হইয়া উঠেন। সাধনার অগ্রগতির সাথে বহু বিস্ময়কর যোগবিভূতিও তাঁহার আয়ত্তে আসিয়া যায়।

এই সময়ে গুরুদেব একদিন বলিয়া বসেন, "বাবা, তোমার এখানকার শিক্ষা সমাপ্ত হয়েছে। এবার তোমায় দেশে ফিরে যেতে হবে, বিবাহ ক'রে প্রবেশ করতে হবে গৃহস্থাশ্রমে।"

একি অদ্ভুত আদেশ! অপ্রত্যাশিত প্রস্তাব! তরুণ সাধকের মাথায় যেন বজ্রাঘাত পড়িল।

সাধন রাজ্যের অমৃতলোকে তিনি পৌঁছিয়াছেন। তাহা ছাড়িয়া আজ আবার কোথায় গিয়া দাঁড়াইবেন? চৌদ্দ বৎসর বয়সে এই পবিত্র অধ্যাত্ম-কেন্দ্রে তিনি আগমন করেন, বর্ত্তমানে তাঁহার বয়স প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর। কৃচ্ছ্রসাধন ও তপস্যা ইতিমধ্যে তাঁহাকে যোগ ও তন্ত্রের উচ্চ শিখরে তুলিয়া দিয়াছে। গৃহস্থাশ্রমে ঢুকিলে ভাগ্যে কি ঘটিবে, কোন্ অতল গহ্বরে নামিতে হইবে, কে জানে? সাধনার পক্ষে সে পরিবেশ মোটেই অনুকূল নয়। অর্জ্জিত যোগসামর্থ্য যে ক্রমে

হ্রাস পাইবে না তাহারই বা স্থিরতা কি? বিশুদ্ধানন্দ বড় মুষড়িয়া পড়িলেন।

অন্তর্য্যামী গুরু শিষ্যের এ মনোভাব লক্ষ্য করিলেন। আশ্বাস দিয়া সস্নেহে কহিলেন, "বাবা, ভয় নেই, গার্হস্থ্যাশ্রমে গেলেও তোমার ক্ষতি কিছু হবে না। সাধনার ধারা অব্যাহতই থাকবে। আমাদের সাহায্য তুমি ঠিকই পাবে। তাছাড়া, এই নূতন পরিবেশের মধ্য দিয়েই অচিরে ঘটবে তোমার সিদ্ধিলাভ।"

বিশুদ্ধানন্দ জানেন, মহাতপার বাণী অভ্রান্ত। অন্তরের আলোড়ন এবার তাই কিছুটা শান্ত হইল।

তবুও বহু প্রশ্ন মনের কোণে ভীড় করিতে থাকে! বালককাল হইতেই সমাজজীবন হইতে তিনি বিচ্ছিন্ন। যে ব্রহ্মচর্য্যব্রত জীবনে গ্রহণ করিয়াছেন, হিমালয় ক্রোড়ের যোগীসঙ্ঘের মধ্যে তাহা লালিত। সংঘাত-সংকুল সাংসারিক জীবনে কি করিয়া তাহা আত্মরক্ষা করিবে? তাছাড়া, আরও ভাবিবার কথা আছে। পৈতৃক বিষয়-আশয় কিছুই নাই, লৌকিক কোন শিক্ষাও এযাবৎ তিনি গ্রহণ করেন নাই। পরিবারের ভরণ-পোষণের উপায়ই বা কি হইবে?

গুরুদেব তাঁহার চিন্তার ধারাটি বুঝিয়া নিয়া কহিলেন, "বাবা, তুমি মোটেই ভেবো না। চিকিৎসাবৃত্তি ও যোগজ্যোতিষ দ্বারা তোমার জীবিকা অর্জ্জনের ব্যবস্থা হবে। এরপর যা যা করতে হবে, সে নির্দ্দেশ আমি তোমায় যথাসময়ে দেব।"

হিমালয়ের এই পবিত্র গুরুকুল, আর এই সব উচ্চকোটি সাধকদের সান্নিধ্য ত্যাগ করিতে বিশুদ্ধানন্দের হৃদয় যেন ভাঙ্গিয়া যায়। এই সাধনভূমিকে কেন্দ্র করিয়াই যে তাঁহার অধ্যাত্ম-জীবনের ভিত্তিটি গড়িয়া উঠিয়াছে, এক অবিচ্ছেদ্য যোগসূত্রে তিনি বাঁধা পড়িয়া গিয়াছেন।

গুরুদেব ও শিক্ষকদের স্নেহের স্মৃতি কোনদিনই ভুলিবার নয়।

ব্রহ্মচারীজীবনের কত কাহিনীর স্মৃতিই না আজ তাঁহার মনের দুয়ারে আসিয়া দাঁড়ায়—

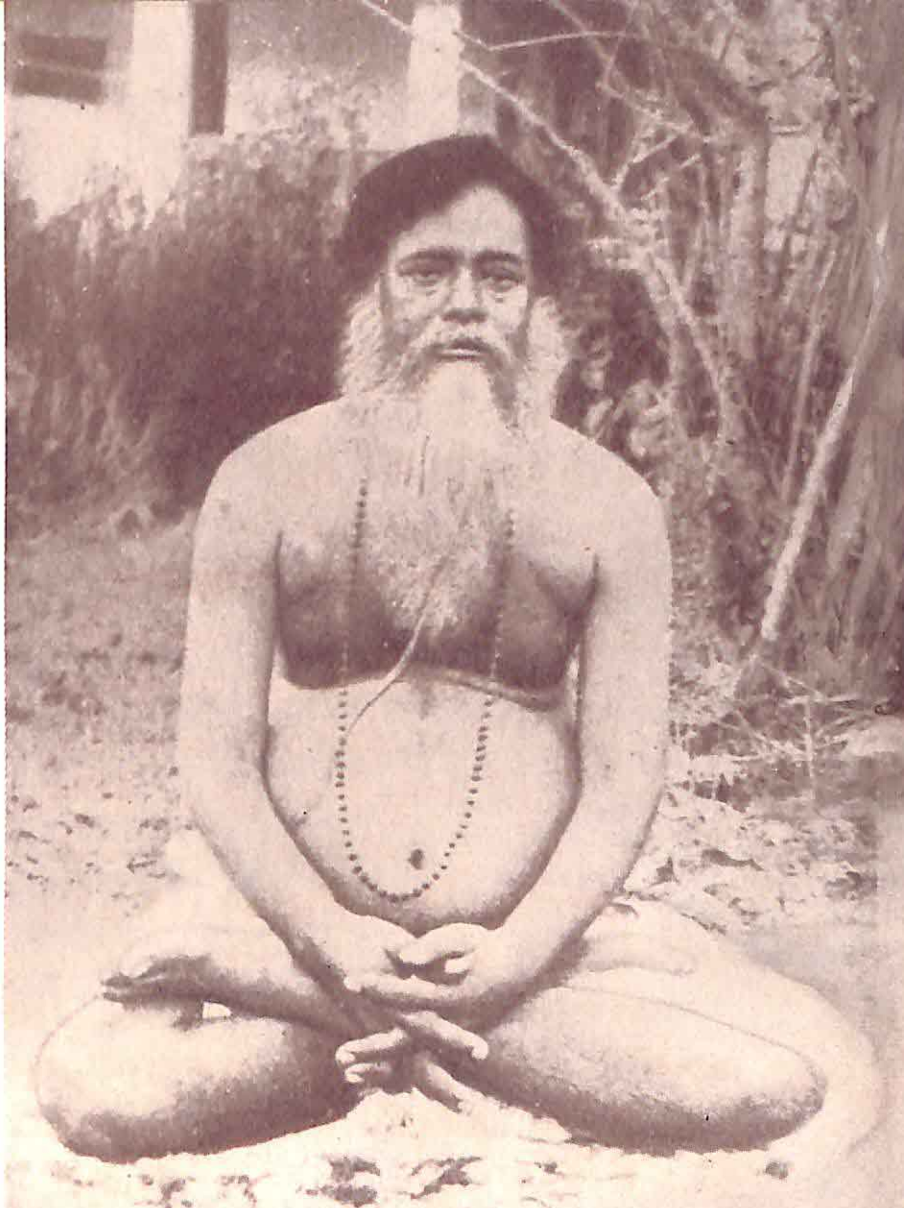
সে-বার ব্রহ্মচারী বিশুদ্ধানন্দ সতীর্থদের সাথে বিন্ধ্যাচল ভ্রমণে গিয়াছেন। পাহাড়ের: বুকে একটি বড় আমগাছ, অজস্র আম উহাতে পাকিয়া রহিয়াছে। অনেকেরই ঝোঁক হইল, এগুলি পাড়িতে হইবে। উৎসাহের বশে তরুণ বিশুদ্ধানন্দ আমগাছের ডাল লক্ষ্য করিয়া বেগে এক লাফ দিয়া বসিলেন। কিন্তু ডাল অবধি তাঁহাকে পৌঁছিতে হইল না, লক্ষ্যচ্যুত হইয়া পড়িলেন ভূতলে। সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারাইলেন। জ্ঞান ফিরিলে দেখিলেন, দাদা-গুরুদেব ভৃগুরাম পরমহংস তাঁহাকে কোলে করিয়া শূন্যপথে পাহাড়ের শিখরে উঠিতেছেন।

উপরে উঠিয়া পরমহংসজী তাঁহাকে কোল হইতে নামাইলেন। এবার সেই পাকা আমটি তাঁহার হাতে গুঁজিয়া দিয়া কহিলেন, "নাও, হ'লো তো? আমটি এখন খেতে পারো। এর জন্যই তো এত কাণ্ড।"

চঞ্চল কিশোরকে সতর্ক করিয়া ভৃগুরাম স্বামী কহিলেন, "এবার প্রতিজ্ঞা কর, এমন কাজ আর কখনো ক'রবে না।"

বিশুদ্ধানন্দ ততক্ষণে সাহস সঞ্চয় করিয়া ফেলিয়াছেন। উত্তর দিলেন, "খুব করবো। দেখলাম তো, আপনি থাকতে আমার আবার ভয় কি?" এই সহজ সরল মন্তব্যে খুসী হইয়া দাদা-গুরুদেব হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন।

অকপটতা ও সত্যনিষ্ঠা ছিল বিশুদ্ধানন্দের বড় বৈশিষ্ট্য। সাধন-জীবনের গোড়ার দিক হইতেই এই দুইটি তাঁহার মধ্যে ফুটিয়া উঠিতে দেখা যায়। তিনি তাঁহার ব্রহ্মচারী জীবনের কাহিনী বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন, "একদিন স্নান করতে গিয়ে একটি কুমারীকে স্নান করতে দেখি, তাতে আমার কামভাবের উদয় হয়। আমি স্নান না করেই তৎক্ষণাৎ দাদা গুরুদেবের নিকট উপস্থিত হ'লাম। তিনি আমাকে দেখে একটু হাস্য করলেন মাত্র। আমি অকপটে তাঁকে আমার মনের কথা ব্যক্ত করে বললাম, 'হয় আমার একটা প্রায়শ্চিত্তের



বিশুদ্ধানন্দ পরমহংস

ব্যবস্থা করে দিন, না হয় আমায় এখান থেকে তাড়িয়ে দিন। আমার মত লোক এখানে থাকবার উপযুক্ত নয়।"

শিষ্য যেমন সত্যসন্ধ, তেমনিই পরম কারুণিক তাঁহার শিক্ষাগুরু। ভৃগুরাম পরমহংস নির্ব্বিকারভাবে উত্তর দেন, "তোমার কোনো অনুশোচনার প্রয়োজন নেই। আমি আশীর্ব্বাদ করছি, তোমার এই ধরণের কামভাব আর হবে না।" সঙ্গে সঙ্গে তরুণ সাধককে সেদিন তিনি বিশেষ একটি মন্ত্র ও আসন দিয়া দিলেন।

এমন শক্তিধর মহাপুরুষদের সান্নিধ্য, এমন কল্যাণকর পরিবেশ, এমন স্নেহবন্ধন ছাড়িয়া বিশুদ্ধানন্দ আজ গৃহে ফিরিতে চাহিবেন কেন? সংসারাশ্রম গ্রহণের কথায় তিনি বিচলিত হইবেন, তাহাতেই বা বিস্ময়ের কি আছে?

গুরুর আদেশে তাঁহাকে কিন্তু গৃহে ফিরিতেই হইল।

রাজরাজেশ্বরী দেবী নয়নের মণি পুত্রকে এতদিন পরে ফিরিয়া পাইয়াছেন, তাই তাঁহার আনন্দের সীমা নাই! অচিরেই তোড়জোড় করিয়া ভোলানাথের তিনি বিবাহ দিলেন। শুভক্ষণে সুলক্ষণা বধূ কৃষ্ণভামিনী দেবীকে ঘরে আনা হইল।

বিশুদ্ধানন্দজীর জীবনে এ এক প্রকাণ্ড পটপরিবর্ত্তন। গুরুদেবের আদেশে জনজীবনের মধ্যে নিজেকে এবার তিনি স্থাপন করিলেন। বর্দ্ধমানের কাছেই গুস্করা গ্রাম। এখানে আসিয়া শুরু করিলেন চিকিৎসা ব্যবসায়। স্থানীয় জমিদারের বহির্ব্বাটির একাংশে বসিয়া তাঁহার কাজ চলিতে লাগিল।

নিজে তিনি কেবলই প্রচ্ছন্ন থাকিতে চান, কিন্তু তাহা ঘটিয়া উঠে কই? চিকিৎসকের খ্যাতির চেয়ে তাঁহার যোগী জীবনের খ্যাতিই বেশী প্রচারিত হইতে থাকে। আধিব্যাধিক্লিষ্ট জনসাধারণ প্রায়ই তাঁহার কাছে ভীড় জমায়।

বিশুদ্ধানন্দের নিজস্ব সাধনার ধারাটি কিন্তু বরাবরই পূর্ব্বের মত বহিয়া চলিয়াছে। দৈনন্দিন জীবনের কাজকর্ম্ম শেষ হইয়া যায়,

তারপর গভীর রাত্রে নিজের সাধন-আসনে গিয়া তিনি উপবিষ্ট হন। গুরু প্রদত্ত সাধন ও নিগূঢ় যোগক্রিয়া পরম নিষ্ঠায় সম্পন্ন করেন। মাঝে মাঝে অমানিশাযোগে গুস্করার শ্মশানে গিয়াও শক্তি সাধনার নানা রকমের ক্রিয়া অনুষ্ঠান করিয়া আসেন। তাঁহার যোগবিভূতির কথা ধীরে ধীরে সে অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িতে থাকে। এ সময়ে গুরুদেবের আদেশে তিনি শিষ্য গ্রহণও শুরু করিয়া দেন। দলে দলে তাঁহার কাছে আসিতে থাকে আর্ত্ত ও মুমুক্ষু আশ্রয়ার্থী।

বহুতর অলৌকিক সিদ্ধি এ সময়ে বিশুদ্ধানন্দজীর করতলগত হইতেছে। ঘটিতেছে নানা চাঞ্চল্যকর ঘটনা।

এসময়ে তাঁহার কক্ষে দুইটি বিষধর সাপ সর্ব্বদা বাস করিত, স্বচ্ছন্দে সেখানে তাহারা বিচরণও করিত। স্বামীজী তাহাদের খুব আদর-যত্ন করিতেন। উত্তরকালে তিনি বলিতেন, "গুস্করাতে আমার ঘরে দুটো সাপ ছিল, আমি তাদের নাম দিয়েছিলাম, শিবদাস আর শিবদাসী। ক্রিয়ার সময় এ দুটো এসে আমায় জড়িয়ে থাকতো।"

বাল্যকাল হইতেই সাপের সহিত তাঁহার বড় অন্তরঙ্গতা। গ্রামের বাড়ীতে ছিল একটি শিলাময় শিবলিঙ্গ। একটা বিষাক্ত সাপ নিশাকালে প্রায়ই এ লিঙ্গটি জড়াইয়া শুইয়া থাকিত। বলা বাহুল্য, বাড়ীর লোকে রাত্রে কখনো এ মন্দিরে যাইতে সাহসী হইত না। বালক ভোলানাথ কিন্তু এ সাপ সম্বন্ধে ছিলেন অকুতোভয়। এ সম্পর্কে বলিয়াছেন, "আমার কিন্তু মোটেই ভয় ছিল না। আমি দুধ নিয়ে যেতাম; সাপটা ফোঁস্ ফোঁস্ করে উঠলে বলতাম—চুপ! শিবকে দুধ দেব না? তখন সাপটা আর ফোঁস্ করত না। আমি কতকটা দুধ শিবের গায়ে ঢেলে, বাকিটার কিছু প্রসাদ বলে নিজে খেয়ে, কতকটা সাপটাকে দিয়ে আসতাম।"

বিশুদ্ধানন্দজীর খ্যাতি শুনিয়া রমেশ দত্ত মহাশয় একদিন গুস্করায় তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসেন। দত্তমহাশয় তখন বর্দ্ধমানের

ম্যাজিষ্ট্রেট। আসিবার আগে তিনি কয়েকটি গিনি গোপনে তাঁহার স্ত্রীর নিকট রাখিয়া আসিয়াছেন। পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চান, যোগবিভূতিসম্পন্ন সাধু উহা জানিতে পারেন কিনা।

দত্তমহাশয় আসিতেছেন, গুস্করার জমিদারদের মধ্যে তাই সেদিন খুব চাঞ্চল্য পড়িয়া গেল। শশব্যস্তে বারবার আসিয়া বিশুদ্ধানন্দকে বলিতে লাগিলেন, "আপনি শিগ্‌গীর প্রস্তুত হোন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব যে এসে পড়লেন।"

তিনি সহাস্যে উত্তর দিলেন, "আসছেন, তাতে আমার কিরে বাবা। তোমাদের তিনি ম্যাজিষ্ট্রেট, আমার কি?"

দত্তমহাশয় আসিয়া স্বামীজীর সঙ্গে আলাপ শুরু করিয়া দিলেন। তারপর কথাপ্রসঙ্গে কহিলেন, "আপনার সম্বন্ধে অনেক কিছু শুনতে পাই। আপনার নাকি যোগবিভূতি প্রচুর।"

স্বামীজী তৎক্ষণাৎ স্মিতহাস্যে বলিয়া উঠিলেন, "তা কিছুটা রয়েছে বই কি। তুমি তো দেখছি পাঁচখানা গিনি তোমার গিন্নির কাছে গোপনে রেখে এসেছো আর তারপর ভাবছো আমার অলৌকিক শক্তি কতটা তা পরখ্ করবে, দরকার হলে এ সাধুর ভণ্ডামিটাও ভাঙবে। তা, সেটা ভাঙতে পারবে কি?"

রমেশচন্দ্র ততক্ষণে বড় অপ্রতিভ হইয়া পড়িয়াছেন। ইহার পর সশ্রদ্ধভাবে তিনি বিশুদ্ধানন্দজীর সূর্য্যবিজ্ঞান, বায়ুবিজ্ঞান প্রভৃতি ক্রিয়াকাণ্ড দেখিতে লাগিলেন।

রমেশচন্দ্র অতঃপর সবিনয়ে তাঁহাকে জানাইলেন, তিনি বেদের কিছুটা অংশ অনুবাদ করিয়াছেন। শুনিয়া বিশুদ্ধানন্দজী তাঁহার নিজস্ব ভঙ্গীতে তিরস্কারই করিলেন। মুখের উপর সোজা বলিয়া দিলেন, "শূদ্রের পক্ষে এটা নিতান্ত অনধিকারচর্চ্চাই হয়েছে!"

রমেশ দত্ত মহাশয় কিন্তু খেয়ালী সাধকের এ কঠোর বাক্য সেদিন সহজভাবেই গ্রহণ করেন। অপ্রসন্নতার কোন চিহ্ন তাঁহার মুখে দেখা যায় নাই।

সাধক বিশুদ্ধানন্দের জীবনে এবার শুরু হয় নূতন পর্য্যায়। আচার্য্য-রূপে, গুরুরূপে মুমুক্ষু নরনারীকে তিনি আশ্রয় দিতে থাকেন।

রায় বাহাদুর গিরীন্দ্র মুখোপাধ্যায় পুলিশের একজন বড় কর্ম্মচারী। অধ্যাত্মজীবনের উন্নতির জন্য এক সময়ে তিনি ব্যাকুল হইয়া পড়েন। কিছুদিন আগে স্বপ্নে এক গুহ্য মন্ত্র পাইয়াছেন, দেখিয়াছেন এক অপূর্ব্ব দেবমূর্ত্তি। কর্ম্মকার দ্বারা এই দেবমূর্ত্তির অনুরূপ এক ধাতু বিগ্রহ তিনি গঠন করাইয়াছেন। গিরীনবাবুর সংকল্প, যে মহাপুরুষ এস্বপ্নপ্রাপ্ত মন্ত্রের অর্থ উদ্‌ঘাটন করিতে পারিবেন, তাঁহাকেই তিনি বরণ করিবেন গুরুরূপে। বহু সাধুসন্ত এযাবৎ দেখিয়া বেড়াইয়াছেন, এবার আসিলেন বিশুদ্ধানন্দের কাছে।

স্বামীজী প্রথম সাক্ষাতেই বলিয়া উঠিলেন, "তুমি তো দেখছি স্বপ্নেই মন্ত্র পেয়েছো।"

গিরীনবাবু সহসা কোন কথা স্বীকার করিতেছেন না। স্বামীজী এবার ধাতুমূর্ত্তির কথা বলিয়া দিলেন। শুধু তাহাই নয়, অতঃপর তাঁহার বাড়ীতে গিয়া, যে বাক্সে উহা লুকানো রহিয়াছে তাহাও দেখাইয়া দিলেন। গিরীনবাবুর লজ্জা ও অনুতাপের সীমা রহিল না। মহাপুরুষের চরণে এবার করিলেন আত্মসমর্পণ।

বিখ্যাত ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার একবার গুস্করায় গিয়া বিশুদ্ধানন্দকে দর্শন করেন। আলোচনা প্রসঙ্গে স্বামীজী তাঁহাকে বলেন, "মানবদেহের সাধারণ কয়টি দ্বার ছাড়া আরও অগণিত দ্বার রয়েছে। এমন কি প্রত্যেকটি লোমকূপই এক একটি দ্বার; লৌকিক চোখ দিয়ে এগুলো আমাদের কাছে ধরা পড়ে না। যোগীরা কিন্তু অবলীলায় দেখিয়ে দিতে পারেন।"

ডাঃ সরকার স্বামীজীকে ধরিয়া পড়িলেন, তাঁহাকে ইহা দেখাইতে হইবে। কৌতূহলী ভক্তেরা ভীড় করিয়া দাঁড়াইলেন। বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসকের সম্মুখে শুরু হয় যোগবিভূতি প্রদর্শন।

বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে ডাঃ সরকার দেখেন, স্বামীজী নিজ দেহের

লোমকূপ দিয়া বড় বড় স্ফটিকের দানা প্রবিষ্ট করাইতেছেন। হাত দিয়া ঘষিবার সঙ্গে সঙ্গে আবার তাহা বাহির হইয়া আসিতেছে।

সবাইর সামনে আরও এক অদ্ভুত কাণ্ড তিনি করেন। দীর্ঘ একখণ্ড ঘৃতসিক্ত বস্ত্র নিজের মুখ-বিবরে প্রবেশ করান, তারপর সর্ব্বসমক্ষে নাভিদেশ দিয়া উহা টানিয়া বাহির করিতে থাকেন। ডাঃ সরকার নিজেও এই বস্ত্রখণ্ড কিছুটা টানিয়া দেখিয়াছিলেন।

বড় অদ্ভুত বিশুদ্ধানন্দের এই কাণ্ড। ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া ভারত-প্রসিদ্ধ ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার সেদিন বলেন, "স্বামীজী, আমাদের বৈজ্ঞানিকদের দেহতত্ত্ব বিদ্যা যে কত অসম্পূর্ণ, আজ তা আপনি ভালোভাবেই আমায় দেখিয়ে দিলেন।"

ডাঃ চন্দ্রশেখর কালী ও অক্ষয়কুমার দত্ত সেবার বিশুদ্ধানন্দের সাথে দেখা করিতে আসেন। তাঁহারা শুনিয়াছেন, স্বামীজী পরমাণুর রূপান্তর ঘটাইয়া হীরা, প্রবাল প্রভৃতি রত্ন তৈরী করেন। তাঁহাদের অনুরোধে স্বামীজী একটি লেন্স নিয়া বসিলেন, উহাতে সূর্য্যালোক প্রতিফলিত করিয়া একটি প্রবাল তৈরী করিবেন।

ক্রিয়াটি দেখানো হইতেছে, শ্রীযুক্ত দত্ত সন্দিগ্ধ হইয়া ভাবিলেন, স্বামীজীর হাতের কোনো কৌশল ইহাতে নাই তো? তখনি হঠাৎ তিনি বিশুদ্ধানন্দজীর হাত ধরিয়া ফেলেন।

এ সংশয় আর চপলতায় স্বামীজী খুব চটিয়া যান। সঙ্গে সঙ্গে অক্ষয়কুমার দত্তের গণ্ডে করেন এক চপেটাঘাত। বলেন, "বেশ তো, এবার ছাখ, আমার হাতে কি রয়েছে।"

অতঃপর স্বামীজী নিজের কম্বলাসন হইতে কিছু পশম ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। অল্প কিছুক্ষণ ইহা নিজ মুঠোর মধ্যে রাখার পর, যোগবলে পরিণত করিলেন এক উজ্জ্বল প্রবালে।

শ্রীযুক্ত দত্ত তখনো ভাবিতেছেন, কোথাও হয়তো হাতের কৌশল কিছু রহিয়াছে। সংশয়বাদী এই বৈজ্ঞানিকের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য স্বামীজী তখন এক অমানুষিক কাণ্ড করেন। নিজ দেহের নাভিদেশ

স্ফীত ও বিস্ফারিত করিয়া উহার মধ্যে তিনি একটি বালিশের অর্দ্ধাংশ প্রবিষ্ট করাইয়া দেন। এই অমানুষিক কর্ম্মের দৃশ্য দেখিয়া দত্ত মহাশয় সেদিন ভয়ে মূর্চ্ছিতপ্রায় হন।

অতঃপর গুস্করা হইতে স্বামীজী বর্দ্ধমানে স্থান পরিবর্ত্তন করেন। এসময়ে শক্তিপীঠ কামাখ্যা ও রামেশ্বর প্রভৃতি বিশিষ্ট তীর্থ তিনি পর্য্যটন করিয়া আসেন।

উত্তরজীবনে বিশুদ্ধানন্দ বাস করেন কাশীধামে হনুমান ঘাটে ও মালদহিয়ায়। এ সময় হইতে তাঁহার মধ্যে ফুটিয়া উঠে নূতনতর প্রকাশ। গুরু-জীবনের লীলা-নাট্য অভিনীত হইতে থাকে বৃহত্তর রঙ্গমঞ্চে। তাঁহার বারাণসী জীবনের এ অধ্যায় ঋদ্ধি সিদ্ধির চমৎকারিতায়, শক্তিসাধনার ঐশ্বর্য্যে ভরিয়া ওঠে।

অলৌকিক শক্তিধর এই মহাপুরুষ বারাণসীর আচার্য্যদের মধ্যে অল্পকাল মধ্যে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া বসেন। দলে দলে আসিতে থাকে ভক্ত আর কৌতূহলী দর্শনার্থী। স্বামীজীও তাঁহার যোগবিভূতির ঐশ্বর্য্য চারিদিকে বিস্তারিত করিয়া দেন। স্বামীজীর এসময়কার সাধন জীবনের নানা অলৌকিক কাহিনী তাঁহার বিশিষ্ট শিষ্য মহামহোপাধ্যায় ডক্টর গোপীনাথ কবিরাজের রচিত 'বিশুদ্ধানন্দ প্রসঙ্গ' গ্রন্থে বর্ণিত রহিয়াছে। ভক্তদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিবৃত এই কাহিনী লোকের বিস্ময় জাগাইয়া তোলে।

বিশুদ্ধানন্দের দেহ হইতে মাঝে মাঝে পদ্মগন্ধ নির্গত হইত। অনেক সময় দূর দূরান্তে থাকিয়াও আশ্রিত ভক্ত শিষ্যেরা এই অলৌকিক পুষ্পসৌরভ টের পাইতেন। তাঁহাদের কাছে এই গন্ধ ছিল সূক্ষ্মদেহে গুরুদেবের এক বিশেষ প্রকাশ। কত সমস্যায় ও সঙ্কটে এই দিব্য গন্ধ আশা ও আশ্বাস নিয়া উপস্থিত হইত, মুমূর্ষু আর মুমুক্ষু উভয়েরই জীবনে আনিয়া দিত নূতন প্রেরণা।

এক একদিন খেয়ালখুসীমত বিশুদ্ধানন্দজী আপন বিভূতি প্রদর্শন করেন, ভক্ত ও কৌতূহলী দর্শকেরা সোৎসাহে তাঁহাকে ঘিরিয়া বসে,

খানিকটা তূলা ও লেন্‌স নিয়া শুরু করেন ক্রিয়া, তারপর সৌরকর সাহায্যে তৈরী করেন বহুমূল্য হীরক ও প্রবাল। কখনো বা ভক্তদের আব্দার ও অনুরোধে এগুলি তৈরী হয়, আবার তুচ্ছ বস্তুর মত স্বেচ্ছায় এই রত্ন নদীতেও ফেলিয়া দেন। এ বিষয়ে কেহ বিস্ময় প্রকাশ করিলে সহাস্যে বলেন, "সাধুর আবার রত্ন দিয়ে কি প্রয়োজন? তাঁর কাছে এর মূল্যই বা কি?"

মহাপুরুষের এই যোগবিভূতির লীলা বিচিত্র ধারায় বহিয়া চলে। কখনো কাহাকেও কাছে ডাকিয়া সানন্দে তাঁহার রুমালে বা পোষাক-পরিচ্ছদে পুষ্পগন্ধের সৃষ্টি করেন। কখনো বা একটি খালি পাত্র কাপড় দিয়া ঢাকিয়া রাখেন, তারপর ভিতর হইতে বাহির করেন একগাদা সুস্বাদু সন্দেশ। কাগজ হইতে বিভূতিবলে তৈরী হয় সদ্য-প্রস্ফুটিতে কত মনোহর পুষ্প। পাথরের শিবলিঙ্গগুলি টপাটপ নিজের মুখগহ্বরে ফেলিয়া দেন, মুহূর্তে সেগুলি কোথায় অন্তর্হিত হয়। প্রয়োজন মত যখন তখন এই শিবলিঙ্গ আবার উদ্‌গীরণও করেন।

তাঁহার কাছে এ যেন এক কৌতুককর খেলা। ভক্তদের কহিতেন, "আমি বিভূতি দেখাই কেন জানো? আমি চাই, লোকে যেন এসব দেখে অতীন্দ্রিয় জগৎ সম্বন্ধে প্রেরণা পায়।" কিন্তু ক্রিয়া দেখানোর আগে কুমারী ভোজনের টাকাটি উৎসাহী দর্শনার্থীর কাছ হইতে আদায় করিতে কখনো তাঁহার ভুল হইত না।

একবার এক ভক্ত প্রশ্ন করেন, "বাবা, কুমারী ভোজন সম্বন্ধে আপনার এমন কড়াকড়ি কেন?"

বিশুদ্ধানন্দজী উত্তরে কহিলেন, "বিভূতি দেখানো যে অপরাধ!"

ভক্তটি বিচলিত হইয়া উঠিলেন। আবার প্রশ্ন করিলেন, "বাবা, আপনার আবার অপরাধ কিসের?"

স্বামীজী সহাস্যে বলিলেন, "যারা বিশুদ্ধ বস্তু দেখবার অধিকারী নয়, তাদের এ বস্তু দেখানো অপরাধ নয় তো কি? হাতীর বোঝা ছাগলের ঘাড়ে চাপানো অপরাধ বই কি!"

বিশুদ্ধানন্দ বলিতেন, কুমারীদের মধ্যে মহাশক্তির ভাবনা করিয়া তিনি তাহাদের ভোজন করান। একবার তাঁহাকে বলিতে শুনা গিয়াছিল, "ছাখো কুমারী ভোজনের প্রয়োজন তোমাদের নয়, আমার। যখন আমি কিছু দেখাই, তখন সেই প্রক্রিয়ার ফলে আমার শরীরে তাপ জন্মে, সেই তাপ প্রশমনের উপায় হচ্ছে এই কুমারী ভোজন।"

স্বামীজীর অন্যতম জীবনীকার শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত এ সম্পর্কে লিখিয়াছেন, "কুমারী ভোজন হইলে কোনও একটি কুমারীর পাত হইতে কিঞ্চিৎ প্রসাদ তুলিয়া স্বামীজীর ভোজনকালে দেওয়া হইত। কুমারী সেবাটা তাঁহার নিকট একটা আচার মাত্র ছিল না। তাঁহার চক্ষে কুমারী জগদম্বারই প্রতীক। অনেকদিন পরে একদা কথাপ্রসঙ্গে তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন,—'স্বয়ং জগদম্বা ভিন্ন জগতে আবার কুমারী কে আছে রে, বাপু?' অর্থাৎ, নিঃসঙ্গা আদি ও অদ্বিতীয়া শক্তিই প্রকৃত কুমারী।"

এই কুমারীদের মধ্যেই শক্তিসাধক বিশুদ্ধানন্দ পরমহংস তাঁহার আরাধ্য মহাশক্তির প্রতিরূপ দর্শন করিতেন।

আত্মম্ভরী ব্যক্তিদের, তা সাধু সন্ন্যাসী হোক কি গৃহী ভক্তই হোক, স্বামীজী বড় অপছন্দ করিতেন। ইহাদিগকে মাঝে মাঝে তিনি বেশ শিক্ষাও দিয়া দিতেন। সে-বার শান্তিপুরে শিষ্য গিরীন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে তিনি বসিয়া আছেন। এমন সময় কোথা হইতে এক সন্ন্যাসী সেখানে আসিয়া উপস্থিত। সন্ন্যাসীর কাছে একটি অদ্ভুত শিবলিঙ্গ রহিয়াছে, কোন সাধকই নাকি উহার দিকে বেশীক্ষণ দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া থাকিতে পারেন না।

সন্ন্যাসী এই অলৌকিক গুণসম্পন্ন শিবলিঙ্গটি দিয়া নবপরিচিত সাধকদের শক্তি পরীক্ষা করিতেন। এবার বিশুদ্ধানন্দজীকে যাচাই করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল—তাই শিবলিঙ্গটি তাঁহার সম্মুখে স্থাপন করিলেন। সন্ন্যাসীর মনোভাব বুঝিয়া নিতে স্বামীজীর দেরী হয় নাই।

শিবলিঙ্গটিকে দুই-তিনবার হাত দিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া উহার দিকে তিনি স্থিরদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকাইয়া রহিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘটিল এক অদ্ভুত কাণ্ড। কি জানি কেন শিলা-নির্ম্মিত শিবলিঙ্গ ফাটিয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া মাটিতে ছড়াইয়া পড়িল।

এভাবে এই বস্তুটি ফাটিয়া যাওয়ায় সন্ন্যাসী বড় মুষড়িয়া পড়েন, দুই চোখ দিয়া জল ঝরিতে থাকে।

বিশুদ্ধানন্দ কহেন, "কেন বাবা, এটা ভেঙ্গে যাওয়ায় কাঁদবার কি আছে? আর একটা শিবলিঙ্গ যোগাড় করা যায় না?"

সখেদে সন্ন্যাসী জানাইলেন, "বাবা, এই শিবলিঙ্গ আসলে আমার নিজের নয়, আর একজনের কাছ থেকে এনে কাজে লাগাচ্ছিলুম। এটা ভেঙ্গে যাওয়ায় আমি মহা বিপদে পড়লাম।"

"বাপুহে, এত অধীর হয়ো না। যে এ বস্তু ভাঙ্গতে পারে, আবার গড়ে দিতেও সে পারে! কিন্তু এমন কাজ তুমি কেন এখানে করতে এলে, বল তো? মনে রেখো, যে সাধককে পরীক্ষা করতে চাও, তাঁর হৃদয়ে ক্ষমার পরিমাণ কম থাকলে তোমার ঘোরতর অনিষ্ট হতে পারে। একাজ আর কক্ষনো ক'রো না!"

অতঃপর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত টুক্‌রাগুলি করপুটে রাখিয়া বিশুদ্ধানন্দ কয়েকবার তাহা শূন্যে আন্দোলিত করিলেন। সকলে বিস্মিত হইয়া দেখিল, খণ্ডবিখণ্ড শিবলিঙ্গ একেবারে জোড়া লাগিয়া গিয়াছে! কখনো ভাঙ্গিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না।

কিন্তু কোন নিরভিমান, খাঁটি সাধু-সন্ন্যাসী আসিলে স্বামীজীর আদর-যত্নের আর সীমা থাকে না। ঐ গিরীনবাবুর বাড়ীতেই আর একদিন কয়েকটি সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হয়। ইঁহারা প্রকৃত মুমুক্ষু ত্যাগ-তিতিক্ষাবান সাধক। আন্তরিক সম্ভাষণের পর স্বামীজী তাঁহাদের কাছে আনিয়া বসাইলেন।

শিষ্য গিরীনবাবু কয়েকদিন আগে গুরুজীকে একটি মূল্যবান শাল

উপহার দিয়াছেন। এটি মাটিতে বিছাইয়া স্বামীজী সাধুদের জন্য আসন রচনা করিয়া দিলেন। তাঁহারাও পরমানন্দে এই শালের উপর বসিয়া গাঁজার ছাই ঢালিতে লাগিলেন।

স্বামীজীর ইচ্ছা হইয়াছে, এই সৎ সাধুদের ভাল করিয়া সম্বর্দ্ধনা করিবেন। তাছাড়া, এ সূত্রে আর একটি কল্যাণকর কাজও করা যাইবে। বহুমূল্য শালটি গুরুকে দান করিয়া শিষ্যের অন্তরে কিছুটা অহঙ্কার জাগিয়াছিল। এবার তাহা স্তিমিত হইয়া আসিল।

সত্যকার নিরভিমানতা ও গ্রহণেচ্ছু মন নিয়া স্বামীজীর কাছে না আসিলে দর্শনার্থীরা অনেক সময় বিপদে পড়িতেন।

দর্শনশাস্ত্রের বিখ্যাত অধ্যাপক, ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত একবার বিশুদ্ধানন্দজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। স্বামীজীকে ঘিরিয়া তখন গৃহমধ্যে বহু সাধক ও বিদ্বান লোক বসিয়া আছেন। মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ, বিচারপতি স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি তাঁহার সভায় প্রায়ই আসেন। আজিও আসিয়াছেন। ডঃ দাশগুপ্তকে স্বামীজীর সহিত পরিচয় করিয়া দেওয়া হইল। স্বভাবতঃই এই মনীষী অধ্যাপকের রচিত গ্রন্থের কথাও উঠিল।

ডঃ দাশগুপ্ত প্রশ্ন করিলেন, "যোগ সাধনার নিগূঢ় তত্ত্বসমূহ আমার তেমন বোধগম্য হচ্ছে না কেন, বলুন তো?"

স্বামীজী বলিলেন, "তুমি যা লিখেছ, সেটুকু বুঝেছ তো?"

অধ্যাপক সখেদে উত্তর দিলেন, "বুঝেছি যে, তা-ই বা কি করে বলা যায়? তাছাড়া, এত লিখেই বা কি হ'লো?"

কক্ষস্থিত বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সম্মুখে বিশুদ্ধানন্দ বলিয়া বসিলেন, "হবে না কেন? সত্যি সত্যি যা চেয়েছ, তা তো যথেষ্টই পাচ্ছ। অর্থ আসছে, নাম হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে অহঙ্কারও আসছে।"

সকলেই মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিলেন, শক্তিধর মহাপুরুষ কাহারো মনরাখা কথা বলিতে অভ্যস্ত নন।

ডঃ দাশগুপ্ত নিবেদন করিলেন, স্বামীজীর কিছু বিভূতি তিনি দর্শন

করিতে চান। স্বামীজী কিন্তু একথায় কানই দিলেন না। মনক্ষুণ্ণ হইয়া অধ্যাপককে সেদিন ফিরিয়া আসিতে হইল।

ডঃ দাশগুপ্ত যাহা পারেন নাই, পরদিন কিন্তু তাঁহার বালিকা কন্যা তাহা করিতে সমর্থ হয়। স্বামীজী তাঁহার সহিত নানা কৌতুক করিতেছিলেন। হঠাৎ এক সময়ে খুসী হইয়া বলিলেন, "আচ্ছা ছ্যাখ, তোকে আমি এখনি চমৎকার সন্দেশ খাইয়ে দিচ্ছি।"

একটি খালি কৌটা নিয়া সর্ব্বসমক্ষে উহা একখণ্ড চাদর দিয়া ঢাকিয়া দিলেন। তারপর কৌটাটি খুলিয়া দেখা গেল এক আশ্চর্য্য দৃশ্য। কোথা হইতে কয়েকটি অতি উৎকৃষ্ট সন্দেশ সেখানে আসিয়া গিয়াছে। বালিকা তো এ সন্দেশ পাইয়া মহা খুসী।

প্রয়োজন হইলেই শিষ্যদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে এই মহাপুরুষের বিভূতিলীলা প্রকট হইত। অপরিচিত ভক্তজনের উপরও তাঁহার কৃপা বর্ষণের নজীর আছে।

বর্দ্ধমান জেলার শোভারাণী দাসী নামে এক ক্ষুদ্র বালিকা বড় অদ্ভুত ভাবে সে-বার বিশুদ্ধানন্দজীর কৃপা লাভ করে। ইহার পর কাশীধামে স্বামীজীর কাছে সে যে পত্র দেয়, তাহা বড় বিস্ময়কর। মেয়েটি লেখে, "বাবা, আমি আপনাকে চিনি না, কিন্তু মনে হয়, প্রায়ই আপনাকে আমাদের ঠাকুর-ঘরে দেখিতে পাই। সেদিন রাত্রিতে স্বপ্নেও আপনাকে দেখিলাম। আপনি বলিলেন, 'আমার নাম ভোলানাথ, উপস্থিত প্রকাশ বিশুদ্ধানন্দ পরমহংসরূপে, আমি কাশীতে থাকি'।"

স্বামীজী এই ভক্তিমতী বালিকাটিকে আশ্রয় দেন, সাধন নির্দ্দেশ দিয়া পত্রাদি লেখেন।

গুরুর দায়িত্ব সম্বন্ধে বিশুদ্ধানন্দজী বলিতেন, "গুরুর কাজ শিষ্যদলের মধ্যে অধিষ্ঠিত হয়ে তাদের শোষণ করা নয়—শিষ্যদের গুরুভার গ্রহণ করেন, তাই তিনি গুরু।"

আশ্রিতদের রক্ষণাবেক্ষণ এবং তাহাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্পর্কে

তাই তাঁহার এমন সদা সতর্ক দৃষ্টি ছিল। সুদূর অঞ্চলে অবস্থান করিয়াও সজাগ প্রহরায় তিনি তাহাদিগকে রক্ষা করিয়া চলিতেন। কি সাংসারিক জীবনের আপদে বিপদে, কি সাধন-স্তর অতিক্রম করার সময়ে, সর্ব্বদা শিষ্যেরা এই শক্তিধর গুরুর সাহায্য লাভে ধন্য হইত। সূক্ষ্মদেহে দিব্য পদ্মসৌরভ বিস্তার করিয়া 'গন্ধবাবা' বিশুদ্ধানন্দ দূরদূরান্তের ভক্তদের সম্মুখে অনায়াসে আবির্ভূত হইতেন।

স্বামীজী তখন বর্দ্ধমানে। সেদিন দুপুরে তিনি বিশ্রাম করিতেছেন, একটি ভক্ত বিষণ্নমনে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

স্বামীজী তাঁহাকে দেখিয়াই রুক্ষস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "বাপুহে, সাধনার আসন কি মেয়েমানুষের মুখ ভাববার জন্য ?"

শিষ্যটি এক নূতন সাধক। কাতরকণ্ঠে মিনতি করিয়া কহিলেন, "বাবা, এরকম আর কখনো হবে না।"

শিষ্যটি অতঃপর গুরুভ্রাতাদের কাছে প্রকৃত ঘটনা বিবৃত করেন। আগের দিন তিনি এক সরকারী তদন্তের ভার নিয়া মফঃস্বলে যান। সে সময়ে পথে একটি সুন্দরী তরুণীকে দেখিয়া তাঁহার মন চঞ্চল হইয়া উঠে। সন্ধ্যার সময় আসন করিয়া বসিয়াছেন, তখনো বার বার মেয়েটির কথা মনে উঁকিঝুঁকি মারিতে থাকে। ফলে সাধন ক্রিয়ায় সেদিন বড় ব্যাঘাত ঘটে। শিষ্য কিন্তু তখনি বুঝিয়াছিলেন, গুরুদেবের সদা-সজাগ দৃষ্টিকে কখনো এড়ানো যাইবে না। স্বামীজীর কাছে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে তাহা প্রমাণিত হইয়া গেল।

চরিত্রহীন একটি লোক সেবার স্বামী বিশুদ্ধানন্দজীর কৃপা প্রাপ্ত হয়, দীক্ষাও সে লাভ করে। লোকটি বিবাহিত। এখন হইতে দাম্পত্য জীবনের সততা রক্ষায় সে উদ্বুদ্ধ হয়।

এক ভ্রষ্টা নারীর সহিত এতকাল তাহার অবৈধ প্রণয় চলিয়া আসিতেছিল। সেই নারী কিন্তু এত সহজে তাহাকে ছাড়িতে চায় না, বারবারই উত্যক্ত করিতে থাকে। অবশেষে একদিন শিষ্যটি স্থির করে,

গোপনে সেই তরুণীর কাছে যাইবে, তাহাকে ভাল ভাবে বুঝাইয়া আসিবে—তাহাদের প্রণয় সম্পর্ক চিরতরে শেষ হইয়াছে।

একদিন মধ্যরাত্রে সুযোগ মিলিল। স্ত্রী শয্যার একপাশে শুইয়া আছে। গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। এই সুযোগে সে সন্তর্পণে দুয়ার খুলিয়া বাহির হইল। ক্ষণপরেই পিছন হইতে ছুটিয়া আসিয়া স্ত্রী তাহাকে ধরিয়া ফেলে। কাঁদিতে কাঁদিতে বলে, "ছিঃ, তোমার কি লজ্জা নেই! আবার সেই মেয়েটার কাছে যাচ্ছো!"

বিস্মিত হইয়া স্বামী প্রশ্ন করিল, "আচ্ছা, সত্যি সত্যি বল তো, আমি সেখানে যাচ্ছি, তা তুমি জানলে কি করে? আর এমন গভীর ঘুমই বা তোমার কি করে ভাঙ্গলো?"

"তা হলে শোন এক অদ্ভুত কথা। বাবা বিশুদ্ধানন্দ যে এইমাত্র এসে আমায় ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে দিলেন। বলে গেলেন—ওরে ওঠ, ওঠ, তুই তো বেশ ঘুমিয়ে আছিস্, আর ছাখ্, তোর স্বামী আবার সেই ভ্রষ্টা মেয়েটার কাছে চললো।"

বিশুদ্ধানন্দ এ ঘটনাস্থল হইতে বহু দূরে আছেন। শত শত মাইলের ব্যবধানে, এই গভীর নিশীথে কোন্ শিষ্য কি করিতেছে, কে কোথায় অধঃপাতে যাইতেছে, কোন কিছুই এই শক্তিধর মহাত্মার জানার বাইরে নয়। এমনি সদা সজাগ, কল্যাণময় দৃষ্টি দিয়া শিষ্যদের তিনি ঘিরিয়া রাখেন, বহন করেন তাহাদের গুরুভার।

শিষ্যদের উদ্বুদ্ধ করিতে, সাধন ও ক্রিয়ার দিকে সজাগ করিয়া তুলিতে স্বামীজীর উৎসাহের অন্ত ছিল না। মুমুক্ষু শিষ্যেরা অনেক সময় ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিতেন, "বাবা, ঈশ্বরের কৃপা, গুরুর কৃপা, কি করে পাবো, তা বলে দিন।"

স্বামীজী উত্তরে বলিতেন, "ক্রিয়া কর, ক্রিয়া কর, তা থেকেই নির্ভর আসবে, সকল বুঝতে পারবে, আর বিচলিত হবে না।—ক্রিয়া করলেই ঈশ্বরের কৃপা উপলব্ধি করা যায়। আরে বাবা, কৃপা তো অনবরতই মাথার উপর ঝরছে, কিন্তু বুঝতে পাচ্ছো কি? স্ত্রীর পেছনে, অর্থের

পেছনে, ভাল আহারের পেছনে যখন ছুটছো—তখন তোমরা কর্ত্তা। আর শুধু সাধন-ভজনের বেলায়—বাবা কৃপা করুন !”

ক্রিয়ানিষ্ঠা সম্বন্ধে শক্তিধর মহাপুরুষের এ ধরণের উক্তি বহু শিষ্যের জীবনে কল্যাণ আনিয়া দেয়।

সাধারণভাবে শিষ্যদের সম্পর্কে স্বামীজীর মনোভাব ও আচরণ ছিল অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও স্নেহপূর্ণ। এক এক দিন তাই তাঁহাকে বলিতে শুনা যাইত, “আমি এখনও ঠিক গুরু হইনি, যেদিন হবো, সেদিন সাজা দিয়ে, ক্লেশ দিয়ে সকলকে টেনে তুলবো।”

যে কোনো ছোটোখাটো উপকার কাহারো কাছে একবার পাইলে, স্বামীজী তাহা বিস্মৃত হইতেন না। উপযুক্ত সময়ে ইহার বহু গুণ প্রত্যুপকার করাই ছিল তাঁহার স্বভাবগত ধর্ম্ম।

সে-বার তিনি কলিকাতায় অবস্থান করিতেছেন। অনেক খোঁজখবর নিয়া নেপালের এক রাণা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। কক্ষে ঢুকিয়াই রাণাসাহেব তাঁহার সম্মুখে তুলিয়া ধরিলেন জটাজূটমণ্ডিত এক সাধুর পুরাতন ছবি !

সেদিকে তাকাইয়াই স্বামীজী বলিয়া উঠিলেন, “হ্যাঁ বাবা, আমার স্মরণ হয়েছে। তা আমার কাছে কি প্রয়োজন, বল।”

সঙ্গিনী কন্যাটিকে দেখাইয়া রাণাসাহেব বলিলেন, “আমার এ কন্যাটি সবচেয়ে আদরের। দীর্ঘদিন যাবৎ সে মস্তিষ্কের রোগে ভুগছে। ডাক্তারেরা বলছেন এ রোগ দুরারোগ্য। চিকিৎসা অনেক করা হয়েছে, কোন ফল হয় নাই। আমার মেয়ের জীবন কি তাহলে ব্যর্থ হয়ে যাবে ? কৃপা করে আপনি তার প্রাণরক্ষা করুন।”

প্রসন্ন দৃষ্টিতে নেপালী মেয়েটির দিকে চাহিয়া স্বামীজী তাহাকে কাছে ডাকিলেন। খানিকক্ষণ তাহার মস্তকটি নিজের হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিয়া রহিলেন। তারপর বলিলেন, “মা, তোমার রোগ একেবারে সেরে গেছে। দেখবে, এ অসুখ আর কখনো হবে না।”

মেয়েটির ঐ ব্যাধি চিরতরে দূর হইয়া যায়।

ইঁহারা চলিয়া গেলে স্বামীজী পুরাতন কাহিনী বিবৃত করিলেন। বহু বৎসয় আগে, পরিব্রাজক অবস্থায়, একবার তিনি নেপাল যান। এক গহন অরণ্যে সাধন-আসন স্থাপন করিয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় এক ভক্তিমান রাণা অনুচরবৃন্দসহ সেখান দিয়া যাইতেছেন। ইনিই সেই রাণা। স্বামীজীর বনমধ্যস্থিত আসনের সম্মুখে আসিয়া সেদিন করজোড়ে জিজ্ঞাসা করেন, "বাবা, আমি আপনার কি উপকার করতে পারি, কৃপা করে আদেশ করুন।"

স্বামীজী উত্তরে বলেন, "বেটা, তোমার তেমন ইচ্ছে হলে এখানে কিছু ধুনীর কাঠ যোগাড় করে দিতে পারো।"

রাণা সাহেব তখনি সোৎসাহে তাঁহার লোকজন দিয়া প্রচুর কাঠ সংগ্রহ করিয়া দেন। বহু বৎসর পর বিশুদ্ধানন্দ মহারাজ আজ সেই উপকারটুকুর প্রতিদান দিলেন।

সাধারণভাবে স্বামীজী ভক্ত সাধক অপেক্ষা শক্তিধর যোগীর বেশী মর্য্যাদা দিতেন। ত্রৈলঙ্গ স্বামী, রামদাস কাঠিয়াবাবা, শ্যামাচরণ লাহিড়ী, লোকনাথ ব্রহ্মচারী, গম্ভীরনাথ প্রভৃতি মহাপুরুষকেই তিনি সার্থকনামা যোগী বলিয়া স্বীকৃতি দিতেন, শ্রদ্ধা করিতেন।

সে-বার মা আনন্দময়ী ভক্তদের নিয়া বিশুদ্ধানন্দজীর আশ্রমে তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। সেদিনকার এই সাক্ষাতের দৃশ্যটি বড় কৌতূহলোদ্দীপক।

আনন্দময়ীর আগমনে আশ্রমে আনন্দের তরঙ্গ উঠিল। কিছুক্ষণ কুশলবার্ত্তা ও নানা হাস্যকৌতুকের পর আগন্তক ভক্তদের কেহ কেহ ধরিয়া বসিলেন, বাবাকে বিভূতি লীলা দেখাইতে হইবে।

বিশুদ্ধানন্দকে রাজী হইতে হইল। এবার সানন্দে সকলে তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিলেন। একটি ফুল হাতে নিয়া বড় একটি স্ফটিকের দানা তৈরী করিতেছেন, এমন সময় আনন্দময়ী খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

কহিলেন, "বাবা, তুমি যা করছো, মেয়ে কিন্তু তা সব কিছুই বুঝতে পারছে।"

শিষ্যদের বারবার অনুরোধ সত্ত্বেও মা-আনন্দময়ী কিন্তু এই রহস্য উদ্‌ঘাটন করিলেন না। হাসিতে হাসিতে শুধু কহিলেন, "না গো, খুলে বললে যে, বাবা আমায় ডাণ্ডা মারবে।"

বিশুদ্ধানন্দজী এতক্ষণ মুচকি হাসি হাসিতেছিলেন। এবার স্নেহের সুরে আনন্দময়ীকে লক্ষ্য করিয়া সংক্ষেপে কহিলেন, "বেটি, তোকে দিয়েই তো এসব কচ্ছি।"

লঘু ও কৌতুকপূর্ণ এই সব হাস্যালাপের পর আনন্দময়ী অনুযোগের সুরে বলিয়া উঠিলেন, "বাবা, তুমি এসব কি দেখাও? এর চাইতে তোমার ভেতরে যে দুর্লভ বস্তু আছে, তা এদের তুমি দাও না কেন?"

স্বামীজী এবার অন্তর্মুখীন হইয়া উঠিলেন। শান্ত, অনুচ্চ কণ্ঠে কহিলেন, "নেয় কে?"—অর্থাৎ এ সাধনার উপযুক্ত অধিকারী কোথায়? আর, কোথায়ই বা তাহা গ্রহণের সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা?

আনন্দময়ী কিন্তু সহজে ছাড়িবার পাত্রী নন। স্বামীজীর প্রিয় শিষ্য ডক্টর গোপীনাথ কবিরাজকে ডাকিয়া বলিলেন, "বাবাজী, বাবা কিন্তু তোমাদের এই সকল খেলা দেখিয়ে ভুলিয়ে রেখেছেন, তোমরা এ দেখে ভুলে থেকো না যেন। বাবার মধ্যে যে সব বস্তু আছে তা শিগ্‌গীর তোমরা আদায় করে নাও।"

বিশুদ্ধানন্দজী প্রায়ই ভক্তদের বলিতেন, "দ্যাখো, এ সব অলৌকিক বিভূতিলীলা দেখার ফলে কিছুটা কাজ হয়, নূতন সাধকের চিত্তে উৎসাহ জাগে। এই উৎসাহ জাগানো, আর নাস্তিকদের মধ্যে আস্তিক্য বুদ্ধির উন্মেষ ঘটানোই যে আমি চাই।"

উত্তরকালে স্বামীজীর এই বিভূতি প্রদর্শনের উৎসাহে ভাটা পড়ে—ধীরে ধীরে কেবলি তিনি অন্তর্মুখীন হইতে থাকেন। এসময়ে তাঁহাকে বলিতে শোনা যাইত, "আগে আগে অনেক বিভূতিই দেখিয়েছি। তখন এ সব দেখানোর দিকে একটা ঝোঁক ছিল। জ্ঞানগঞ্জে যাবার আগে

শাস্ত্রের অনেক কথাই গালগল্প বলে মনে হত। জ্ঞানগঞ্জে গিয়ে দেখি, সে যেন একটা মায়াপুরী। সেখানে যে কত কি হয়, তা বলে শেষ করা যায় না। সেখান থেকে যোগশক্তি লাভ করে এসে সকলকে এসব এই অভিপ্রায়ে দেখাতাম যে, সকলে বুঝুক, শাস্ত্র ও সাধন মিথ্যে নয়। আজকাল সে ইচ্ছে হয় না। বরং মনে হয়, এতে লাভ কি হচ্ছে?"

বিশুদ্ধানন্দজীর মরদেহের বিচিত্র লীলা এবার ধীরে সমাপ্তির দিকে আসিয়া পড়িতেছে।

১৩৪৪ সালের আষাঢ় মাস। স্বামীজী তখন কলিকাতায় অবস্থান করিতেছেন। দুরারোগ্য রোগে তিনি আক্রান্ত, তাই চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে আনা হইয়াছে।

২৭শে তারিখের বর্ষণস্নাত প্রভাত। মহানগরীর আকাশে বাতাসে জড়ানো রহিয়াছে মৌন মন্থরতা। বিশুদ্ধানন্দ মহারাজ নিকটস্থ শিষ্যদের কাছে ডাকিলেন। বলিলেন, "সবাই ভাল করে গাও গো, হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।"

ভক্তদের মিলিত কণ্ঠের আওয়াজে, ভক্তিরসাত্মক পদের মধুর ঝঙ্কারে ঘর ভরিয়া গেল। স্বামীজী নিজেও তাহাতে যোগ দিয়া ধীর স্বরে গাহিতে লাগিলেন। শিষ্যদের আননে আজ ফুটিয়া উঠিয়াছে মহা বিস্ময়। তাই তো। এ কি অদ্ভুত ব্যাপার? এরূপ কীর্ত্তন করিতে স্বামীজীকে তো তাহারা কখনো দেখে নাই! যোগ ও তন্ত্র সাধনার শক্তিতে তিনি শক্তিমান, ঋদ্ধি সিদ্ধির তিনি মূর্ত্ত বিগ্রহ। তাই ভক্তিসঙ্গীতের রস ও লালিত্যের ধার কোনদিন ধারেন নাই! আজ কেন এ ব্যতিক্রম?

মর্ত্ত্যলীলার শেষের দিনটিতে স্বামীজীর সারা সত্তায় জাগিয়া উঠিল প্রেমের অপূর্ব্ব আকুতি। তারকব্রহ্ম মহানাম উচ্চারণ করিতে করিতে, আষাঢ়ের মেঘলা সন্ধ্যায়, চিরতরে তিনি নয়ন মুদিলেন।

মরদেহ বিশুদ্ধানন্দজী ত্যাগ করিলেন। কিন্তু এ সঙ্গে ভক্তজনদেরও কি চিরতরে করিলেন পরিত্যাগ? স্বামীজীর এক গুজরাটী ভক্ত ছিলেন,

নাম—হীরালাল ভোগীলাল ত্রিবেদী। ত্রিবেদীজী বর্ণিত এক ঘটনা হইতে এ প্রশ্নের উত্তর কিছুটা মিলিবে।

বিশুদ্ধানন্দজীর তিরোধানের পর প্রায় ছয় বৎসর গত হইয়াছে। এ সময়ে একবার ত্রিবেদীজীর বালিকা কন্যাটি মারাত্মক বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়। ডাক্তারেরা জবাব দিয়া গেলেন। বাঁচিবার যখন কোন আশাই নাই, অসহায় পিতা তখন অবলম্বন করিলেন তাঁহার শেষ আশ্রয়। গৃহে টাঙানো বিশুদ্ধানন্দজীর ছবিটি জল দিয়া ধুইয়া সেই জল তিনি কন্যার মুখে ঢালিয়া দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বিদেহী স্বামীজীর নিকট আকুল প্রার্থনা নিবেদিত হইল—মৃত্যুপত্রযাত্রিণী কন্যার যেন সদ্‌গতি হয়।

উপস্থিত সবাই হঠাৎ চমকিয়া উঠিলেন, রোগীর কক্ষটি যেন পদ্মগন্ধে আমোদিত হইয়া উঠিয়াছে। ভক্ত ত্রিবেদীজী বিস্ময়ে আনন্দে হতবাক হইয়া গিয়াছেন! এ কি! এ যে গুরুজী বিশুদ্ধানন্দেরই বহু পরিচিত অলৌকিক দেহ-গন্ধ!

ইহার পর হইতেই মরণাপন্না বালিকার বিকারের ঘোর কাটিয়া যায়। ধীরে ধীরে সে আরোগ্যলাভ করে।

সেদিন মেয়ের জ্ঞান আসিলে ত্রিবেদীজী যাহা শুনিলেন, তাহাতে বিস্ময়ের সীমা রহিল না। সে বলিল, "বাপুজী, আমাদের এখানে আজ যে গুরুজী এসেছিলেন! আমার কাছে বিছানার ওপর বসে আমায় কত আশ্বাস দিয়ে গেলেন—'বাপ থাকতে মেয়ের আবার ভয় কি গো? তোমাদের সকলের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি আর আজকের? এ যে বহুকালের।'

দেহধারী বিশুদ্ধানন্দ ভক্ত ও শিষ্যদের অনেক গুরুভারই বহন করিয়া চলিতেন। বহুবার অনেকে ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছে। সেদিন কিন্তু মর্ত্যলীলার অবসানেও দেখা গেল, সূক্ষ্মদেহী বিশুদ্ধানন্দ তাঁহার সে দায়িত্বভার ত্যাগ করেন নাই।

শ্রীরমণ মহর্ষি

'অরুণাচল—অরুণাচল!' কে জানে কি ইন্দ্রজাল রহিয়াছে এই নামে? বালক বেঙ্কটরমণের কাণে হঠাৎ সেদিন পশে এই শব্দের ঝঙ্কার, হৃদয়ে তুলিয়া দেয় অদ্ভুত অনুরণন।

কোথায় ইহার অবস্থান, কি ইহার মাহাত্ম্য, কিছুই তাহার জানা নাই, একবারো জানিতে সে চাহে নাই। 'অরুণাচলের' সেই ছন্দোময় বাণী আজ তাহার ঘুমন্ত জীবনে আনিয়াছে জাগরণের আলো, সর্ব্ব সত্তার মূলে দিয়াছে নাড়া! তাই তো সর্ব্বত্যাগী হইয়া আজ সে তিরুভান্নামালাই-এ উপস্থিত হইয়াছে।

ভোর হইতে না হইতে তীর্থযাত্রীবাহী গাড়ীটি ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছে। বেঙ্কটরমণ তাড়াতাড়ি কামরার বাহিরে আসিয়া দাঁড়ায়।

সম্মুখেই পবিত্র অরুণগিরি, প্রভাত সূর্য্যের রক্তচ্ছটায় তাহা রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে। সানুদেশে দণ্ডায়মান অরুণাচলেশ্বরের সহস্রস্তম্ভ মন্দির। প্রকৃতি আর মানুষের দুই মহান সৃষ্টি—পাশাপাশি!

মুগ্ধ বিস্ময়ে বালক বারবার তাকায় অরুণাচলের এই মায়াপুরীর দিকে। সারা অন্তর আজ তাহার অপার তৃপ্তিতে ভরিয়া উঠিয়াছে! এই ভূমিতেই যে তাহার জীবনপ্রভুর অধিষ্ঠান!

১৮৯৬ সালের পহেলা সেপ্টেম্বর। সংসারত্যাগী বেঙ্কটরমণের জীবনে রচনা করে এক নূতন অধ্যায়।

জীবন তাহার সফল, আনন্দের তাই অবধি নাই। দ্রুতপদে সে মন্দিরে ঢুকিয়া পড়ে। বাহিরের দুয়ার, গর্ভগৃহের দুয়ার সবই আজ রহিয়াছে উন্মুক্ত। বিরাট মণ্ডপের কোথাও একটি জনপ্রাণীও নাই। অরুণাচলেশ্বর নিজেই কি কৃপা করিয়া প্রিয় পুত্রের সাথে এই নিভৃত সাক্ষাতের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন?

যুক্তকরে, সাশ্রুনয়নে বেঙ্কটরমণ প্রভুর চরণে প্রণতি জানায়, আর চিরতরে করে আত্মসমর্পণ !

উত্তরজীবনে সেদিনকার এই ঘর ছাড়া বালকই রূপান্তরিত হয় এক মহাজ্ঞানী তাপসরূপে। নাম হয় মহর্ষি রমণ। আপন তপস্যার বলে যে আলোক তিনি প্রজ্বলিত করেন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বহু মুমুক্ষুর জীবনে তাহা পরম কল্যাণ আনিয়া দেয়।

আগের দিন ছিল গোকুলাষ্টমী। পথে আসার সময় কিছু প্রসাদ ও মিঠাই জুটিয়াছে। এদিক ওদিক ঘোরাঘুরির পর খাবারের মোড়কটি নিয়া বালক আইয়ানকুলাম সরোবরের তীরে উপস্থিত হয়। অন্তরে সহসা চিন্তা খেলিয়া যায়। তুচ্ছ এই দেহ, ইহার জন্য এত সব উপাদেয় খাবারের কি দরকার ? কেনই বা এসব সঞ্চয় করিয়া রাখা ?

মোড়কটি তখনি সে জলে নিক্ষেপ করে।

পাথেয় হইতে তিনটি টাকা বাঁচিয়াছে, তাহা সঙ্গেই আছে। কিন্তু এ টাকায় কোন্ প্রয়োজন ? অরুণাচলেশ্বরের মন্দিরের কোণে চমৎকার আশ্রয় পাওয়া যাইবে। তাছাড়া, ভোজন চলিবে ভিখারীদের মত যত্রতত্র। উপাধানের কাজ করিবে এই বাহুদ্বয়। তবে টাকাকড়ি কোন্ কাজে আসিবে ? সঙ্গের তিনটি টাকাও সে জলে ফেলিয়া দেয়।

গলায় আছে পবিত্র উপবীত। বৈরাগী বেঙ্কটরমণের কাছে তাহাও আজ তুচ্ছ ! সরোবরের জলে অবলীলায় এবার উহা ভাসাইয়া দেয়। পরনের কাপড় ছিঁড়িয়া তৈরী করে কৌপীন ! বাকী অংশটুকু রাস্তায় পড়িয়া থাকে। একেবারে নিষ্কিঞ্চন সাধুর বেশ !

বেঙ্কটরমণ মন্দিরের দিকে ফিরিয়া আসিতেছে। এমন সময় এক ভদ্রলোক তাঁহার মুখোমুখী আসিয়া দাঁড়ান। কহেন, "বাবা, তুমি কি মস্তক মুণ্ডন করে ফেলতে চাও ? তা'হলে, আমার সঙ্গে এসো।"

চকিতে বালকের মনে ভাবনা খেলিয়া যায়—সত্যই তো, তাহার এই সুন্দর কোঁকড়ানো চুলের তো আর প্রয়োজন নাই। এবার কাটিয়া

ফেলিলেই জঞ্জাল দূর হয়। তখনই এ প্রস্তাবে সে রাজী হইয়া পড়ে।

অদ্ভুত এই অপরিচিত ভদ্রলোক। বেঙ্কটরমণের মাথার চুল নিয়া তাঁহার এমন মাথাব্যথা কেন? কি মনে করিয়া হঠাৎ নিজ ব্যয়ে তিনি উহা কাটাইয়া দিলেন, তাহা কে বলিবে?

সুন্দর সুঠামতনু, মুণ্ডিতমস্তক বালকের চেহারায় এবার দণ্ডী সন্ন্যাসীর ছাপ পড়িয়াছে।

তীর্থে মস্তক মুণ্ডনের পর স্নান করিতে হয়, ইহাই শাস্ত্রের বিধি। কিন্তু বেঙ্কটরমণের মনে তখন তীব্র বৈরাগ্যের ভাব। সব কিছুই তাহার কাছে অবান্তর হইয়া উঠিয়াছে। ভাবিতে থাকে, নশ্বর দেহের জন্য আবার স্নানের বিলাস কেন?

অরুণাচলেশ্বর নিজেই যেন উদ্যোগী হইয়া স্নানশুদ্ধির ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। পথের মধ্যে হঠাৎ মুষলধারে বৃষ্টি হইয়া গেল। বেঙ্কটরমণ মন্দিরের মণ্টপম্-এ আসিয়া দাঁড়াইতেই দেখা গেল, তাহার সারা দেহ সিক্ত, অজস্র ধারায় জল ঝরিতেছে।

মণ্টপমের মাঝখানে অবস্থিত প্রস্তরবেদীর উপর নবীন সাধক তাহার ধ্যানের আসন বিছাইয়া দেয়। মূল মন্দিরে না ঢুকিয়া এখন হইতে এই মণ্টপম্‌কেই করে তাহার আশ্রয়স্থল।

তিন বৎসর পরে আর একবার মাত্র মন্দিরের অভ্যন্তরে গিয়া সে দেববিগ্রহ দর্শন করিয়াছিল।

আসনে উপবেশন করার সঙ্গে সঙ্গে বেঙ্কটরমণ ধ্যানস্থ হইয়া পড়ে। দিনরাতের ব্যবধান ঘুচিয়া যায়। সংসারের কোন আলোড়নই আর পেঁাছে না তাহার কাছে। পরম প্রশান্তি নিয়া ধ্যানের গভীরে দিনের পর দিন সে ডুবিতে থাকে।

মৌন, আত্মসমাহিত কে এই কিশোর সাধক? তাহাকে ঘিরিয়া মন্দিরের দর্শনার্থীদের কৌতূহলের সীমা নাই। এসময়ে সাধারণের কাছে সে পরিচিত হইয়া উঠে ব্রহ্মণস্বামী নামে।

আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব কেহ কাছে নাই। সদা ধ্যানাবিষ্ট সাধকের দেখাশুনা কে করিবে? কে-ই বা করিবে রক্ষণাবেক্ষণ?

এ কাজে আগাইয়া আসেন শেষাদ্রিস্বামী। তিরুভান্নামালাইর পথে পথে এই খেয়ালী সন্ন্যাসী ঘুরিয়া বেড়ান। সেদিন হঠাৎ এই বালক সাধককে দেখিয়া তাঁহার মমতা জাগে। এখন হইতে তাঁহার সেবা-পরিচর্য্যা শেষাদ্রি নিজেই কিছুটা করিতে থাকেন।

বেঙ্কটরমণের সাধন জীবনে এইবার দেখা দেয় নানা বাধা-বিঘ্ন। দূরদেশ হইতে আসিয়াছেন, এ অপরিচিত স্থানে সহায় বা বন্ধুবান্ধব কেহ নাই। সুযোগ বুঝিয়া দুষ্ট বালকেরা নির্য্যাতন শুরু করে। ঢিল ছুঁড়িয়া, গণ্ডগোল করিয়া চরম উপদ্রব করিতে থাকে।

মণ্টপম্-এর প্রান্তে রহিয়াছে এক অন্ধকারময় ভূগর্ভ। স্থানটির নাম পাতাল-লিঙ্গম। দুর্ব্বৃত্ত বালকদের হাত এড়ানোর জন্য বেঙ্কটরমণ এইখানেই গিয়া ধ্যানস্থ হন। নোংরা, আলো-বাতাসহীন, এই ভূগর্ভে কেবল উঁই, ইঁদুর আর পোকামাকড়ের রাজত্ব। বেঙ্কটরমণের দেহে চলে ইহাদের অবাধ আক্রমণ।

এজন্য তাঁহার কিন্তু এতটুকু ভ্রূক্ষেপ নাই। বিষাক্ত পোকার কামড়ে পিঠে ক্ষতের সৃষ্টি হয়, দরদর ধারে রক্ত ঝরিতে থাকে। কিন্তু ধ্যানের গভীরে তলাইয়া গিয়া সব কিছু তিনি বিস্মৃত হন।

শুভাকাঙ্ক্ষীরা আসিয়া অনুরোধ উপরোধ করে, কিন্তু কিছুতেই তাঁহাকে এই ভূগর্ভ-আসন হইতে সরানো যায় না।

অবশেষে এখানেও দুষ্ট বালকেরা ধাওয়া করে। একদিন দৌরাত্ম্য চরমে উঠে এবং বাধ্য হইয়া বেঙ্কটরমণকে অন্যত্র সরাইয়া নিতে হয়। দুষ্টেরা সেদিন শেষাদ্রি ও বেঙ্কটরমণকে লক্ষ্য করিয়া বড় বড় ইঁট ছুঁড়িয়া মারিতেছে। মহা সোরগোল। এমন সময় বেঙ্কটাচল মুদালি নামে এক ভদ্রলোক দেবদর্শনে আসিয়াছেন। ছেলেদের উৎপাত দমনের জন্য তিনি তাড়াতাড়ি আগাইয়া আসিলেন।

সম্মুখে গিয়া যে দৃশ্য দেখিলেন, তাহাতে বিস্ময়ের অবধি রহিল না। অন্ধকারাচ্ছন্ন গুহার ভিতরে এক দিব্যকান্তি নবীন সাধক নয়ন মুদিয়া বসিয়া আছেন। পোকামাকড়ের তীব্র দংশন, বালকদের নির্য্যাতন কোন কিছুই তাঁহার ধ্যান ভাঙ্গাইতে পারে নাই। বাহ্যজ্ঞান নাই, সারা দেহ একেবারে নিস্পন্দ।

মুদালি কয়েকজনের সাহায্যে বেঙ্কটরমণের দেহটি ধরাধরি করিয়া বাহিরে আনিলেন। কাছেই সুব্রহ্মণ্য মন্দির। তাঁহাকে সেখানে নামানো হইল। কীটের দংশনে পদদ্বয় ও জানুতে ক্ষতের সৃষ্টি হইয়াছে। রক্ত ও পুঁজে একেবারে মাখামাখি। আশ্চর্য্যের বিষয়, এত কিছুতেও কিশোর সাধকের ধ্যান টুটে নাই। এ অদ্ভুত দৃশ্য দেখার জন্য লোকের ভীড় জমিয়া গেল।

মন্দিরগর্ভ হইতে বেঙ্কটরমণের সেদিনকার এই নিক্রমণ উন্মোচিত করে তাঁহার জীবনের এক নূতন অধ্যায়। লোকলোচনের সম্মুখে তিনি আসিয়া দাঁড়ান। শুরু হয় রমণ-মহর্ষির অভ্যুদয়।

আত্মজ্ঞানী মহাসাধক প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী ব্যাপিয়া বিতরণ করেন তাঁহার অধ্যাত্মসম্পদ, বহু মুমুক্ষুর জীবনে আনেন রূপান্তর।

যে উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া মহর্ষি রমণের জীবনভিত্তি রচিত হয়, সে কাহিনী বড় কৌতূহলোদ্দীপক। তিরুচুঝির বালক বেঙ্কটরমণের জীবনে যে আলোকের ঝিলিক সেদিন দেখা দেয়, পরিণত বয়সে তাহারই ঘটে জ্যোতির্ম্ময় প্রকাশ।

মাদুরা শহরের ত্রিশ মাইল দূরের এক গণ্ডগ্রাম তিরুচুঝি। সুন্দরম্ আইয়ার এই গ্রামেরই এক অবস্থাপন্ন ব্রাহ্মণ। স্থানীয় ফৌজদারী আদালতে তিনি আইনব্যবসায় করেন, ব্যবসায়ে পসার-প্রতিপত্তিও মন্দ নয়। ভক্ত ও অতিথিবৎসল বলিয়া সুন্দরম্ আইয়ার ও তাঁহার পত্নী আলাগাম্মলের সুনাম এ অঞ্চলে রহিয়াছে। এই দম্পতিরই পুত্র বেঙ্কটরমণ—উত্তরকালের বিশ্ববিশ্রুত রমণ মহর্ষি।

সেদিন আরুদ্রদর্শনের উৎসব। তিরুচুঝিতে বড় আনন্দ সমারোহ। প্রতি বৎসরই এ সময়ে ভক্তের দল সাড়ম্বরে শিব বিগ্রহ নিয়া শোভাযাত্রা করেন। ঘন ঘন শোনা যায় শঙ্খ ঘণ্টা ঝাঁঝের মঙ্গলধ্বনি, চারিদিকে আলোকসজ্জা ও পুষ্পমাল্যের ছড়াছড়ি। প্রচুর আনন্দ-উল্লাসের মধ্য দিয়া দেবাদিদেবের পূজা এ দিনে অনুষ্ঠিত হয়।

এমনি এক পুণ্যময় উৎসব-দিনে, ১৮৭৯ সালের ৩০শে ডিসেম্বর, পিতামাতার দ্বিতীয় পুত্ররূপে বেঙ্কটরমণ ভূমিষ্ঠ হন।

সেদিন সারা গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়া রাত্রি একটার সময় শিব-বিগ্রহ মন্দিরে ফিরাইয়া আনা হইয়াছে, ঠিক সেই সময়ে সুন্দরম্ আইয়ারের গৃহে মাঙ্গলিক শঙ্খ বাজিয়া উঠে। শিবের উৎসব দিনে আবির্ভূত হন শিবাংশসম্ভূত দিব্যকান্তি শিশু! উত্তরকালে শিবেরই জ্ঞানময় সত্তার অপরূপ রূপায়ণ দেখা যায় তাঁহার মধ্যে।

বালক বেঙ্কটরমণকে শিক্ষার জন্য প্রথমে স্থানীয় বিদ্যালয়ে পাঠানো হয়। তারপর ডিণ্ডিগলের স্কুলে তিনি প্রায় এক বৎসরকাল পড়াশুনা করেন। বার বৎসর বয়সের কালে, তাঁহার জীবনে আসে নিয়তির নির্ম্মম আঘাত। পিতা সুন্দরম্ আইয়ার হঠাৎ একদিন পরলোকে চলিয়া যান। তিরুচুঝির সুখনীড়ও ভাঙ্গিয়া পড়ে।

এবার বড় ভাই নাগস্বামীর সহিত বেঙ্কটরমণকে পাঠানো হয় পিতৃব্য সুব্বিয়ারের কাছে, মাদুরায়। এখানকার উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে কয়েক বৎসর তিনি পড়িতে থাকেন। কিন্তু বই-খাতার বোঝা নিয়া যাতায়াত করিলে কি হইবে, স্কুলের পড়ায় বেঙ্কটরমণের বিন্দুমাত্র উৎসাহ নাই। অসাধারণ মেধার অধিকারী হইলেও এ মেধার সদ্ব্যবহার বড় একটা করিতে দেখা যায় না। নেহাৎ যেটুকু পড়াশুনা না করিলে নয়, তাহা করিয়াই থাকেন সন্তুষ্ট। দেহটি দৃঢ় ও সুগঠিত, খেলাধূলায়ও দেখা যায় তাঁহার প্রচুর উৎসাহ।

সুন্দরম্ আইয়ারের পরিবারের কিন্তু একটা বৈশিষ্ট্য আছে।

স্থানীয় লোকেরা সবাই জানে যে, বিশ-ত্রিশ বৎসর অন্তর এই পরিবার হইতে একজন করিয়া গৃহত্যাগী হয়, সন্ন্যাসজীবন বরণ করে। সুন্দরমের এক কাকা গৈরিকের আহ্বানে ঘর ছাড়িয়াছেন, পরবর্ত্তীকালে তাঁহার বড় ভাইও সন্ন্যাস নিয়াছেন। এবার সুন্দরমের পুত্রদের মধ্যে কে কখন সংসারবিরাগী হইয়া উঠে, তাহা কে জানে? জননী আলাগাম্মলের মনে তাই মাঝে মাঝে হয় দুশ্চিন্তার ছায়াপাত।

আশঙ্কা শেষকালে একদিন সত্য হইয়াই দাঁড়ায়, আর ইহা ঘটে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রেরই জীবনে।

হাসি আনন্দে বেঙ্কটরমণের দিন কাটিয়া যাইতেছিল। হঠাৎ কোথা হইতে অন্তরে আসে বৈরাগ্যের তীব্র আলোড়ন।

মাদুরায় তাঁহার পিতৃব্যের বাড়ীতে সেদিন এক নিকট-আত্মীয় আসিয়া উপস্থিত। কথাপ্রসঙ্গে কৌতূহলী বেঙ্কটরমণ প্রশ্ন করেন,—কোথা হইতে তিনি আসিতেছেন? নিতান্ত সাধারণ প্রশ্ন! তেমনি সাধারণ এক জবাব শোনা যায়—"অরুণাচল।"

কিন্তু কি আশ্চর্য্য! মুহূর্ত্ত মধ্যে এই নামের ঝঙ্কার তাঁহার সারা অন্তরে ছড়াইয়া পড়ে। কে জানে কোন দিব্যলোকের স্পর্শ, কোন মন্ত্রচৈতন্য রহিয়াছে এ শব্দে?

অজানা, অব্যক্ত ভাবরসে মনপ্রাণ ভরপুর হয়, উদ্গত হয় সাত্ত্বিক সংস্কার। উপলব্ধিতে ফুটিয়া উঠে অরুণাচল-এর স্বরূপ। একি! এ যে তেজোলিঙ্গম মহাদেবেরই স্থূল রূপ! তাঁহারই পবিত্র প্রতীক!

উৎফুল্ল হইয়া আবার প্রশ্ন করেন, "অরুণাচল?—কোথায় রয়েছে এই অরুণাচল?"

আত্মীয়টি উত্তর দেন, "সে কি কথা! তিরুভান্নামালাই-এর নাম জানো না তুমি? সেখানেই তো—অরুণাচল।"

কিশোর মনের উদ্দীপনা পরে কিন্তু আর থাকে নাই। এক ঝলক স্বর্গীয় আলোকের মত দেখা দিয়া 'অরুণাচল' আবার কোথায় অন্তর্হিত হইয়া যায়।

কয়েক মাস কাটিয়া গিয়াছে। প্রসিদ্ধ তামিল ধর্ম্মগ্রন্থ পেরিয়া-পুরাণম্ হঠাৎ সে দিন বেঙ্কটরমণের হাতে পড়ে। এ গ্রন্থ তাঁহার জীবনে সর্ব্বপ্রথমে আনিয়া দেয় আত্মিক জীবনের তথ্যসম্ভার।

বহু সিদ্ধপুরুষের অমৃতময় জীবনকথা ইহাতে রহিয়াছে। একাগ্র মনে এগুলির পাঠ শেষ করেন। অলৌকিক জীবনের গোপন রহস্য হাতছানি দেয় বারবার। কোথায় সিদ্ধপুরুষদের এই অতীন্দ্রিয় রাজ্য? ভাববিহ্বল হইয়া বসিয়া বসিয়া ভাবেন, আর উভচরের মত ডানা মেলিয়া মন কেবলি সেখানে উড়িয়া যাইতে চায়।

প্রেম বৈরাগ্য ও আত্মনিবেদনের পথে এইসব মহাপুরুষের আনাগোনা; ভগবানের সহিত ইঁহারা মধুর যোগবন্ধনে বাঁধা। বালক বেঙ্কটরমণের মনশ্চক্ষে বারবার জাগিয়া উঠে এই মহাত্মাদের ছবি, মন অস্থির হইয়া ওঠে।

কিছুদিন পরের কথা। এক অদ্ভুত অনুভূতির মধ্য দিয়া তাঁহার জীবনে ঘটে আধ্যাত্মিক সত্যের প্রকাশ, আসে এক পরিবর্ত্তন। এই পরিবর্ত্তন যেমনি অপ্রত্যাশিত তেমনই বৈপ্লবিক।

মৃত্যুর করাল ছায়া যেন সেদিন তাঁহার সর্ব্ব সত্তায় নামিয়া আসে, আর ইহারই মধ্য দিয়া স্ফুরিত হয় অখণ্ড জীবনের পরম তত্ত্ব।

মাদুরার গৃহের এক নির্জ্জন দ্বিতল কক্ষে বালক বেঙ্কটরমণ সেদিন বসিয়া রহিয়াছেন। অকস্মাৎ তিনি উপলব্ধি করিলেন, মৃত্যুর যবনিকা তাঁহার দেহ, মন ও সমগ্র সত্তার উপর নামিয়া আসিতেছে—এখনি তাঁহার প্রাণ বিয়োগ ঘটিবে। মুহূর্ত্তমধ্যে মনে চিন্তার বিদ্যুৎ-ঝলক খেলিয়া গেল—ডাক্তার, আত্মীয়স্বজন, ইঁহাদের ডাকিয়া কি হইবে?

সঙ্কট হইতে ত্রাণের উপায় নিজেই বাহির করিলেন।

মনে মনে সঙ্কল্প স্থির করামাত্র বিচারবুদ্ধি ও চিন্তাস্রোতটি অন্তর্মুখী হইয়া গেল। শ্বাস-কুম্ভক করিয়া বেঙ্কটরমণ তাঁহার সমগ্র চিন্তাধারাকে সত্যানুসন্ধানের পথে চালিত করিলেন। অনুভূতি হইয়া উঠিল স্বচ্ছ ও

আলোকোজ্জ্বল। ভিতর হইতে স্ফুরিত হইল তত্ত্ব—মৃত্যুর কবলিত হইতে যাইতেছে কোন্ বস্তু? ইহা তো তাঁহার এ নশ্বর দেহটিই, যাহা প্রাণহীন, নীরব, নিস্পন্দ! শ্মশানে নিয়া গিয়া এখনি তো ইহা পোড়াইয়া ফেলা হইবে।

সত্তার গভীরে নিজের চেতনাকে তিনি ঠেলিয়া নিয়া যান। তারপর বিচার করিতে থাকেন—"এই দেহের মৃত্যুর সাথে সাথে দেহমধ্যস্থ 'আমি'রও কি ঘট্‌বে বিনাশ? মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও যে আমি আমার আত্মসত্তার শক্তি ও স্পন্দন উপলব্ধি করছি। সুতরাং এই 'আমি' হচ্ছে একটি অধ্যাত্মকর্ত্তা—যা দেহকে অতিক্রম করেই বর্ত্তমান। বস্তুগত দেহটি অবশ্যই বিনষ্ট হতে পারে—কিন্তু দেহোত্তর 'আত্মা' যে মৃত্যুর স্পর্শ-সীমার একেবারে বাইরে! তা হলে এই প্রকৃত 'আমি' হচ্ছে এক মৃত্যুঞ্জয়ী সত্তা!" (সেলফ্ রিয়েলিজেশান: নরসিংহস্বামী)

মৃত্যুভাবনার সঙ্গে সঙ্গে চলে বালকের সত্যানুসন্ধান। ইহাকে কিন্তু মনোবিশ্লেষণ বা বিচার মনে করিলে ভুল করা হইবে। উত্তরকালে মহর্ষি তাঁহার কৈশোরের এ অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে বলিতেন, "এই সত্ত্ব আমার চৈতন্যের সম্মুখে এক জীবন্ত সত্যরূপে উদ্ভাসিত হয়ে উঠ্‌লো—একে আমি সেই মুহূর্ত্তেই উপলব্ধি করলাম, কোন ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণের প্রয়োজনই আর রইলো না। এই প্রকৃত 'আমি' তখন এক বাস্তব সত্য—আমার দেহের সাথে সংশ্লিষ্ট সমস্ত কর্ম্ম ও আচরণ তখন এই প্রকৃত আত্মসত্তার মধ্যেই কেন্দ্রীভূত হয়ে উঠেছে। এর পর জীবনের সমস্ত কিছু আকর্ষণ এই 'আত্মার' ওপরই নিবদ্ধ হ'ল। মৃত্যুভয়ের চিহ্নমাত্র রইল না। এই নবজাগ্রত আত্মচৈতন্যের মধ্যে আমার জীবনের সমস্ত কিছু তখন থেকে বিলীন হয়ে যেতে শুরু করেছে, আজও তার বিরাম নেই। অপর চিন্তা বা তত্ত্ব বারবার আমার অন্তরে উদিত হয়েছে, আবার দূরীভূতও হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত 'আমি' বা আত্মবোধ রয়েছে অবিচ্ছিন্নভাবে আমার জীবনে বর্ত্তমান। এ যেন সঙ্গীতের নানা ধ্বনি ও মূর্চ্ছনার মধ্যস্থিত অচঞ্চল এক মূল সুর। অতঃপর এই দেহ যা কিছু

কাজ করুক না কেন, প্রকৃত 'আমিটি' সেই অন্তর্নিহিত মূল আত্মবোধের কেন্দ্রেই অধিষ্ঠিত রয়েছে।" (রমণ মহর্ষি ঃ এ ওসৃবোর্ণ)

কিশোর বেঙ্কটরমণের জীবনে সেদিনকার এ অনুভূতির ফল সুদূর-প্রসারী হইয়া উঠে। চিন্তাধারা বারবারই খুঁজিয়া ফিরে জীবনের উৎস-মুখ। দেখা যায় নূতনতর চেতনার উন্মেষ।

সেদিনকার ঐ মৃত্যু-বোধ ও সঙ্কটের কারণ খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। কোন ব্যাধি বা ভগ্নস্বাস্থ্যের প্রতিক্রিয়া ইহা নয়। বেঙ্কটরমণ খেলাধূলায় দক্ষ। সুস্থ, প্রাণবন্ত দেহে তাঁহার নিটোল স্বাস্থ্য টলমল করিতেছে। অন্তর পৌরুষে ভরপুর। মৃত্যুর ছায়া তাঁহার দেহে ও মনে স্বাভাবিক ভাবে কি করিয়া আসিবে? কেনই বা আসিবে?

এই মানস-সঙ্কটের মধ্য দিয়াই বেঙ্কটরমণের জীবনে সেদিন আত্মতত্ত্বের চকিত স্ফুরণ ঘটে। এজন্য কোন চেষ্টা, কোন অনুসন্ধান বা প্রস্তুতিরই প্রয়োজন হয় নাই। প্রারব্ধের বেগ হইয়াছে অনিবার্য্য, জন্মান্তরের সঞ্চিত সাত্ত্বিক সংস্কাররাশি তাই মাথা ঠেলিয়া উঠিতেছে, আনিয়াছে মুক্তির প্রেরণা।

বেঙ্কটরমণের মধ্যে অসাধারণত্ব কিছু নাই। আচার-আচরণ নিতান্ত স্বাভাবিক, আর পাঁচটি কিশোরেরই মত। ধ্যান ও আত্মবিচারের কোন প্রবণতাও কখনো দেখা যায় নাই! তবে তাঁহার গাঢ় নিদ্রালুতার মধ্যেই হয়তো ছিল কিছুটা বৈশিষ্ট্য।

বালককালে তাঁহার নিদ্রার গাঢ়ত্ব কিরূপ অস্বাভাবিক ছিল, মহর্ষি উত্তরজীবনে ভক্তদের কাছে তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। এ বর্ণনায় নিদ্রাকালীন প্রচ্ছন্ন ধ্যানাবেশের ইঙ্গিত পাই ঃ

"আমার নিদ্রা সাধারণতঃ খুব গাঢ় ছিল। তখন আমি ডিণ্ডিগলে থেকে পড়াশুনা করি। একদিন খুব নিদ্রাকর্ষণ হয়েছে, কিছুতেই জাগ্‌ছি না। বহু লোক আমার শয়নকক্ষের সামনে দাঁড়িয়ে আমার ঘুম ভাঙাতে চেষ্টা করে। তুমুল চিৎকার, দ্বারে প্রচণ্ড করাঘাত, সব

কিছুই ব্যর্থ হয়। জোর ক'রে ঘরে প্রবেশ ক'রে, আমার দেহকে তীব্র ঝাঁকুনি দিলে তবে আমার বাহ্যজ্ঞান আসে… …মধ্যরাতে অনেক সময় এক রকমের অদ্ভুত নিদ্রাবেশ হত—এটা ছিল অর্দ্ধ-বাহ্যজ্ঞানের অবস্থা। দুষ্ট খেলার সাথীরা দিনের বেলায় আমায় ঘাঁটাতে সাহস করতো না! রাতে ঐ অবস্থায় তারা আমার ওপর উপদ্রব করতো। অনেক সময়ে আমায় ঘুমন্ত অবস্থায়ই তারা খেলার মাঠে ধরে নিয়ে যেত। তারপর আমায় প্রহার ক'রে, নানাভাবে নির্য্যাতন ক'রে আবার তারা বিছানায় শুইয়ে দিয়ে যেত। এত কিছুতেও কিন্তু সে সময়ে আমার বাহ্যজ্ঞান সহজে ফিরে আসৃতো না।"

সেদিনকার মৃত্যু-সঙ্কটের অনুভূতি বেঙ্কটরমণের সমগ্র জীবনে এক অদ্ভুত ধরণের পরিবর্ত্তন আনিয়া দেয়। পাঠে আর তাঁহার মন নাই, আহারের রুচি ও উৎসাহ কোথায় চলিয়া গিয়াছে। বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনের আকর্ষণও একেবারে শিথিল। ব্যক্তিসত্তার মূলে এক প্রচণ্ড নাড়া পড়িয়া গিয়াছে। ক্রীড়াচঞ্চল, পৌরুষদৃপ্ত কিশোরের জীবন সেদিন বিনয় ও নম্রতার ভারে আনত। নূতনতর লাবণ্যশ্রী এ সময়ে তাঁহার চোখে মুখে ফুটিয়া উঠিতেছে!

এখন হইতে যেটুকু সময় বেঙ্কটরমণ নির্জ্জনে থাকেন, ধ্যানাবেশেই প্রায় তাঁহার কাটে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নাগস্বামী বিদ্রূপ করিয়া কখনো কখনো বলেন, "ওহে জ্ঞানীপুরুষ, যে রকম দেখ্‌ছি, তাতে তোমার পক্ষে উচিত হবে প্রাচীন ঋষিদের মত বনে চলে যাওয়া।"

বেঙ্কটরমণের কিন্তু তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। নিজের ভাবের ঘোরেই তাঁহার দিন কাটিয়া যায়।

কাছেই মীনাক্ষী-সুন্দরেশ্বরের মন্দির। এখন হইতে এ মন্দিরই হয় তাঁহার বড় আশ্রয়স্থল। ইতিপূর্ব্বে মাদুরার এই বিখ্যাত মন্দিরে খুব কমই গিয়াছেন, এবার এখানকার আকর্ষণ তাঁহাকে পাইয়া বসিল।

প্রতিদিন সন্ধ্যায় ভক্তিআনত শিরে মন্দির-অঙ্গনে গিয়া দাঁড়ান।

মীনাক্ষী, নটরাজ ও শৈব সিদ্ধাচার্য্যদের মূর্ত্তির সম্মুখে দাঁড়াইয়া হৃদয়ে জাগে অপূর্ব্ব ভাবাবেশ। কেন যে দু'নয়নে কেবলি অশ্রু ঝরিতে থাকে, তাহা বুঝিতে পারেন না।

এ সময়কার ভাবানুভূতি ও মনোভাবের বর্ণনায় রমণ বলেন—"ভাবাবেগের তরঙ্গ এ সময়ে আমায় ধীরে ধীরে তলিয়ে ফেল্‌ছিল। দেহাত্মবুদ্ধি লোপ পেয়ে গেছে, তাই আত্মসত্তা এতকাল দেহের যে অবলম্বন বা আশ্রয় নিয়ে চলে আসছিল, তাও পরিত্যাগ করতে চায়! সে এখন খুঁজে বেড়ায় এক নূতনতর আশ্রয়কে। তাই তো মন্দিরে এই আনাগোনা। আত্মার বন্ধনমুক্ত প্রবাহ তাই তো এই অশ্রুধারার মধ্য দিয়ে তখন এমন উপ্‌চে পড়ছে। জীবের সাথে ঈশ্বরের খেলা বা লীলার স্বরূপই তো এই! ঈশ্বর—যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অদৃষ্টচক্রের নিয়ামক, যিনি সর্ব্বশক্তিমান ও সর্ব্বজ্ঞ, তাঁর সম্মুখে তাই তো গিয়ে দাঁড়াতুম, আর মাঝে মাঝে তাঁর কৃপা প্রার্থনা করতুম, যেন শৈব সিদ্ধাচার্য্যদের মতই আমার ভক্তি ও নিষ্ঠা বেড়ে ওঠে। তবে প্রায়ই আমি কোন নির্দ্দিষ্ট প্রার্থনা সেখানে করতাম না। শুধু ভেতরের গভীরতম সত্তাকে বাইরের মহাসত্তার সঙ্গে এক করে দিতাম, নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকতাম।"

ভিতরকার মানুষটি সবেমাত্র জাগিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এ সময়ে কোন তীব্র দুঃখ বা সুখ বোধ তাঁহার নাই। বৈরাগ্য, মুক্তি প্রভৃতি কথা যেমন তাঁহার কাছে কোন অর্থজ্ঞাপন করে না—সংসার, ব্রহ্ম প্রভৃতির মর্ম্মও তেমনি রহিয়াছে অজানা। কিন্তু মীনাক্ষী-সুন্দরেশ্বরের অঙ্গনে গিয়া দাঁড়াইলেই দুই চোখে ঝরিতে থাকে অশ্রুধারা।

সকল কিছু দুঃখ ও আনন্দের উর্দ্ধে, অন্তরাত্মার কোন অব্যক্ত বাণী এ অশ্রু প্রকাশ করিতে চায়?

প্রতিদিনই বেঙ্কটরমণ ঐ দেব-দেউলের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ান। অন্তরের প্রার্থনা বারবার নিবেদন করেন।

এক জ্ঞানপন্থী সাধক উত্তরকালে রমণকে প্রশ্ন করেন, "মহর্ষি, মৃত্যুর অনুভূতির ভেতর দিয়ে আগে থেকেই তো আত্মস্বরূপকে আপনি

উপলব্ধি করেছিলেন, তবে আর ঐ বিগ্রহের কাছে আপনার প্রার্থনা জানানোর কি দরকার ছিল ?”

রমণ উত্তর দেন, “সেদিনকার মৃত্যু অনুভূতি থেকে আমি জানতে পেরেছিলাম, আমি দেহ নই। শুদ্ধ মনের সাহায্যেই এ জ্ঞান আহরিত হয়েছিল, কিন্তু এই শুদ্ধ মন তো সেদিন বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। তাই একটি নূতনতর অবলম্বন বা আশ্রয়ের দরকার ছিল। এ জন্যই মন্দির-বিগ্রহের কাছে গিয়ে দাঁড়াতাম।”

বেঙ্কটরমণের উদাসীনতা ক্রমে গৃহজীবনে তিক্ততার সৃষ্টি করিতে থাকে। পিতৃব্য ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার তিরস্কারের সঙ্গে আসে বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কঠোর শাসন। তাঁহারা ভাবেন—এ ছেলে এমন মেধাবী, এমন প্রাণবন্ত, ভবিষ্যৎ তাহার কত সম্ভাবনাপূর্ণ। অথচ নির্ব্বোধের মত আজ সব কিছু সে নষ্ট করিতে বসিয়াছে। শুভানুধ্যায়ীদের গঞ্জনা ও ধিক্কার দিন দিন বাড়িয়াই চলে।

বেঙ্কটরমণের কাছে ঘর-সংসার আজ একেবারে অর্থহীন। বাড়ীর লোকেরা কিন্তু ভাবে অন্যরূপ। ছেলে লেখাপড়া শিখুক, উপার্জ্জন করুক, ইহাই তাহাদের আশা। ফলে সংঘাত অনিবার্য্য হইয়া উঠিল।

রমণ সেদিন নিজ কক্ষে বসিয়া স্কুলের পাঠ লিখিতেছেন। কিছুক্ষণ পরে সহসা তাঁহার মনে হইল, কেন শুধু শুধু এই অর্থহীন, গতানুগতিক কাজের ভীড়ে বসিয়া থাকা ? পুঁথিপত্র একদিকে সরাইয়া রাখিয়া চোখ বুজিয়া তিনি ধ্যানে বসিলেন।

দাদা নাগস্বামীর চোখে পড়িল এই দৃশ্য! শ্লেষের সুরে তিনি বলিয়া উঠিলেন, “ভাবভঙ্গী, আচরণ যার এরকম, ঘর-সংসারে থেকে তার আর কি দরকার ?”

কথা কয়টি নূতন নয়, অনেকবারই রমণ এমন মন্তব্য শুনিয়াছেন। কিন্তু দাদার এ শ্লেষ আজ মর্ম্মমূলে গিয়া বিদ্ধ হইল। সত্যই তো! সংসারে সারবস্তু কিছু আছে বলিয়া তাঁহার মনে হয় না, সারা দৃষ্টিভঙ্গীই

সম্পূর্ণরূপে বদলাইয়া গিয়াছে। তবে আর গৃহকোণে এমন করিয়া বসিয়া থাকা কেন ?

এই চিন্তাস্রোতের মধ্যে হঠাৎ মনে জাগিল অরুণাচলের কথা। প্রথম শোনার সঙ্গে সঙ্গে এ নামের ধ্বনি সর্ব্বসত্তায় ঝঙ্কার তুলিয়া দিয়াছিল। আজ আবার উহা তাঁহার চেতনাকে উদ্দীপিত করিয়া তুলিল। সর্ব্বশক্তির আধার, সর্ব্বজ্ঞানের উৎস যিনি, সেই ভগবানের আহ্বান যে এ নামের ভিতর নিহিত! ইহারই মধ্যে বেঙ্কটরমণ খুঁজিয়া পাইলেন পরম-পিতার নির্দ্দেশ!

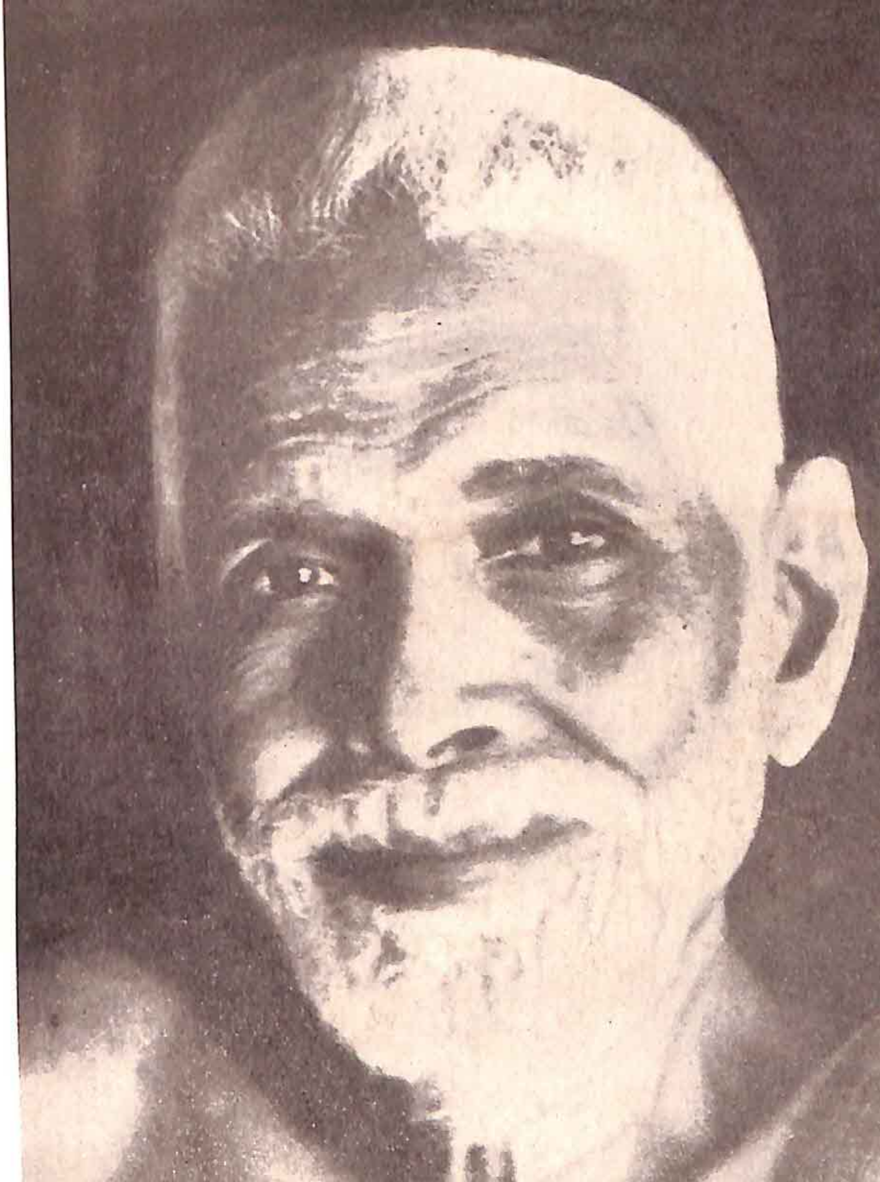
সঙ্গে সঙ্গেই সঙ্কল্প স্থির হইয়া গেল, চিরতরে গৃহত্যাগ করিয়া বাহির হইবেন অরুণাচলের পথে। মনে ভয়, বাড়ীর লোকেরা পাছে তাঁহাকে অনুসরণ করে। তাই গোপনে, সবার অলক্ষ্যে সেদিন বাহির হইতে হইল।

প্রথমে এক ছলনার আশ্রয়ই নিলেন। দাদাকে ডাকিয়া কহিলেন, "এক্ষুণি একবার আমায় স্কুলে যেতে হবে।"

উত্তর হইল, "বেশ তো, চলে যা। হ্যাঁ, ভালো কথা। যাবার সময় পাঁচটা টাকা নিয়ে যাস্। আমার কলেজের মাইনে আজ দিতে হবে, তুই-ই ওটা দিয়ে আসিস্।"

এ যে এক অপ্রত্যাশিত সুযোগ! পথের খরচও বুঝি কৃপালু ভগবান এভাবে জুটাইয়া দিলেন। অরুণাচলে, তিরুভান্নামালাই-এ তিনি আজই যাত্রা করিবেন। দাদার বেতনের পাঁচ টাকা হইতে তিনটি টাকা পাথেয়স্বরূপ নিলেন সঙ্গে।

রওনা হওয়ার আগে বেঙ্কটরমণ তাঁহার দাদার নামে পত্র রাখিয়া গেলেন—"আমার 'পিতারই' উদ্দেশে আমি এই যাত্রা শুরু করলাম, এ কাজে তাঁর আদেশও মিলেছে। পুণ্যকর্ম্ম সাধনের জন্যই আমি চলেছি। কাজেই এতে কারুর দুঃখ করার কিছু নেই। এর খোঁজ-খবরের জন্য কোন টাকাকড়ি যেন অনর্থক খরচ করা না হয়। তোমার বেতন দেওয়া হয়নি। তা থেকে দুটো টাকা এখানে রেখে গেলাম।"



রমণ মহর্ষি

পত্রে কোন স্বাক্ষর নাই—কিন্তু লেখকের মনের স্বাক্ষরটি ঠিকই রহিয়াছে। 'আমি', 'আমার' এসব দিয়া পত্র শুরু করিয়া পরবর্ত্তী ছত্রেই নিজেকে 'এ' বলিয়া অভিহিত করিতেছেন।

নীচে নাম লেখা নাই। ভাবখানা এই—দেহাত্মবুদ্ধি যে ছাড়িতে চলিয়াছে, নিজের পরিচয় জ্ঞাপনের জন্য সে কেন আজ আর উৎসুক হইবে? পত্র লেখার বা স্বাক্ষর করার প্রয়োজন যে তাহার চিরতরেই ফুরাইয়াছে।

মাতুরা ষ্টেশনে আসিয়া বেঙ্কটরমণ খোঁজ খবর নিলেন। ট্রেন পৌঁছানোর সময় বহুক্ষণ চলিয়া গিয়াছে। কি কারণে যেন পথে বিলম্ব ঘটিতেছিল তাই কোনমতে উহা ধরিতে পারিলেন। এই বৈরাগী বালকের জন্য পাথেয় ও পরিবহণের ব্যবস্থা কে যেন আগে হইতেই করিয়া রাখিয়াছে।

১৮৯৬ সালের ২৯শে আগষ্ট বেঙ্কটরমণের জীবনে উন্মোচিত করে নূতনতর অধ্যায়, তিনি হন এক নূতন মানুষ। এ রূপান্তর আসে প্রভু অরুণাচলেশ্বরের করুণায়।

জনবহুল গাড়ীর সোরগোল বালকের মনে দাগ কাটিতেছে না, আগামী দিনের চিন্তা নাই, গন্তব্য স্থানের কথা নিয়াও তেমনি নাই কোন মাথাব্যথা। চলমান ট্রেনের এক কোণে ধ্যানাবেশে আত্মবিস্মৃত হইয়া আছেন।

ট্রেনের কামরায় উঠিয়া বসার পর বেঙ্কটরমণ শুনিয়াছেন, তাঁহার গন্তব্যস্থলে যাইতে হইলে ভেলুপুরম জংশনে নামিয়া গাড়ী বদল করিতে হইবে। শেষ রাত্রে তাই ভেলুপুরমে নামিয়া পড়িলেন। এবার আর এক গাড়ীতে চড়িতে হইবে।

ভোর হওয়ামাত্র ষ্টেশনের বাহিরে আসিয়া দাঁড়ান। ক্ষুধার জ্বালায় পেট চোঁ-চোঁ করিতেছে, অথচ সঙ্গে আছে মাত্র দশটি পয়সা। কাছেই একটা ছোট হোটেলে আহার করিতে গেলেন।

সুদর্শন কিশোরের চোখে মুখে কি এক অদ্ভুত আকর্ষণ রহিয়াছে। হোটেলের মালিক বারবার তাঁহার দিকে তাকায়, উদাস আচরণ লক্ষ্য করিতে থাকে। বেঙ্কটরমণ খাবারের দাম দিলে কি জানি কেন সে উহা ফেরৎ দেয়।

উদ্বৃত্ত পয়সা দশটি দিয়া তখনি বেঙ্কটরমণ টিকিট কিনিয়া বসিলেন। ভাবিলেন, ট্রেনে যতটা আগাইয়া যাওয়া যায় ততই ভাল। এ টিকিট ছিল মাম্বলপট্টু অবধি। সেখানে পৌঁছনোর পর পদব্রজেই আগাইয়া চলিলেন।

সন্ধ্যার অন্ধকার নামিয়া আসিতেছে। দশ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া তিনি আরিয়ানি-নেলুরে পৌঁছিলেন। সম্মুখে পাহাড়ের গায়ে অতুল্যনাথের মন্দির। সেখান হইতে দূরে দিক্‌চক্রবালে দেখা যায় তাঁহার মানসবিগ্রহ, অরুণাচলেশ্বরের দেউল-চূড়া!

শ্রদ্ধানতশিরে বেঙ্কটরমণ প্রবেশ করেন অতুল্যনাথের মন্দিরে, বিগ্রহের সম্মুখে বসামাত্র ধ্যানাবিষ্ট হইয়া পড়েন।

তরুণ সাধকের অন্তর সত্তায় জাগিয়া উঠে অলৌকিক, আনন্দময় অনুভূতি। চাহিয়া দেখেন, এক অপরূপ দিব্য জ্যোতির ধারায় সারা মন্দির প্লাবিত হইয়া উঠিয়াছে। কোথায় এই স্বর্গীয় জ্যোতির উৎস, কি ইহার তাৎপর্য্য, এসব কিছুই তিনি বুঝিতে পারিলেন না। শুধু উপলব্ধি করিলেন, এক অপার আনন্দের ঢেউ তাঁহার সারা দেহ-মন ভাসাইয়া নিয়া চলিয়াছে।

প্রভু অরুণাচলেশ্বর সেদিন এই অপার্থিব আলোকধারার মধ্য দিয়াই পাঠান তাঁহার স্নেহের পরশ!

এই অলৌকিক আলোকরাশি এবার মন্দিরের চারিদিকেও ছড়াইয়া পড়িতে থাকে। বেঙ্কটরমণ ভাবেন, তবে কি এ আলো বিগ্রহ হইতেই নিঃসৃত হইতেছে?

ব্যগ্রভাবে তখনি মন্দিরের গর্ভগৃহে ছুটিয়া যান, আগাইয়া আসেন

বিগ্রহের কাছে। কিন্তু আলোক-বিচ্ছুরণ ততক্ষণে থামিয়া গিয়াছে, উৎসস্থলটি তাই নির্ণয় করা গেল না। এবার মন্দিরের এক কোণে বসিয়া গভীর ধ্যানে তিনি ডুবিয়া গেলেন।

বহুক্ষণ পরে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসে। কাণে প্রবেশ করে পূজারীর কণ্ঠস্বর, "মন্দিরের কোণে, কেগো অমন করে বসে আছো? বেরিয়ে এসো, দরজায় তালা দিতে হবে।"

এতক্ষণে বেঙ্কটরমণের হুঁস হইল। তাই তো! সমস্ত দিন যে তাঁহার কোন আহার জুটে নাই। ক্ষুৎ-পিপাসায় দেহ অবসন্ন। মুখ ফুটিয়া পূজারীর কাছে কিছু খাবার চাহিলেন।

এই মন্দিরে ভোগপ্রসাদ ব্যবস্থা নাই। তাছাড়া, রাত্রে কাহাকেও এখানে শয়ন করিতে দেওয়া হয় না। পূজারী কহিলেন, "ওহে, ঐ তো কাছেই রয়েছে বিরাটেশ্বরের মন্দির, সেখানে যাও—আহার, আশ্রয় দুই-ই মিলবে।"

বিরাটেশ্বরের পূজা ও আরতি চলিতেছে, কিশোর সাধক মন্দিরের এক কোণে গিয়া বসিলেন। আবার তলাইয়া গেলেন ধ্যানের গভীরে, কোন হুঁস রহিল না।

রাত্রি নয়টায় আরতি শেষ হইয়া গেল। এবার ধীরে ধীরে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল। ক্ষুধার জ্বালায় প্রাণ যাওয়ার উপক্রম। ক্ষীণস্বরে দুই-একজনের কাছে কিছু খাবার চাহিলেন। মন্দিরের বাদ্যকর দূরে দাঁড়াইয়া নবাগত এই কিশোরকে লক্ষ্য করিতেছিল। এত অল্প বয়সে এই ধ্যান-তন্ময়তা! এমনটি তো কখনো দেখে নাই! নিজের ভাগের প্রসাদান্ন তখনি তাঁহাকে সে দিয়া দিল।

আহার্য্য জুটিয়া গেল, কিন্তু ভোজন তো শুরু করা যায় না। কারণ, পানীয় জলের কোন ব্যবস্থা এখানে নাই। কাছেই এক ব্রাহ্মণ শাস্ত্রীর বাড়ী, সেখানে না গেলে জল পাওয়া যাইবে না। কিন্তু রমণ তখন ক্লান্তি আর অবসাদে মৃতপ্রায়, নড়িবার কোন সামর্থ্য নাই। অল্প

কিছু দূর হাঁটিয়া গিয়া সংজ্ঞাহীন হইয়া তিনি ভূতলে পড়িলেন। চারিদিকে বেশ ভীড় জমিয়া গেল।

চেতনা ফিরিয়া আসিলে রমণ চাহিয়া দেখিলেন, থালাটি মাটিতে গড়াইতেছে। অন্নরাশি চারিদিকে ছড়ানো। ক্ষুধার জ্বালায় কি আর করেন, তাহাই কুড়াইয়া নিয়া খাইতে বসিলেন।

প্রভু অরুণাচলেশ্বরের হাতছানি তাঁহাকে ঘরের বাহির করিয়াছে—পরিণত করিয়াছে এক দীন হীন ভিক্ষুকে। তারপর রাস্তায় ছড়ানো ভাত খুঁটিয়া খাওয়াইয়া তবে প্রভু নিরস্ত হইলেন।

ভোর হইতে না হইতেই আবার যাত্রা শুরু হয়। গন্তব্যস্থল তিরুভান্নামালাই এখান হইতেই বিশ মাইল দূরে। এবার হাতে একটি পয়সাও নাই, সারা পথ পদব্রজেই যাইতে হইবে। দৃঢ় পদক্ষেপে বেঙ্কটরমণ আগাইয়া চলিলেন।

পথঘাট কিছুই জানা নাই, তদুপরি দেহে নামিয়াছে অবসাদ। বারবার মনে হইতে থাকে, এই পথটুকু ট্রেনে যাইতে পারিলেই বাঁচা যাইত। তাছাড়া, ঠিকমত খাওয়া-দাওয়া না জুটিলেও পথ চলা দুষ্কর হইয়া উঠিবে। কিন্তু তিনি যে কপর্দ্দকহীন!

সহসা মনে পড়িয়া গেল,—তাই তো, তাঁহার কাণে যে দুই-গাছা সরু সোনার কুণ্ডল রহিয়াছে! এই দুইটি বন্ধক দিয়া কয়েকটা টাকা হয়তো পাওয়া যায়। কিন্তু টাকা তাঁহাকে দিবে কে? এ অঞ্চলে কেহই জানাশোনা যে নাই।

ক্ষুধার জ্বালা ক্রমে অসহ্য হইয়া উঠে। অগ্রসর হইতেই চোখে পড়ে এক ধনী গৃহস্থের বাড়ী। বাড়ীর কর্ত্তার নাম মুথুকৃষ্ণ ভাগবতার। দ্বারে দাঁড়াইয়া বেঙ্কটরমণ কিছু খাবার চাহিলেন।

সেদিন গোকুলাষ্টমী। এই পবিত্র দিনে শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি ভক্তেরা পালন করে, আনন্দ-উৎসবে মত্ত হয়। এ গৃহেও আজ মহা সমারোহ। ভোজের প্রচুর আয়োজন হইয়াছে। এমনি দিনে অতিথিরূপে দুয়ারে

আসিয়াছেন সুন্দর সুঠাম ব্রাহ্মণ কিশোর। বাড়ীর কর্ত্রী, ভাগবতারের স্ত্রীর আনন্দ আর ধরে না। পরম যত্নে বেঙ্কটরমণকে ভোজন করাইতে বসিলেন। শুধু তাহাই নয়, পরমাত্মীয়ার মত স্নেহভরে কিছু মিষ্টিও পুঁটুলিতে বাঁধিয়া দিলেন।

এট নূতন পরিচয়ের সুযোগ গ্রহণ করিতে রমণ ছাড়েন নাই। ট্রেনভাড়া সংগ্রহ করা চাই, এজন্য এক ছলনার আশ্রয় নিলেন।

ভাগবতারকে কহিলেন, রাস্তায় মালপত্র সব হারাইয়া যাওয়ায় তিনি বড় বিপদে পড়িয়াছেন। তাই কাণের কুণ্ডল দুইটি বাঁধা দিয়া চারটি টাকা সংগ্রহ করিতে চান। এ দুটির দাম নিশ্চয়ই বিশ টাকার কম হইবে না।

ভাগবতার তৎক্ষণাৎ চারটি টাকা দিয়া দিলেন। একখণ্ড চিরকুটে স্বর্ণকুণ্ডলের রসিদও দেওয়া হইল, রমণকে যাহাতে এই টাকা শোধ করিয়া নিজের অলঙ্কার তিনি ফেরৎ নিতে পারেন।

বেঙ্কটরমণ এবার ত্রস্তপদে ষ্টেশনের দিকে ছুটিলেন। ভাগবতারের দেওয়া রসিদ ইতিমধ্যেই ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছেন। কে আবার আসিবে এই সোনার কুণ্ডল ফিরাইয়া নিতে?

তিরুভান্নামালাই-এর গাড়ী কিশোর সাধককে সেদিন তাঁহার স্বপ্নলোক অরুণাচল-গিরির পাদমূলে আনিয়া পৌঁছাইয়া দেয়। এই দিনটি ছিল ১৮৮৬ সালের ১লা সেপ্টেম্বর। শুধু বেঙ্কটরমণের জীবনেই নয়, অগণিত মানুষের অধ্যাত্মজীবনেও এ দিন চিরস্মরণীয় হইয়া উঠে। তেষট্টি বৎসরের বিরামহীন তপস্যার মধ্য দিয়া সেদিনকার নবীন সাধক রূপান্তরিত হন রমণ-মহর্ষিরূপে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শত শত মুমুক্ষু নরনারী জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে এই মহাপুরুষের করুণাধারায় অভিসিঞ্চিত হন।

প্রায় দুইমাস কাল বেঙ্কটরমণ সুব্রহ্মণ্যম মন্দিরে অবস্থান করেন। অন্তর্ম্মুখীন ভাব কেবলি বাড়িতে থাকে। ধ্যান-তন্ময় অবস্থায় কাটিতে

থাকে দিনের পর দিন। কখনো থাকেন অর্দ্ধবাহ্য অবস্থায়, কখনো বা নিষ্পন্দ, চৈতন্যরহিত।

পান, ভোজন প্রভৃতি দৈহিক প্রয়োজনের দিকে কোন হুঁসই নাই। মন্দিরের উমা-বিগ্রহের অভিষেক-স্নানে দুধ-কলা, হলুদ, চিনি মিশাইয়া তৈরী করা হয় এক তরল বস্তু। গোড়ার দিকে ইহাই অর্দ্ধ-অচেতন কিশোর সাধকের মুখে ঢালিয়া দেওয়া হইত। ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও রুচি-অভিরুচির সমস্ত প্রশ্নই তাঁহার কাছে সেদিন একেবারে অবান্তর হইয়া গিয়াছিল।

ইহার পর আরও দুটি একটি স্থানে বেঙ্কটরমণ আসন পাতিয়া বসেন, স্থানীয় লোকদের মধ্যে ব্রহ্মণস্বামী নামে তিনি পরিচিত হইয়া উঠেন। শ্রদ্ধা ও প্রীতির অর্ঘ্য নিয়া ভক্ত ও আর্ত্তের দল তাঁহার কাছে সমবেত হইতে থাকে। বিশেষ করিয়া কার্ত্তিকেঈ উৎসবের দিনেই এই তরুণ সাধকের সম্মুখে দর্শনার্থীর ভীড় লাগিয়া যায়। 'তেজোলিঙ্গম' অরুণাচলকে সকলে পরিক্রমা করিতে আসে, আর সেই সুযোগে মৌনী তাপসকেও করে প্রণাম নিবেদন।

অরুণাচলের এমনি এক উৎসবমুখর দিনে, এক ইলুপ্পাই গাছের নীচে কিশোর সাধক বসিয়া আছেন। দূর দূরান্ত হইতে আগত তীর্থ-যাত্রীরা দলে দলে শ্রদ্ধাভরে তাঁহাকে প্রণাম জানাইয়া যাইতেছে। এমন সময় হঠাৎ সেখানে উপস্থিত হন উদ্দণ্ডী নাইনার, ব্রহ্মণস্বামীর —রমণ-মহর্ষির প্রথম সেবক ও শিষ্য।

বন্দীবাসের কাছাকাছি এক গ্রামে ত্যাগী সাধক নাইনারের জন্ম। অল্প বয়সেই এক ক্ষুদ্র মঠ স্থাপন করিয়া একান্তে তিনি সাধনা করিয়া আসিতেছেন। সে সাধনায় আজো তাঁহার সিদ্ধি আসে নাই। অন্তরের অতৃপ্তি অন্তরেই চাপিয়া রাখিয়াছেন, আর ব্যাকুল হইয়া দিকে দিকে করিতেছেন সদ্‌গুরুর সন্ধান।

রমণের প্রশান্ত আননের দিকে তাকাইয়াই নাইনার আত্মবিস্মৃত হইয়া যান। জাগিয়া উঠে বিচিত্র অনুভূতি।

অস্ফুটস্বরে বলিয়া উঠেন, "প্রভু, একি অপূর্ব্ব বিস্ময়! এমন মানুষই যে এতকাল আমি খুঁজে এসেছি। এই তাপসের মধ্যেই যে আমার বহু আকাঙ্ক্ষিত শান্তিকে আজ রূপায়িত হতে দেখ্ছি। দেখ্ছি, আত্মস্বরূপের সত্যকার প্রতিষ্ঠা হয়েছে এই মহাজীবনে।"

নাইনার এখানেই থাকিয়া গেলেন। রমণ কিন্তু আগের মতই রহিলেন মৌনী, নির্ব্বিকার! তত্ত্বের উপদেশ, সাধনার নির্দ্দেশ কিছুই তিনি ভক্তকে দেন না। প্রশান্ত গম্ভীর নয়ন হইতে নিরন্তর ঝরে শুধু শান্তির অমৃতধারা। এমন শান্তি, এমন আনন্দ নাইনার কখনো লাভ করেন নাই। জীবন তাঁহার ধন্য হইয়া গেল!

ইহার পর উপস্থিত হন আন্নামালাই তম্বিরণ। ধ্যানে বিভোর তরুণ সাধক রমণের মধ্যে কোন্ দিব্য বস্তুর সাক্ষাৎ তিনি পাইলেন তাহা তিনিই জানেন।

তম্বিরণ নিজে বিষয়বিরক্ত ভিক্ষুক সন্ন্যাসী। পথে প্রান্তরে দিনরাত ভক্তি-রসাশ্রিত তেবরম্ সঙ্গীত গাহিয়া তাঁহার দিন কাটে। দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা মাগিয়া যাহা পান, দরিদ্রের সেবাতেই প্রায় সবটা সানন্দে বিলাইয়া দেন। তারপর দিনের শেষে শ্রান্ত দেহে ফিরিয়া আসেন অরুণাচলে। ইলুপ্পাই গাছের ছায়ায়, কিশোর গুরুর চরণতলে বসিয়া নিবেদন করেন নিজের যত কিছু প্রশ্ন। রমণের আয়ত নয়নের স্নিগ্ধ জ্যোতি ছড়াইয়া পড়ে তাঁহার দেহে মনে। অধ্যাত্ম-জীবনের পরম আশ্রয় তম্বিরণ খুঁজিয়া পান।

তিরুভান্নামালাই-এর উপকণ্ঠে, গুরুমূর্ত্তমে তম্বিরণের নিজ বাড়ী। আগ্রহভরে রমণকে সেখানে তিনি টানিয়া নিয়া গেলেন। লোকের ভীড় এড়ানোর জন্য রমণও ব্যস্ত। তাই কয়েকমাস গুরুমূর্ত্তমে অবস্থান করিতে তিনি আপত্তি করেন নাই। এখানেও আগের মত চলিত তাঁহার কৃচ্ছ্রব্রত ও ধ্যানতন্ময়তা।

গুরুমূর্ত্তমের মন্দিরেও দুর্ভোগ কম ভুগিতে হয় না। পিপীলিকা ও

পোকার অত্যাচার অবিরত চলিতে থাকে। দর্শনার্থীরা ক্ষণেকের তরেও সেখানে দাঁড়াইতে পারে না, অতিষ্ঠ হইয়া স্থান ত্যাগ করে। আত্মসমাহিত রমণ কিন্তু থাকেন নির্ব্বিকার, দিবারাত্র একই আসনে তিনি উপবিষ্ট থাকেন।

ভক্তেরা ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তাই তো, পোকার কামড় হইতে তাঁহাকে বাঁচানোর উপায় কি ?

মন্দিরের কোণে একটা উঁচু কাষ্ঠাসন স্থাপন করিয়া তাহার পায়ার নীচে রাখা হয় জলাধার। এবার সকলে অনেকটা নিশ্চিন্ত, পিঁপড়ে বা পোকার উপদ্রব আর 'স্বামীকে' সহ্য করিতে হইবে না।

কিন্তু আত্মবিস্মৃত সাধক নিজেই নিজের বিপদ বাধাইয়া বসেন। ধ্যানতন্ময় হওয়ার ফলে মন্দিরের দেয়ালে দেহ হেলিয়া যায়, আর পিঁপড়ের দল তাঁহাকে ছাইয়া ফেলে। তাছাড়া পোকার কামড়ে ঝরে রক্ত, দেওয়ালে দাগ লাগিয়া যায়। এ দাগ বহু বৎসরেও মোছে নাই। উত্তরকালে মহর্ষির ভক্তেরা এ স্থানটি দেখিতে আসিতেন।

কিশোর সাধকের এই আত্মসমাহিত ভাব দেখিয়া সবাই অবাক। দেহাত্মবুদ্ধি তাঁহার বিলুপ্তপ্রায়, স্নান করার কোন ধার ধারেন না, শরীরে জমিয়াছে ময়লার পুরু আস্তরণ। আঙ্গুলের দীর্ঘ নখ ও মস্তকের রুক্ষ কেশ দেখিয়া মনে হয়, যেন প্রাচীন যুগের কোন তাপস ! অচিরে এ অঞ্চলের চারিদিকে তাঁহার খ্যাতি রটিয়া যায়। গুরুমূর্ত্তমে অজস্র ভক্ত ও দর্শনার্থী ভাড় করিতে থাকে।

ভক্তেরা লক্ষ্য করিলেন, এখানে আসার পর হইতেই রমণের তপস্যার তীব্রতা খুব বাড়িয়া গিয়াছে। ধ্যানাবেশেই অধিকাংশ সময় কাটিয়া যায়। দিন বা রাত্রির কোন বোধই তাঁহার নাই।

প্রাণধারণের জন্য পান করেন সামান্য একটু তরল বস্তু। কৃচ্ছ্র-সাধনের ফলে শরীর এমন শীর্ণ ও দুর্ব্বল হইয়াছে যে, অপরের সাহায্য ছাড়া উঠিয়া দাঁড়ানো আর সম্ভব নয়।

আহারের সংযম ও মৌনব্রত সম্বন্ধে কঠোর হইলেও রমণ কখনো ইহাকে ধর্ম্মাচরণের অঙ্গ বলিয়া মনে করেন নাই। উত্তরকালে এ সম্বন্ধে বলিতেন, "মৌন অবলম্বনে আমার কোন সঙ্কল্প ছিল না। আহার সম্বন্ধে এ দেহের প্রয়োজন বড় কম, তাই আমার এ সংযম। তাছাড়া, কারুর সঙ্গে কথা বলার দরকার এ দেহ সে সময়ে অনুভব করেনি, মৌন অবলম্বন করেছিলাম সেজন্যই।"

এ মৌনব্রত আনুষ্ঠানিক কিছু নয়, কিন্তু তবুও এ ধরণের সংযমের উপর তিনি কম গুরুত্ব দিতেন না। তখনকার একটি ঘটনায় ইহার পরিচয় মিলে।

গুরুমূর্ত্তমের এক নির্জ্জন বাগানে সেদিন একলাটি তিনি ধ্যানাসনে বসিয়া আছেন। আশেপাশে অনেকগুলি তেঁতুল গাছ। তেঁতুল চুরির উদ্দেশ্যে একদল চোর সেদিন বাগানে ঢুকিয়াছে।

কিশোর সাধক এক কোণে নীরবে ধ্যান করিতেছেন। চোরদের একজন বলিয়া উঠিল, "আরে, এ বালক-সাধু দেখছি ঢঙ্ করে মৌনী হয়ে বসে আছে। কথা বলে কিনা তা দেখতে হবে। চোখের ভেতর বিষ খানিকটা ঢেলে দে, চোখ এখনি যাবে অন্ধ হয়ে। জ্বালার চোটে বাছাধনের মুখে তখন কথাও ফুটবে।"

বলা বাহুল্য, এ কাজ তাহাদের পক্ষে কঠিন নয়—অবলীলায় যে কোন ঘৃণ্য অপরাধই তাহারা করিতে পারে। আশ্চর্য্যের কথা, রমণ কিন্তু নির্ব্বিকার হইয়াই বসিয়া আছেন। এ সঙ্কটকালে মুখ দিয়া তাঁহার একটি শব্দও বাহির হইতেছে না।

তস্করের দল কি ভাবিল তাহা কে জানে? অতঃপর কিশোর সাধুর দিকে আর তাহারা তেমন মনোযোগ দেয় নাই। তাড়াতাড়ি নিজেদের কাজে লাগিয়া পড়ে।

রমণ কিন্তু নীরব, নিস্পন্দ, ধ্যানস্থ। বাগানের সমস্ত গাছ উজাড় করিয়া তেঁতুল পাড়িয়া নিলে যেমন তাঁহার ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, তেমনি চোখ দুইটি একেবারে নষ্ট করিয়া দিলেও কিছু যায় আসে না। এই সামান্য

ব্যাপারের জন্য কেন এত ব্যস্ত হওয়া ? শুধু শুধু মৌন ভঙ্গ করিতে যাওয়াই বা কেন ?

মন হইয়া পড়িয়াছে একেবারে অন্তর্মুখীন। ধ্যানের গভীরে যত ডুবিতেছেন, বহিরঙ্গ জীবনের চলাফেরা, বাক্যালাপ ততই হইয়া উঠিতেছে নিরর্থক, অপ্রয়োজনীয়। তাই তো সেদিন চক্ষু দুইটি নষ্ট হওয়ার আশঙ্কায়ও একটিবারের মত মুখ খুলিলেন না। সুখের বিষয় বিপদ সেদিন কিছু ঘটে নাই। নিজেদের কুকর্ম্ম তাড়াতাড়ি শেষ করিয়া চোরেরা বাগান ত্যাগ করে।

গুরুমূর্ত্তমে অপর যে শিষ্যটি আসিয়া উপস্থিত হন তাঁহার নাম পলনীস্বামী। জাতিতে মলয়ালী, ভক্তি-নিষ্ঠা অসাধারণ। বিনায়ক বিগ্রহের সেবায় দিনরাত মত্ত হইয়া থাকেন।

সেদিন এক শুভানুধ্যায়ী বন্ধু তাঁহাকে ডাকিয়া কহেন, "ওহে, সারা জীবন তো এই পাথরের 'স্বামী' নিয়ে কাটিয়ে দিলে। তাতে আর কি লাভ হলো ? বরং যাও, গুরুমূর্ত্তমের ঐ জীবন্ত 'স্বামী'কে দেখে এসো। পুরাণের ধ্রুবের মতই তাঁর অদ্ভুত তপস্যা ! তাঁরই সেবায় প্রাণমন ঢেলে দাও, জীবন সফল হয়ে যাবে।"

সামান্য কয়েকটি কথা। কিন্তু তির্য্যক্‌ভাবে উহা পলনীস্বামীর মর্ম্মে গিয়া বিঁধিল। দীর্ঘকাল পাষাণমূর্ত্তির সেবায় দিন কাটিয়াছে, আজ মন চাহিতেছে এক জীবন্ত বিগ্রহের আশ্রয়—পুরাতন নোঙর এবার ছিঁড়িয়া যাইতে চায়। তরুণ সাধকের কাছে সেইদিনই ছুটিয়া গেলেন। দর্শন করামাত্র হৃদয়ে খেলিয়া গেল এক অপূর্ব্ব ভাবতরঙ্গ। অন্তরাত্মা হইতে কে যেন ডাকিয়া বলিল, 'ওরে, এই তোর জীবন্ত বিনায়ক'।

এই কিশোর সাধকের পদেই নিজেকে তিনি বিকাইয়া দিলেন, ক্রমাগত একুশ বৎসর তাঁহার সেবায় করিলেন অতিবাহিত।

ভক্তেরা সেবার জন্য উন্মুখ, কিন্তু এ সেবা গ্রহণে রমণের সতর্কতার

অন্ত নাই। বৈরাগ্যের যে কঠোর রূপ এ জ্ঞান-তপস্বীর মধ্যে রূপায়িত, শিষ্যদের সম্মুখে দেখা গেল তাহারই আত্মপ্রকাশ।

শিষ্য তম্বীরণ ছিলেন এক ভাবুক ভক্ত, রমণের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধাও ছিল অপরিসীম। গুরুমূর্ত্তমে থাকিতে একবার তিনি সঙ্কল্প স্থির করেন, রোজ গুরুকে শাস্ত্রানুযায়ী অর্চ্চনা করিবেন। ভোগরাগ, আরতি প্রভৃতি কোন অঙ্গই এ পূজায় বাদ দেওয়া হইবে না। তম্বীরণ সব উদ্যোগ-আয়োজন ঠিক করিয়া ফেলিলেন। কিশোর সাধক রমণের জীবনে আসিল এক নূতন পরীক্ষা!

তম্বীরণের ভাব-কল্পনা ও ভক্তির উচ্ছ্বাস আজ ভুল পথে যাইতেছে, ভক্তপ্রবর তাঁহার শুদ্ধাভক্তির স্থলে বাহ্য পূজা অনুষ্ঠানকেই বড় করিয়া তুলিতেছেন। এ ভ্রম হইতে যে তাঁহাকে রক্ষা করা দরকার। রমণ তাই তাঁহার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিলেন।

তম্বীরণ সেদিন গুরুর জন্য ভোগান্ন নিয়া আসিয়াছেন। মন্দিরে ঢুকিতেই দেয়ালের দিকে চোখ পড়িল, তিনি চমকিয়া উঠিলেন।

কয়লার কালি দিয়া রমণ লিখিয়া রাখিয়াছেন, "এ দেহের জন্য দরকার শুধু এই খাবারটুকুই।"

তামিল ভাষায় কথা কয়টি লেখা। লেখকের সঙ্কল্প ও দৃঢ়চিত্ততা ইহাতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। স্পষ্টই বুঝা গেল, দেহ ধারণের জন্য যেটুকু সামান্য খাদ্যবস্তুর প্রয়োজন তাহার অতিরিক্ত কিছু এই কিশোর তাপস গ্রহণ করিতে রাজী নন। বলা বাহুল্য, তম্বীরণের চৈতন্যোদয় হইল। সেদিন হইতে রমণকে পূজা করার সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন।

ঐ কয়েক ছত্র লেখার মধ্য দিয়া সেদিন কিন্তু একটি মূল্যবান তথ্য প্রকাশ হইয়া পড়ে। এই প্রথম ভক্তগণ জানিলেন, রমণ ভাল তামিল লিখিতে পারেন। তবে কি তাঁহার মাতৃভাষা তামিল? তাই যদি হয়, পূর্ব্বাশ্রমের গৃহ কোথায়?

ভক্ত বেঙ্কটরাম আইয়ার কিন্তু এ রহস্য ভেদ করিতে সেদিন বড় ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছেন। সোজাসুজি তিনি জানাইয়া দিলেন, "স্বামী,

আপনার প্রকৃত পরিচয় আজ আমায় জানাতেই হবে, নইলে এখান থেকে এক পা'ও আমি নড়ছিনে, কেউ আমায় আহার গ্রহণ করাতেও আর পারবে না। হ্যাঁ, এই আমার দৃঢ় পণ।"

আইয়ার এক প্রবীণ ভক্ত! তাঁহার এ পণ রমণকে সেদিন টলাইয়া ছাড়িল! নিজের পরিচয় জানাইয়া ইংরেজী অক্ষরে সংক্ষেপে লিখিয়া দিলেন, "বেঙ্কটরমণ, তিরুচুঝি।"

এই ক্ষীণ পরিচয়ের সূত্রটি ধরিয়াই অতঃপর তাঁহার সকল সংবাদ প্রকাশিত হইয়া পড়ে।

কিশোর সাধুর কাছে দর্শনার্থীদের ভীড় বাড়িয়াই চলিয়াছে। অবস্থা ক্রমে এমন দাঁড়ায় যে, জনতা নিয়ন্ত্রণের জন্য তাঁহার চারিদিকে বাঁশের এক দৃঢ় বেষ্টনী বাঁধিয়া দিতে হয়।

ভক্তদের দুশ্চিন্তা বাড়িতে থাকে। কি করিয়া ভীড় এড়ানো যায়? 'স্বামী' কঠোর তপস্যাপরায়ণ, কোন নিভৃত জায়গায় তাঁহাকে না সরাইলে বিপদ। ভক্ত বেঙ্কটরাম নাইনার প্রস্তাব করিলেন, 'স্বামী'কে তাঁহার আম্রকাননে নিলে কেমন হয়? সানন্দে সকলে সম্মতি দিলেন। স্থির হইল, নাইনারের ঐ বাগানে, দুইটি ক্ষুদ্র কুঠরীতে রমণ ও তাঁহার সেবক-শিষ্য পলনীস্বামী বাস করিবেন। মালীর প্রতি নির্দ্দেশ থাকিবে, সেবকের অনুমতি ছাড়া 'স্বামী'র সহিত কাহাকেও দেখা করিতে দেওয়া হইবে না।

প্রায় ছয়মাস এই আম্রকাননেই রমণ অবস্থান করেন। বড় নিভৃত এ বাগানটি। একান্তে সাধন-ভজন করা ছাড়া আরও একটি সুযোগ এখানে তিনি প্রাপ্ত হন, শাস্ত্রপাঠের উপযুক্ত অবসর মিলিয়া যায়। দেশ-বিদেশের অগণিত জিজ্ঞাসু ও মুমুক্ষু লোকের সংস্পর্শে উত্তর জীবনে তাঁহাকে আসিতে হইবে, সেই আচার্য্য জীবনের প্রস্তুতিটি সেদিন শুরু হইয়া যায়।

পলনীস্বামীর জ্ঞানস্পৃহা বড় প্রবল। প্রায়ই এই নিভৃত স্থানে তিনি

ধর্ম্মশাস্ত্র ও দর্শনের নানা গ্রন্থ আনয়ন করেন। এগুলির অধিকাংশই তামিলে রচিত, অথচ সে ভাষা তাঁহার তেমন জানা নাই। বড় কষ্ট করিয়া এ সব গ্রন্থ তাঁহাকে আয়ত্ত করিতে হয়।

রমণের মন ভিজিয়া যায়, নিজেই তিনি ভক্তকে সাহায্য করিতে আগাইয়া আসে। জীবনে কখনো শাস্ত্র অধ্যয়নের ধার ধারেন নাই। তাই তামিল ভাষায় লিখিত বইগুলি তাঁহার কাছে পড়িয়া শোনানো হয়, আর তিনি এগুলি সহজভাবে ব্যাখ্যা করিতে থাকেন নিজের সাধনোজ্জ্বল বুদ্ধির সাহায্যে।

এদিকে কিশোর সাধক রমণের সংবাদ তাঁহার আত্মপরিজনের কাছে পৌঁছিয়া গিয়াছে।

বড় কাকা সুব্বিয়ার ইতিমধ্যে পরলোকে গিয়াছেন। ছোটকাকা নেলিয়াপ্পীয়ের সংবাদ পাইয়াই তিরুভান্নামালাই-এ উপনীত হইলেন। নাইকারের বাগানে প্রবেশ করিয়া বেঙ্কটরমণের যে চেহারা তিনি দেখিলেন তাহাতে বিস্ময়ের অবধি রহিল না। কৃচ্ছ্রব্রতী, মৌনী সাধকের পরনে কৌপীন, মাথার চুলে জট পাকাইয়া গিয়াছে। প্রস্তর-মূর্ত্তির মত নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া আছেন। নয়নের দৃষ্টি আশেপাশে কোথাও পড়ে না, কোন্ দুর্জ্ঞেয় লোকে উধাও হইয়া গিয়াছে।

নেলিয়াপ্পীয়ের নিজে উকিল। কিন্তু এই মৌনী ভ্রাতুষ্পুত্রের নিকট তাঁহার সমস্ত কিছু যুক্তিতর্ক সেদিন ব্যর্থ হইয়া গেল। স্পষ্টরূপে বুঝিলেন, তাঁহাদের বেঙ্কটরমণের জীবনের ধারা একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে। আর তাঁহাকে ঘরে ফিরাইয়া নেওয়া সম্ভব নয়। দেশে গিয়া তাঁহার মাকে সব কথা নিবেদন করিলেন।

নাইকারের নিভৃত আম্রকানন রমণ এবার ত্যাগ করিলেন। অপরের সেবা গ্রহণে চিরকালই তাঁহার বিতৃষ্ণা, এইবার তাহা চরমে উঠিল। স্থির করিলেন, নিজেই দ্বারে দ্বারে মাধুকরী করিয়া উদরান্নের সংস্থান করিবেন। শিষ্য পলনীস্বামীকে জানাইয়া দিলেন, এখন হইতে

আর তাঁহাদের একত্র থাকা চলিবে না। ভিক্ষা সংগ্রহের জন্যে উভয়ে স্বেচ্ছামত ঘুরিয়া বেড়াইবেন।

এ কি নিষ্ঠুর কথা! ভক্ত পলনীস্বামীর মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। এই তরুণ তাপসের মধ্যেই যে তিনি তাঁহার একমাত্র আশ্রয় খুঁজিয়া পাইয়াছেন। এবার কি নিয়া তিনি বাঁচিবেন?

সারাদিন এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করার পর রাত্রিতে পলনীস্বামী রমণের কাছেই ফিরিয়া আসিলেন। নয়নে তাঁহার অশ্রুধারা!

ভক্তের করুণ ক্রন্দনে রমণের সঙ্কল্পের বাঁধন শিথিল হইয়া পড়ে। পলনীস্বামী পূর্ব্ববৎ তাঁহার সাথেই রহিয়া যান, কিন্তু রমণ তাঁহার নিজের ভিক্ষাব্রত রাখেন অব্যাহত।

তাঁহার ভিক্ষা করার ধরণটি বড় অদ্ভুত; গৃহস্থবাড়ীর সম্মুখে গিয়া দণ্ডায়মান হন। সদাই মৌন থাকেন, তাই মুখে কোন কথা না বলিয়া করতালির শব্দে নিজের আগমন ঘোষণা করেন। ভিক্ষা নিয়া কেহ আগাইয়া আসিলে, গ্রহণ করেন অঞ্জলি পাতিয়া। অনুরোধ বা অনুনয়-বিনয় করিয়া এই বৈরাগীপুরুষকে গৃহের ভিতরে নেওয়া যায় না। রাস্তায় দাঁড়াইয়াই তিনি ভিক্ষান্ন মুখে পুরিয়া দেন, তারপর তাড়াতাড়ি নিজ আসনে গিয়া হন ধ্যানস্থ।

পুত্রের সংবাদ শুনার পর জননী আলাগাম্মল স্থির থাকিতে পারেন নাই। তাঁহাকে ঘরে ফিরাইয়া নিবার জন্য পাগলিনীর মত আসিয়া উপস্থিত হন। রমণ তখন অরুণাচলের পার্শ্বস্থিত গিরিচূড়া, পাবাঝাকুন্রুতে আসন পাতিয়াছেন। সাধুবেশী কিশোর বেঙ্কটরমণকে চিনিয়া ফেলিতে মায়ের কিন্তু এক মুহূর্ত্তও দেরী হয় নাই।

এবার শুরু হয় ক্রন্দন আর অশ্রুবর্ষণের পালা। জননী বারবার কহিতে থাকেন, সন্ন্যাসজীবনের এ কঠোরতায় কি তাঁহার প্রয়োজন? কোমল দেহে এ কষ্ট সহিবেই বা কেন? না—প্রাণ থাকিতে তিনি তাঁহার নয়নমণিকে এখানে ফেলিয়া যাইবেন না।

জননী কিন্তু বৃথাই কাঁদাকাটি করিতেছেন। তাঁহার কথার এতটুকুও কি ধ্যানপরায়ণ পুত্রের কাণে পশিতেছে? প্রস্তরমূর্ত্তির মত রমণ নির্ব্বাক নিশ্চল হইয়া বসিয়া আছেন। মায়ের এত আর্ত্তি ও অশ্রুজল তাঁহার মৌন ও প্রশান্তি ভাঙ্গিতে পারিল না।

আলাগাম্মলও সহজে পুত্রকে ছাড়িবেন না। দিনের পর দিন তাঁহাকে বুঝাইতে থাকেন। নানা রুচিকর খাদ্য রাঁধিয়া আনিয়া স্নেহের পুত্তলীকে ভোজন করান। কিন্তু রমণ পূর্ব্ববৎ নির্ব্বিকার।

কয়েকদিন পরের কথা। সেদিন আলাগাম্মলের ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। পুত্রের এ কি নিস্পৃহ, উদাসীন ভাব? এ যে অসহ্য! ক্ষোভে দুঃখে তিনি ফাটিয়া পড়িলেন। ভক্তদের কাছে কাঁদিয়া কাঁদিয়া কহিতে লাগিলেন, "ওগো, তোমরা কি কেউ আমায় সাহায্য করবে না। আমার অঞ্চলের নিধিকে কি আমার ঘরে ফিরিয়ে নিতে দেবে না?"

বড় মর্ম্মস্পর্শী জননীর এ ক্রন্দন! জনৈক ভক্তের হৃদয় গলিয়া গেল। রমণকে অনুনয় করিয়া কহিলেন, "মা এমন করে কাঁদছেন, এত অনুরোধ করছেন। হাঁ বা না একটা উত্তর তো তাঁকে দেওয়া উচিত? এই যে কাগজ পেন্সিল রয়েছে। 'স্বামী' দয়া করে তাঁর মতটা স্পষ্ট করে জানিয়ে দিন না।"

লেখা হইতে যে বক্তব্য জানা গেল, তাহা যেন কোন ব্যক্তি-বিশেষের নয়। রমণ লিখিলেন, "প্রারব্ধ বা পূর্ব্বজন্মের সঞ্চিত কর্ম্মফল অনুযায়ীই বিশ্বনিয়ন্তা নিয়ন্ত্রণ ক'রে থাকেন জীবের ভাগ্য। যা ঘট্‌বার নয়, তা কিছুতেই ঘট্‌বে না—শত চেষ্টাতেও না। আর যা ঘট্‌বার, তা শত প্রতিরোধ সত্ত্বেও ঘট্‌তে বাধ্য। এ একেবারে নিশ্চিত। কাজেই সবচেয়ে ভাল হচ্ছে মৌন হয়ে থাকা!"

ঘরে তিনি আর ফিরিয়া যাইবেন কিনা, সে সম্বন্ধে হাঁ বা না—কোন কিছুরই উল্লেখ নাই।

আলাগাম্মল ও নাগস্বামী বুঝিলেন, তাঁহাদের বেঙ্কটরমণ আজ

রূপান্তরিত হইয়াছে এক নূতন মানুষে। ঘরের দিকে তাহাকে আর টানা যাইবে না। ক্ষুণ্ণমনে উভয়ে স্থান ত্যাগ করিলেন।

তিরুভান্নামালাই-তে আসার পর প্রায় আড়াই বৎসর গত হইয়াছে, এ আড়াই বৎসর রমণের জীবনে রচনা করিয়াছে এক বিশিষ্ট অধ্যায়। কৃচ্ছ্র, ত্যাগনিষ্ঠা ও ধ্যান-ধারণার মধ্য দিয়াই বেশীর ভাগ সময় তাঁহার অতিবাহিত হইয়াছে। ধ্যানের গভীরে, আত্মার গভীরে ধীরে ধীরে তিনি তলাইয়া গিয়াছেন। কখনো বৃক্ষতলে, কখনো বা মন্দিরের নিভৃত কোণে চলিয়াছে তাঁহার নিগূঢ় সাধনা।

উত্তরকালে এ সময়কার কথাপ্রসঙ্গে রমণ ভক্তদের বলিতেন, "দিন রাতের সংবাদ এ সময়ে এটা (দেহ) প্রায়ই রাখত না। এক একদিন ধ্যানাবেশের পর চক্ষু মেলে দেখতাম—প্রভাত হয়েছে। কোন কোন দিন দেখা যেত, সন্ধ্যা উত্তীর্ণপ্রায়। সূর্য্য কখন উঠে, কখনই বা অস্ত যায়, তার সংবাদ রাখবার মত মনের অবস্থা এর (দেহের) তখন একেবারেই ছিল না।"

এই কঠোর সাধনার ফলও অচিরে ফলিয়া যায়। রমণের জীবনে আসে সিদ্ধি, আসে অপরূপ আধ্যাত্মিক রূপান্তর। এবার কৃচ্ছ্র-সাধন ও নিভৃত তপস্যা তিনি ত্যাগ করেন, আসিয়া দাঁড়ান জীবনের প্রকাশ্য রাজপথে। জন-সংস্পর্শ হইতে দূরে থাকার ইচ্ছা এখন আর নাই। দর্শনার্থী ও ভক্তমণ্ডলীর দৃষ্টির সম্মুখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়া থাকিতে তিনি অভ্যস্ত হইয়াছেন। অনশন ও অর্দ্ধাশনের দিকে আজকাল আর ঝোঁক নাই। নিয়মিতভাবেই তাঁহাকে আহার করিতে দেখা যায়। তপস্যাযুগের শেষে এবার শুরু হইয়াছে আচার্য্য জীবন।

জননী চলিয়া যাওয়ার কিছুকাল পরেই রমণ অরুণাচল পাহাড়ের কোলে আশ্রয় নিলেন। এই পবিত্র গিরির বিভিন্ন অঞ্চলে বিরাজিত রহিয়াছে বহু সাধনগুহা, এখন হইতে এইসব গুহায় এক এক সময়ে তিনি অবস্থান করেন। সঙ্গে থাকে তাঁহার ভক্ত ও শিষ্যদল।

দেবতাত্মা অরুণগিরি! অনির্ব্বচনীয় ইহার মহিমা! অপরূপ মৌনের মধ্য দিয়া এ পর্ব্বতের আশীর্ব্বাণী যুগে যুগে বিস্তারিত হইতেছে, ভক্ত সাধকদের জীবনে আনিয়াছে পরম কল্যাণ।

শঙ্করাচার্য্য অরুণাচলকে আখ্যা দিয়াছেন—মেরুপর্ব্বত। স্কন্দপুরাণ ইহাকে চিহ্নিত করিয়াছেন মহাদেবের হৃদ্‌ক্ষেত্ররূপে।

বহু ব্রহ্মজ্ঞ সাধক ও শৈব সিদ্ধের তপস্যার আলোকে এই পর্ব্বত উদ্ভাসিত। রমণ মহর্ষি অরুণাচল সম্পর্কে উত্তরকালে শিষ্যদের বলিতেন,—"যুগ-যুগান্তের ধারা বেয়ে এঁর কন্দরে কন্দরে সিদ্ধগণ বাস করছেন, আজিকার দিনেও তাঁরা রয়েছেন।"

দাক্ষিণাত্যের পুরাণে অরুণাচলের মহিমার নানা বর্ণনা আছে।—সাধকদের হিতের জন্য এক সময়ে মহেশ্বর এই পবিত্র তীর্থে আবির্ভূত হন। জ্যোতির্ম্ময় লিঙ্গ বা স্তম্ভরূপে তাঁহার প্রকাশ ঘটে। আদি-অন্তহীন এ জ্যোতিঃস্তম্ভ। আয়তন মাপিতে বিষ্ণু ও ব্রহ্মাও নাকি হার মানিয়া যান। এ লিঙ্গের অত্যুজ্জ্বল আলোকচ্ছটায় নয়ন ধাঁধিয়া যায়, দেব বা মানব কেহই এদিকে তাকাইতে পারে না। অবশেষে মহেশ্বরের করুণা জাগিয়া উঠে। সর্ব্বলোকের কল্যাণের জন্য, নয়ন গ্রাহ্যরূপে অরুণাচলের আকার তিনি ধারণ করেন।

দেবাদিদেব বলেন, 'এই মহাতীর্থে আমি এই আকার গ্রহণ করেছি আমার ভজনাকারী সাধক ও সিদ্ধদের সুবিধার জন্য। এই অরুণাচল মরজগতের প্রণবস্বরূপ। প্রতি কার্ত্তিকেঈ উৎসবে আমি এ পর্ব্বতের চূড়ায় আবির্ভূত হবো পরাশান্তির উৎসরূপে।'

অদ্বৈতবাদী সাধকদের প্রিয় তীর্থ এই পবিত্রগিরি। শৈবাচার্য্যদের সাধনস্থল হিসাবেও ইহার প্রসিদ্ধি কম নয়।

আত্মজ্ঞানী মহাসাধক রমণ তাঁহার ধ্যানের ধন, অরুণাচলের স্তবগাথা রচনা করিয়া গাহিয়াছেন—

"হে প্রভু, একান্ত মনে আমি তোমারই অনুধ্যান করছিলাম, তাই

তো তোমার কৃপার জালে আমি পড়েছি ধরা। ঠিক যেমন করে মাকড়শা যায় জড়িয়ে, তেমনি তোমার মধ্যে রেখেছ আমায় বন্দী করে তোমার পরম ক্ষণটিতে আমায় তুলে নেবার জন্যে।······

"আমায় মিলিয়ে নাও তোমার মহাসত্তায়। নইলে যে, অশ্রুর নদীতে ডুবে ঘটবে আমার মরণ, তারপর এ দেহ গলে মিশে যাবে তার জলধারায়!"

১৮৯৬ সালের প্রথম ভাগ। অরুণাচলের বিরূপাক্ষ গুহায় রমণ তাঁহার আসন পাতিয়া বসিয়াছেন। প্রণব অক্ষরের মত এই গুহাটির আকৃতি, ঐতিহ্যও এখানকার কম নয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীর সিদ্ধ সাধক বিরূপাক্ষদেবের দেহাবশেষ এখানে রক্ষিত আছে, এজন্যও সাধকেরা এই শৈলগুহাকে পরম পবিত্র বলিয়া মনে করেন।

শুধু শিবরাত্রি ও কাত্তিকেঈ উৎসবেই যে এখানে দর্শনার্থীদের ভীড় হয় তাই নয়, সারা বৎসরই তরুণ 'স্বামী'র এই গুহায় বহিয়া যায় জনস্রোত।

এ গুহাটি ছিল স্থানীয় বিরূপাক্ষ মঠের পরিচালনাধীনে। বিশেষ বিশেষ উৎসবের দিনে এই গুহায় লোকের ভীড় জমিয়া যায়, কিশোর স্বামীর দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় অরুণাচল যাত্রীরা দলে দলে আসিয়া জুটে। মঠের কর্ত্তৃপক্ষ ভাবিলেন, আয় বাড়ানোর এ সুযোগ তো ছাড়া ঠিক নয়। যাত্রীদের উপর তাঁহারা দর্শনী-কর বসাইয়া দিলেন।

রমণের কাণে উঠিল এই কর আদায়ের কথা। গরীব লোকের উপর এই অত্যাচার তিনি সহ্য করিতে রাজী নন, প্রতিবাদ জানাইয়া তখনি বিরূপাক্ষ গুহা ত্যাগ করিলেন। এবার মঠাধ্যক্ষদের চৈতন্য হইল। তাঁহারা দেখিলেন, তরুণ 'স্বামী' স্থানত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে দর্শনার্থীদের সংখ্যাও কমিয়া গিয়াছে। দর্শনী-প্রথা তাড়াতাড়ি উঠাইয়া দিয়া রমণকে তাঁহারা ফিরাইয়া আনিলেন।

দর্শনার্থী ও ভক্তেরা যে ফলমূল ও দুধ আনয়ন করে, তাহাই হয় 'স্বামী' ও তাঁহার সেবক-শিষ্যদের দৈনিক আহার্য্য। যেদিন যাহা জুটে, সকলে সমান ভাগে ভাগ করিয়া খান।

ভক্ত সমাগম প্রতিদিন সমান হয় না। লোক কম আসিলে ভেটও তেমনি আসে সামান্য পরিমাণ। অথচ গুহাস্থিত আশ্রমে সাঙ্গোপাঙ্গদের সংখ্যা সে সময়ে বাড়িয়াই চলিয়াছে।

এতগুলি লোকের আহারের ব্যবস্থা করা কম দায়িত্বের কথা নয়। পলনীস্বামী প্রভৃতি তাই ভিক্ষার জন্য পাহাড়ের নীচে চলিয়া যান, শঙ্খ বাজাইয়া শহরের পথে পথে সংগ্রহ করেন ভিক্ষা।

এক ভক্ত সেদিন রমণের কাছে আব্দার ধরিলেন, নগর ভিক্ষার জন্য একটি ভক্তি-সঙ্গীত রচনা করিয়া দিতে হইবে। রমণ রাজী হইলেন, রচিত হইল তাঁহার প্রসিদ্ধ স্তবমালা, অক্ষর-মনমালাই। এ স্তবের মধ্য দিয়া প্রভু অরুণাচলেশ্বরের চরণে নিবেদন করিলেন তাঁহার প্রাণের আকূতি। ভাবকল্পনা ও ভক্তিরসের দিক দিয়া এ রচনা অপূর্ব্ব!

অরুণাচলের হাতছানি বালক রমণকে একদিন ঘরের বাহির করে, সেই অরুণাচলেরই কোলে বসিয়া চলে তাঁহার কৈশোর ও যৌবনের ত্যাগ বৈরাগ্যময় তপস্যা।

মৌনী মহাশিব, দক্ষিণামূর্ত্তির এক তেজোময় রূপ এই অরুণাচল। সাধক রমণের দৃষ্টিতে এই দিব্য রূপ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে দিনের পর দিন। তাই তো এই পবিত্র পাহাড়ের পরিক্রমাকে তিনি মনে করেন এক মহা পবিত্র ব্রত।

পরিক্রমণ প্রসঙ্গে এক অলৌকিক কাহিনী মহর্ষি রমণ উত্তরকালে বিবৃত করিতেন—

সেবার এক বর্ষীয়ান ভক্ত অরুণাচল পরিক্রমা করিতে আসিয়াছে। পা দুইটি তাহার দীর্ঘদিন যাবৎ পঙ্গু। পর্ব্বত সানুদেশের সমতল রাস্তা ধরিয়া কোনমতে সে লাঠিতে ভর দিয়া চলিয়াছে। খঞ্জ বলিয়া অনেক কষ্ট, অনেক গঞ্জনা তাহাকে সহিতে হয়, আজ ঠিক করিয়া

আসিয়াছে, গিরি-প্রদক্ষিণ শেষ হইলেই চিরতরে সে দেশত্যাগী হইবে। আত্মীয়-স্বজনের গলগ্রহ হইয়া থাকা আর নয়।

পথ চলিতে চলিতে হঠাৎ এক অপরিচিত ব্রাহ্মণ তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত। সুন্দর সুঠাম মূর্ত্তি। অঙ্গে দিব্য কান্তি ফুটিয়া বাহির হইতেছে। দেখিলেই মন সম্ভ্রমে ভরিয়া উঠে।

কাছে আসিতেই ব্রাহ্মণ অদ্ভুত আচরণ করিয়া বসিলেন। খঞ্জ লোকটির হাতের দণ্ডটি করিলেন দূরে নিক্ষেপ। কহিলেন, "ওহে, এবার এসব ফেলে দাও, আর এ দিয়ে তোমার কোন প্রয়োজন নেই!"

খঞ্জ চমকিয়া উঠিল! এ কি অদ্ভুত আচরণ এই ব্রাহ্মণের! কিন্তু পরক্ষণে বিস্ময় তাহার চরমে পৌঁছিল। কোন দুর্জ্ঞেয় ইন্দ্রজাল বলে দেখিতে দেখিতে পঙ্গু পা দুটি সুস্থ ও স্বাভাবিক হইয়া উঠিয়াছে!

অন্তর হইতে কে যেন বলিয়া দিল, 'ওরে, অরুণাচলেশ্বরের কৃপায় যে তোর খঞ্জত্ব মোচন হয়েছে। দৈহিক বিকলতা থেকে চিরতরে পেলি মুক্তি।'

তিরুভান্নামালাই এ জীবনে আর সে ত্যাগ করে নাই।

প্রাচীন পুরাণগাথায় আছে এই জাগ্রত শৈলের অধিষ্ঠাতৃপুরুষ অরুণগিরি-যোগীর উল্লেখ। পর্ব্বতের কোলে এক বিশাল বটবৃক্ষের মূলে এই সূক্ষ্মদেহী মহাযোগী ধ্যানস্থ হইয়া বসিয়া থাকেন। ইঁহারই প্রদত্ত অলৌকিক 'মৌন দীক্ষা' যুগ-যুগান্ত ধরিয়া অরুণাচলের সাধকেরা প্রাপ্ত হয়, পূর্ণ হয় তাঁহাদের আত্মজ্ঞানের সাধনা। পুরাণ ও জনশ্রুতি চিরকাল এ কাহিনীই প্রচার করিয়া আসিতেছে।

সাধক রমণের জীবনেও পুরাণের এ কাহিনী একদিন সত্য হইয়া দাঁড়ায়, বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করে। অরুণগিরি-যোগীর করুণাধারায় তিনি অভিষিক্ত হন।

১৯০৬ সালের কথা। রমণ মহর্ষি একদিন পাহাড়ের উপর ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। হঠাৎ দেখিলেন, অদূরে প্রকাণ্ড একটি বটের পাতা

পড়িয়া আছে। খুব বিস্মিত হইয়া গেলেন। একি অদ্ভুত ব্যাপার ? বটগাছ তো অরুণাচলের কোথাও নাই! তবে এই পাতা কোথা হইতে আসিল ?

কৌতূহলভরে আরো আগাইয়া চলিলেন। পথ দুর্গম, প্রস্তরাকীর্ণ। কিছুটা দূরে গিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। সত্যই দূরে দণ্ডায়মান এক বিশাল বটবৃক্ষ! আরো আশ্চর্য্যের কথা, কঠিন প্রস্তরের উপরই উহা গজাইয়া উঠিয়াছে। এখানে এমনভাবে বনস্পতির আবির্ভাব! এ কেমন রহস্য ?

রমণ সাগ্রহে এই বৃক্ষটিকে লক্ষ্য করিয়া চলিতে থাকেন। কিন্তু একটু পরেই তাঁহাকে নিরস্ত হইতে হয়। কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া এক ঝাঁক ভীমরুল তাঁহার পায়ে কামড়াইয়া ধরে। পাষাণ-স্তূপের আড়ালে এই বোলতার চাক লুকানো ছিল, অজ্ঞাতে তিনি উহা পায়ে মাড়াইয়া দিয়াছেন। মনে মনে বুঝিয়া নিলেন, ঐ অলৌকিক বটবৃক্ষের সান্নিধ্যে যাওয়া অরুণাচলেশ্বরের অভিপ্রেত নয়।

ফিরিয়া আসিয়া শিষ্যদের নিকট এই অদ্ভুত বৃক্ষের কাহিনী তিনি বিবৃত করেন। বলা বাহুল্য, এ কথা শোনামাত্র অনেকেই উহা দেখার জন্য কৌতূহলী হইয়া উঠেন। কিন্তু বহু চেষ্টায়ও এই বটবৃক্ষের সন্ধান আশ্রমবাসী ভক্তেরা পায় নাই। হঠাৎ আবির্ভূত হইয়া তেমনি উহা অন্তর্হিত হয়।

অরুণগিরির 'মহাযোগী'-ই কি ঐ অলৌকিক বটবৃক্ষের নীচে বসিয়া ছিলেন ? রমণকে সেদিন কি মৌন দীক্ষা দিয়া গেলেন ?

অরুণাচল পরিক্রমায় রমণের বরাবরই মহা উৎসাহ। নির্জ্জন আঁকা-বাঁকা পথ পাহাড়ের কোলে কোলে উঠিয়া গিয়াছে। প্রায়ই মহর্ষি লাঠি হাতে পরমানন্দে এ পথে পদচারণা করিয়া ফিরেন। এখনকার প্রতিটি গুহা, গিরিচূড়া ও পাষাণস্তূপের সহিত যে তাঁহার নিবিড় আত্মীয়তা!

রমণ সেদিন পার্ব্বত্য পথে ভ্রমণ করিতেছেন। চারিদিকে বনজঙ্গল। পথের বাঁকে দাঁড়াইয়া দেখিলেন, সম্মুখে এক বৃদ্ধা নারী শুক্‌নো কাঠ-কুটো সংগ্রহ করিতেছে। পরণে তাহার জীর্ণ, ময়লা একখানা শাড়ী। নীচ জাতীয়া স্ত্রীলোক বলিয়াই মনে হয়।

কাছে যাইতেই বৃদ্ধা তাঁহাকে তীক্ষ্ণস্বরে গালাগালি দিতে থাকে। খ্যাতনামা মহাপুরুষ হইলে কি হয়, রমণ যেন এই রমণীরই এক সমশ্রেণীর লোক। আচরণে তাহার ভয় বা সঙ্কোচের লেশমাত্র নাই। তিরস্কারের পর যে কথা কয়টি সে বলিল তাহা শুনিয়া রমণ হতবাক হইয়া গেলেন।

বৃদ্ধা তাঁহাকে শাসাইয়া বলিতে থাকে, "কেনরে, যম কি তোকে ছোঁয় না? শ্মশানে গিয়ে পুড়ে মরতে পারিস না? বল্ দেখি, কেন তুই এই রৌদ্রে এমন করে শুধু শুধু ঘুরে মরছিস? আচ্ছা, চুপচাপ একটা জায়গায় তুই বসে যেতে পারিস্ না?"

কে এই রহস্যময়ী বৃদ্ধা নারী? পরম হিতাকাঙ্ক্ষিণীর অধিকার নিয়া অবলীলায় সে গালিগালাজ করিতেছে, তপস্বী রমণকে তাঁহার ঘোরাফেরা কমাইতে বলিতেছে। সর্ব্বজনশ্রদ্ধেয় মহাপুরুষকে কড়া কথা বলিতে একটুও তাহার বাধিল না? বড় অদ্ভুত এ আচরণ!

রমণের মুখে এ কাহিনী শুনিয়া ভক্ত ও শিষ্যগণ বড় কৌতূহলী হইয়া উঠেন। বারবার সকলে প্রশ্ন করিতে থাকেন, কে এই বৃদ্ধা?

উত্তর হয়, "ইনি সাধারণ নারী নন, এমন কি মানবীও নন। কে ইনি, তা কে বলতে পারে?"

শিষ্যগণ কিন্তু ধরিয়া নেন, এটি অরুণাচলেশ্বরেরই অলৌকিক লীলা। আরো আশ্চর্য্যের কথা, এই ঘটনার পর হইতে রমণ তাঁহার পর্ব্বতে বেড়ানোর অভ্যাস ছাড়িয়া দেন। বৃদ্ধার সেদিনকার ঐ নির্দ্দেশ তিনি অরুণাচলের কল্যাণময় বাণীরূপে গ্রহণ করেন।

বালক বয়সে মৃত্যুর অনুভূতি রমণের জীবনে একদিন অধ্যাত্ম-

সাধনার দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেয়। অনুরূপ অনুভূতি তাঁহার জীবনে কিন্তু আরও কয়েকবার আসিয়াছে, আত্মসত্তার গভীরতর স্তরে তাঁহার সমগ্র চেতনাকে ঠেলিয়া নিয়া গিয়াছে।

১৯১৮ সালের এক স্নিগ্ধ প্রভাত। রমণ তাঁহার কয়েকজন শিষ্যসহ পাচায়াম্মান-কয়েল নামক স্থান হইতে গুহায় ফিরিতেছেন। হঠাৎ কি এক অজ্ঞাত কারণে তাঁহার সমস্ত শরীর শিথিল, অবসন্ন হইয়া পড়ে। রমণ বলিয়াছেন—

"সারা বহির্জ্জগতের দৃশ্য অন্তর্হিত হয়ে গেল। আর চোখের সামনে নেমে এলো একটি সাদা পর্দ্দা, যা আমার দৃষ্টিকে অবরুদ্ধ করে দিল। যে ক্রমিক পর্য্যায়ে ব্যাপারটা এগিয়ে আসছিল, তা আমি পরিষ্কারভাবে দেখতে পাচ্ছিলাম। গোড়ার দিকে ঐ পর্দ্দা এগিয়ে এলো সামনের দৃশ্যগুলোকে কিছুটা ঢেকে। আমি থমকে গেলাম। আছাড় খাবো—এই ভয়ে পথচলা বন্ধ করে দিলাম। তারপর এ ধাক্কাটা চলে গেল। আমি আবার এগিয়ে যেতে লাগলাম। এরপর আমার চোখের সামনে অন্ধকার এলো ঘনিয়ে। বাহ্যজ্ঞান ধীরে ধীরে তখন চলে যাচ্ছে। এ অবস্থাটা কেটে না যাওয়া অবধি একটা বড়ো প্রস্তরখণ্ডের উপর আমি হেলান দিয়ে বসে রইলাম।

"আবার তৃতীয়বার এলো চৈতন্য অবলুপ্তির পালা। পাথরটির সামনে আমি বসে পড়লাম। ঐ সাদা পর্দ্দাটি আমার দৃষ্টিকে একেবারে ঢেকে দিল। রক্তসঞ্চালন ও শ্বাসক্রিয়া দুই-ই তখন রুদ্ধ হয়ে গিয়েছে। শরীরের বর্ণ হয়ে গেছে কৃষ্ণাভ নীল। সঙ্গী বাসুদেব শাস্ত্রী তো ভেবে নিয়েছে, আমি আর বেঁচে নেই। দু হাত দিয়ে আমায় জড়িয়ে ধরে সে তখন শুরু করেছে শোকের কান্না।

"এই অবস্থায়ও কিন্তু আমার চেতনার ধারাটি ছিল অব্যাহত। দেহের শেষ অবস্থা দেখে ভয় বা দুঃখের মনোভাব আমার হয়নি। আমি আমার অভ্যস্ত ভঙ্গীতেই আসন করে বসেছিলাম, প্রস্তরখণ্ডের উপর হেলান দিয়ে বসবার প্রয়োজন হয়নি। রক্তস্রোত, শ্বাস-প্রশ্বাস

বন্ধ! অথচ সে সময়ে উপবেশনের ভঙ্গীতে অবস্থান করতে এ দেহের কোন অসুবিধা হয়নি।

"এ অবস্থায় পনের মিনিট কেটে যায়। তারপর সারা দেহের ওপর এক আকস্মিক তীব্র কম্পন অনুভূত হয়। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে যায় সবেগে রক্ত সঞ্চালন ও শ্বাস-প্রশ্বাস। প্রতি রোমকূপ হতে প্রবলভাবে ঘাম বেরুতে থাকে। এরপর শরীরের রং সজীব দেহের মতই আবার হয়ে ওঠে স্বাভাবিক! একসঙ্গে রক্তসঞ্চালন ও শ্বাস রুদ্ধ হবার অভিজ্ঞতা আমার দেহে এই প্রথম।"

এ অনুভূতির প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিয়া উঠা সহজ নয়, কিন্তু ইহার প্রতিক্রিয়া যে রমণের জীবনে সুদূরপ্রসারী হয়, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। এই মৃত্যু-অনুভূতি সম্বন্ধে শিষ্য মহলে নানা জল্পনা-কল্পনার সূত্রপাত হয়। সে সময়ে তাহাদের সকল কিছু কূটতর্কের অবসান ঘটাইয়া রমণ বলেন, "ছ্যাখো, এই অনুভূতি আমার নিজের ইচ্ছায় উদ্ভূত হয়নি। মৃত্যু ঘটলে এই দেহের কি অবস্থা হবে, তা বুঝবার জন্যও নিজে থেকে আমি এর অবতারণা করিনি। এরূপ অভিজ্ঞতা আগেও আমার মাঝে মাঝে হয়েছে—কিন্তু এবারে এর তীব্রতা ও গুরুত্ব ছিল অন্যান্য বারের চেয়ে অনেক বেশী।"

তপস্বী রমণের জীবনে জ্বলিয়া উঠে পরম সত্যের আলোক, তিনি হন সিদ্ধকাম। ধীরে ধীরে মহাপুরুষের পদপ্রান্তে আসিয়া জুটে একদল মুক্তিকামী সাধক। এই সাধকদের কৃপা বিতরণ করিতে গিয়া উত্তরকালে মহর্ষি রমণের জীবনে প্রকটিত হয় বহুতর লীলা।

শেষিয়ার এই ভাগ্যবান সাধকদের অন্যতম। তাঁহার জ্ঞানস্পৃহা মিটানোর জন্য রমণকে অনেক সময় নানা অত্মোপদেশ দিতে হইত। এ সময়ে আচার্য্য শঙ্করের 'বিবেক চূড়ামণি'র কিছুটা অংশ নিজেই তিনি তামিল ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন।

শিবপ্রকাশম পিলেই এক নিরভিমান, পবিত্রচেতা সাধক। তাঁহার

জীবনে সে সময়ে আসে এক জটিল সমস্যা। স্ত্রী হঠাৎ মারা যাওয়ায় পিলেই মহা ফাঁপরে পড়িয়াছেন। বরাবরই সন্ন্যাস জীবনের উপর তাঁহার ঝোঁক। এবার এ সুযোগে কি ঘর ছাড়িবেন, না আবার বিবাহ করিয়া ঘর-সংসার ও ধর্ম্মকর্ম্ম এক সঙ্গে করিবেন, কোন কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছেন না। তাই রমণের নিকট তিনি ছুটিয়া আসিয়াছেন। কয়েক দিন কাটিয়া গিয়াছে, কিন্তু প্রশ্নটি উত্থাপন করার সুযোগ আর হইতেছে না।

পিলেই একদিন নিজেই ঠিক করিয়া ফেলিলেন, বিবাহ করার সত্যসত্যই কোন প্রয়োজন তাঁহার নাই। সংসারের বন্ধন যখন খসিয়াই পড়িয়াছে আর তাহাতে জড়ানো কেন? তাছাড়া, রমণ-স্বামীর জীবন্ত উদাহরণ তো তাঁহার সম্মুখেই রহিয়াছে।

অনর্থক দেরী করিয়া লাভ নাই, এবার দেশে ফিরিয়া যাওয়া দরকার। সেদিন অন্যান্য ভক্তদের সঙ্গে রমণের সম্মুখে পিলেই বসিয়া আছেন, সহসা চোখে ভাসিয়া উঠিল এক অলৌকিক দৃশ্য। দেখিলেন, মহর্ষির মুখমণ্ডলের চতুর্দ্দিক দিব্য জ্যোতির ছটায় উদ্ভাসিত। আরও এক দৃশ্য দেখিয়া অবাক হইলেন—রমণের শিরোদেশ হইতে এক স্বর্ণকান্তি শিশু বাহির হইয়া আসিতেছে, আর ভিতরে ঢুকিতেছে। দুই-তিন বার এ দৃশ্য তাঁহার নয়ন সমক্ষে ফুটিয়া উঠিল।

কেন এই অলৌকিক দর্শন, কি ইহার তাৎপর্য্য, পিলেই কিছু বুঝিলেন না। কিন্তু অন্তস্তলে নাড়া পড়িয়া গেল। বুঝিলেন, সত্যকার এক শক্তিধর মহাপুরুষের আশ্রয়েই তিনি আছেন, তাঁহার সকল সমস্যার ভারও রহিয়াছে তাঁহারই উপর। তবে শুধু শুধু এ দুশ্চিন্তা কেন? সত্যিই তো। তাঁহার মত এমন সৌভাগ্য কয়জনের? ভাবাবেগে অধীর হইয়া তিনি কাঁদিতে লাগিলেন।

আরও দুইদিন পিলেই রমণস্বামীর দিব্যমূর্ত্তি দর্শন করেন। একদিন ফুটিয়া উঠে ভস্মমাখা এক তাপসের করুণাঘন মূর্ত্তি, আর একদিন তাঁহাকে দেখা যায় রজতগিরিসন্নিভ এক দেববিগ্রহরূপে!

পিলেইর জীবনধারা এই দর্শনের পর হইতে বদলাইয়া যায়। ত্যাগ তিতিক্ষা ও ব্রহ্মচর্য্যের ব্রত নিয়া তিনি সাধনপথে অগ্রসর হন।

লক্ষীমিয়াম্মল রমণের এক পুরাতন শিষ্যা। ভক্তদের মধ্যে এচাম্মল নামেই তিনি পরিচিত হইয়া উঠেন। পরম সুখে এই তরুণী ঘর-সংসার করিতেছিলেন, হঠাৎ সেদিন জীবনে তাঁহার নামিয়া আসে নিয়মিত চরম আঘাত। একে একে স্বামী, পুত্র, কন্যা সব হারাইয়া শোকে দুঃখে তিনি মুহ্যমান হইয়া পড়েন।

নানা তীর্থে ছুটাছুটি করিয়াও এচাম্মলের শোকের জ্বালা দূর হইল না। এবার অরুণাচলে রমণকে দর্শন করিতে আসিলেন। কল্যাণশ্রী-মণ্ডিত মহাপুরুষ সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন। দুই চোখে ফুটিয়া উঠিয়াছে অপার স্নেহ আর করুণা। অদ্ভুত তাঁহার শক্তি। নয়ন দুইটির দিকে চাহিবামাত্র শোকবিধুরা নারীর দুঃখ-জ্বালা অন্তর্হিত হইয়া গেল। রমণস্বামীর চরণ সেবায় করিলেন আত্মসমর্পণ।

রমণের সেবার জন্য এই ভক্তিমতী মহিলার উৎসাহের অবধি নাই। রোজই নানা উপাদেয় আহার্য্য নিয়া পাহাড়ে চলিয়া আসেন। রমণকে ভোজন করানো হয় তাঁহার নিত্যকার ব্রত। কিন্তু রমণ কোন কিছু একাকী খান না, ভক্ত অভ্যাগত সবাইকে সঙ্গে নিয়া আহারে বসাই তাঁহার অভ্যাস। এচাম্মল তাই সবার জন্যই খাবার তৈরী করিয়া আনেন। তিনি বহুদিন এ দায়িত্ব সানন্দে বহন করেন।

মহর্ষির অনুমতি নিয়া এচাম্মল একটি মেয়েকে প্রতিপালন করিতে থাকেন। ধূমধাম করিয়া তাহার বিবাহও দিয়া দেন। দুর্ভাগ্যক্রমে কয়েক বৎসর পরে এই পালিতা কন্যাটির মৃত্যু হয়। তারযোগে এই দুঃসংবাদ এচাম্মলের কাছে সেদিন পৌঁছে।

মহর্ষি ছাড়া আর তাঁহার আশ্রয়স্থল কোথায়? কাঁদিতে কাঁদিতে আশ্রমে গেলেন, তারবার্ত্তাটি তাঁহার হাতে দিলেন।

এই শোকবার্ত্তা পাঠ করিয়াই মহর্ষির নয়ন দুইটি করুণার্দ্র হইয়া উঠিল। পালিতা কন্যার ছেলেটি বাস করিত এচাম্মলেরই গৃহে,

তাহাকে মহর্ষির কোলে তুলিয়া দিয়া অভাগিনী নারী অঝোর ধারে কাঁদিতে লাগিলেন। দেখা গেল, রমণস্বামীর গণ্ডেও অশ্রুধারা নামিয়া আসিয়াছে। সর্ব্বপাশমুক্ত আত্মজ্ঞানী তাপস দুঃখিনী এচাম্মলের শোকের অংশ নিতে আগাইয়া আসিয়াছেন।

একে একে স্বামী, পুত্র, কন্যা হারাইয়া এচাম্মল পাগলের মত হইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু রমণের স্নেহচ্ছায়ায় আসিয়া বসার পর সে শোকদুঃখ অনেকটা সহ্য হইয়া যায়। কিন্তু এবারকার আঘাত হৃদয়ে বড় বেশী বাজিয়াছে।

চিরদুঃখিনী শিষ্যার কান্নার সহিত গুরুও আজ তাঁহার অশ্রুধারা মিশাইয়া দিলেন। শিষ্যার শোক-তাপ কিছুক্ষণের মধ্যেই কোথায় যেন অদৃশ্য হইয়া গেল।

শক্তিধর মহাপুরুষের স্পর্শে এচাম্মলের হৃদয় এবার শান্ত, অন্তর্মুখীন। সকলের নয়ন সমক্ষে ফুটিয়া উঠিল রমণ মহর্ষির মানবীয় রূপ, আর সেই সঙ্গে লোকগুরুর লৌকিক জীবনের এক করুণাঘন প্রকাশ!

খাবার নিয়া রোজই এচাম্মলকে বিরূপাক্ষ গুহায় যাইতে হয়। সেদিন তিনি ঝাঁপিটি হাতে নিয়া পাহাড়ে উঠিতে যাইতেছেন। হঠাৎ চোখে পড়িল—পাহাড়ের পাদদেশে, পথের একধারে দাঁড়াইয়া মহর্ষি এক অপরিচিত ব্যক্তির সহিত নিম্নস্বরে কি আলাপ করিতেছেন। তিনি হয়তো জরুরী কথার আলোচনায় ব্যস্ত, এচাম্মল তাই কোন কথা না বলিয়া পাশ কাটাইয়া চলিলেন।

মহর্ষি সহাস্যে তাঁহাকে ডাকিয়া কহিলেন, "আচ্ছা শুধু শুধু পাহাড় বেয়ে কষ্ট করে আর ওপরে যাও কেন, বল তো? আমি তো নীচে এখানেই রয়েছি!"

এচাম্মল একটু থমকিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু কথাবার্ত্তা বলা আর হইয়া উঠিল না। রমণের কাছে তখনো দাঁড়াইয়া আছেন সেই অপরিচিত ব্যক্তি। এচাম্মল আর সেখানে অপেক্ষা করিলেন না।

তাছাড়া, এখন কাজের তাড়াও কম নয়, গুহায় পৌঁছিয়াই সকলের ভোজনের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

কিন্তু গুহায় প্রবেশ করামাত্র তাঁহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। দেখিলেন, উত্তরভারত হইতে আগত এক দর্শনার্থী পণ্ডিতের সঙ্গে মহর্ষি প্রশান্তভাবে কথাবার্ত্তা বলিতেছেন। একি আশ্চর্য্য ব্যাপার! এইমাত্র যে পাহাড়ের নীচে, মহর্ষিকে তিনি বাক্যালাপে রত দেখিয়া আসিলেন! এ কি অলৌকিক কাণ্ড! এচাম্মল কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া গিয়াছেন, দেহ তাঁহার থরথর করিয়া কাঁপিতেছে।

রমণ স্মিতহাস্যে প্রশ্ন করিলেন, "কি গো, আজ এমনধারা ভাব কেন তোমার? কি হয়েছে খুলে বল তো?"

এচাম্মল কম্প্রকণ্ঠে কহিলেন, "ভগবান, আপনাকে যে এইমাত্র পাহাড়ের নীচে আমি দেখে এলাম। এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আপনি আলাপ করছিলেন। আমি পাশ দিয়েই যে এলাম। দেখতে একটুও ভুল আমার হয়নি। কিন্তু একি অবিশ্বাস্য ব্যাপার? দুই জায়গাতেই কি এক সঙ্গে আপনি রয়েছেন?"

অভ্যাগত পণ্ডিত অনুযোগ দিয়া কহিলেন, "স্বামী, এখানে এই গুহার ভেতরে বসে এতক্ষণ ধরে আপনি আমার সঙ্গে আলাপ কচ্ছেন, অথচ দেখছি, এই একই সময়ে শিষ্যাকে পাহাড়ের নীচে দাঁড়িয়ে দেখা দিতে আপনার বাধছে না। আমার ওপরও একটু কৃপা করুন।"

সুকৌশলে মহর্ষি এ প্রসঙ্গ এড়াইয়া গেলেন। সংক্ষেপে শুধু কহিলেন, "এচাম্মল যে আমার কথাই ভাবে, আমাকেই ধ্যান করে। তাই-তো এরকম দেখেছে।"

সে-বার এক ইউরোপীয় দর্শনার্থী রমণের আশ্রমে আসিয়াছেন। আহার ও বিশ্রামের পর অরুণাচলের পার্ব্বত্য পথে তিনি ভ্রমণে বাহির হইলেন। এই বিখ্যাত, পবিত্র শৈলের নানা অঞ্চলে যাহা কিছু দর্শনীয় আছে তাড়াতাড়ি সব দেখিয়া ফেলিতে চান! বহুক্ষণ ঘোরাফেরার

পর সাহেব কিন্তু পথ হারাইয়া ফেলিলেন। আশ্রমে ফিরিবার আর কোন উপায় রহিল না। রৌদ্রের তাপও সেদিন প্রচণ্ড, শ্রান্তিতে তিনি অবসন্ন হইয়া পড়িলেন।

এদিকে তাঁহার বিলম্ব দেখিয়া সকলে চিন্তিত হইয়া উঠিয়াছেন। নূতন লোক, কোথায় পথ হারাইলেন কে জানে? ফিরিয়া আসিয়া আশ্রমিকদের তিনি এক অদ্ভুত কাহিনী শুনাইলেন। শ্রোতাদের বিস্ময়ের অবধি রহিল না।

তিনি কহিলেন, "পথ ভুলে যাবার পর কি যে করবো, ভেবে পাচ্ছিলাম না। এমন সময়ে দেখা হয়ে গেল রমণ মহর্ষিরই সঙ্গে, ঐ পথেই কোথায় নাকি যাচ্ছিলেন। তিনিই তো আমায় খানিকটা পথ এগিয়ে দিয়ে গেলেন। তাই তো ফিরতে পারা গেল।"

শিষ্যেরা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতেছেন। কারণ, তাঁহারা সবাই জানেন, মহর্ষি সারা সকাল শিষ্য-পরিবৃত হইয়া আশ্রমে বসিয়া আছেন, ক্ষণকালের জন্যও বাহিরে যান নাই।

জ্ঞান-তপস্বী রমণ কিন্তু বরাবরই শিষ্যদিগকে অলৌকিক ক্রিয়া বা দর্শনাদি সম্পর্কে আগ্রহশীল হইতে নিষেধ করিতেন। তাঁহার আধ্যাত্মিক সাধনার আদর্শ—আত্মানুসন্ধান ও আত্মজ্ঞান। এই দিকেই শিষ্য ও ভক্তেরা সাধনা কেন্দ্রীভূত করুক, ইহাই তিনি চাহিতেন।

আত্মজ্ঞানী মহাপুরুষ আত্মার গভীরে সদা অবস্থিত থাকেন। তাই প্রপঞ্চময় জগতের সব কিছুই তাঁহার নিকট নাট্যাভিনয় ছাড়া কিছু নয়। নিজ জীবনের স্তরে স্তরে এই পরম উপলব্ধিকে তিনি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। তাই বহিরঙ্গ জীবনের কোন দুঃখ, কোন বাধা-বিঘ্নই দেহাত্মবোধহীন মহা তাপসকে চঞ্চল করিতে পারে নাই।

অনেকদিন আগের কথা। কিশোর রমণ তখন অরুণাচলের বিশিষ্ট সাধকরূপে খ্যাত হইয়া উঠিয়াছেন। চারিদিকে তাঁহার সদাই থাকে ভক্ত শিষ্য দর্শনার্থীর ভীড়। বালানন্দ নামে এক দুষ্ট প্রকৃতির 'সাধু'

রমণের জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগাইতে থাকে। ইহাও সে বুঝিয়া নেয়, যত উপদ্রবই সে করুক না কেন, দেহাত্মবোধহীন সাধক রমণ তাহাতে কোনদিন বাধা দিবেন না।

রমণের কাছে অনেক দর্শনার্থীই আসে। তাহাদের কাছে প্রায়ই সে খুব মুরুব্বিয়ানা দেখাইতে থাকে। ঔদ্ধত্য তাহার কিন্তু এখানেই শেষ হয় না। রমণ প্রায়ই থাকেন মৌন, মুদিত-নয়ন বা ধ্যানাবিষ্ট। তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া দুষ্ট সাধুটি দর্শনার্থীদের বলে, "ছ্যাখো, এ বাচ্চা আমারই শিষ্য। একে তোমরা খাবার দাও, ভেট দাও।"

ভাবটা এই—সে রমণের এক মস্ত অভিভাবক, আর রমণ তাহারই আজ্ঞাবহ এক ছোকরা সাধক মাত্র। এমনি ধৃষ্টতা এ লোকটি দিনের পর দিন দেখাইতে থাকে। রমণ কিন্তু মৌনী, নির্ব্বিকার। এ কথার প্রতিবাদে একটিবারও তিনি মুখ খোলেন নাই।

দর্শনার্থী জনতা চলিয়া যায়, বালানন্দ তাঁহাকে চুপি চুপি বলে, "ছ্যাখো' আমি এমনিভাবে রোজ সবাইকে বলবো—আমি তোমার গুরু। ভেট হিসেবে তাদের কাছ থেকে টাকাকড়ি আদায়ও করবো। এতে তোমার তো বাছা ক্ষতি-বৃদ্ধি কিছু নেই। তুমি যেন আমার কথার প্রতিবাদ করে বসো না, সব ফাঁস করে দিয়ো না।"

রমণ কিন্তু কোন কথাতেই কাণ দেন না. দিনের পর দিন পরম প্রশান্তি নিয়া এই দুর্ব্বৃত্তের অনাচার সহ্য করিয়া যান।

ভক্তেরা প্রায় ক্ষেপিয়াই রহিয়াছেন, কিন্তু এই ভণ্ড সাধুকে শাসন করিবার শক্তি তাঁহাদের নাই! কারণ, তাহার এই দুষ্কৃতির পরেও রমণ নিজে রহিয়াছেন অচঞ্চল।

শেষটায় ভক্ত পলনীস্বামীর আর ধৈর্য্য রহিল না। অতর্কিতে সেদিন এক ঝগড়া বাধাইয়া বসিলেন। ভণ্ড সাধু বালানন্দ তো ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায়। সবাইকে সে জঘন্য গালাগালি দিতে থাকে, এমন কি রমণের গায়েই সে থুথু ফেলিয়া বসে। আত্মসমাহিত কিশোর সাধকের ইহাতেও কিন্তু কোন ভাব-বৈলক্ষণ্য দেখা যায় নাই।

ভক্তেরা মহা উত্তেজিত হইয়া উঠেন তখনি ঐ ভণ্ড সাধুকে তাহারা বাহির করিয়া দেন। গুহায় আবার শান্তি ফিরিয়া আসে।

আরও পরবর্ত্তী কালের কথা। গুটিকয়েক শিষ্য নিয়া রমণ তখন পর্ব্বতের সানুদেশে, তাঁহার আশ্রমে বাস করিতেছেন। এক রাত্রিতে একদল দুর্দ্ধর্ষ চোর সেখানে উপস্থিত হয়, ঘরের জানালা-দরজা ভাঙ্গিতে থাকে। শিষ্যেরা লাঠিসোটা নিয়া প্রস্তুত হন।

রমণ কিন্তু প্রশান্ত কণ্ঠে বলিয়া উঠেন, "চুপ কর, বাধা দেবার কোন প্রয়োজন নেই। ওরা ওদের কাজ করছে করুক। আমাদের দিক থেকে কর্ত্তব্য হচ্ছে, সহ্য করে যাওয়া—সব কিছু ক্ষমা করা।"

চোরের দলকে তিনি ডাকিয়া কহিলেন, "ওহে বাপু, তোমরা ব্যস্ত হয়ো না. স্বচ্ছন্দে ভেতরে ঢুকতে পারো, কেউ বাধা দেবে না। যা কিছু সামান্য জিনিষপত্র এখানে আছে, নিয়ে যাও। একটি কথাও কেউ তোমাদের বলবে না।"

কিন্তু এমন সহজ সরল কথার মর্ম্ম তস্করেরা বুঝিতে চাহিবে কেন? ভাবিল, আসলে এ প্রস্তাব সাধুদের ছলনা মাত্র, ঘরে ঢুকিলেই তাহাদের ফাঁদে ফেলা হইবে। তাই বারংবার আমন্ত্রণ করা সত্ত্বেও সম্মুখের দরজা দিয়া তাহারা আগাইয়া আসিল না।

রমণ উচ্চ কণ্ঠে জানাইয়া দিলেন, শিষ্যদের নিয়া তিনি আশ্রম ত্যাগ করিতেছেন, এবার শূন্য গৃহে তাহারা স্বচ্ছন্দে ঢুকিতে পারে।

সর্ব্বপ্রথমে আশ্রমের পালিত কুকুর কারুপ্পনকে নিরাপদ আশ্রয়ে পাঠানো হইল—তস্করেরা যেন হাতের কাছে পাইয়া তাহাকে না মারিতে পারে।

সাঙ্গোপাঙ্গসহ রমণ বাহির হইয়া যাইতেছেন, এমন সময়ে চোরেরা তাঁহার পায়ে সজোরে লাঠি মারিয়া বসিল। কিন্তু সেদিকে মহাপুরুষের ভ্রূক্ষেপ নাই। শান্তস্বরে কহিলেন, "এতেও যদি খুশী না হয়ে থাকো, তবে আরেকটা পা'ও জখম করতে পারো।"

শিষ্য রামকৃষ্ণস্বামী এবার সবেগে সম্মুখে আগাইয়া আসেন, দুই হাতে আগলাইয়া তিনি গুরুকে বাঁচান।

নিকটস্থ এক চালাঘরে গিয়া রমণ ও তাঁহার শিষ্যেরা উপবেশন করেন। এদিকে তস্করেরা তন্নতন্ন করিয়া জিনিষপত্র খুঁজিতেছে, অনেক কিছু লণ্ডভণ্ড করিতেছে। আশ্রমগৃহ অন্ধকার। আলোর অভাবে কাজের বড় অসুবিধা। তস্করদের একজন আসিয়া কহিল, "ওহে. শিগ্‌গীর একটা লণ্ঠন যোগাড় করে দাও তো!"

অদ্ভুত দুঃসাহস ইহাদের। একদল ভক্ত তো একেবারে মারমুখী। কিন্তু রমণের আদেশে তৎক্ষণাৎ একটি লণ্ঠন দিতে হইল।

আশ্রমে বেশী কিছু ছিল না, সামান্য দ্রব্যাদি নিয়াই চোরেরা সেদিন ক্ষুণ্ণমনে চলিয়া যায়।

লাঠির আঘাতে শিষ্যদের দেহেরও নানা স্থান কাটিয়া গিয়াছে, রমণ তাঁহাদের তাড়াতাড়ি মলম লাগাইতে বলিলেন। কিন্তু শিষ্যেরা গুরুর জন্যই বেশী ব্যস্ত। তাঁহারা কহিলেন, "স্বামীর নিজের দেহে যে আঘাত লেগেছে, তার কি ব্যবস্থা হবে?"

রমণ কৌতুকভরে শুধু কহিলেন, হ্যাঁ, আমি ওদের 'পূজো' কিছুটা পেয়েছি বৈ কি?"

এই 'পূজোর' ফল কিন্তু বড় মর্ম্মান্তিক। আঘাতের চোটে তাঁহার উরুদেশ কাটিয়া গিয়াছে—রক্ত ঝরিতেছে। এক শিষ্যের আর ধৈর্য্য রহিল না। একটা লোহার ডাণ্ডা হাতে নিয়া উত্তেজিত স্বরে কহিলেন, "ভগবান, একবারটি আপনি আদেশ দিন, আমি এই দুষ্টদের উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে আসি।"

ধীরকণ্ঠে রমণ কহিলেন, "দ্যাখো, আমরা সাধু। আমাদের ধর্ম্ম আমরা কোনোমতেই ছাড়বো না। তুমি যদি আজ এই লোহার ডাণ্ডা ওদের মাথায় মারো, হয়তো কেউ না কেউ মারা যাবে। এর জন্য লোকে কিন্তু চোরদের অনুযোগ দেবে না, দেবে আমাদের মত সাধুদের। ওরা হচ্ছে পথভ্রষ্ট, অজ্ঞানান্দন্ধ মানুষ। ভালমন্দের বিচার এ দুর্ভাগাদের নেই।

সে বিচার যে আমাদেরই করতে হবে। নীতি ও আদর্শকে আঁকড়ে ধরে আমাদেরই থাকতে হবে। আর ভেবে ছাখো, যদি কোন অসতর্ক মুহূর্ত্তে তোমার দাঁত তোমার জিভটাকে কামড়ে দেয়, তুমি কি তাহলে দাঁতটাই উৎপাটন করে ফেলবে ?"

সৎ অসৎ, ভাল মন্দ সব কিছুই এই মহাজ্ঞানী তাপসের দৃষ্টিতে হইয়া গিয়াছে একাকার। সারা দৃশ্যমান জগতে একই আত্মসত্তাকে তিনি ওতপ্রোত দেখিতেছেন। সাধু ও চোর তাঁহার চোখে আজ একই আত্মার পৃথক রূপ ছাড়া যে আর কিছুই নয়।

কাব্যকণ্ঠ গণপতি শাস্ত্রী ছিলেন রমণের অন্যতম শিষ্য। ঈশ্বরদত্ত মেধা ও প্রতিভার বলে ইনি প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করেন! বেদ বেদান্ত, পুরাণ এবং কাব্য অলঙ্কার প্রভৃতি নানা শাস্ত্রে তাঁহার বুৎপত্তি ছিল। এই সঙ্গে ভগবদ্‌দর্শনের জন্যও শাস্ত্রীজী কম সাধন ভজন করেন নাই। দীর্ঘদিন কৃচ্ছ্র সাধনও করিয়া আসিতেছেন।

বাল্যকাল হইতেই সংস্কৃত কাব্য রচনায় শাস্ত্রীজীর দক্ষতার পরিচয় মিলে। চৌদ্দ বৎসর বয়সে তাঁহার এ প্রতিভা বিদগ্ধসমাজকে চমৎকৃত করে, সাহিত্য ও ধর্ম্মশাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি প্রাসদ্ধি লাভ করেন। উত্তরকালে নবদ্বীপের সুধী সমাজ তাঁহার কাব্য প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া উপাধি দেন, কাব্যকণ্ঠ।

এত কালের শাস্ত্রপাঠ, জপতপ ও তীর্থভ্রমণের পরও শাস্ত্রীর জীবনে আসে নাই অধ্যাত্ম-জীবনের সার্থকতা। অন্তরে জ্বলিতেছে প্রবল অশান্তির জ্বালা।

সেদিন পবিত্র কার্ত্তিকেঈ উৎসব। গণপতি শাস্ত্রীর অন্তরে বারবারই এক অব্যক্ত ব্যথা গুমরিয়া উঠিতেছে। যে শান্তি, যে অমৃত লাভের জন্য সারা জীবন তিনি ছুটাছুটি করিয়া আসিয়াছেন, তাহার সন্ধান তো পাইলেন না! তবে কি এ জীবন ব্যর্থ হইবে? কোথায় যাইবেন, কাহার কাছে আশ্রয় নিবেন ভাবিয়া কূল পান না?

সহসা মনে পড়িল, অরুণগিরির কন্দরে উপবিষ্ট কিশোর 'স্বামী'র কথা। সদাই ধ্যানাবেশে, আত্মসমাহিত অবস্থায় তাঁহার দিম কাটে। ইঁহার কাছে কি আকাঙ্ক্ষিত বস্তু পাওয়া যাইবে না? এমন ত্যাগ তিতিক্ষা ও ধ্যাননিষ্ঠা শাস্ত্রী কোথাও দেখেন নাই। নিশ্চয়ই এ সাধক সিদ্ধকাম। আজ জিজ্ঞাসা করিয়া, জানিয়া নিবেন, জীবন-তপস্যা তাঁহার সফল হইবে কিনা।

চিন্তাকূল মনে গণপতি শাস্ত্রী বিরূপাক্ষ গুহায় আসিয়া পৌঁছিলেন। রমণস্বামীর চরণ দুইটি জড়াইয়া ধরিলেন, সাশ্রুনয়নে কহিলেন, "প্রভু, ধর্ম্মশাস্ত্র এযাবৎ অনেক পাঠ করেছি। জপতপও কম করা হয়নি। কিন্তু অমৃতজ্যোতির এক কণাও লাভ করতে পারিনি। তাই আপনার চরণে আজ আশ্রয় নিলাম।"

রমণ নীরবে নিষ্পলক নেত্রে প্রায় পনের মিনিট কাল পণ্ডিতের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তারপর প্রশান্ত কণ্ঠে কহিলেন, "একান্তভাবে কেউ যদি অনুসন্ধান করে—কোথা থেকে 'আমি' বোধটি উদ্‌গত হচ্ছে, তাহলে ক্রমে সেইখানেই মন বিলীন হয়ে যায়—এই হচ্ছে প্রকৃত তপস্যা। যদি কেউ জপমন্ত্রের উৎসটির খোঁজ করে, তাহলে সেইখানেই মন একেবারে মিলিয়ে যায়—প্রকৃত তপস্যা একেই বলে।

শাস্ত্রবাক্য ও ধর্ম্মোপদেশ গণপতি শাস্ত্রী অনেক শুনিয়াছেন। যে কথা কয়টি উপদেশপূর্ণ এইমাত্র শুনিলেন, তাঁহার মত সর্ব্ব-শাস্ত্র বিশারদ, প্রতিভাধর পুরুষের কাছে তাহা অজানা নয়। কিন্তু তরুণ তাপসের শ্রীমুখের বাণী যেন চৈতন্যময়। শাস্ত্রীর সর্ব্ব সত্তার মূলে উহা প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়া যায়। অপার্থিব আনন্দধারা তাঁহার দেহে মনে ছড়াইয়া পড়ে, আর এ আনন্দ উৎসারিত হয় রমণের দেহ হইতে।

গণপতি শাস্ত্রী সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত। এখন হইতে তাঁহার বহুতর রচনায়, অনবদ্য ভাবে ও ভাষায় রমণের প্রশস্তি-গাথা তিনি গাহিতে থাকেন। রমণের ভাব ও আদর্শের বহু ব্যাখ্যাও তিনি রচনা করেন। 'ভগবান শ্রীরমণ' বা 'রমণ মহর্ষি' নাম গণপতি শাস্ত্রীরই

দেওয়া। এখন হইতে দেশে ও বিদেশে এই দুইটি নামেই রমণস্বামী পরিচিত হইয়া উঠিতে থাকেন।

এক বৎসর পরের কথা। রমণ মহর্ষির কৃপা গণপতি শাস্ত্রীর জীবনে সেদিন হঠাৎ এক অলৌকিক লীলার মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করে। তিরুবত্তিয়ুর-এর গণপতি মন্দিরে বসিয়া সে রাত্রে শাস্ত্রীজী ধ্যান জপ করিয়া চলিয়াছেন। এ সময়ে হঠাৎ তাঁহার অন্তরে জাগিয়া উঠে রমণ মহর্ষিকে দর্শনের তীব্র ইচ্ছা। এ ইচ্ছা সেদিন তাঁহার পূর্ণ হয় বড় বিস্ময়কর রূপে।

শাস্ত্রীজী দেখেন, মহর্ষি মন্দির মধ্যে তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত। শুধু তাহাই নয়, তাঁহার অলৌকিক দেহের স্পর্শও শাস্ত্রীজী অনুভব করেন, আনন্দে তিনি বিহ্বল হইয়া পড়েন। শাস্ত্রীজী বলিয়াছেন, মহর্ষি এসময়ে অঙ্গুলি দিয়া তাঁহার মস্তক স্পর্শ করেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সারা দেহে উঠে দিব্য রসের তরঙ্গ।

অথচ রমণ কিন্তু তিরুভান্নামালাই-এ আসার পর হইতে একটি দিনের জন্যও কোথাও বাহিরে যান নাই। জীবনে কোনদিন তিরুবত্তিয়ুর নামক স্থানটি দর্শনই করেন নাই।

কিছুদিন পরে গণপতি শাস্ত্রী মহর্ষির কাছে তাঁহার এই অলৌকিক অভিজ্ঞতার কথা বিবৃত করেন। মহর্ষি ইহার উত্তরে বলেন, "কয়েক বৎসর আগে অরুণাচলের গুহায় একদিন আমি চুপচাপ শুয়ে আছি। হঠাৎ অনুভব করলাম, আমার দেহটি কেবলি বহু উর্দ্ধে আকাশে উঠে যাচ্ছে। ক্রমে দৃশ্যমান বস্তু সব অন্তর্হিত হয়ে গেল, আর আমার চারিদিকে রইলো শুধু এক শুভ্র জ্যোতির পরিমণ্ডল।

"কিছুক্ষণ পরে আমার এ দেহ আবার নীচে নামতে শুরু করলো। তারপর চোখের সামনে দেখতে পেলাম বস্তুজগৎ। নিজের মনে মনেই আমি বল্লাম, 'এরকম ক'রেই সিদ্ধগণ নিশ্চয় আবির্ভূত ও অন্তর্হিত হয়ে থাকেন। আমার কিন্তু সে সময়ে ধারণা হ'লো, আমি তিরুবত্তিয়ুরে

এসে পড়েছি।' একটা বড় রাস্তা ধরে আমি এগিয়ে গেলাম। এরই একধারে কিছুদূরে গণপতির মন্দির। সরাসরি ভেতরে প্রবেশ করলাম। কিন্তু সেখানে কি বলেছি বা কি করেছি তা স্মরণ নেই। তারপর হঠাৎ এক সময়ে বাহ্যজ্ঞান ফিরে এলো। দেখলাম, বিরূপাক্ষ গুহায় শুয়ে আছি। সেই দিনই আমি পলনীস্বামীর কাছে এ ঘটনানাটা বলেছিলাম —তখন সব সময় সে আমার কাছে থাকতো।"

শিষ্যদের অধ্যাত্ম-সাধনার প্রয়োজনে, কখনো বা তাহাদের আর্ত্ত আহ্বানে রমণ মহর্ষির এরূপ অলৌকিক আবির্ভাব মাঝে মাঝে দেখা যাইত। কিন্তু এ ধরণের বিভূতি দেখাইতে নিজে কখনও তিনি উৎসাহী ছিলেন না। যেটুকু অলৌকিক ঘটনা হঠাৎ প্রকাশিত হইয়া পড়িত, সাধারণতঃ তাহা লোকলোচনের আড়ালে রাখিতেই তিনি চাহিতেন। জানাজানি হওয়ার পর, কৌতূহলী ভক্তেরা এ সম্পর্কে প্রশ্ন করিলে মহর্ষি শুধু কহিতেন, "কে জানে? বোধ হয় অরুণাচলের সিদ্ধগণই এসব কাণ্ড ঘটিয়ে থাকেন!"

সাধনার যে গভীরে শিষ্যদের রমণস্বামী চালিত করিতে চাহিতেন, গণপতি শাস্ত্রীর পক্ষে তাহা কিন্তু অনুসরণ করা সম্ভব হয় নাই! স্বদেশের মুক্তি ও ধর্ম্ম-সংস্কৃতির উজ্জীবন ছিল তাঁহার প্রধান চিন্তা। এ চিন্তা কখনো তিনি ছাড়িতে পারেন নাই। আত্মিক সাধনার পথে তাই এক দুস্তর বাধা আসিয়া উপস্থিত হয়।

১৯৩৬ সালে রমণের এই প্রতিভাধর শিষ্যের লোকান্তর ঘটে। জীবনে তাঁহার আত্ম-সাক্ষাৎকার ঘটিয়াছিল কিনা, রমণকে এ প্রশ্ন করা হয়। অবলীলায় তিনি উত্তর দেন, "কি করে তা সম্ভব হবে? তার মনের সঙ্কল্প যে শেষ পর্য্যন্ত রয়েই গিয়েছিল।"

ভক্ত রাঘবাচারিয়ার তাঁহার জীবনের এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতার কথা বলিয়াছেন। মহর্ষি রমণ সেদিন বহু ভক্ত পরিবৃত হইয়া বসিয়া আছেন। রাঘবাচারিয়াও সেখানে উপস্থিত। তাঁহার অন্তরে এ সময়ে এক তীব্র

আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠে, মহর্ষির লোকোত্তর রূপ তিনি আজ দর্শন করিবেন, তাঁহার মহিমা উপলব্ধি করিবেন।

মহর্ষি রমণ সামনা সামনি বসিয়া আছেন। তাঁহার পিছনে একটি দেয়াল, দক্ষিণামূর্ত্তির এক চিত্র উহাতে টাঙানো। রাঘবাচারিয়ার দেখিলেন, মহর্ষির জীবন্ত দেহ ও দক্ষিণামূর্ত্তির ঐ চিত্র দুই-ই ধীরে ধীরে একেবারে অদৃশ্য হইয়া গেল। দেয়ালটিও কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে, দেখা যাইতেছে শুধু মহাশূন্যের সীমাহীন বিস্তার!

তারপর দৃশ্যটি বদলাইয়া যায়। রাঘবাচারিয়ার দেখেন, শুভ্রবর্ণ মেঘরাশি ধীরে ধীরে সেখানে জমাট বাঁধিতেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই রমণ মহর্ষির দেহ ও দক্ষিণামূর্ত্তির চিত্রটি পূর্ব্ববৎ বিরাজ করিতে থাকে। মহাপুরুষের চারিদিকে ঘনায় এক দিব্যজ্যোতির পরিমণ্ডল।

এ অলৌকিক দর্শন রাঘবাচারিয়ারকে হতবাক্ করিয়া দেয়। রমণকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া নীরবে কম্প্রবক্ষে তিনি কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হন।

একমাস পরে রমণের সহিত আবার তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। সেই অলৌকিক দৃশ্যের তাৎপর্য্য জানার জন্য তিনি বড় ব্যগ্র হইয়াছেন। তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে রমণ কহিলেন, "তুমি যে সেদিন আমার প্রকৃত রূপটি দেখতে চেয়েছিলে! আমার অন্তর্দ্ধানই তুমি দেখেছ, কারণ আমি যে আকারহীন! সঙ্গে সঙ্গে আরও যা কিছু বেশীর ভাগ দেখেছ, তা হয়তো তোমার গীতাপাঠ থেকে উদ্ভূত হয়েছে।—গণপতি শাস্ত্রীরও তোমার মতই এক অলৌকিক দর্শন হয়েছিল। তার সঙ্গে তুমি আলাপ করে দেখতে পারো। তবে, এ ধরণের অনুসন্ধিৎসা ছেড়ে দিয়ে 'আমি কে' তা-ই আবিষ্কার করবার চেষ্টা ক'র। এই পরমাতত্ত্বের সন্ধানই হ'লো আসল সাধনা।"

রমণ মহর্ষির প্রথম জীবনের শিষ্যদের মধ্যে ছিলেন এক নাম-না-জানা সাধক। মহাপুরুষের অপার স্নেহ ও করুণা তিনি লাভ করেন। বিরূপাক্ষ গুহায় পাঁচ দিনের জন্যে ভক্তটির আগমন ঘটে, তারপর

আর তাঁহাকে কখনো দেখা যায় নাই। রমণের কৃপার ধারা তাঁহার উপর অকৃপণ করে বর্ষিত হইত। বহু ভক্তের ভীড়েও দেখা যাইত, মহর্ষির অমৃতময় দৃষ্টি নবাগত সাধককে বিশেষভাবে অভিসিঞ্চিত করিতেছে। তিনি তামিল ভাষায় মহর্ষিকে লক্ষ্য করিয়া এক অপরূপ প্রশস্তি রচনা করিয়া যান।

'রমণ সদ্‌গুরু' নামে এক মনোরম সঙ্গীতমালা তিনি রচনা করেন। একদিন গুহায় বসিয়া এক ভক্ত সুন্দর সুর-তানলয় যোগে ইহা গান করিতেছেন। রমণ মহর্ষিরও সেদিন যেন মন খুলিয়া গিয়াছে। সকলকে বিস্মিত করিয়া সেদিন নিজেও তাঁহার সঙ্গে সুর মিলাইয়া স্তবগান শুরু করিয়া দিলেন।

এ কাণ্ড দেখিয়া ভক্তটি কৌতুকী হইয়া উঠে। পরিহাস করিয়া বলে, "ভগবান, নিজের স্তব নিজে গাইবার দৃষ্টান্ত আমার জীবনে কিন্তু এই প্রথম দেখলাম।"

সদ্‌গুরু তৎক্ষণাৎ উত্তরে কহিলেন, "সে কি কথা? রমণকে এই ছয় ফিট দৈর্ঘ্যের মধ্যে তোমরা সীমিত করে দেখছো কেন?—সে যে এক সর্ব্বজনীন ও সর্ব্বব্যাপক সত্তা!"

শিষ্য না হইলেও শেষাদ্রি স্বামী ছিলেন রমণের এক গুণগ্রাহী ভক্ত। শক্তি মন্ত্রে পূর্ব্বেই তাঁহার দীক্ষা লাভ হইয়াছে, কিছু কিছু অলৌকিক বিভূতির অধিকারীও হইয়াছেন। বহু স্থানে তপস্যাদি করার পর তিরুভান্নামালাই-এ আসিয়া তিনি বাস করিতে থাকেন। হঠাৎ সেদিন অরুণাচলেশ্বর মন্দিরে আসিয়া রমণকে দর্শন করেন, আর সেদিন হইতেই এক অবিচল শ্রদ্ধা নিয়া তিনি এই তরুণ তাপসের জয়গান করিয়া বেড়ান। তাঁহার উৎসাহ অনুপ্রেরণায় বহু লোক রমণের সান্নিধ্য লাভ করে।

এক ব্যক্তি শেষাদ্রি স্বামীর বড় স্নেহভাজন, রমণের আশ্রয় সে গ্রহণ করুক ইহাই তিনি চান। কিন্তু বারবার বলা সত্ত্বেও লোকটির যাওয়া ঘটিয়া উঠিতেছে না। শেষাদ্রি একদিন বড় উত্তেজিত হইয়া

উঠিলেন। তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "সে কি কথা! রমণের নিকট তুমি এখনো যাচ্ছো না! তুমি কি জানো না যে, তাঁর কাছে না যাওয়ায় তোমার ব্রহ্মহত্যার পাপ হচ্ছে।"

তিরস্কৃত ব্যক্তি ভীত হইয়া কাঁদিয়া রমণ মহর্ষির কাছে গিয়া পড়ে। মহর্ষি সহাস্যে এই তিরস্কারের তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ করিয়া দেন। বলেন, "তুমি ব্রহ্মহত্যা কোরছো, একথা বলবার মানে—তুমি নিজেই যে ব্রহ্ম এ সত্য তোমার উপলব্ধিতে এখনো আসছে না। 'ব্রহ্মহত্যা' কথাটি শেষাদ্রি স্বামী এই হিসেবেই প্রয়োগ করেছেন, তোমার কোন ভয় নেই।"

ইংরেজ তরুণ এফ্, এইচ হামফ্রিজ-এর জীবনে রমণ মহর্ষির প্রভাব সঞ্চারিত হয় এক লোকোত্তর লীলার মধ্য দিয়া। এ কাহিনী বড় বিস্ময়কর। পুলিশের এক উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী হিসাবে হামফ্রিজ ভেলোরে আসেন। অরুণাচল হইতে এ শহরটির দূরত্ব মাত্র কয়েক মাইল। মুন্সী নরসিংহায়া-র কাছে এসময়ে তিনি তেলেগু শিখিতেছেন।

সহসা একদিন তেলেগু শিক্ষক মুন্সীকে তিনি বলিয়া বসেন, "আচ্ছা, তুমি কি এ অঞ্চলে কোন সাধু মহাত্মাকে জানো?" বড় অতর্কিত এ প্রশ্ন। মুন্সী চমকিয়া উঠিলেন। এ প্রসঙ্গের মোড় ঘুরাইয়া দিয়া কহিলেন, "না স্যর, এমন কাউকে তো চিনিনে।"

তুইদিন পরের কথা। ভোরবেলায় নরসিংহায়া ছাত্রকে পড়াইতে আসিয়াছেন। কিন্তু আজ তাঁহার কথা শুনিয়া একেবারে হতভম্ভ হইয়া গেলেন। হামফ্রিজ কহিলেন, মুন্সী, তুমি না বলেছিলে, কোন মহাত্মার সাথে তুমি পরিচিত নও? আমি কিন্তু তোমার গুরুদেবকে দেখে ফেলেছি—প্রত্যূষে ঘুম ভাঙবার আগেই স্বপ্নে আমার এ দর্শন হয়েছে। আমার পাশে বসেই তিনি কি যেন সব বলছিলেন, আমি তা বুঝতে পারলুম না।"

এ কি অদ্ভুত কাহিনী! সাহেবের কথা শুনিবার পর নরসিংহায়া চুপ করিয়াই বসিয়া আছেন। কিছুক্ষণ বাদে হামফ্রিজ স্মিতহাস্যে

বলিয়া উঠিলেন, “জানো মুন্সী? ভেলোর শহরের যে লোকটিকে আমি বম্বেতে থাকৃতে সর্ব্বপ্রথম দেখেছি, সে তুমি।”

এ যে আরও অবিশ্বাস্য! নরসিংহায়া জীবনে কোন দিন বম্বেতে যান নাই—সাহেবের সঙ্গে দেখা হওয়া তো দূরের কথা। অতঃপর হামফ্রিজ আদ্যোপান্ত তাঁহার কাহিনী বলিলেন।

—ভেলোরে সরকারী কাজে যোগদান করার আগে হামফ্রিজ খুব অসুস্থ হইয়া পড়েন। এ সময়ে বম্বের এক হাসপাতালে চিকিৎসার্থে কয়েকদিন থাকিতে হয়। সেদিন চুপচাপ বিছানায় শুইয়া আছেন, হঠাৎ কার্য্যস্থল ভেলোরে যাওয়ার চিন্তা মনে জাগিয়া উঠে। সঙ্গে সঙ্গে এক অলৌকিক অভিজ্ঞতা তাহার হয়। কোন এক অদৃশ্য শক্তির কৃপায় সূক্ষ্মদেহে তিনি ভ্রমণ করিতে থাকেন। এ সময়েই ভেলোরের মুন্সী, নরসিংহায়াকে তিনি দেখিতে পান!

এ অলৌকিক দর্শনের কথা শুনিয়া নরসিংহায়া কোন উত্তর দেন না, সন্দেহের দোলায় তিনি দুলিতে থাকেন।

কিন্তু এ সন্দেহ তাঁহার বেশী দিন টিকে নাই। এই তরুণ ইংরেজ অফিসারটি আর একদিন তাঁহাকে অনেক বেশী অবাক করিয়া দেয়। নরসিংহায়ার হাতে সেদিন রহিয়াছে একগাদা ছবি। হামফ্রিজ এগুলি সোৎসাহে টানিয়া নেন, তারপর খুঁজিয়া খুঁজিয়া ইহার মধ্য হইতে নরসিংহায়ার গুরু রমণ মহর্ষির ছবিটি চট্ করিয়া বাহির করিয়া দেন—এ যেন তাঁহার এ অতি পরিচিত ব্যক্তির ছবি।

আরও বিস্ময়ের কথা, হামফ্রিজ সেদিন পেন্সিলের রেখায় যে চিত্রটি আঁকিয়া দেখান, তাহাতে রমণ মহর্ষি এবং তাঁহার আশ্রমগুহার সমগ্র দৃশ্যটি ফুটিয়া উঠে। সহাস্যে মুন্সীকে বলেন, “হ্যাঁ হুবহু এই চিত্রটিই আমি সেদিন স্বপ্নে দেখেছিলাম।

অতঃপর হামফ্রিজ রমণকে দর্শন করিতে আসেন। এই সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, “পর্ব্বত গুহায় ঢুকবার পর মহর্ষির সম্মুখে,

নীরবে তাঁর চরণতলে গিয়ে বসলাম। দীর্ঘ সময় আমরা বসেছিলাম, আর এ সময়ে কেবলি আমার মনে হ'তে লাগ্‌লো, আমি যেন আমার দেহসত্তা থেকে উর্দ্ধে উঠে গিয়েছি। প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে আমি মহর্ষির চোখের দিকে তাকিয়েছিলাম, কিন্তু তাঁর দৃষ্টি থেকে ধ্যান-তন্ময়তা এতটুকুও অপসৃত হতে দেখিনি। উপলব্ধি করতে লাগলাম, তাঁর দেহটি যেন পবিত্রাত্মা খৃষ্টের এক মন্দির বিশেষ। আরো বোধ হতে লাগলো, ঐ দেহটি যেন সামনে উপবিষ্ট মানুষটির কিছু নয়, তা যেন ভগবানেরই এক যন্ত্র বিশেষ—তা যেন নীরব নিস্পন্দ এক প্রাণহীন দেহ, যা থেকে দিব্যজ্যোতি কেবলি চারদিকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে। আমার তখনকার মনের ভাব সত্যই অবর্ণনীয়।"

হামফ্রিজ উচ্চশিক্ষিত ও আদর্শবাদী তরুণ। মানব কল্যাণের আদর্শে তখন তিনি উদ্‌বুদ্ধ। ব্যগ্রভাবে মহাপুরুষকে প্রশ্ন করিলেন, "ভগবান, মনে আমার দীর্ঘদিনের সঙ্কল্প রয়েছে আমি জগৎকে সাহায্য কর্‌বো। তা কি আমি কখনো পারবো না ?"

উত্তর হইল, "হ্যাঁ, তা পারবে, যদি আগে নিজেকেই তুমি প্রকৃত সাহায্য করো। ভুলে গেলে চলবে না, তুমি জগৎদ্বারা বিধৃত রয়েছো। শুধু তাই নয়, এ জগৎ যে তোমারই আপন সত্তা। তুমি নিজে যেমন এই বিশ্বসৃষ্টি থেকে পৃথক নও, এই বিশ্বও তেমনি তোমাতে রয়েছে ওতপ্রোত।"

অলৌকিক বিভূতির উপর হামফ্রিজের তীব্র আকর্ষণ ছিল। মহর্ষির সান্নিধ্যে থাকিয়া ক্রমে তাঁহার সে আকর্ষণ কমিয়া আসে। হামফ্রিজের জীবনে যে অধ্যাত্মবীজ এ সময়ে রোপিত হয় অচিরে তাহা অঙ্কুরিত হইয়া উঠে। পরম কল্যাণের পথটিই জীবনে তিনি বাছিয়া নেন এবং উচ্চ চাকুরির মোহ ছাড়িয়া স্বদেশে চলিয়া যান। সেখানে এক ক্যাথলিক সন্ন্যাসীদের মঠে যোগদান করেন।

১৯১৬ সালের প্রথম ভাগে জননী আলাগাম্মল অরুণাচলে আসেন।

মাদুরার বাড়ীটি দেনার দায়ে বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। বৃদ্ধা জননী এবার তাই স্থায়ীভাবেই প্রিয় পুত্র রমণের সাথে বাস করিতে আসিলেন। সংসারত্যাগীর আশ্রমে মাতার এই আগমন কিন্তু কোন আলোড়নই তোলে নাই, একটুও ছন্দোপতন ঘটায় নাই। অতি স্বাভাবিকভাবেই জননীকে রমণ সেদিন গ্রহণ করিলেন।

ইহার পূর্ব্বেও জননী একবার তাঁহার নিকট আসিয়াছিলেন। সে সময়ে জ্বরবিকারে তিনি শয্যাশায়ী হইয়া পড়েন। মায়ের সেবায় রমণকে সেদিন বিন্দুমাত্র উদাসীন হইতে দেখা যায় নাই। নিজ হস্তে পরম যত্নে তিনি তাঁহার শুশ্রূষা করেন। শুধু তাহাই নয়, মাতার রোগমুক্তির জন্য অরুণাচল শিবের কাছে সাধারণ মানুষের মত প্রার্থনা জানাইতেও তাঁহাকে দেখা যায়।

মাতাকে আশ্রমে রাখিলে কি হয়, প্রতিটি কথাবার্তা ও আচরণে রমণ তাঁহাকে বুঝাইয়া দিতেন, পুত্রের সহিত ব্যবহারিক জীবনের কোন সম্বন্ধ রাখা আর তাঁহার চলিবে না। মাতৃত্বের দাবী ও অধিকার সম্বন্ধে জননীর বেশী সচেতন হইবার উপায় ছিল না। তাছাড়া, তিনি কোন কারণে কাহারো উপর রুষ্ট হইলে রমণ স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া দিতেন, "জেনে রেখো, সব নারীই আমার জননী—তুমি একাই নও।"

জ্ঞানতপস্বী পুত্রের এই সমদর্শিতার সহিত মা ধীরে ধীরে নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া নেন। আশ্রমের শান্ত, বৈরাগ্যময় পরিবেশ ও সাত্ত্বিকতা ক্রমে তাঁহাকে রূপান্তরিত করিয়া তোলে।

পুত্রের আধ্যাত্মিক স্বরূপের আভাসটি কিন্তু জননী আলাগাম্মল পাইতেন। রমণ যে এক শিবপ্রতিম মহাপুরুষ, এ অনুভূতি তাঁহার মাঝে মাঝে হইত। একদিন রমণের সম্মুখে তিনি শান্ত মনে বসিয়া আছেন। হঠাৎ দেখিলেন, পুত্র তাঁহার সেখানে নাই, তাঁহার আসনটিতে বিরাজমান এক শিবলিঙ্গ। জননী বড় ঘাবড়াইয়া গেলেন। এ অলৌকিক দৃশ্য কিসের ইঙ্গিত জানাইতেছে? পুত্র কি তবে দেহত্যাগ করিবে?

তিনি চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠেন! পরক্ষণেই স্বাভাবিক দৃশ্য

আবার তাঁহার সম্মুখে ফুটিয়া উঠে। তিনি দেখেন, রমণ পূর্ব্ববৎ সশরীরে সম্মুখে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। (রমণ মহর্ষি : এ, ওসৃবর্ণ)

আর একদিনের কথা, ভক্তদল পরিবেষ্টিত হইয়া রমণ গুহার মধ্যে বসিয়া আছেন। জননী সবিস্ময়ে দেখিলেন, এ তো তাঁহার রমণ নয়—এক শুভ্রকান্তি দেবমূর্ত্তি তাঁহার সম্মুখে, আর তাঁহার গলা বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে এক জোড়া বিষধর সর্প।

জননী ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "ও দুটোকে বিদেয় কর, শিগ্‌গীর বিদায় কর্, ওদের দেখে আমার ভয় হচ্ছে।"

এ অলৌকিক দর্শনের মধ্য দিয়া অরুণাচলেশ্বর সেদিন মহাসাধক রমণের দিব্য স্বরূপটিই কি জননীকে জানাইয়া দিলেন ?

রমণ নিজে ছিলেন সর্ব্বত্যাগী। কিন্তু কোনদিনই গৃহ ও গৃহত্যাগীর পার্থক্য তাঁহাকে করিতে দেখা যায় নাই। নিজে আশ্রমবাসী হইয়াও মাতাকে সঙ্গে রাখিতে তিনি একটুও দ্বিধা করেন নাই। আবার সংসারত্যাগেচ্ছু বহু ভক্তকে তিনি ঘরে থাকিয়া সাধনা করিতেই বলিতেন। সন্ন্যাসকামী ভক্তদের বলিতেন, "জেনে রেখো, পোষাক পরিচ্ছদ বর্জ্জন করা বা গৃহত্যাগ করাকে সন্ন্যাস বলে না। প্রকৃত সন্ন্যাস হচ্ছে বাসনা, কামনা ও মোহকে পরিত্যাগ করা। সত্যকার সন্ন্যাস যে গ্রহণ করে, সে সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে লীন হয়ে যায়, একাত্মক হয়ে যায়। তার প্রেম সারা বিশ্বকে আলিঙ্গন করার জন্য প্রসারিত হয়ে ওঠে। কাজেই সন্ন্যাসী সাধকের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য তার গৈরিক পরিচ্ছদ বা গৃহত্যাগে নয়—প্রকৃত বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার সর্ব্বাত্মক প্রেমে।"

মহাজ্ঞানী সাধক আরও বলিতেন, "যদি তুমি এই সর্ব্বপরিপ্লাবী প্রেম অনুভব কর, যদি তোমার হৃদয় এই বিরাট জগৎকে বক্ষে ধারণ করার মত প্রসার লাভ করে, তবে আর এই সংসারাশ্রম ত্যাগ করার ইচ্ছাটি তোমার ভেতর থাকবে না। তুমি তখন জীব-জীবনের বৃন্ত থেকে একটি পাকা ফলের মতই পড়বে খসে। তোমার উপলব্ধিতে তখন এসে পড়বে—এই সারা বিশ্বজগৎই তোমার নিজের ঘর।"

দেবরাজ মুদালিয়র তাঁহার স্মৃতিকথায় রমণের ব্যাখ্যা ও তত্ত্ব সম্পর্কে লিখিয়াছেন, "নিরাসক্তভাবে জীবনের সমস্ত কিছু কাজকর্ম্ম করে যাওয়া এবং আত্মাকে পরম সত্তারূপে জ্ঞান করা—এই দুইটিই একযোগে করা যায়। কারুর মন প্রাণ যদি আত্মসত্তার মধ্যে কেন্দ্রীভূত হয় তবে তার পক্ষে বাহ্য জীবনের কাজকর্ম্ম করে ওঠা শক্ত হবে—এ ধারণা মোটেই সত্য নয়।

"আত্মজ্ঞানের সাধক হচ্ছে একটি অভিনেতার মত। সে সাজগোজ করে, কাজকর্ম্ম করে, নিজের অভিনয়ের অংশটুকুর কথাও ভাবে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার রয়েছে প্রকৃত জ্ঞান। সে জানে, যে চরিত্র তার দ্বারা অভিনীত হচ্ছে সে নিজে তা মোটেই নয়, প্রকৃত জীবনে সে অপর এক ব্যক্তি। সেই রকম, যখন তুমি নিশ্চিতরূপে জানো যে তুমি দেহ নও—তুমি আত্মা, তখন এই দেহাত্মবুদ্ধি অথবা 'আমি এই দেহী' এই চিন্তা তোমাকে চঞ্চল করে তুলবে কেন? দেহ যা কিছু করুক না কেন, তা তোমাকে 'আত্মা'র ধৃতি থেকে বিচ্যুত করবে না। এই ধৃতি তোমার দেহের যে কোন কর্ত্তব্য বা আচরণকে ব্যাহত করবে না—যেমন ঐ অভিনেতা চরিত্রাভিনয় তার ব্যক্তিগত জীবনকে কোনমতেই বিপর্য্যস্ত করে না।"

মহাজ্ঞানী রমণের জীবনে দ্বৈত সত্তার এই পরিণতিটি, অভিনেতার এই অপূর্ব্ব রূপটি আমরা ফুটিয়া উঠিতে দেখি।

জননীর প্রতি কর্ত্তব্য পালনের মধ্যে তাই সেদিন এই মহাপুরুষের বিন্দুমাত্র ত্রুটি ও স্খলন আমরা দেখিতে পাই না। পুত্রের আশ্রমে প্রায় ছয় বৎসর বাস করার পর আলাগাম্মলের শেষের দিনটি ক্রমে সেদিন ঘনাইয়া আসে।

মাতার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের আর বেশী দেরি নাই। এসময়ে তাঁহার সেবায় ও কল্যাণ কামনায় সংসার বিরাগী রমণ মহর্ষি কিন্তু বিন্দুমাত্র ত্রুটি ঘটিতে দেন নাই।

শয্যার চারিদিকে বেদপাঠ ও রামনাম কীর্ত্তন চলিতেছে। মুমূর্ষু

মাতার শিরে ও বক্ষে নিজের হাত দুইটি স্থাপন করিয়া রমণ পাশে বসিয়া আছেন। জননী শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিলে তিনি ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সবাই শোকে অভিভূত। দুশ্চিন্তা ও দৌড়ঝাঁপে ব্যতিব্যস্ত থাকায় আশ্রমবাসীদের কাহারও আহার হয় নাই। মহর্ষি নির্ব্বিকার ভাবে সকলকে ডাকিয়া কহিলেন, "এবার তবে আমরা সবাই আহার্য্য গ্রহণ করতে পারি। তোমরা পাত পেতে ব'সো। জানবে, এ মৃত্যুর ফলে কোন আহার্য্যই অশুচি হয়নি।"

জননীর এই মৃত্যুকে রমণ মহর্ষি মৃত্যু বলিয়া মোটেই মনে করেন নাই। চৈতন্যময় সত্তার মধ্যে জননী আবার প্রবেশ করিতেছেন, এই দৃষ্টিতেই এ মৃত্যুকে তিনি দেখিয়াছেন। সেদিনকার কথায় ও আচরণে এই তত্ত্বেরই ইঙ্গিত তিনি দিয়াছিলেন।

কোন এক ব্যক্তি এ সময়ে আলাগাম্মলের মৃত্যুর কথা উল্লেখ করেন। মহর্ষি তাহাকে সংশোধন করিয়া বলিলেন, "তাঁর তো মৃত্যু হয়নি! তিনি লীন হয়েছেন মাত্র।"

১৯৩০ সালের কথা। মহর্ষিকে ঘিরিয়া ধীরে ধীরে তাঁহার আশ্রমটি গড়িয়া উঠিয়াছে। অদ্বৈত তত্ত্বভাবনার এক মূর্ত্ত বিগ্রহরূপে এই জ্ঞানতপস্বী বিশ্বের দিগ্বিদিকে পরিচিত হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহার চরণোপান্তে তাই এখন প্রায়ই দেখা যায়, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মুমুক্ষু ও শরণার্থীর ভীড়।

এই ভীড়ের মধ্যে বিখ্যাত ইংরেজ সাংবাদিক পল ব্রান্টনকেও একদিন দেখা গেল। আধুনিক সমাজে মহর্ষির জীবন ও দর্শন ব্যাখ্যায় উত্তরকালে ইনি খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

ব্রান্টন তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া আসিয়াছেন। সম্মুখস্থ এক কম্বলাসনে তিনি উপবিষ্ট। বহু ভক্ত ও শিষ্য অর্দ্ধচন্দ্রাকারে রমণ মহর্ষিকে ঘিরিয়া উন্মুখ হইয়া বসিয়া আছেন।

শুভ্র শয্যায় মহর্ষি উপবিষ্ট। চরণদ্বয় একটি ব্যাঘ্রচর্ম্মের উপর স্থাপিত রহিয়াছে। দেহখানি সুগৌর সুঠাম। প্রশস্ত ললাটে অপূর্ব্ব

প্রশান্তি। নয়ন দুইটি নিষ্পলক—অতলস্পর্শী গভীরতা মানুষের মনকে টানিয়া নেয়। সারা কক্ষে নিবিড় নীরবতা বিরাজমান। ধূপাধারের সুগন্ধি ধোঁয়ার কুণ্ডলী ধীরে ধীরে উর্দ্ধে উঠিয়া মিলাইয়া যাইতেছে।

ব্রাণ্টন মনে মনে ঠিক করিয়াছেন, অনেক কিছু প্রশ্ন তিনি করিবেন। কিন্তু তাহা সম্ভব হইয়া উঠিল কই? মহর্ষির নিষ্পন্দ দেহ ও নিষ্পলক দৃষ্টির সম্মুখে বসিয়া তাঁহার সমগ্র চেতনার ধারা যেন বদলাইয়া গেল। নীরবতার মধ্য দিয়া দুই ঘণ্টা কাটিয়া গিয়াছে, একটি বাক্যও মহর্ষি এযাবৎ উচ্চারণ করেন নাই। এ ধ্যান-মৌন পরিবেশে বসিয়া ব্রাণ্টনের মনের সমস্ত কিছু প্রশ্ন ও দ্বিধা দ্বন্দ্ব যেন কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল। এক পরম শান্তি ও আনন্দের রসে তাঁহার হৃদয় আজ কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছে। এমনটি তো জীবনে কখনো তিনি অনুভব করেন নাই!

যেসব প্রশ্ন নিয়া এতকাল এত বিচার-বিশ্লেষণ করিয়াছেন, আজ সে সব মনে হইতেছে অকিঞ্চিৎকর। বুদ্ধির ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া যে সব সমস্যাকে এতকাল দেখিয়া আসিয়াছেন, সগর্ব্বে যুঝিয়াছেন, তাহার কোন গুরুত্বই আজ নাই।

শুধু মহর্ষির সান্নিধ্যে বসিয়া, তাঁহার পবিত্র দৃষ্টিতে স্নাত হইয়া বুদ্ধির অতীত স্তরে, সত্তার গভীরে তিনি ডুবিয়া গেলেন। এ কি অলৌকিক কাণ্ড কোন্ শক্তিবলে মৌনী সাধক তাঁহার মধ্যে আজ এই বিপ্লব ঘটাইয়া তুলিলেন?

ব্রাণ্টন ভাবিতে লাগিলেন, পুষ্প যেমন নিঃশব্দে, স্বাভাবিকভাবে দিকে দিকে তাহার সৌরভ ছড়াইয়া দেয়, মহর্ষিও ঠিক তেমনিভাবে, সবার অলক্ষ্যে অধ্যাত্ম-শান্তির ধারা দিকে দিকে সঞ্চালিত করিয়া দিতেছেন। এই ক্ষুরধার-বুদ্ধি, সদা-অনুসন্ধিৎসু সাংবাদিক সেদিন একটি প্রশ্নও উত্থাপন করিতে সমর্থ হন নাই।

আর একদিনের কথা। ব্রাণ্টন মহর্ষির কক্ষে আসিয়া বসিয়াছেন।

দৃষ্টিটি তাঁহার দিকেই নিবদ্ধ। ধীরে ধীরে তাঁহার চোখ দুইটি বুজিয়া আসিল, তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া ব্রাণ্টন এক বিচিত্র স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, "আমি যেন হঠাৎ এক পাঁচ বৎসরের বালকে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছি, অরুণাচলে উঁচুনীচু প্রস্তরাকীর্ণ পথে মহর্ষি আমার হাতখানি ধরে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। সূচিভেদ্য অন্ধকারের মধ্য দিয়ে তিনি আমায় নিয়ে পর্ব্বত শিখরে উঠতে লাগলেন। ক্রমে চাঁদের আবৃছা আলোয় আমি কিছুটা দেখতে পেলাম। প্রস্তর এবং ঝোপঝাঁড়ের আড়ালে রয়েছে কত প্রাচীন যোগীদের আশ্রম।

ধীরে ধীরে আমরা অরুণাচল শিখরের অতি নিকটে উপনীত হলাম। আমার সমগ্র সত্তায় তখন এক রূপান্তর ঘটে গেছে। আশা আকাঙ্ক্ষা ও স্বার্থবুদ্ধির চিহ্নমাত্রও সেখানে নেই। এক পরম শান্তি পারাবারে নিরন্তর অবগাহন করছি।

"মহর্ষি আমায় বললেন—দেশে ফিরে গিয়ে তুমি এই শান্তিই পেতে পারবে, কিন্তু এর জন্য তোমার মূল্য দিতে হবে, আর সে মূল্য হচ্ছে তোমার দেহবোধ ও বুদ্ধিবৃত্তিকে চিরতরে পরিত্যাগ করা। তা হলেই বহিরঙ্গ জীবনকে বিস্মৃত হয়ে তুমি ধীরে ধীরে প্রকৃতরূপে আত্মাভিমুখী হতে পারবে।" (এ সার্চ ইন সিক্রেট ইণ্ডিয়া—ব্রাণ্টন)

এই রহস্যময় স্বপ্ন সেদিন পল ব্রাণ্টনের সমগ্র চেতনায় এক তীব্র ঝাঁকুনি দিয়া যায়।

ব্রাণ্টন একদিন প্রশ্ন করেন, "ভগবান, আমাদের মত আধুনিক মানুষের জীবনে রয়েছে বড় বেশী কর্ম্মচাঞ্চল্য। এর সাথে আপনার সাধনপন্থা কি খাপ খায়ানো যাবে? মানুষকে কি তার জীবনধারা বদ্‌লে ফেলতে হবে? সে কি কর্ম্ম ত্যাগ করবে?"

মহর্ষি উত্তরে কহেন, "কর্ম্মত্যাগ করার দরকার মোটেই নাই। তুমি ব্যবহারিক কাজকর্ম্ম করেই রোজ দু-এক ঘণ্টা আত্মানুসন্ধান ও উপাসনা করে যাবে। এ পন্থা ঠিকভাবে অনুসরণ করলে তোমার

মনোলোকে যে ভাবধারা সঞ্চারিত হবে, তা ক্রমে সব কিছু কর্ম্ম-ব্যস্ততার ভেতরও প্রবাহিত হতে থাকবে। যারা আধ্যাত্মিক জগতে নূতন প্রবেশ করছে, তাদের জন্য অবশ্যই গোড়ার দিকে উপাসনার জন্য পৃথক একটা সময় নির্দ্ধারিত রাখা প্রয়োজন। কিন্তু সাধনপথে অগ্রসর হতে থাকলে তখন সে কোন কাজ করুক আর না-ই করুক, কেবলই অধিকতর আনন্দ লাভ করবে। তখন তার হস্তদ্বয় যতই কর্ম্মরত থাকুক না কেন, মস্তিস্ক থাকবে বহিরঙ্গ জীবনের বহু উর্দ্ধে—তা থাকবে অনাসক্ত, শান্ত ও অচঞ্চল।

"......আমার পন্থা যোগীদের থেকে পৃথক। রাখাল বালক যেমন তার লাঠি দিয়ে তাড়িয়ে তাড়িয়ে গরুকে গন্তব্যস্থলে নিয়ে যায়, যোগীও সেইরকম তার চিত্তকে লক্ষ্যের দিকে চালিত করে। কিন্তু আমি যে পদ্ধতির কথা বলছি, তা অন্যরূপ। এ যেন একমুঠো তৃণ হাতে নিয়ে গরুকে আহারের জন্য প্রলুব্ধ করা, তারপর ক্রমে তাকে লক্ষ্যস্থলে টেনে নিয়ে যাওয়া।"

ভক্তদের ভাবকল্পনা ও দার্শনিকতার বিলাসকে মহর্ষি মোটেই প্রশ্রয় বা উৎসাহ দিতে চান নাই। তাঁহার নিজস্ব আদর্শ ও সাধন প্রণালীর ব্যাখ্যা যখন যেটুকু তিনি করিতেন, তাহার উদ্দেশ্য থাকিত জিজ্ঞাসুদের প্রয়োজন মেটানো—নিছক তত্ত্বালোচনায় বা উপদেশ বর্ষণে তাঁহার কোনদিন আগ্রহ ছিল না।

সে-বার এক ভক্ত প্রশ্ন করেন—"আচ্ছা ভগবান, মৃত্যুর পর মানুষের কোন্ অবস্থা হয়?"

উত্তর হয়, "জীবন্ত অবস্থায়ই নিজের সত্তার কোন সন্ধান তুমি পাও নি। তবে, মৃত্যু বা পরপারের খোঁজে তোমার কি প্রয়োজন, বল তো?"

কোন কৌতূহলী দর্শনার্থী জানিতে চাহেন, এই পৃথিবী ও মানব সভ্যতার ভবিষ্যৎ কি?

উত্তর হয়, "আগে নিজেকে জানো, জগতের কথা পরে। নিজেকে জানলে জগৎকেও জানা হয়ে যাবে। কারণ, জগৎ আর তুমি এক।"

আত্মবিচারের উপরই রমণ মহর্ষি গুরুত্ব দিতেন বেশী। কহিতেন, "মনের চিন্তা ও সমস্যার সংখ্যা বৃদ্ধি না করে, একটি একটি ক'রে এগুলো বিনষ্ট ক'রে, নির্ম্মূল ক'রে ফেলে।"

আত্মানুসন্ধানের কথায় তিনি বলিয়াছেন, "আনন্দই হচ্ছে মানুষের প্রকৃত স্বভাবধর্ম্ম, আর আত্মার মধ্যেই রয়েছে এই আনন্দের উৎস। অজ্ঞাতসারে, স্বাভাবিক প্রবণতাবশে মানুষ যখন আনন্দ খুঁজে বেড়ায় তখন সে আত্মারই সন্ধান ক'রে ফিরে। আত্মা অখণ্ড ও অবিনাশী। কাজেই, এই আত্মাকে লাভ করলে অফুরন্ত ও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দই মানুষ ভোগ করতে পারে।"

তাঁহার মতে, সর্ব্বপ্রথমে মানুষের মনে 'আমি' চিন্তাটি আবির্ভূত হয়। এই চিন্তা উদ্ভূত হওয়ার পরই অপরাপর চিন্তা আত্মপ্রকাশ ক'রে, নতুবা সেগুলি আসিতেই পারে না। সর্ব্বনামের প্রথম পুরুষ হইতেছে 'আমি'। 'তুমি'র প্রকাশ ইহার পরে, আগে কখনো নয়।

মনের প্রবাহ অনুসরণ করিয়া কেহ যদি 'আমি'র উৎসস্থলে পৌঁছাইতে পারে, সে দেখিবে,—'আমি' চিন্তাটি যেমন সকলের আগে উদ্ভূত হয়, তেমনিই বিলীনও হয় সর্ব্বশেষে।

মহর্ষি বলিতেন,—এই 'আমি' বোধের উৎপত্তিস্থলে আসিয়া গেলেই মানুষ লাভ করে তাহার মহামুক্তি। ইহাই হইতেছে সচ্চিদানন্দময় পরম অবস্থা।

মনের ভিতর দিয়াই হয় জগৎ-বোধের প্রকাশ। তাই রমণ বলেন, —মনের উৎপত্তি স্থানটিতে উপনীত হয়ে সেখানেই যদি মনকে বিনষ্ট করা যায়, তবেই দেখবে, আত্মজ্ঞান উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

কিন্তু মনের সত্যকার বিনাশ সাধন কি করিয়া হইবে? এ কৌশলও তিনি সাধনার্থী ভক্তদের কাছে বর্ণনা করিয়াছেন।—নিরন্তর 'আমি কে?'—এ অনুসন্ধানের মধ্য দিয়াই মনের বিলয় ঘটানো যায়। অবশ্য এ অনুসন্ধানও একটি মানসিক প্রক্রিয়া এবং ইহার চরম পর্য্যায়ে, মনের বিলয়ের সঙ্গে সঙ্গে এ প্রক্রিয়াটিও বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

চিতাগ্নি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যে বংশখণ্ড ব্যবহার করা হয়, এ যেন তাই। সৎকার কার্য্যের শেষে এই যষ্টিও ভস্মীভূত হইয়া যায়।

মহর্ষির মতে, মনের বিনাশ সাধনের সহায়ক হইতেছে বিচার। যে পর্য্যন্ত না এই মনের ক্রিয়া শেষ হইয়া যাইবে, সে পর্য্যন্ত এ বিচার চালাইয়া যাওয়া দরকার। শত্রুদুর্গের ভিতরে সৈন্য আছে। বারবারই তোমাকে আক্রমণ করার জন্য তাহারা বাহির হইয়া আসিবে। প্রতিবারই তাহাদিগকে কিছু কিছু করিয়া বিনাশ করিতে হইবে নতুবা দুর্গ অধিকার করা অসম্ভব।

মহর্ষির প্রচারিত জ্ঞান সাধনার পথে অনাবশ্যক কোন জটিলতা ছিল না। তাঁহার আহ্বানও ছিল সর্ব্বজনীন। যে কোনো ধর্ম্মের, যে কোন সম্প্রদায়ের লোক আচার্য্যজ্ঞানে তাঁহার সান্নিধ্যে আসিতে পারিত, আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ধন্য হইত। স্বপ্রকাশ অধ্যাত্মসূর্য্যের মত তিনি থাকিতেন সদা বিরাজমান, অগণিত মুমুক্ষু মানুষ লাভ করিত তাঁহার করুণাসম্পাত!

অরুণাচলের আশ্রমে তাঁহার পদপ্রান্তে আসিয়া জড় হইত, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শত শত দর্শনার্থী। এই মহাপুরুষকে দর্শন করার পর ঘটিত তাঁহাদের রূপান্তর। মহর্ষির দিব্য দৃষ্টি ও সান্নিধ্যের প্রভাব অনেকের উপর কাজ করিত ইন্দ্রজালের মত।

আত্মজ্ঞানের জ্যোতিতে রমণের জীবন উদ্ভাসিত। সর্ব্বসত্তায় তাই জাগিয়া উঠিয়াছে অখণ্ড চেতনা। জাতি, ধর্ম্ম ও তাত্ত্বিক মতবাদের গণ্ডী সব হইয়া গিয়াছে একাকার।

সমদর্শী মহাপুরুষের কাছে মানুষের ভেদবৈষম্য যেমন নাই, তেমনি জীব জন্তুর পার্থক্যের সীমারেখাও হইয়াছে নিশ্চিহ্ন। আশেপাশের জীব জন্তুর সঙ্গে তিনি বোধ করেন নিবিড় আত্মীয়তা, একাত্মকতা। উহারাও তেমনি তাঁহাকে দেখে এক পরম বান্ধব ও আত্মজনরূপে।

কাঠবিড়ালীরা লাফাইয়া মহর্ষির শয্যায় আসিয়া বসে। হুড়াহুড়ি

করিয়া হাত হইতে বাদাম ছিনাইয়া খায়। ইহাদের জন্য খাবার রাখিতে মহর্ষির কোনদিন ভুল হয় না।

আশ্রমের রান্না শেষ হইলে সর্ব্বাগ্রে কুকুরদের খাইতে দিতে হইবে, ইহাই চিরাচরিত নিয়ম। ডাকিবামাত্র ময়ূরগুলি নাচিয়া নাচিয়া মহর্ষির সম্মুখে আসিয়া জড়ো হয়, ইহাদের জন্যও উপাদেয় আহার্য্য রাখার ব্যবস্থা রহিয়াছে।

আশ্রমের পালিতাকন্যা, গাভী লক্ষ্মী যেন রমণ মহর্ষির আদরের শকুন্তলা। রোজই মাঠে বিচরণের জন্য লক্ষ্মীকে বাহির হইতে হয়, যাত্রার আগে মহর্ষির সভাকক্ষে একবার নিশ্চয় তাহার যাওয়া চাই। মহাপুরুষের আদরের স্পর্শ নিয়া তবে সে রওনা হইবে।

আশ্রমের কুকুর চিন্না কুরুপ্পান ও কমলার সহিত মহর্ষির ব্যবহার যেন গৃহস্থ ঘরেরই পিতা ও পুত্র-কন্যার মত।

বনের বানরের দল তাহাদের সুখে দুঃখে এই মহাপুরুষকেই কেন্দ্র করিয়া আশ্রমে আশা যাওয়া করে। এইসব জীবজন্তুদের ভাষা মহর্ষি জানেন না, কিন্তু ইহাদের প্রতিটি আচরণ ও আশা আকাঙ্ক্ষার সহিত তাঁহার নিবিড় পরিচয় আছে। ইহাদের বিবাহ, সন্তান প্রসব ও মৃত্যুর সময়ে মানুষের করণীয় সবকিছু সংস্কার-অনুষ্ঠান তিনি সম্পন্ন করান, নহিলে তাঁহার স্বস্তি থাকে না।

মহর্ষির কাছে তাঁহার আশ্রমটি ছিল এক রঙ্গমঞ্চ বিশেষ। কাজ-কর্ম্মের ভীড়ে, অতিথি ও দর্শনার্থীদের মধ্যে তিনি বিরাজ করিতেন নিতান্তই এক অভিনেতারূপে। এই ভূমিকায় দাঁড়াইয়া তাঁহাকে কত কৌতুক করিতেও দেখা যাইত।

সেদিন তিনি নিজের কক্ষে বসিয়া আছেন। অঙ্গনে দাঁড়াইয়া এক ভিখারী দুটি অন্নের জন্য মিনতি জানাইতেছে। জীর্ণ, মলিন বসন পরিহিত লোকটিকে কেহ আমল দিতেছে না, বিশিষ্ট অতিথি ও সাধু সন্ন্যাসীদের নিয়াই সকলে ব্যস্ত।

করার পর আজ আমায় বাইরে—দূরে যেতে হচ্ছে। কিন্তু সেখানে গিয়ে আমি কি করে থাকবো ?"

রমণ তৎক্ষণাৎ সকলকে কাছে ডাকিয়া কহিলেন, "তোমরা সবাই শোন আইয়ারের অদ্ভুত কথা ! চল্লিশ বৎসর ধরে এখানকার উপদেশ সে পেয়ে আসছে। অথচ আজ্‌কে বল্‌ছে, ভগবানের কাছ থেকে নাকি দূরে চলে যাচ্ছে ?"

এই শ্লেষের মধ্য দিয়া যে তত্ত্বটি সেদিন তিনি বুঝাইতে চাহিলেন তাহা তাঁহার স্বরূপ, তাঁহার সাধনার মর্ম্ম উদ্‌ঘাটন করে। নিত্যবস্তুরূপে, সদ্‌গুরু সত্ত্বারূপে তিনি যে সর্ব্বত্র আছেন বিরাজমান ! তাছাড়া, আত্ম-উপলব্ধির সাধনা যে শিষ্যেরা এতকাল পাইয়া আসিয়াছে, তাঁহারা মহর্ষির দেহের সান্নিধ্য না পাইলে এমন চঞ্চল হইবেন কেন ?

১৯৫০ সালে রমণ মহর্ষির দেহে উদ্‌গত হয় এক বিষাক্ত টিউমার। চিকিৎসা, অস্ত্রোপচার ইত্যাদি যাহা কিছু দরকার, সবই হইয়া গিয়াছে, আর ইহাকে ঠেকানো যাইতেছে না। শিষ্যেরা বুঝিলেন, এই ব্যাধিকে উপলক্ষ করিয়াই মহর্ষি মরদেহ ত্যাগ করিতে চান।

অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটিতেছে। ভক্তেরা গুরুর নিরাময়ের জন্য নিষ্ঠাভরে আশ্রমে শুরু করিয়াছেন নামকীর্ত্তন ও শাস্ত্রপাঠ।

জনৈক ভক্ত রমণকে একান্তে পাইয়া প্রশ্ন করিলেন, "এসব কি সত্যই কার্য্যকরী হবে ? মহর্ষি কি এর ফলে সেরে উঠবেন ?"

স্মিতহাস্যে মহাপুরুষ উত্তর দিলেন, "ত্যাখো, ভাল কাজে রত থাকা সব সময়েই ভাল। ওরা এসব করছে, করুক্ না, ক্ষতি কি ?"

রোগপাণ্ডুর রোগীর মুখের হাসিটি কিন্তু তেমনই রহিয়া গিয়াছে। তীব্র জ্বালা যন্ত্রণার মধ্যেও ভাবপ্রবণ ভক্তদের লক্ষ্য করিয়া তিনি রসিকতা করিতে ছাড়িতেছেন না।

গুরুর প্রাণঘাতী ক্ষত দর্শনে সেদিন এক মহিলা-ভক্ত শোকে অধীর হইয়া উঠেন। কক্ষের বাহিরে দাঁড়াইয়া এক স্তম্ভের উপর সজোরে তিনি মাথা ঠুকিতে থাকেন।

সে দিকে দৃষ্টি পড়িতেই মহর্ষির চোখ তুইটি কৌতুকোজ্জ্বল হইয়া উঠে। রহস্যভরে বলিয়া বসেন, "তাই বল, আমি, এতক্ষণ ভাবছিলাম, ও বুঝি ঠুকে ঠুকে ওখানে নারকেল ভাঙছে!"

অবস্থা আরো খারাপের দিকে যায়। ভক্তেরা শুধু কাতর দীর্ঘশ্বাস ফেলেন, আর মহর্ষির দিকে অসহায়ভাবে তাকাইয়া থাকেন।

সকলকে প্রবোধ দিবার উদ্দেশ্যে মহর্ষি সেদিন কহিলেন, "ছাখো, এই দেহটি হচ্ছে যেন এক কদলীপত্র। এর ওপর অনেক কিছু মুখ-রোচক খাবার সাজিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ভোজন শেষ হয়ে গেলে আমরা কি কখনো এই পাতাটিকে সঞ্চয় করে রেখে দিই? কাজ ফুরিয়ে গেছে বলে একে কি পরিত্যাগ করিনে? কাজেই এ দেহের জন্য তুঃখ কি, বল তো?"

সারা আশ্রমে ঘনাইয়া আসে বিষাদের কালো ছায়া। ভক্তদের অন্তস্তল হইতে উঠে মর্ম্মভেদী আর্ত্তি। মহর্ষির অদর্শন কি করিয়া সহ্য করিবেন? কে আর তাঁহাদের দিবে এমন আশ্রয়?

মহর্ষি একদিন সান্ত্বনার সুরে কহিলেন, "তোমরা কিন্তু এ দেহটার ওপর বড় বেশী গুরুত্ব দিচ্ছ। সকলে বল্‌ছে, আমি নাকি মরতে যাচ্ছি। কিন্তু আমি তো সত্যিই যাচ্ছিনে? কোথায় আবার যাবো, বল তো? আমি যে চিরদিনই এইখানে।"

মহাপ্রয়াণের আগের দিন। ব্যথা কমানোর জন্য ডাক্তার এক নূতন ঔষধ দিতে যাইতেছেন। মহর্ষি সংক্ষেপে শুধু কহিলেন, "ব্যাস্, আর কোন কিছুর প্রয়োজন এ দেহের নেই। চিন্তা নেই, তুদিনের ভেতর সব ঠিক হয়ে যাবে।"

অন্তরঙ্গ ভক্তগণ চমকিয়া উঠিলেন। তাঁহাদের বুঝিতে বাকী নাই যে, বিদায়ের ক্ষণটি আসন্ন।

১৯৫০ সালে ১৪ই এপ্রিল। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ভক্তদল মহর্ষির শয্যার পাশে দাঁড়াইয়া আছেন। গভীর স্নেহে, সকলের দিকে দৃষ্টিপাত

করিয়া মহর্ষি আজ যেন তাঁহাদের দীর্ঘ সাহচর্য্য ও সেবার স্বীকৃতি দিলেন। তারপর ধীর কণ্ঠে কহিলেন, "ইংরেজদের ভাষায় একটা কথা রয়েছে, থ্যাঙ্কস্। আমরা বলি, সন্তোষম্।"

ধীরে ধীরে অরুণাচলের আকাশে নামিয়া আসে রাত্রির ঘন অন্ধকার। উদ্‌গত শোকাশ্রু গোপন করিয়া একদল ভক্ত বারান্দায় গিয়া বসেন, গাহিতে থাকেন স্তবগান—'অরুণাচল-শিব'।

রাত্রি তখন প্রায় পৌনে নয়টা। ক্ষণতরে মহর্ষির অতলস্পর্শী নয়ন দুইটি ঝলকিয়া উঠে। তারপরই নামিয়া আসে তাঁহার জীবন-লীলানাট্যের উপর চিরবিরতির যবনিকা।

প্রাণবায়ু উৎক্রমণের মুহূর্ত্তে দৃষ্টিগোচর হয় এক অলৌকিক দৃশ্য! চকিত উদ্ভাসনের মধ্য দিয়া একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র আশ্রমের উপরিভাগ হইতে ছুটিয়া বাহির হয়। তারপর উর্দ্ধে উঠিয়া মিলাইয়া যায় নিঃসীম আকাশের দিগন্তে। এক বিশিষ্ট ফরাসী প্রেস-ফটোগ্রাফার রমণ মহর্ষির অন্তিম সময়ের ছবি তোলার জন্য ব্যাকুলভাবে বারান্দায় পাদচারণা করিতেছিলেন। ধাবমান নক্ষত্রের এই অদ্ভুত আলোক বিচ্ছুরণ দেখিয়া তিনি চমকিয়া উঠিলেন! অনুসন্ধানে জানা গেল, আশ্রমস্থ আরো অনেকেই এ অলৌকিক দৃশ্যটি দর্শন করিয়াছেন। সুদূর মাদ্রাজেও ঠিক একই সময়ে এ আলোর ঝলক অনেকের চোখে পড়িয়াছে।

দীর্ঘ বৎসর আগে অরুণাচলের হাতছানি বালক রমণকে ঘরের বাহিরে টানিয়া আনে, স্থান দেয় আপন ক্রোড়ে। সাধনা ও সিদ্ধির শেষে সেই অরুণাচলেরই পরমসত্তায় কি রমণ আজ লীন হইলেন।

'তেজোলিঙ্গম' অরুণাচলের চিরন্তন মাহাত্ম্য রমণ মহর্ষি গাহিয়া গিয়াছেন তাঁহার অনুপম 'অরুণাচল অষ্টকম'-এ—

"সাগরের বারি সূর্য্যকর ও বায়ুতে হয় উত্তোলিত; নেমে আসে মেঘ আর বর্ষণের ভেতর দিয়ে পাহাড় চূড়ায় আর উপত্যকার কোলে। আবার মিশে যায় সে তার উৎসে—সেই সাগরেরই বুকে। সেখানেই ঘটে তার চরম বিরতি।

— বলাকার সারি আকাশে ডানা মেলে চলে যায় দূর দিগ্‌দিগন্তে, আবার তারা ফিরে আসে তাদের বিশ্রাম-নিলয়ে।

—যে সূক্ষ্ম আত্মা একদিন সৃষ্টির আদিকালে আবির্ভূত হয়েছিল তোমা থেকে, হে পবিত্র শৈল, আবার ফিরতে হবে তাকে তোমারই সেই মহাসত্তায়। হে পরম আনন্দ স্বরূপ! তোমাতেই সে নেবে তার শরণ, চিরবিশ্রাম—ডুবে যাবে তোমার গভীরে, গলে মিশে যাবে তোমার অমৃতধারায়—তোমার সঙ্গে হয়ে উঠবে সে অদ্বৈতস্বরূপ।*

সেই অদ্বৈতস্বরূপেই মহর্ষি সেদিন বিলীন হইয়া গেলেন!

*সৎদর্শন ভাষ্য—(রমণ-গীতাবলী), রমণাশ্রম।

শ্রীঅরবিন্দ

মুক্তির পরম মন্ত্র যুগে যুগে ভারতের মহাপুরুষদের কণ্ঠে উদ্‌গীত হইয়াছে। জীবন-যজ্ঞে আত্মাহুতি দিয়া মানুষের জন্য তাঁহারা রাখিয়া গিয়াছেন অমৃতের সঞ্চয়। এই সর্ব্বত্যাগী তাপসদেরই এক উত্তরসাধক শ্রীঅরবিন্দ।

এই মহাপুরুষের জীবনের স্তরে স্তরে বিধাতাপুরুষ অকৃপণ করে তাঁহার ঐশ্বর্য্য ঢালিয়া দেন, জীবনের-শতদলটি ভরিয়া উঠে রঙে, রসে, সৌগন্ধে ও দিব্য লাবণ্যে। লোকোত্তর মেধা, মনীষা ও কবিত্বের সঙ্গে অরবিন্দের জীবনে দেখা দেয় অসামান্য দার্শনিক প্রতিভা ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের শক্তি। তারপর এই জীবন পরিধি অচিরে হইয়া উঠে আরো বিস্তৃত, আরো গভীর। বহিরঙ্গ জীবনের মুক্তিসংগ্রাম একদিন অধ্যাত্মমুক্তির দিব্য চেতনায় ভাস্বর হইয়া উঠে।

সর্ব্বত্যাগী মহাসাধক এবার তাঁহার জ্যোতির্ম্ময় জীবনের প্রাঙ্গণ তলে আসিয়া দাঁড়ান। ঈশ্বরের দেওয়া সমস্ত কিছু সমৃদ্ধিকে জ্বালাইয়া দেন সমিধরূপে। জীবনযজ্ঞ তাঁহার সার্থক হইয়া উঠে। শুধু দিব্য জীবনের অমৃতবার্ত্তাটি ঘোষণা করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন না, যে পরম উপলব্ধি তাঁহার সাধনসত্তায় উপজিত হয়, মানব কল্যাণে তাহাই অবলীলায় বিলাইয়া যান।

বঙ্কিম ও বিবেকানন্দই দেশমাতৃকার মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে দেবীত্বের আরোপ করেন, ইহা সত্য। কিন্তু এই তত্ত্বকে জনচৈতন্যে তুলিয়া ধরেন অরবিন্দ। অরবিন্দের ধ্যানকল্পনা, তাঁহার সাধনা সেদিন স্পষ্টরূপে জানাইয়া দেয়—জগন্মাতা আর দেশমাতার ভেদ নাই। আর তাঁহার এই মাতৃপূজায় চরম ত্যাগ ও আত্মদানের আহ্বানও তিনি

জানান। তাঁহার প্রতিভা ও সত্য দৃষ্টি এ আদর্শকে করিয়া তোলে ব্যাপকতর। রাজনৈতিক আন্দোলনের অপরিসর, ধূলিধূসর ক্ষেত্রে অধ্যাত্মশক্তিকে তিনি উৎসারিত করিয়া দেন। রাজনীতিতে আধ্যাত্মিক আদর্শের প্রয়োগের দিক দিয়া অরবিন্দ অবতীর্ণ হন এক পথিকৃৎরূপে।

তিনি বিশ্বাস করিতেন, ভারতের অধ্যাত্ম-জাগরণের মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে জগতের কল্যাণ। আর এ জাগরণ, রাজনৈতিক মুক্তি ছাড়া কখনো সম্ভব নয়। তাই জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের ব্রত সম্বন্ধে এমনতর নিষ্ঠা তাঁহার ছিল। শিক্ষাব্রত ত্যাগ করিয়া সেইজন্যই তিনি একদিন রাজনীতির পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়ান। কিন্তু দৃষ্টি তাঁহার কোনদিনই চরম লক্ষ্য হইতে সরিয়া যায় নাই। মুক্তিসংগ্রামের মহত্তর অধ্যায়টি উন্মোচিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতি হইতে নিজেকে তিনি সরাইয়া নেন, আত্মিক শক্তি আহরণের জন্য করেন সর্ব্বস্ব পণ।

ভারতের মুক্তিসংগ্রাম অরবিন্দের দৃষ্টিতে ছিল এক ধর্ম্মযুদ্ধ, ইহার সম্ভাবনাও ছিল তাঁহার দৃষ্টিতে অপরিসীম। তাই পুরুষোত্তম বাসুদেবকে জাতির পুরোভাগে তিনি স্থাপন করেন পরম পুরুষরূপে। রাজনীতির ক্ষেত্রে অধ্যাত্ম-চেতনার তরঙ্গ বহাইয়া দেন।

উত্তরজীবনে তাঁহার নিজের অধ্যাত্ম-সংগ্রামের পুরোভাগেও এই বাসুদেবকেই আমরা দণ্ডায়মান দেখি। আলিপুরের কারাকক্ষে একদিন যে অলৌকিক চেতনার উন্মেষ হয়, পরবর্ত্তীকালে ঘটিতে দেখা যায় তাহারই এক মহত্তর ও জ্যোতির্ম্ময় প্রকাশ। দিব্য জীবনের বার্ত্তা তাঁহার মহাজীবনে ধ্বনিত হয়।

অরবিন্দের-জীবন শতদল থরে থরে তাহার দল মেলিয়া দেয়—অমৃতলোকে ঘটে তাঁহার মহাউত্তরণ।

আধুনিক ভারতের ধর্ম্মজীবনে বাংলার হুগলি জেলার অবদান প্রায় অতুলনীয়। রামমোহন, রামকৃষ্ণ ও অরবিন্দ—ভারতের এই

তিনটি বিশিষ্ট ধর্ম্মনেতাকে হুগলী এক শতাব্দীর মধ্যে উপহার দিয়াছে। কোন্নগর এই জেলারই এক ক্ষুদ্র জনপদ। এখানকার প্রসিদ্ধ কায়স্থ বংশে, ডাক্তার কৃষ্ণধন ঘোষের গৃহে অরবিন্দ আবির্ভূত হন।

মনীষী ও মহাপ্রাণ সমাজনেতা রাজনারায়ণ বসুর কন্যা স্বর্ণলতাকে ডাঃ ঘোষ বিবাহ করেন। আর এই ঘোষ দম্পতিরই তৃতীয় সন্তান রূপে, ১৮৭২ সালের ১৫ই আগষ্ট অরবিন্দ ভূমিষ্ঠ হন।

মাতৃ ও পিতৃকুলের যে দুইটি বেগবতী সাংস্কৃতিক ধারা অরবিন্দের মধ্যে আসিয়া মিলিত হয় তাহার গুরুত্ব অস্বীকার করার উপায় নাই। একদিকে তাঁহার দেখি—ভারতীয় সাধনা ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক রাজনারায়ণের প্রভাব, অপরদিকে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও জীবনধারার উগ্র সমর্থক ডাঃ কৃষ্ণধনের ব্যক্তিত্ব ও গতিবেগ।

এবারডীন বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. ডি. উপাধি নিয়া ডাঃ কৃষ্ণধন যে দিন দেশে ফিরিয়া আসেন, কোন্নগরের রক্ষণশীল সমাজে সেদিন এক মহা আলোড়ন পড়িয়া যায়। প্রায়শ্চিত্ত না করিলে তো তাঁহাকে সমাজে স্থান দেওয়া হইবে না! কৃষ্ণধনের তেমনি দৃঢ় পণ, কিছুতেই তিনি মাথা নোয়াইবেন না। অবশেষে ক্রোধভরে পৈতৃক ভদ্রাসন এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের কাছে নামমাত্র মূল্যে তিনি বিক্রয় করিয়া দিলেন। কোন্নগরের বাস চিরতরে উঠিয়া গেল।

উৎকট সাহেবীয়ানা ছিল কৃষ্ণধনের, আবার তেমনি ছিল একগুঁয়ে স্বভাব। অথচ ইহারই আড়ালে সংগোপিত ছিল এক মহানুভব, দরিদ্র বান্ধব ব্যক্তির স্পর্শসচেতন মন।

ডাঃ ঘোষ তখন উত্তরবঙ্গে সরকারী কাজে রত। ম্যালেরিয়ার জন্য তাঁহার অঞ্চলটি কুখ্যাত। একটি হাজামজা খালের সংস্কার করা অবিলম্বে দরকার, জলনিকাশের ব্যবস্থা না হইলে লোকের দুর্ভোগ বাড়িবে। সরকারী বিলি ব্যবস্থার উপর নির্ভর করিয়া কোন লাভ নাই, উহা বড় মন্থর গতিতে চলে। অথচ এদিকে রোগের আক্রমণে বহু লোকের মৃত্যু ঘটিতেছে। এ দুর্দ্দশা দেখিয়া ডাক্তার ঘোষের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল,

ঐ খাল সংস্কারের জন্য বহু সহস্র টাকা তিনি দান করিয়া ফেলিলেন। এজন্য তাঁহাকে ঋণভার ও অর্থকষ্ট কম সহ্য করিতে হয় নাই।

মানব কল্যাণের জন্য নিঃস্ব হওয়ার এই শক্তি কৃষ্ণধনের পুত্র অরবিন্দের জীবনে তীব্রভাবে সঞ্চারিত হইয়াছিল।

কৃষ্ণধন ইংরেজী শিক্ষাদীক্ষায় বিশ্বাসী। অরবিন্দকে তাই পাঁচ বৎসর বয়সেই দার্জ্জিলিং-এর ইংরেজ-স্কুলে তিনি পড়িতে দেন। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও জীবনধারার প্রতি পিতার উৎকট মোহ এইখানেই ক্ষান্ত হয় নাই, ১৮৭৯ সালে অপর দুই ভ্রাতার সহিত অরবিন্দকে ইংলণ্ডে পাঠানো হয়। স্থির হয়, সেখানে থাকিয়াই এবার হইতে তিনি পড়াশুনা করিবেন। এ-সময়ে তাঁহার বয়স মাত্র সাত বৎসর।

অসাধারণ মেধা ও প্রতিভা এই বালকের। বাল্যকালেই ইংরেজী ও ফরাসী ভাষায় তিনি ব্যুৎপন্ন হন। পরবর্ত্তীকালে ইটালীয় ও জার্ম্মান ভাষাতেও তাঁহার দক্ষতা জন্মে। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় বৃত্তি লাভ করার পর অরবিন্দ কিংস্ কলেজে অধ্যয়ন করিতে থাকেন। ঐ বৎসরই, আঠার বৎসর বয়সে তিনি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। মেধাবী তরুণ এই পরীক্ষায় গ্রীক ও লাটিনে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

কিন্তু সিভিল সার্ভিসের কাঠামোর মধ্যে এ মহাজীবনকে বন্দী করিয়া রাখিবে কে? দুই বৎসর বেশ দক্ষতার সহিত তিনি শিক্ষানবিশী করিলেন। তারপর দেখা গেল, অশ্বারোহণ পরীক্ষার দিন তিনি উপস্থিত নাই। অরবিন্দের ভগিনী সরোজিনী দেবী বলিয়াছেন, এ সময়ে তিনি পরমোৎসাহে তাস খেলিতেছিলেন।

সিভিল সার্ভিসের কর্ম্মবন্ধন অরবিন্দ সেদিন যেন ইচ্ছা করিয়াই এড়াইয়া যান। ভবিষ্যতের মহামানব ও লোকগুরুর জীবনধারা মুক্ত ও প্রশস্ততর ক্ষেত্রে আসিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচে।

যে জীবনে একাগ্রতা ও দুঃসাহসের অবধি নাই, এই ঘোড়ায় চড়ার

মৃণালিনী দেবীর আবির্ভাব তাই কোন পরিবর্ত্তন আনিতে পারে নাই। মহীয়সী পত্নীও স্বামীর দেশসেবা ও মুক্তিসাধনার ধারাকে নিজস্ব খাতে বহিয়া যাইতে দেন। অরবিন্দের ব্রত উদ্‌যাপনে মৃণালিনী একদিনের তরেও অন্তরায় ঘটান নাই। আত্মবিলুপ্তির এক অপূর্ব্ব নিদর্শনই তাঁহার জীবনে তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন।

অরবিন্দ মানসের এক সুস্পষ্ট বিবর্ত্তন আমরা দেখি বরোদা জীবনের শেষ পর্যায়ে। দেশমাতৃকার ধ্যানরূপ তখন তাঁহার অন্তর্লোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। রাজনৈতিক মুক্তির বহু ঊর্দ্ধে, ভারতীয় আত্মিক সাধনার বেদীতে উহাকে তিনি স্থাপিত করিতে চান। রাজনীতির এ অধ্যাত্মরূপান্তরকে অরবিন্দ তখন মন-প্রাণ দিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক স্বাধীনতার আদর্শ ও তাঁহার পরিকল্পিক জাতীয় মুক্তির পার্থক্য এবার ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতেছে।

মনীষী, শিক্ষাব্রতী অরবিন্দের জীবনমঞ্চে এবার আসিয়া দাঁড়ান মুক্তিসংগ্রামের নেতা ও রাজনৈতিক চিন্তানায়ক অরবিন্দ। আড়ালে বসিয়া জীবন দেবতা বোধহয় হাসিয়া বলেন—ইহবাহ্য। বিবর্ত্তনের ধারা আরো আগাইয়া চলে। সর্ব্বশেষে দেশনেতা অরবিন্দের জীবনে পুষ্পিত ও ফলিত হইয়া উঠেন—মহাসাধক অরবিন্দ।

অরবিন্দের এ সময়ে দৃঢ় প্রত্যয় আসিয়া গিয়াছে—অধ্যাত্ম ভারতের জাগরণের আর দেরী নাই। এ মহতী জাগরণের প্রস্তুতিও তাঁহার চোখে সেদিন ধরা দিয়াছে।

ইতিমধ্যে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের অভ্যুদয় ঘটিয়াছে। এ অভ্যুদয়ের দূর বিস্তারী প্রভাব মনীষী ও সাধক অরবিন্দের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে। তাই ঠাকুর সম্পর্কে তিনি লিখেন—

"আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত, পাশ্চাত্য মতবাদে আস্থাবান কোন ব্যক্তি হয়তো বলিয়া বসিবেন, 'এই লোকটি জ্ঞানহীন। কি সে জানে? আমি আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত, আমাকে সে কি-ই বা শেখাবে?' কিন্তু



শ্রীঅরবিন্দ

শুধু ঈশ্বর জানেন যে, তিনি কি আজ ঘটাইয়া তুলিতেছেন। তিনিই এই ব্যক্তিকে বাঙ্গলা দেশে প্রেরণ করিয়াছেন, ইঁহাকে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরতলে বসাইয়া দিয়াছেন, আর আজ ভারতের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব পশ্চিম হইতে শিক্ষিত জনগণ—যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব, পাশ্চাত্যের সমস্ত শিক্ষা যাঁহাদের অধিগত—তাঁহারা এই তাপসের পদপ্রান্তে আসিয়া নিপতিত হইতেছেন। আমি তাই বিশ্বাস করি, মুক্তির কাজ সত্যই আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।"

১৯০৩ সালে অরবিন্দ তাঁহার ভবানী মন্দিরের পরিকল্পনা রচনা করেন। পুস্তিকাকারে এসময়ে ইহা প্রকাশিতও হয়। স্থির হয় যে, দেশের দিকে দিকে মায়ের মন্দির স্থাপিত হইবে, আর এগুলির সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিবে তরুণ কর্ম্মযোগীদের আশ্রম। এই আশ্রমের কর্ম্মীরা চারিদিকের জনসাধারণের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিবে এবং গঠনমূলক কাজে ব্রতী হইবে। এই সঙ্গে চলিবে তাহাদের সামরিক সংগঠন ও আধ্যাত্মিক উন্নয়ন সাধনকারী যোগাভ্যাস।

স্বাধীনতা সমরের তরুণ যোদ্ধা ও মা-ভবানীর সেবকদের প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থায় অরবিন্দ ব্রতী হইয়া পড়েন। প্রথমটায় নর্ম্মদা তীরে গঙ্গোনাথ আশ্রমে, তারপর কলিকাতার মুরারিপুকুরের বাগানে এই শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করা হয়।

সে সময়ে গঙ্গোনাথ আশ্রমের গুরু ছিলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ। এক উচ্চকোটি যোগী বলিয়া এই মহাত্মার খ্যাতি ছিল। ইঁহাকে অরবিন্দ মনেপ্রাণে শ্রদ্ধা করিতেন এবং যোগীর কৃপাদৃষ্টিও তাঁহার উপর পতিত হইয়াছিল।

প্রাণের ব্যাকুলতা নিয়া অরবিন্দ সে-বার ব্রহ্মানন্দজীকে দর্শন করিতে গিয়াছেন। শিবকল্প মহাপুরুষের কাছে দিগ্বিদিক হইতে ভক্ত ও দর্শনার্থীরা সমবেত হইতেছে। তিনি কিন্তু প্রায় সময়েই থাকেন ধ্যানাবিষ্ট! সহসা কাহারো দিকে তাঁহাকে বড় একটা দৃষ্টিপাত করিতে

দেখা যায় না। অরবিন্দ যাওয়ার পরই কিন্তু এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। যোগীবরকে প্রণাম করিয়া উঠামাত্র তিনি চক্ষু উন্মীলন করেন। তাঁহার কৃপাধন্য হইয়া অরবিন্দ সানন্দে বরোদায় ফিরিয়া আসেন।

স্বামী ব্রহ্মানন্দের দেহত্যাগের পর তাঁহার শিষ্য কেশবানন্দজীর সহিতও অরবিন্দের ঘনিষ্ঠতা হয়, এক প্রীতির সম্পর্ক গড়িয়া উঠে। এই সম্পর্ক দীর্ঘদিন বর্ত্তমান ছিল।

বরোদায় থাকার সময়ে দেশপাণ্ডে ছিলেন অরবিন্দের এক ঘনিষ্ঠ সুহৃদ ও সহকর্ম্মী। এই দেশপাণ্ডে ও স্বামী কেশবানন্দের সহযোগিতায় তাঁহার ভবানী মন্দির পরিকল্পনার কাজ অগ্রসর হইতে থাকে। একদল কিশোর ছাত্রকে এই সময় গঙ্গোনাথ আশ্রমে রাখিয়া গড়িয়া পিটিয়া তোলার চেষ্টা করা হয়।

পুণ্যতোয়া নর্ম্মদার অপর পারে রাজপিপ্‌লা রাজ্যের ছারোডী শহর। এখানকার এক আশ্রমে প্রসিদ্ধ যোগী সাখরিয়া বাবার বাস। সিদ্ধ সাধক হিসাবে সে অঞ্চলে তাঁহার তখন খুব প্রসিদ্ধি। যোগীবর সিপাহী যুদ্ধের এক প্রাক্তন যোদ্ধা ছিলেন বলিয়াও অনেকে বলিত। সাখরিয়া বাবা অরবিন্দকে বরাবরই ভালবাসিতেন। দেশোদ্ধারের পরিকল্পনায় এ মহাপুরুষের আশিস্‌ও অরবিন্দ প্রাপ্ত হন। ভবানী মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইলে সাখরিয়া বাবা সেখানে বাস করিবেন—এ প্রতিশ্রুতিও অরবিন্দ তাঁহার নিকট হইতে আদায় করেন। দুর্ভাগ্যের বিষয়, কয়েক বৎসরের মধ্যেই ছারোডীর এই মহাত্মার লোকান্তর ঘটে।

বরোদার শিক্ষাব্রতী জীবনের শেষ কয়েক বৎসর অরবিন্দকে প্রায়ই ছুটি নিতে দেখা যায়। ভবানী মন্দিরের কাজকর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে নিজের আধ্যাত্মিক সাধনায়ও এ সময়ে তিনি আগাইয়া চলিয়াছেন।

মন যত অন্তর্ম্মুখীন হইতে থাকে, সাধন পথের গূঢ় নির্দ্দেশ পাইবার জন্য অরবিন্দ ততই ব্যাকুল হইয়া পড়েন।

এইবার মহারাষ্ট্রীয় যোগী বিষ্ণুভাস্কর লেলের প্রভাব পড়ে অরবিন্দের

সাধন জীবনে। গোড়ার দিকে যোগসাধনার বিভিন্ন ক্রম সম্বন্ধে তিনি লেলের নিকট মূল্যবান নির্দ্দেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

চিত্তের সহজাত একাগ্রতা নিয়া অরবিন্দ জন্মিয়াছেন। এই একাগ্রতার বলে অতি সহজে ধ্যানের গভীরে তিনি ডুবিয়া যাইতেন, বাহ্য জগতের চেতনাও প্রায়ই বিলুপ্ত হইয়া যাইত।

এবার অরবিন্দের জীবনে ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠে তাঁহার লোকগুরু মূর্ত্তি। বরোদা-জীবনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও রাজনৈতিক সহকর্ম্মী, দেশপাণ্ডে ও মাধবরাও যাদবকে তিনি 'ওঙ্কার জপ' শিক্ষা দেন! একাগ্রভাবে তাঁহাদিগকে এই জপ অভ্যাস করিতে দেখা যাইত।

শ্রীযুক্ত চারু দত্ত অরবিন্দের এক অনুরাগী বন্ধু ও ভক্ত। অরবিন্দের সাধন জীবনে এ সময়ে যে অলৌকিক শক্তি সঞ্চারিত হইতেছে, তাহার কিছুটা দত্ত মহাশয়ের জানা ছিল। তাই একদিন তিনি কিছু সাধননির্দ্দেশ চাহিয়া বসিলেন।

শ্রীযুক্ত দত্ত লিখিয়াছেন, "একদিন কথায় কথায় তাঁকে (অরবিন্দ) বললাম, একটা ভাল জিনিস কিছু দাও না ভাই, যার উপর একাগ্র হবার চেষ্টা করতে পারি। এবার আর 'নট ইয়েট' বলে কথাটা উড়িয়ে দিলেন না। তবে আশ্বাসও দিলেন না। দুই একদিনে বরোদায় ফিরে গেলেন। এদিকে আমি একদিন খেয়ালবশে সন্ধ্যাবেলায় চোখ বুজে আরাম-চেয়ারে আড় হয়ে বসতেই একটু তন্দ্রার মত এল—অকস্মাৎ আমার নজর চলে গেল বুকের ভিতরে হৃদ্‌পিণ্ডের মধ্যে। পরিষ্কার দেখতে পেলাম যে, সেখানে এক অপূর্ব্ব সুন্দর মূর্ত্তি, জ্যোতির্ম্ময় পদ্মাসনে ধ্যানস্থ। মুখখানি কোন চেনা লোকের নয় কিন্তু অতি মধুর। সেই থেকে আজ পর্য্যন্ত কতবার, যখনই চেয়েছি তখনই সেই মূরতি দেখেছি। ইদানীং অনেকবার দেখেছি যে, তাঁর মুখ যেন শ্রীঅরবিন্দের মুখের মাঝে মিলিয়ে গেল।"

এ তথ্যটি হইতে বুঝা যায়, শুদ্ধসত্ত্ব ও ভক্তিমান লোকের আধারে

এই ধরণের অধ্যাত্ম-অনুভূতি জাগাইয়া তোলার ক্ষমতা ইতিমধ্যেই অরবিন্দ লাভ করিয়াছেন।

অনুগামী সাধকদের অনেক কিছু আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতাই সেদিনের নূতন যোগী অরবিন্দের চক্ষু এড়াইত না, ইহাও আমরা দেখিতে পাই। ১৯০৬ সালে এই চারুবাবুকেই তিনি বরোদা হইতে লিখিতেছেন, "আচ্ছা, তুমি যখন আনমনা হয়ে চুপটি করে ব'স, তখন কোন রঙ দেখতে পাও? একই রঙ না, নানা রকমের রঙ?"

চারুবাবু উত্তরে তাঁহাকে জানাইয়া দেন, সব সময়েই একটি গোলাপী রঙ তাঁহার দৃষ্টিগোচর হয়।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ভারতের মুক্তি সংগ্রামের এক নূতন অধ্যায় উন্মোচিত করিয়া দেয়। এ আন্দোলনের মধ্য দিয়া জাগিয়া উঠে সমগ্র দেশের সুপ্ত শক্তি। জাতীয় জীবনের এই মাহেন্দ্রক্ষণের প্রতীক্ষাই অরবিন্দ করিতেছিলেন। এবার বরোদা ত্যাগ করিয়া বিক্ষোভ-চঞ্চল বাংলার কর্ম্মক্ষেত্রে তিনি ঝাঁপাইয়া পড়িলেন।

গোড়ার দিকে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের স্থাপিত, জাতীয় কলেজের অধ্যক্ষ পদ তিনি গ্রহণ করিলেন। কিন্তু জীবনবিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ। ঘটনাচক্র অচিরে তাঁহাকে শিক্ষাব্রতীর জীবন হইতে সরাইয়া আনে, স্থাপন করে জাতীয় সংগ্রামের পুরোভাগে। মুক্তিযজ্ঞের পুরোধারূপে তিনি চিহ্নিত হইয়া উঠেন।

'বন্দে মাতরম্' পত্রিকার সম্পাদকরূপে এ সময়ে তাঁহার লেখনী হইতে যে বাণী নিঃসৃত হয় তাহা শুধু দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধই করে নাই, মুক্তি-সংগ্রামের চিন্তাধারায়ও আনিয়া দেয় বিপ্লব। প্রকাশ্যে সুস্পষ্ট ভাষায় সকলের আগে তিনি ঘোষণা করেন পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ।

স্বাধীনতার বাণীর সঙ্গে সঙ্গে অরবিন্দ জাগাইয়া তোলেন দেশের অধ্যাত্মচেতনা। যুগে যুগে যে আত্মিক রসধারা ভারতের প্রাণশক্তিকে

জাগ্রত করিয়াছে, সঞ্জীবিত রাখিয়াছে, সে সম্বন্ধেও তিনি দেশবাসীকে সজাগ করিয়া তুলিতে থাকেন।

ভারতের আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব ও ঈশ্বর-নির্দ্দিষ্ট ভূমিকা সম্বন্ধে রহিয়াছে অরবিন্দের সহজাত বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের বাণীই অপরূপ ভাবে ও ভঙ্গীতে তাঁহার 'বন্দে মাতরম্'-এর মাধ্যমে দিগ্বিদিকে ছড়াইতে থাকে। নবীন ভারতের অন্যতম চিন্তানায়ক ও রাজনৈতিক নেতারূপে তাঁহার অভ্যুদয় ঘটে।

সুরাট কংগ্রেসের সংঘর্ষে তিলক ও অরবিন্দের জয় ঘোষিত হয় এবং ইহার পর হইতেই জাতীয় কংগ্রেসের রূপান্তর ঘটে। আত্মপ্রতিষ্ঠ, সংগ্রামশীল প্রতিষ্ঠান হিসাবে শুরু হয় তাহার পদক্ষেপ।

সুরাট-সংঘর্ষ অরবিন্দের জীবনেও এক নূতন পর্ব্বের সূচনা করে। মনীষী চিন্তানায়ক এবার দেশের প্রকাশ্য রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে আসিয়া দাঁড়ান—পাদপ্রদীপের আলোকে গ্রহণ করেন জননেতার এক নূতন ভূমিকা।

কিন্তু বহিরঙ্গ জীবনের এ কর্ম্মচাঞ্চল্য তাঁহার অন্তরের শান্তিকে ব্যাহত করে নাই। নিষ্কাম কর্ম্মযোগী ইতিমধ্যেই সব কিছু হইতে অনেকটা নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া নিয়াছেন। বারীন্দ্রকুমার অরবিন্দের এই অন্তর্লীন রূপটি সুরাট কংগ্রেসের মঞ্চে ফুটিয়া উঠিতে দেখেন। তিনি লিখিয়াছেন,—সুরাট অধিবেশনে চারিদিকে তখন মার মার শব্দে ইট-পাটকেল নিক্ষিপ্ত হইতেছে। গরম ও নরম দলে সংঘর্ষ চলিতেছে। অরবিন্দ তখন মঞ্চের উপর নির্ব্বিকার ভাবে, প্রশান্তবদনে বসিয়া আছেন। পুলিশ আসিয়া সভাস্থল জনশূন্য করিবার পর সকলের শেষে কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে তিনি ধীরে ধীরে স্থান ত্যাগ করিলেন। এত বড় একটা আলোড়নের মধ্যেও চরিত্রের যে প্রশান্তি ও নির্লিপ্তি তিনি দেখান, সহকর্ম্মীদের মনে তাহা বিস্ময় জাগাইয়া তোলে।

এই ঘটনার অল্পকাল পরেই, এত রাজনৈতিক কর্ম্মতৎপরতার

মধ্যেও যোগী বিষ্ণুভাস্কর লেলের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সাহচর্য্য আমরা দেখিতে পাই। এই সময়ে লেলের নির্দ্দেশে অরবিন্দ বরোদার এক নির্জ্জন কক্ষে ক্রমাগত তিনদিন ধ্যানস্থ থাকেন। ধ্যান-তন্ময়তার ফলে সারা দেহে ও মনে জাগে এক দিব্য অনুভূতি, সর্ব্বসত্তায় ছড়াইয়া পড়ে নিস্তরঙ্গ প্রশান্তি।

এই সময়ে বোম্বাইয়ের ন্যাশনাল ইউনিয়নের এক বিরাট সভায় অরবিন্দকে ভাষণ দিতে হয়। তার আগে লেলে তাঁহাকে অন্তর্নিহিত শক্তি উদ্বোধনের এক যৌগিক কৌশল শিখাইয়া দেন। বলিয়া দেন, শ্রোতাদের নমস্কার করিয়া শান্ত চিত্তে তিনি যেন কিছুকাল অপেক্ষা করেন, তবেই তাঁহার মনের গভীরতম প্রদেশ হইতে অনর্গল ধারায় বাণী উৎসারিত হইবে। হইলও ঠিক তাহাই। জাতীয়তার আদর্শ ও স্বরূপ সম্বন্ধে যে উদ্দীপনাময়ী বাণী সেদিন অরবিন্দের কণ্ঠ হইতে নির্গত হয়, তাহা সকলের বিস্ময়ের সৃষ্টি করে।

অরবিন্দের এ সময়কার ভাষণগুলি উত্তর ও পশ্চিম ভারতের জনচিত্তে আলোড়ন তুলিয়া দেয়। জাতীয়তাবাদের এক নূতনতর ভাষ্য তাঁহার উদাত্ত কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হয়। তিনি বলেন, "আমাদের এই জাতীয়তার আন্দোলন স্বার্থমূলক নয়, উদ্দেশ্য প্রণোদিতও নয়। রাজনৈতিক লাভালাভের প্রশ্ন এতে জড়িত নেই। এ হচ্ছে একটি ধর্ম্ম, যাকে আশ্রয় করে আমরা বাঁচতে চেষ্টা করবো। এ একটা ধৃতি, যার সাহায্যে আমরা জাতির মধ্যে, দেশবাসীর মধ্যে ভগবানকে প্রত্যক্ষ করতে চাই। ভারতের এই ত্রিশ কোটি জনগণের মধ্যেই আমরা তাঁকে পাবার চেষ্টা করছি।"

নব জাতীয়তার এ এক অভূতপূর্ব্ব ব্যাখ্যা! ঘুমন্ত দেশবাসীর কাণে তো বার্ক, মিলের উক্তি শোনানো হইতেছে না! ফরাসী, মার্কিন মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসও তো আওড়ানো হইতেছে না! তিনি করিতেছেন দেশমাতৃকার মধ্যে ভগবৎসত্তার আরোপ। মুক্তিযজ্ঞের ঋত্বিক দেশকে দিতেছেন এক নূতন মন্ত্র, আর নূতন মন্ত্রচৈতন্য!

বলা বাহুল্য, বৃটিশ রাজশক্তি নীরব দর্শক হইয়া থাকে নাই, জাতীয়তাবাদের এই শক্তিধর নেতাকে চূর্ণ করিতে তাহা আগাইয়া আসে।

১৯০৭ সালে 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধের জন্য সম্পাদক অরবিন্দ ধৃত হন। সারা দেশময় সেদিন এক চাঞ্চল্য পড়িয়া যায়। কবি রবীন্দ্রনাথ এই সময়েই তাঁহার প্রশস্তি গাহিয়া লিখেন, —অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।

কবির সত্যদৃষ্টি সেদিন নবজাগ্রত ভারতের প্রাণপুরুষ অরবিন্দকে আবিষ্কার করে, ভারতাত্মার বাণীমূর্ত্তিকে প্রত্যক্ষ করে তাঁহার মধ্যে!

আইনের ফাঁক দিয়া অরবিন্দ ঐ মামলার অভিযোগ হইতে মুক্তি লাভ করিলেন।

এ সময়ে তিনি তাঁহার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সহকর্ম্মী, রাজা সুবোধ মল্লিকের গৃহে অবস্থান করিতেছেন। সদ্যমুক্ত নেতাকে সম্বর্দ্ধনা জানানোর জন্য কবি রবীন্দ্রনাথও সেদিন সেখানে আসিয়াছেন। আলিঙ্গন ও অভিনন্দন জ্ঞাপনের পর কবি রসিকতা করিয়া কহিলেন, "মশাই, আপনি কিন্তু আমায় ফাঁকিই দিলেন!" অর্থাৎ, অরবিন্দের জেল এড়ানোর ফলে কবির প্রশস্তিভরা কবিতাটি মাঠে মারা গেল।

অরবিন্দও সকৌতুকে উত্তর দিলেন, "বেশিদিনের জন্য নয়!" অর্থাৎ রাজরোষ আবার আসন্ন,—কবির কবিতা বৃথা যাইবে না।

কথাটি শীঘ্রই ফলিয়া যায়। তরুণ বিপ্লবীদের সঙ্গে, তাঁহাদের নায়ক হিসাবে অরবিন্দকে গ্রেপ্তার করা হয়। শুরু হয় বিখ্যাত আলিপুর বোমার মামলা। এই মামলা অরবিন্দ জীবনের মহত্তর অধ্যায়টিকে উদ্ঘাটিত করে, তাঁহার অধ্যাত্ম-জীবনের রূপান্তরকেও করে ত্বরান্বিত, সাধন জীবনের অন্তস্তলে যে জ্যোতির ঝলক মাঝে মাঝে দেখা দিত, এবার তাহা জ্যোতির্ম্ময় রূপ ধরিয়া আত্মপ্রকাশ করে।

অরবিন্দ জীবনের সর্ব্বস্তরেই দেখি এক নিষ্কাম্ কর্ম্মযোগীর মহিমময় রূপ। তাঁহার দাম্পত্য-জীবনের মধ্যেও দেখা যায় এক অদ্ভুত সংযম ও

নির্লিপ্তি। যে দিব্য চেতনায় তিনি উদ্বুদ্ধ হইয়াছেন, যে মহান্ ব্রত জীবনে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে সাহায্য করার জন্য তিনি পত্নী মৃণালিনী দেবীকে আহ্বান জানান।

স্ত্রীকে এ সময়ে এক চিঠিতে লেখেন, "আমার বিশ্বাস—ভগবান আমার যে গুণ, যে প্রতিভা, যে উচ্চশিক্ষা ও বিদ্যা, যে ধন দিয়াছেন, সবই ভগবানের ; যাহা পরিবারের ভরণপোষণে লাগে আর যাহা নিতান্ত আবশ্যকীয়, তাহাই নিজের জন্য খরচ করিবার অধিকার। যাহা বাকী রহিল তাহা ভগবানকে ফেরৎ দেওয়া উচিত। আমি যদি সবই নিজের জন্য, সুখের জন্য, বিলাসের জন্য খরচ করি, তাহা হইলে আমি চোর।...এই দুর্দ্দিনে সমস্ত দেশ আমার দ্বারে আশ্রিত। আমার ত্রিশ কোটি ভাই বোন এই দেশে আছে, তাহাদের মধ্যে অনেকে অনাহারে মরিতেছে। অধিকাংশই কষ্টে দুঃখে জর্জ্জরিত হইয়া কোনমতে বাঁচিয়া থাকে। তাহাদের হিত করিতে হয়। কি বল, এই বিষয়ে আমার সহধর্ম্মিণী হইবে ?"

দেশোদ্ধার ও জনকল্যাণের আদর্শের সঙ্গে সঙ্গে এখানে প্রাণের গূঢ়তম ইচ্ছাটির উল্লেখ করিতে তাঁহার ভুল হয় নাই। অধ্যাত্ম-মুক্তির প্রসঙ্গে স্ত্রীকে লিখিতেছেন, "যে কোন মতে ভগবানের সাক্ষাদ্দর্শন করিতে হইবে। ঈশ্বর যদি থাকেন তাহা হইলে তাঁহার সাক্ষাৎ করিবার কোন না কোন পথ থাকিবে। সে পথ যতই দুর্গম হোক, আমি সে পথে যাইবার দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়া বসিয়াছি। হিন্দু ধর্ম্ম বলে, নিজে শরীরের, নিজের মনের মধ্যে সেই পথ আছে। যাইবার নিয়ম দেখাইয়া দিয়াছে। সেই সকল পালন করিতে আরম্ভ করিয়াছি। এক মাসের মধ্যে অনুভব করিতে পারিলাম, হিন্দুধর্ম্মের কথা মিথ্যা নয়। যে যে চিহ্নের কথা বলিয়াছে সেই সব উপলব্ধি করিতেছি। এখন আমার ইচ্ছা তোমাকে সেই পথে নিয়া যাই।..."

দেখা যাইতেছে যে, নিজস্ব প্রেরণা ও চেষ্টাবলে বরোদা-জীবনেই অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহার বহুতর সাধন অনুভূতি হইতে থাকে।

তাই পত্নীর নিকট নিজের অন্তর্জ্জীবনের মর্ম্মকথা এসময়ে যেমন খুলিয়া বলিতেছেন, তেমনি তাঁহাকে এই নূতন জীবনের অংশ গ্রহণের জন্যও জানাইতেছেন সস্নেহ আহ্বান।

পতি ও পত্নীর মধ্যে একটি চমৎকার বুঝাপড়া ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠে। উভয়ের এ সময়কার এক মিলন কাহিনীতে ইহার কিছুটা নিদর্শন মেলে। রাজা সুবোধ মল্লিকের গৃহেই অরবিন্দ তখন বাস করিতেছেন। কলিকাতার রাজনৈতিক জীবন তখন বিক্ষোভময়। মুক্তিসংগ্রামের নব আদর্শ ও প্রেরণা নিয়া অরবিন্দ জাতীয় আন্দোলনের পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। চারিদিকে আসন্ন সংঘর্ষের উত্তেজনা। এমনি এক কর্ম্মচঞ্চল দিনে অরবিন্দের শ্বশুর ভূপালবাবু আসিয়া উপস্থিত। অরবিন্দকে তিনি সে রাত্রে ভোজনের নিমন্ত্রণ করিলেন। একথাও জানাইয়া দিলেন, তাঁহার কন্যা মৃণালিনী দেবী অরবিন্দের সহিত দেখা করার জন্যই কলিকাতায় আসিয়াছেন, তাই অরবিন্দ যেন তাঁহাদের ওখানেই সে রাত্রিটা কাটাইয়া আসেন।

সুবোধ মল্লিকের বাড়ীতে অন্তঃপুরিকাদের মধ্যে আলোড়ন পড়িয়া গেল। পতি-পত্নির আসন্ন মিলনের সংবাদে সকলেই মহা খুসী। মেয়েরা অরবিন্দের সাজসজ্জার যোগাড় শুরু করিলেন। ধবধবে গিলেকরা পাঞ্জাবী ও কোঁচানো ধুতি আনানো হইল। সংগৃহীত হইল সুগন্ধি বেলফুলের গোড়েমালা। অরবিন্দ নীরবে দাঁড়াইয়া মিটি মিটি হাসিতেছেন। উৎসাহিত হইয়া সকলে তাঁহাকে সাজাইতে লাগিলেন। শ্রীযুক্ত চারু দত্ত এ দিনের এক মনোরম চিত্র দিয়াছেন—

"যখন কামরা থেকে বেরিয়ে এলেন, তখন সাজগোজ করে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছিলো ওঁকে—সবচেয়ে সুন্দর, ঠোঁটের কোণে একটি সলজ্জ হাসি। আমরা তো সব দোরগোড়াতেই অপেক্ষা করছিলাম, ওঁকে জামাই বেশে দেখবার জন্য।

"লীলাবতী (চারুবাবুর স্ত্রী) এগিয়ে এসে মালা দুটি হাতে দিলে,

বললে,—'একটি আপনি পরাবেন দিদির গলায়, অন্যটি দিদি পরাবেন আপনার গলায়। ভুলবেন না যেন!'

"অরবিন্দ মিষ্টি হাসি হেসে জবাব দিলেন, 'তুমি যেমন বলছ, তেমনই আমি কোরব, লীলাবতী।"

সুবোধ মল্লিক মহাশয়ও অরবিন্দকে বারবার অনুরোধ জানাইলেন, রাত্রিটা যেন অবশ্য তিনি ওখানেই কাটাইয়া আসেন! তখনি বাড়ীর দারোয়ানকে বলিয়া দিলেন,—ফটক যেন বন্ধ থাকে, ঘোষ সাহেব রাত্রে আর ফিরিবেন না।

পরদিন ভোরে সকলে সবিস্ময়ে দেখিলেন, অরবিন্দ রোজকার মতই মল্লিক বাড়ীর চায়ের টেবিলে উপস্থিত। আগের রাত্রে তিনি বাড়ী ফিরিয়াছেন এবং বাহিরের দ্বার বন্ধ থাকায় দেওয়াল টপ্‌কাইয়াই তাঁহাকে ভিতরে ঢুকিতে হইয়াছে।

উৎসাহী বন্ধু বান্ধবীদের প্রশ্ন বর্ষণ শেষ হইলে অরবিন্দ বলিলেন, "এবার তবে শোন। চর্ব্ব্য-চোষ্য ভোজনের পর রাত্তির এগারোটার সময় আমি ফিরে এসেছি। লীলাবতী, মালা দুটি সম্বন্ধে তোমার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি।"

সকলে ব্যগ্রভাবে কহিলেন, "তা আপনি মাঝ রাত্তিরে পালিয়ে এলেন কেন? তেমন তো কথা ছিল না!"

অরবিন্দের চোখে মুখে কৌতুকের হাসি। উত্তরে বলিলেন, "আমি তাকে সব কথা বুঝিয়ে বলেছি; সে আমায় আসতে অনুমতি দিলে, তবে আমি এসেছি।"

স্বামীর জন্য ত্যাগ তিতিক্ষাময় জীবন যাপন করিলেও মৃণালিনী দেবী তাঁহার উত্তর-জীবনের সাধনার অংশভাগিনী হইতে পারেন নাই। অকালেই তাঁহার জীবন দীপ নিভিয়া যায়। অরবিন্দের বাংলা ত্যাগের প্রায় নয় বৎসর পরে তিনি দেহত্যাগ করেন।

মৃত্যুর পূর্ব্বে শ্রীরামকৃষ্ণ-সহধর্ম্মিণী সারদামণি দেবীর আশ্রয় ও আশীর্ব্বাদ মৃণালিনী লাভ করেন। চারুচন্দ্র দত্তের নিকট লিখিত এক

পত্রে এ বিষয়ে অরবিন্দ তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ঔদার্য্য ও আন্তরিকতা নিয়া লিখেন, "আমি জেনে সুখী হলাম যে, আমার স্ত্রী সাধনজীবনে এমন মহৎ আশ্রয় লাভ করেছে।"

রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ সম্বন্ধে গোড়ার দিকে অরবিন্দের বিপুল শ্রদ্ধা ছিল। 'ধর্ম্ম' পত্রিকায় এ সময়ে তিনি পরমহংসদেব সম্বন্ধে লিখেন, "যিনি পূর্ণ, যিনি যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তক, যিনি অতীত অবতারগণের সমষ্টি-স্বরূপ তিনি ভবিষ্যৎ ভারত দেখেন নাই বা তৎসম্বন্ধে কিছু বলেন নাই—একথা আমরা বিশ্বাস করি না। আমাদের বিশ্বাস, যাহা তিনি মুখে বলেন নাই, তাহা তিনি কার্য্যে করিয়া গিয়াছেন। তিনি ভবিষ্যৎ ভারতের প্রতিনিধিকে আপন সম্মুখে বসাইয়া গঠিত করিয়া গিয়াছেন। এই ভবিষ্যৎ ভারতের প্রতিনিধি স্বামী বিবেকানন্দ। অনেকে মনে করেন যে, স্বামী বিবেকানন্দের স্বদেশপ্রেমিকতা তাঁহার নিজের দান। কিন্তু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, তাঁহার স্বদেশপ্রেমিকতা তাঁহার পরম পূজ্যপাদ গুরুদেবের দান।···

"তিনি (স্বামী বিবেকানন্দ) জন্ম হইতেই বীর, ইহা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ভাব। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহাকে বলিতেন, 'তুই যে বীর রে!" তিনি জানিতেন যে, তাঁহার ভিতর যে শক্তি সঞ্চার করিয়া যাইতেছেন, কালে সেই শক্তির উদ্ভিন্ন ছটায় দেশ প্রখর সূর্য্যকরজালে আবৃত হইবে। আমাদের যুবকগণকেও এই বীরভাব সাধন করিতে হইবে! তাহাদিগকে বে-পরওয়া হইয়া দেশের কার্য্য করিতে হইবে এবং অহরহ এই ভগবৎবাণী স্মরণপথে রাখিতে হইবে, 'তুই বীর রে' !"

'ভারতের প্রাণ পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ' প্রবন্ধে অরবিন্দ এসময়ে 'ধর্ম্ম' পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন, "বিগত পাঁচশত বৎসরের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মত দ্বিতীয় একটি পুরুষ পৃথিবীতে আবির্ভূত হন নাই।"

আলিপুর বোমার মামলার প্রাক্কালে অরবিন্দের বাসস্থানে জোর খানাতল্লাসি হয়। এ সময়ে এক মজার ঘটনা ঘটে। রামকৃষ্ণদেবের

উপর অরবিন্দ সে সময়ে বড় শ্রদ্ধাশীল। তাঁহার নানা লেখায় এ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের প্রশস্তি দেখা যাইত। এ সময়ে দক্ষিণেশ্বরের কিছুটা পবিত্র মাটিও তিনি শ্রদ্ধাভরে নিজের ঘরে রাখিয়া দিয়াছিলেন। পুলিশ কিন্তু উহাকে বোমার মশলা ভাবিয়া সন্দিগ্ধ হইয়া পড়িল।

অরবিন্দ লিখিয়াছেন, “ক্ষুদ্র কার্ড বোর্ডের বাক্সে দক্ষিণেশ্বরের যে মাটি রক্ষিত ছিল, ক্লার্ক সাহেব (পুলিশ অফিসার) তাহা বড় সন্দিগ্ধ চিত্তে নিরীক্ষণ করিতে থাকেন। তাঁহার সন্দেহ হয়, এটা কোন ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণশীল পদার্থ। এক হিসাবে ক্লার্ক সাহেবের সন্দেহ যে ভিত্তিহীন তাহা বলা যায় না। শেষকালে অবশ্য এই সিদ্ধান্তই করা হয় যে ইহা মাটি ভিন্ন আর কিছু নয় এবং রাসায়নিক বিশ্লেষণকারীর নিকট পাঠানো নিতান্ত অনাবশ্যক।”

দক্ষিণেশ্বরের পবিত্র মৃত্তিকায় যে এ যুগের এক বিস্ফোরক শক্তি আত্মগোপন করিয়া আছে, ইহার অধ্যাত্ম-প্রভাব যে সুদূরপ্রসারী হইবে—এ বিশ্বাস অরবিন্দের ছিল। অবশ্য সেদিন ভারতবর্ষের খুব কম লোকই ইহার তাৎপর্য্য বা গুরুত্ব বুঝিতে সক্ষম হয়।

আলিপুর বোমার মামলা শুরু হইয়াছে। নিষ্কাম কর্ম্মযোগের সাধক অরবিন্দ কিন্তু বাহিরের সব কিছু আলোড়ন ও হৈ-চৈ হইতে নিজেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করিয়া নিয়াছেন। ভিতরে তাঁহার রহিয়াছে পরম প্রশান্তি ও নির্ব্বিকার ভাব।

এ সময়ে কারাকক্ষে থাকাকালে এক অলৌকিক অনুভূতি তাঁহার জীবনে আত্মপ্রকাশ করে। অরবিন্দ নিজে ইহার বর্ণনায় লিখিতেছেন ঃ “এইখানে ক্ষুদ্র ঘরের দেওয়ালটি হইতেছে আমার সঙ্গী, নিকটে আসিয়া ব্রহ্মময় হইয়া ইহা আমাকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত।... উদ্যানের দেওয়ালের গায়ে একটি বৃক্ষ ছিল, তাহার নয়নরঞ্জক সবুজ লাবণ্যে প্রাণ জুড়াইলাম। ছয় ডিগ্রীর ছয়টি ঘরের সামনে যে সান্ত্রী ঘুরিয়া বেড়ায়, তাঁহার মুখ ও পদশব্দ ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মুখ ও ঘোরাফেরার

মত প্রিয় বোধ হইত। ঘরের পার্শ্ববর্ত্তী গোয়ালঘরের কয়েদীরা ঘরের সম্মুখ দিয়া গরু চরাইতে যায়, এই গরু ও গোয়াল নিত্যকার প্রিয় দৃশ্য ছিল। আলিপুরের নির্জ্জন কারাবাসে আমি অপূর্ব্ব প্রেম শিক্ষা পাইলাম।"

ইহার পর তাঁহার অধ্যাত্মসত্তায় আসে এক বিরাট পরিবর্ত্তন। কারাগারের চারিদিকের পরিবেশ এবং ভিতরকার সমস্ত কিছু যেন জীবন্ত ও চৈতন্যময় হইয়া উঠে।

প্রসিদ্ধ উত্তরপাড়া-অভিভাষণে তাঁহার কারাকক্ষের অতীন্দ্রিয় অনুভূতির বর্ণনা অরবিন্দ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "তারপর তিনি আমার হাতে গীতা দিলেন। তাঁর শক্তি আমার মধ্যে প্রবেশ ক'রল এবং আমি গীতার সাধনা অনুসরণ করতে সক্ষম হলাম। আমাকে শুধু বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে হয়নি, পরন্তু অনুভূতি ও উপলব্ধির ভেতর দিয়ে জানতে হয়েছিল শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের কাছে কি চেয়েছিলেন ......।

"যখন আমি পাদচারণা করতাম সেই সময়ে তাঁর শক্তি পুনরায় আমার মধ্যে প্রবেশ ক'রল। যে-জেল আমাকে মানব-জগৎ থেকে আড়াল করে রেখেছে, সেইদিকে আমি তাকালাম। কিন্তু দেখলাম, আমি আর জেলের উচ্চ দেয়ালগুলোর মধ্যে বন্দী নেই। আমাকে ঘিরে রয়েছেন বাসুদেব!"

কংসের কারাগারে ভগবান বাসুদেব ভূমিষ্ঠ হন। আর সেদিন ইংরেজের বন্দীশালায় অরবিন্দের জীবনে উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠে সেই বাসুদেবেরই চৈতন্যময় সত্তা। সূক্ষ্ম দৃষ্টি তাঁহার সেদিন খুলিয়া গিয়াছে। চারিদিকের সব কিছু দেখিতেছেন পরম চৈতন্যে পরিপূর্ণ। ইটপাথর, কারাগারের লৌহদ্বার সবই সজীব এবং প্রাণবন্ত। এক অলৌকিক, জ্যোতির স্ফুরণ সর্ব্বদিকে। জেলের কয়েদী হইতে আরম্ভ করিয়া মামলার উকিল, বিচারক অবধি সবই যেন সচ্চিদানন্দময় হইয়া উঠিয়াছে, সব কিছুতেই ওতপ্রোত রহিয়াছে বিশ্বাত্মার প্রাণস্পন্দন!

এই সময়কার অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে আরও বলিতেছেন, "এক একবার এমন বোধ হইত, যেন ভগবান সেই বৃক্ষতলে আনন্দের বাঁশীটি বাজাইতেছেন, দাঁড়াইয়া আছেন, সেই মাধুর্য্যে আমার হৃদয় আকর্ষণ করিতেছেন। সর্ব্বদা বোধ হইতে থাকে, কে যেন আমাকে আলিঙ্গন করিতেছে, কে যেন আমাকে কোলে করিয়া রাখিয়াছে। এই ভাবের বিকাশ আমার সমস্ত মন প্রাণ অধিকার করিয়া নিল। কি এক নির্ম্মল মহান্ শান্তি বিরাজ করিতে লাগিল, তাহা বর্ণনা করা যায় না। প্রাণের কঠিন আবরণটি আমার খুলিয়া গেল।"

নব-উৎসারিত এই অধ্যাত্মস্রোতই অরবিন্দের তীব্র দেশপ্রেমকে মানবতার এক সর্ব্বজনীন বোধে রূপান্তরিত করে, মহাপ্রেমের দিকে তাঁহাকে টানিয়া নেয়।

প্রতিভাবান কৌঁসুলী শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশের দৃষ্টিতে অরবিন্দ জীবনের এই নূতন রূপটি সেদিন ধরা পড়ে। সওয়াল করার সময় ওজস্বিনী ভাষায় এই সাধক-রাজবন্দীর জীবনাদর্শ ব্যাখ্যা করিয়া তিনি সেদিন যে মন্তব্য প্রকাশ করেন, তাহা যেন এক দৈববাণীরই ইঙ্গিত বহন করিয়া আনিয়াছিল।

বিচারক মিঃ বীচ্‌ক্রফ্‌টের সম্মুখে দাঁড়াইয়া চিত্তরঞ্জন অরবিন্দ সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "এই বিতণ্ডা, কোলাহল ও আন্দোলন স্তব্ধ হবার বহুকাল পরে, এঁর অন্তর্দ্ধানের দীর্ঘকাল পরে, মানবসমাজ এঁকে স্বদেশ প্রেমের মহাকবি, জাতীয়তার প্রবর্ত্তক ও মানবপ্রেমিক বলে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করবে। এঁর তিরোধানের দীর্ঘকাল পরে এঁর বাণী, শুধু ভারতবর্ষেই নয়, সাগরপারের দূরদূরান্তে ধ্বনিত হতে থাক্‌বে।"

উত্তরকালে চিত্তরঞ্জনের এই উক্তি সত্য হইয়া উঠে।

এই সময়ে, কারাগারের মধ্যে অরবিন্দ দুইটি বাণী প্রাপ্ত হন। এই বাণীরই প্রত্যাশায় তিনি যেন উন্মুখ হইয়া ছিলেন। তিনি এ সম্পর্কে বলিয়াছেন, "যোগসিদ্ধির, জন্য আমি অনেকদিন ধরে চেষ্টা করেছিলাম

এবং শেষ পর্য্যন্ত আমি তা কতকটা আয়ত্ত করতেও পেরেছিলাম, কিন্তু যা সবচেয়ে বেশী চাইতাম তা পাইনি, সন্তুষ্ট হতেও পারিনি। তারপর জেলের নিঃসঙ্গতার মধ্যে, নির্জ্জন সেলের মধ্যে আবার তা পেলাম। আমি বললাম—প্রভু, দাও আমাকে তোমার আদেশ; আমি জানি না কি কাজ আমাকে করতে হবে, কেমন করে করতে হবে। আমাকে তুমি একটি বাণী দাও!"

এই প্রার্থনার উত্তরে দুইটি বাণী অরবিন্দ এ সময়ে লাভ করেন। একটি জানায় জাতির পুনরুত্থানে সাহায্য করার নির্দ্দেশ, অপরটিতে নিহিত থাকে অধ্যাত্মভারতের ঈশ্বর-নির্দ্দিষ্ট ভূমিকার কথা। অরবিন্দ এই বাণীর বর্ণনায় বলিয়াছেন,—'এই এক বৎসর নির্জ্জনবাসে তোমাকে দেখান হয়েছে এমন কিছু, যার সম্বন্ধে তোমার সন্দেহ ছিল এবং তা হচ্ছে হিন্দুধর্ম্মের মৌলিক সত্যতা। এই ধর্ম্মটিকে আমি জগতের সামনে তুলে ধরছি; ঋষি, সন্ত, অবতারদের ভেতর দিয়ে এই ধর্ম্মটিকে আমি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করে গড়ে তুলেছি; আর এখন এ ধর্ম্ম যাচ্ছে সর্ব্ব জাতির মধ্যে আমার কাজ সম্পন্ন করতে। আমার বাণী প্রচার করবার জন্যেই আমি এই জাতিটাকে তুলছি। এইটিই সনাতন ধর্ম্ম, তুমি এই ধর্ম্মকে আগে বাস্তবিক পক্ষে জানতে না, কিন্তু এখন আমি এটি তোমার কাছে প্রকাশ করছি। *** যখন তুমি বাইরে যাবে তোমার জাতিকে সর্ব্বদা এই বাণীই শোনাবে যে, সনাতন ধর্ম্মের জন্যই তারা উঠছে, নিজেদের জন্য নয়—সমস্ত জগতের জন্যই তারা উঠছে। আমি তাদের স্বাধীনতা দিচ্ছি জগতের সেবার জন্যে।'

এই দিব্য বাণীর প্রেরণা অরবিন্দের উত্তরজীবনকে প্রভাবিত করিয়াছে।

কারাগার হইতে মুক্তি পাইয়া অরবিন্দ 'কর্ম্মযোগিন্' ও 'ধর্ম্ম' এই দুইটি সাপ্তাহিকের মধ্য দিয়া তাঁহার আদর্শ প্রচার করিতে থাকেন। মুক্তি সংগ্রাম, আর ইংরেজ সরকারের দমন নীতি উভয়ই তখন প্রচণ্ড

হইয়া উঠিয়াছে। তেমনি অপর দিকে অরবিন্দের অন্তর্জ্জীবনেও সাধিত হইয়াছে বৈপ্লবিক রূপান্তর। আধ্যাত্মিক নেতৃত্বের নূতনতর ভূমিকার দিকে এবার তিনি আগাইয়া চলেন। রাজনৈতিক জীবন হইতে নিজেকে সংহরণ করিয়া নেন, তারপর নিমজ্জিত হইতে থাকেন অধ্যাত্মজীবনের অমৃতসত্তায়।

ইহার পর তাঁহার জীবনে আসে এক নূতনতর পটপরিবর্ত্তন। রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও কলিকাতার কর্ম্মমুখর জীবন ত্যাগ করিয়া কিছুদিন তিনি চন্দননগরে গিয়া আত্মগোপন করেন। তারপর উপস্থিত হন পণ্ডিচেরীতে। অরবিন্দের অন্যতম সহকর্ম্মী শ্রীরামচন্দ্র মজুমদার তাঁহার কলিকাতা ত্যাগের কাহিনীটি বর্ণনা করিয়াছেন।

তিনি লিখিয়াছেন, "আমি জনৈক সি-আই-ডির নিকট হইতে সংবাদ পাই যে, শ্রীঅরবিন্দকে শীঘ্রই গ্রেপ্তার করা হইবে, এবং খুব সম্ভব শামসুল আলমের হত্যার মামলায় তাঁহার নামে ওয়ারেণ্ট বাহির হইবে। এই সংবাদ আমরা পূর্ব্বেই আরও দুই স্থান হইতে পাই। সংবাদ পাইয়াই আমি কৃষ্ণকুমারবাবুর বাড়ী ছুটিলাম এবং শ্রীঅরবিন্দকে সংবাদ দিলাম। তিনি ধীর চিত্তে ইহা শুনিয়া আমাকে সঙ্গে লইয়া 'কর্ম্মযোগিন্' অফিসে আসিলেন।

"প্রথমে জামিনদার ঠিক করিয়া রাখিবার পরামর্শ হইল। পরে বলিলেন, 'নিবেদিতাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আইস'। আমি ভগিনী নিবেদিতার বাড়ী গেলাম। তাঁহার সঙ্গে পূর্ব্ব হইতেই পরিচয় ছিল। বরোদায় নিবেদিতার সঙ্গে প্রথম আলাপ হয়, নিবেদিতা তাঁহাকে স্বামীজীর 'রাজযোগ' উপহার দেন। অরবিন্দবাবু বলিতেন যে, এই পুস্তক পড়িয়াই তাঁহার হিন্দুদর্শন পড়িবার আগ্রহ হয়। ভগিনী নিবেদিতা 'কর্ম্মযোগিন্'-এ প্রবন্ধ লিখিতেন। যে-সময়ে অরবিন্দবাবু চন্দননগরে লুকাইয়া ছিলেন, সে-সময় নিবেদিতাই কাগজখানি চালাইয়া ছিলেন। ······যাহা হউক ভগিনী নিবেদিতাকে সকল ঘটনা বলিলাম।

"তিনি শুনিয়া বলিলেন,—তোমাদের নেতাকে আত্মগোপন করতে বল, এ আত্মগোপনের পর তিনি তাঁর মধ্যবর্ত্তীদের ভেতর দিয়ে অনেক কিছু কাজ করতে পারবেন।

"একদিন অরবিন্দবাবু আমাকে বলিয়াছিলেন,—'মা কালী সেদিন আমাকে সিষ্টার নিবেদিতার মাধ্যমে আত্মগোপনের আদেশ দেন··· ঐ সংবাদ লইয়া আমি অফিসে ফিরিলাম। অরবিন্দবাবু বলিলেন,—বেশ, তবে সব ব্যবস্থা ক'র।

"গঙ্গার ঘাটে পৌঁছিবার পূর্ব্বে বোসপাড়া লেনে অরবিন্দবাবু ভগিনী নিবেদিতার বাসায় গিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিয়াছিলেন। ······বোধ হয় নিবেদিতার সঙ্গে তিনি 'কর্ম্মযোগিন্' পরিচালনার পরামর্শ করিয়াছিলেন। এই কথাবার্ত্তার সময় আমরা কেহ উপস্থিত ছিলাম না।"

অরবিন্দ চন্দননগরে কিছুকাল আত্মগোপন করেন। তারপর তিনি সমুদ্রপথে পণ্ডিচেরীতে অবতরণ করেন।

চন্দননগরে অবস্থান করার সময়েই দেখা যায়, ইতিমধ্যে তাঁহার মানসলোকে এক বিরাট পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গিয়াছে। বহির্জ্জগতের সমস্ত চাঞ্চল্য ও ধূলিঝঞ্ঝার ঊর্দ্ধে এক অপূর্ব্ব ঔদাসীন্য ও নির্লিপ্তি নিয়া তিনি বিরাজমান। মাঝে মাঝে অতীন্দ্রিয় জগতের রুদ্ধদ্বার কি করিয়া যেন উন্মোচিত হইয়া যায়। ফুটিয়া উঠে জ্যোতির্ম্ময় অক্ষরের মালা, অবাক বিস্ময়ে তিনি চাহিয়া থাকেন।

এ সময়ে মতিলাল রায়ের গৃহে তিনি লুকাইয়া আছেন। সেদিন মতিলালবাবুর কৌতূহলী প্রশ্নের উত্তরে বলেন, "কতকগুলি আলোর লিপি কেবলই আমার চোখের সামনে ভেসে ভেসে আসে, এদের অর্থ বার করবার চেষ্টা করি।"

আবার একদিন তাঁহাকে বলিতে শোনা যায়, "অদৃশ্য সূক্ষ্ম জগতে যে সব দেবতা আছেন, তাঁদের অনেকেরই আকার ফুটে উঠে।

অক্ষরের মত এই সব মূর্ত্তিও অর্থব্যঞ্জক—কি এরা জানাতে চায় তাও উপলব্ধি করতে চেষ্টা করি।”

অলৌকিক জগতের, অধ্যাত্মলোকের কপাট এবার খুলিয়া গিয়াছে। সেখানকার নানা ইঙ্গিত, নানা নিদর্শন সাধক অরবিন্দ এক একদিন প্রাপ্ত হইয়াছেন।

১৯১০ সালের ৪ঠা এপ্রিল অরবিন্দ পণ্ডিচেরীতে গিয়া উপস্থিত হন। রাজনৈতিক ভাঙ্গাগড়ার উন্মাদনা, সংসারের বন্ধন, আত্মীয়বন্ধুদের আকর্ষণ, সমস্ত কিছু নির্ব্বিচারে পরিত্যাগ করিয়া আপন সাধনায় তিনি নিমগ্ন হইয়া যান। শুরু হয় প্রেরিত পুরুষের একান্ত সাধনা। পণ্ডিচেরীর সাগর তীরে তাঁহার অভিনব যোগাশ্রম গড়িয়া উঠিতে থাকে।

নিজের যোগলব্ধ শক্তির প্রভাবে দেশের মুক্তি আনিবেন, মানবাত্মার আত্মিক বিকাশের সম্ভাবনাকে করিয়া তুলিবেন সার্থক—ইহাই ছিল তাঁহার অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাস।

শ্রীযুক্ত মতিলাল রায়কে তিনি এ সময়ে এক পত্রে লিখেন, “একটা জিনিষ উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিও,—যে কাজ আমরা করিতে চাহিতেছি ইহার ফল সে পর্য্যন্ত বৈষয়িক জগতে ফলপ্রসূ হইতে পারিবে না, যে পর্য্যন্ত না আমার অষ্টসিদ্ধি ততখানি প্রবল হয়—যতখানি হইলে এই বস্তুতন্ত্রবাদী মর্ত্ত্যের উপর উহা সমগ্রভাবে কলের মত কাজ করিতে পারে।”

সাধনার আরও গভীরে প্রবিষ্ট হইবার পর অরবিন্দ জীবনে অধ্যাত্মরূপান্তর যেমন ঘটে, তেমনই স্পষ্টতর রূপ পরিগ্রহ করে তাঁহার দার্শনিক জীবনবাদ। মানব সমাজকে দিব্য জীবনের আদর্শ গ্রহণে তিনি আহ্বান জানান।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিচেরী হইতে ‘আর্য্য’ পত্রিকা প্রকাশিত হইতে থাকে, আর প্রধানতঃ ইহারই মাধ্যমে অরবিন্দ তাঁহার নবতম আদর্শ জনচৈতন্যের সম্মুখে তুলিয়া ধরেন।

মহাসাধকের তপস্যার প্রভাব এবার ক্রমে দূরবিস্তারী হইতে থাকে। পণ্ডিচেরীর সহায়-সম্পদহীন পরিবেশে ধীরে ধীরে শ্রীঅরবিন্দ-আশ্রম গড়িয়া উঠে, বিশ্বের দিগ্বিদিকে তাঁহার দার্শনিক আদর্শ এবং অধ্যাত্মসাধনার পথনির্দ্দেশ ছড়াইয়া পড়ে।

নিজের দর্শনতত্ত্ব অরবিন্দ ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাঁহার অবিস্মরণীয় অবদান, লাইফ্-ডিভাইন গ্রন্থে। দিব্য জীবনের অভিনব তত্ত্ব তিনি ইহার মাধ্যমে প্রচার করিয়াছেন।

এই 'দিব্য জীবন' হইতেছে তাঁহার আদর্শ ও তত্ত্বের দিক, আর তাঁহার 'পূর্ণযোগ' সেই তত্ত্বেরই ব্যবহারিক প্রয়োগের দিক। 'লাইফ ডিভাইন' গ্রন্থে তিনি দিব্য জীবনের বার্ত্তা ও তত্ত্বের নিপুণ বিশ্লেষণ দিয়াছেন। আর তাঁহার 'সিন্থেসিস্ অব যোগ' গ্রন্থে স্থাপন করিয়াছেন 'পূর্ণাঙ্গ' বা সমন্বয়ধর্ম্মী যোগের পদ্ধতি।

অরবিন্দ-দর্শনের ভিত্তি হইতেছে বিবর্ত্তন-ক্রিয়া। প্রকৃতির চরম ও পরম পরিণতির কথা প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন, "মন ও প্রাণ যেমন জড় হইতে মুক্তি পাইয়াছে, তেমনি যথাসময়ে সৃষ্টির অন্তর্নিহিত সুগোপন ভগবৎ-সত্তার মহত্তর শক্তিগুলি আবরণ ভেদ করিয়া ফুটিয়া উঠিবে এবং উপর হইতে তাহাদেয় পরম জ্যোতি আমাদের মধ্যে অবতীর্ণ হইবে।" তাঁহার মতে, পৃথিবীতে এমনিভাবে সম্ভাবিত হইয়া উঠিবে অতিমানসের মহাপ্রকাশ!

নূতন মানব জাতির কথা, নূতন মানস উপাদান সমন্বিত নূতন মানবের কথা, ইতিপূর্ব্বে অন্য মনীষী ও দার্শনিকেরাও বলিয়াছেন। কিন্তু অরবিন্দ ঘোষণা করিলেন, প্রকৃতির মধ্যেই এ সাধন প্রণালী রহিয়াছে, ইহা শুধু অন্তর্নিহিত নয়, ক্রিয়াশীলও বটে। আশ্বাস দিয়া তিনি আরো কহিলেন, মানুষের চেষ্টায় ও সাধনায় অতিমানসের অবতরণ অথবা শ্রেষ্ঠতর ও মহত্তর বিবর্ত্তনকে ত্বরান্বিত করা যায়।

যে ত্যাগ-তিতিক্ষা ও অনলস কর্ম্মসাধনার মধ্য দিয়া অরবিন্দের সাধনজীবন সফল হইয়া উঠে তাহা অনেকেরই জানা নাই। সাধন-

জীবনের এ সংগ্রাম সম্পর্কে তিনি তাঁহার এক পত্রে অন্তরঙ্গ শিষ্য, দিলীপকুমার রায়কে লিখিয়াছেন—

"এটা নিতান্তই অদ্ভুত কথা যে—আমি অতিমানস সিদ্ধির উপযুক্ত মানসিক ধৃতি নিয়েই জন্মগ্রহণ করেছিলাম এবং আমাকে জীবনের কঠোর বাস্তবতার সম্মুখীন হতেই হয় নি। কিন্তু ভগবান জানেন, আমার সারা জীবনেই চলেছে নিষ্করুণ বাস্তবতার বিরুদ্ধে এক অবিচ্ছিন্ন সংগ্রাম। ইংলণ্ড জীবনের নানা দুঃখ কষ্ট ও অনশন থেকে শুরু করে পণ্ডিচেরী জীবনের নানা ঘোরতর অসুবিধা ও বিপদের মধ্য দিয়ে আমি এসেছি—বহির্জীবন ও অন্তর্লোক উভয় ক্ষেত্রেই আত্মপ্রকাশ করেছে বহুতর অন্তরায়।

"আমার জীবন বরাবরই হয়েছে একটা যুদ্ধবিশেষ, আর আজ যে আমি এখানকার দোতলায় বসে আমার অধ্যাত্মশক্তি ও অপরাপর বহিরঙ্গ শক্তি-বলে সংঘর্ষ চালিয়ে যাচ্ছি, তাতে আমার এই যুদ্ধের স্বরূপ বদ্‌লায়নি। তবে এটা ঠিক, এসব কথা উচ্চস্বরে চীৎকার করে আমি কখনো বলিনি। তাই বাইরে থেকে স্বভাবতঃই একজন সমালোচকের মনে হবে যে, আমি বাস করছি একটা জাঁকজমকপূর্ণ, কল্পনাবিলাসী ভাবরাজ্যে, যেখানে বাস্তব জীবনের কঠোরতা কোনদিন দেখা দেয়নি। কিন্তু এটা কি একটা প্রকাণ্ড ভুল নয়?"

সাধনা ও সিদ্ধির ইঙ্গিতটি দিয়া আর এক চিঠিতে লিখিতেছেন, "কিন্তু প্রতিদিন, দীর্ঘ বৎসরব্যাপী পাঁচ ছয় ঘণ্টার একাগ্র চিন্তার ফলেই আমার ভেতরে ঐশী শক্তির অবতরণ ঘটতে পেরেছিল—এসব গল্প তোমাদের কে বলেছে, বলতো? যদি একাগ্র চিন্তাকে কঠোর ও প্রয়াসশীল ধ্যান বল, তাহলে এটা কিন্তু আমার জীবনে কখনো ঘটেনি। যা আমি নিয়মিত করেছি তা হচ্ছে চার পাঁচ ঘণ্টা প্রাণায়াম—সে অবশ্য স্বতন্ত্র ব্যাপার।

"আর কোন্ ঊর্দ্ধ লোকের ধারার কথা তুমি ব'লছো? কবিতার স্রোত তো এসেছিলো, যখন আমি প্রাণায়াম করি তখন,—তার কয়েক

বৎসর পরে মোটেই নয়। যদি অনুভূতির প্রবাহের কথা বল, তা এসেছিল দীর্ঘদিন যাবৎ প্রাণায়াম বন্ধ করার পরে—যখন আমি নিষ্ক্রিয় হয়ে বসেছিলাম—কি করবো, এবং সর্ব্ব প্রচেষ্টা বিফল হবার পরে কোন্ দিকে আবার প্রয়াস শুরু করবো, তারও যখন কিছু ঠিক ছিল না।

"তাছাড়া, এটা দীর্ঘ বৎসরের প্রাণায়ামের ফলে উৎসারিত হয়নি, বরং সে সময়ে প্রাপ্ত এক গুরুর কৃপায় নিতান্ত অদ্ভুতভাবে এবং সহজ-রূপে হয়েছিল। শুধু সেই গুরুর কৃপা বললেও হয় তো ঠিক হবে না ---কারণ সেই গুরু নিজেও এর আবির্ভাব দেখে নিতান্ত বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলেন। হয়তো বা এটা পরমব্রহ্ম বা মহাকালী অথবা কৃষ্ণের কৃপায়ই সম্ভব হয়েছিল।"

অরবিন্দের অপূর্ব্ব প্রশস্তিটি ১৯০৮ সালে উদ্গীত হয় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে—১৯২৮ সালের দর্শনে কবি তাঁহার সেই প্রশস্তিকেই রূপায়িত হইতে দেখেন। সে দিনকার এই দর্শনের কথা কবিবর তাঁহার অনুপম ভাষায় বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন—"প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝলুম, ইনি আত্মাকেই সবচেয়ে সত্য করে চেয়েছেন, সত্য করে পেয়েছেন। সেই তাঁর দীর্ঘ তপস্যার চাওয়া ও পাওয়ার দ্বারা তাঁর সত্তা ওতপ্রোত। আমার মন বল্‌লে, ইনি এঁর অন্তরের আলো দিয়েই বাইরের আলো জ্বালাবেন, আপনার মধ্যে ঋষি পিতামহের এই বাণী অনুভব করেছেন, যুক্তাত্মানঃ সর্ব্বমেবাবিশন্তি। পরিপূর্ণের যোগে সকলেরই মধ্যে প্রবেশাধিকার, আত্মার শ্রেষ্ঠ অধিকার।

"আমি তাঁকে বলে এলুম, 'আত্মার বাণী বহন করে আপনি আমাদের মধ্যে বেরিয়ে আসবেন, এই অপেক্ষায় থাকবো। সেই বাণীতে ভারতের নিমন্ত্রণ বাজবে,—শৃন্বন্তু বিশ্বে। প্রথম তপোবনে শকুন্তলার উদ্বোধন হয়েছিল যৌবনের অভিঘাতে, প্রাণের চাঞ্চল্য। দ্বিতীয় তপোবনে তার বিকাশ হয়েছিল আত্মার শান্তিতে। অরবিন্দকে

তাঁর যৌবনের মুখে ক্ষুব্ধ আন্দোলনের মধ্যে যে তপস্যার আসনে দেখেছিলুম সেখানে তাঁকে জানিয়েছি—অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার…! আজ তাঁকে দেখলুম তাঁর দ্বিতীয় তপস্যার আসনে, অপ্রগল্‌ভ স্তব্ধতায়—আজও তাঁকে মনে মনে বলে এলুম—অরবিন্দ রবীন্দ্রনাথের লহ নমস্কার।"

১৯৫০ সালের ৫ই ডিসেম্বর সমাগত হয় শক্তিধর মহাপুরুষের মহা-সমাধির লগ্ন। মরদেহ ত্যাগ করিয়া অরবিন্দ দিব্যলোকে অন্তর্হিত হন। মুক্তির যে অত্যুগ্র সাধনা প্রথম জীবনে তাঁহার রাজনৈতিক সংগ্রামের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে, মানবাত্মার পরম মুক্তির পথে সেই সাধনারই সেদিন ঘটে মহা-উত্তরণ!

4900048

Batanefan